لا اله الا الله محمد رسول الله

সাহিত্য সংস্কৃতি

সী রা তু ন্ন বী [সা.] ২০০৮ হিজরী ১৪২৯

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৮

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১ গ্রীনওয়ে, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৮

প্র কা শ কা ল

জমাদিউস সানী ১৪২৯

আষাঢ় ১৪১৫

জুন ২০০৮

প্র চ্ছ দ

মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্র কা শ না য়

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১ গ্রীনওয়ে, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩৩৩৩২০

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

সাইফুল্লাহ মানছুর

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

সদস্য

হাসান আলীম

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

নাসির হেলাল

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

আলতাফ হোসাইন রানা

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

পরিচালনা পরিষদ ২০০৮

সভাপতি	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
সহকারী সেক্রেটারী	:	মোঃ আবেদুর রহমান
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
মিডিয়া সম্পাদক	:	মাহবুবুল হক
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সাহিত্য সম্পাদক	:	মোশাররফ হোসেন খান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শাহ আলম নূর
প্রকাশনা সম্পাদক	:	নাসির হেলাল
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	:	আবদুর রহীম খান
অফিস ও পাঠাগার সম্পাদক	:	মোঃ বিল্লাল হোসেন

জোনাল দায়িত্বশীল

জোন-এক

সভাপতি	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সেক্রেটারী	:	শাহ আলম নূর

জোন-দুই

সভাপতি	:	মোঃ আবেদুর রহমান
সেক্রেটারী	:	হারুন ইবনে শাহাদাত

জোন-তিন

সভাপতি	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সেক্রেটারী	:	মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

জোন-চার

সভাপতি	:	মোঃ আমিনুল ইসলাম
সেক্রেটারী	:	আবদুর রহীম খান

জোন-পাঁচ

সভাপতি	:	হাসান আলীম
সেক্রেটারী	:	আবদুল্লাহ আল মামুন

জোন-ছয়

সভাপতি	:	মাহফুজ চৌধুরী
সেক্রেটারী	:	শরীফ আবদুল গোফরান

টিম সদস্য

আসাদ বিন হাফিজ
মোঃ আবেদুর রহমান
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
হাসান আলীম
মোঃ আমিনুল ইসলাম
মাহফুজ চৌধুরী

www.pathagar.com

দম্পতি বীমা

দেনমোহর পরিশোধের অঙ্গীকার
নিশ্চিত করবে নারীর অধিকার

ধর্মীয় বিধান পালনের সাথে সাথে
এনে দেবে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা

আন্তর্জাতিক মান ISO 9001 : 2000 সনদপ্রাপ্ত

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

আ র্থি ক   নি রা প ত্তা র   সে তু ব ন্ধ ন

প্রধান কার্যালয় ঃ রাজভবন (৭ম তলা), ২৯ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা- ১০০০।
ফোন ঃ ৭১৬০০৭৪, ৯৫৫৪৫৩৮, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৪৩৯০, ই-মেইল ঃ plicl@bdonline.com

www.pathagar.com

সূচি ক্রম

সম্পাদকীয়

রাসূলের [সা] অনুসরণ ॥ ১১

চয়ন ॥ কবিতা

রাসূলের [সা] শানে মধ্যযুগের কবিতা ॥ ১৩-১৫

চয়ন ॥ কবিতাগুচ্ছ

কাজী নজরুল ইসলাম ১৭ ॥ গোলাম মোস্তফা ১৯ ॥ ফররুখ আহমদ ২০ ॥ আফজাল চৌধুরী ২১

প্রবন্ধ

হে মহানবী [সা], আজ তোমারই একান্ত প্রয়োজন ॥ ড. কাজী দীন মুহম্মদ ২৫ ॥ রাসূলের [সা] ওহি প্রাপ্তি, আন্দোলনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ ॥ এ.কে.এম. নাজির আহমদ ৩৩ ॥ ইসলাম ও রাসূলের [সা] বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ॥ প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ৩৯

কবিতাগুচ্ছ

আল মুজাহিদী ৪৫ ॥ কে. জি. মোস্তফা ৪৭ ॥ মাহফুজ পারভেজ ৪৮

প্রবন্ধ

রাসূলের [সা] দেশ শাসন : শৃঙ্খলা বিধান ॥ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ৪৯ ॥ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলের [সা] অবদান ॥ অধ্যাপক আবু জাফর ৬৮ ॥ মহানবীর [সা] আদর্শ রাষ্ট্র ॥ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৭৭

www.pathagar.com

ক বি তা গু চ্ছ

আবদুল মুকীত চৌধুরী ৮৫ ॥ আমিন আল আসাদ ৮৫ ॥ শফিকুর রহমান রঞ্জু ৮৬ ॥ সা'দত সিদ্দিক ৮৮ ॥ হুসাইন আল জাওয়াদ ৮৯ সুমন মাহমুদ ৮৯

সা হি ত্য

জ্ঞানই রাসূলের [সা] চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ৯০ ॥ 'মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবি' ॥ শফি চাকলাদার ৯৪ ॥ রাসূলকে [সা] নিবেদিত সর্বাধিক পঠিত কবিতার কাব্য ভাবনা ও ভাবনার কাব্য ॥ আ. জ. ম. ওবায়েদুল্লাহ ১০০

ছো ট গ ল্প

যে আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে ॥ জাফর তালুকদার ১০৬

সুবাতাস : প্রজাপতি ও মৌমাছি ॥ মাহবুবুল হক ১০৯

ক বি তা গু চ্ছ

সুজাউদ্দিন কায়সার ১১৩ ॥ আনোয়ারুল ইসলাম ১১৩ ॥ সামুয়েল মল্লিক ১১৪ ॥ মানসুর মুজাম্মিল ১১৫ ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী ১১৬ ॥ নার্গিস চমন ১১৭

প ত্র সা হি ত্য

রাসূলুল্লাহর [সা] একটি পত্র ও মু'জিযা ॥ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ১১৮

শি ক্ষা

শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবীর [সা] ভূমিকা মো: আতিকুর রহমান ১২১

ভ্র ম ণ

মাদায়েন সালেহ

অলৌকিক এক উটের দেশে ॥ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ১২৭

আ ল হা দী স

জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় রাসূলের [সা] কয়েকটি হাদীস মো: আব্দুর রহীম খান ১৯৮

www.pathagar.com

প্র ব ন্ধ

সাংবাদিকতায় পয়গাম্বরি ঐতিহ্য ॥ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ২১৩
আজ খুব বেশী প্রয়োজন ॥ মো: আবেদুর রহমান ২২৭
নিপীড়িত মানবতার নবী মুহাম্মাদ [সা] ॥ জাফর আহমাদ ২৩০

ক বি তা গু চ্ছ

নুরুল ইসলাম মানিক ২৩৭ ॥ জগলুল হায়দার ২৩৮
আবুল হাসান তুহিন ২৩৯ ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল ২৩৯
মুহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ ২৪০ ॥ দুলাল নজরুল ২৪০

ছো ট গ ল্প

ঈর্ষা মধুরেণু ॥ হাসান আলীম ২৪১
ভিমরুলের গার্ড অব অনার
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ২৪৪

প্র ব ন্ধ

মহানবী [সা] নতুন এক সভ্যতার নির্মাতা ॥ ইকবাল কবীর মোহন ২৫১
সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবীর [সা] আদর্শ ॥ নাসির হেলাল ২৫৭
আলোকের সভাপতি ॥ আইউব ওয়াজেদ ২৬৯
মহানবীর [সা] পরমতসহিষ্ণুতা ॥ এস. এম. জহির উদ্দীন ২৭৬

ক বি তা গু চ্ছ

জাকির আবু জাফর ২৭৯ ॥ তমসুর হোসেন ২৮১
মাহমুদুল হাসান নিজামী ২৮২ ॥ শাহনাজ পারভীন ২৮৩
মামুন সারওয়ার ২৮৪ ॥ শাহ মুহাম্মদ মোশাহিদ ২৮৪

সা হি ত্য

কবি ও কবিতার পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী [সা] ॥ ড. নজরুল ইসলাম
খান আলমারূফ ২৮৫
পনের শতকের বাংলা সাহিত্যে রাসূল বিজয় প্রসঙ্গ
নিজাম সিদ্দিকী ২৯৩

অ র্থ নী তি

সুশীল সমাজ গঠনে বিশ্বনবীর [সা] সুষম অর্থনীতি ॥ ড. আ. ছ. ম.
তরীকুল ইসলাম ৩০২

www.pathagar.com

প্র ব ন্ধ

আল্লাহর রাসূলের [সা] ব্যক্তিজীবন ॥ ফখরুদ্দীন আহমাদ ৩১৩

সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে মহানবীর [সা] ভূমিকা
হেলাল আনওয়ার ৩২০

ক বি তা গু চ্ছ

মহিউদ্দিন আকবর ৩২৭ ॥ কামরুল ইসলাম হুমায়ুন ৩২৮
আলতাফ হোসাইন রানা ৩২৯ ॥ গোলাম নবী পান্না ৩৩০
জুবায়ের হুসাইন ৩৩০ ॥ মো: আবুল হোসেন ময়েজী ৩৩১
ইকবাল মুজাহিদ ৩৩২

প্র ব ন্ধ

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলের [সা] অনুসরণ ॥ মুহাম্মাদ ইউছুফ ৩৩৩
রাসূলের [সা] আদর্শে জীবন গঠন ॥ আবদুর রহমান ৩৩৯
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল [সা] ॥ মোরশেদা খান শেলী ৩৪৯

ছো ট গ ল্প

পরশ পাথর ॥ নাসীমুল বারী ৩৫৩
বোহাইরা পাদ্রীর বিস্ময় ॥ নাজমুস সা'দাত ৩৫৭

জী ব ন প ঞ্জি

নবী মুহাম্মাদের [সা] ৬৩ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ॥ ওমর ফারুক ৩৬

প্র তি বে দ ন

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ॥ শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ৩৬৯

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] অনুসরণ

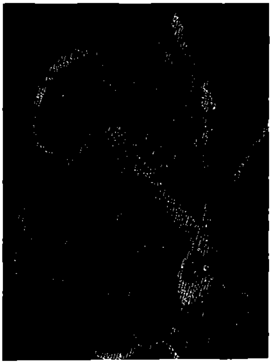

মহান রাব্বুল আলামীন বলছেন, "তোমার পূর্বে আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে আমরা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি [আল্লাহ] ছাড়া আর কোনো 'ইলাহ' নেই। অতএব কেবল আমারই দাসত্ব করো।" [সূরা আম্বিয়া ॥ আয়াত-২৫]

মহান রবের এ এক বিপুল বিশাল রহমত এবং মেহেরবানী আমাদের জন্য যে, তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল মুহাম্মাদকেই [সা] আমাদের সত্যপথের দিশারী হিসাবে মনোনীত করেছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর [সা] জন্য এটা একটি পরম সম্মানজনক প্রাপ্তি। সেই দিক থেকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমাদের জন্য আল্লাহপাকের দিকনির্দেশনাবাহী চূড়ান্ত বক্তব্যই হলো, "নি:সন্দেহে রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে।" [সূরা আহযাব ॥ আয়াত-২১]

আর রাসূলকে [সা] মহান বারী তায়ালা বলছেন– "হে রাসূল! তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা যথাযথভাবে পৌঁছে দাও।" [সূরা মায়িদা ॥ আয়াত-৬৭]

পরপর এই দু'টি আয়াতের মাধ্যমে মহান রব তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর মনোনীত শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহপাকের করুণাসিক্ত নবী মুহাম্মাদ [সা] নবুওয়ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। শুধু নবুওয়ত জীবনে নয়, বরং আমাদের বিস্ময়কেও হার মানিয়ে তিনি শৈশব থেকে ওফাত পর্যন্ত এমন এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন আমাদের জন্য– যা প্রকৃত অর্থেই তুলনা রহিত। রাসূল [সা] তাঁর গোটা জীবনকেই আমাদের জন্য এমন এক অত্যুজ্জ্বল মডেল হিসেবে পেশ করেছেন– যার অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া মুক্তির আর কোনো দরোজাই আমাদের জন্য খোলা রাখা হয়নি। এখানেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যারাই রাসূলের [সা] জীবনাদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রাঙিয়ে তুলবেন– তারাই সফলতার চূড়া স্পর্শ করবেন। আর বদনসীব তো তাদের জন্য, যারা চেতনে-অবচেতনে কিংবা উন্নাসিকতার কারণে রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ কিংবা তাঁর নির্দেশনাকে অবজ্ঞা, অবহেলা বা পাশ কাটিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এ ধরনের হঠকারী ভাগ্যবিড়ম্বিতদের জন্যই রয়েছে মহান রবের পক্ষ থেকে যত লাঞ্ছনা, গ্লানি, অপমান এবং যাবতীয় ব্যর্থতার কালিমা।

কারণ রাসূল [সা] নিজেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, "সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর [কুদরতী] হাতে [আমি] মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মাতের [মানব জাতির] যে কেউই হোক না কেন, [নবুওয়তের] কথা শুনবে অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরীত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান গ্রহণ না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে।" [মুসলিম]

রাসূলের [সা] এই দ্ব্যর্থহীন উক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলের সর্বাত্মক এবং সর্বাঙ্গীন অনুকরণ, অনুসরণ এবং তাঁর জীবনাদর্শ ছাড়া আমাদের জন্য বিকল্প কোনো পথ নেই।

আল্লাহপাকের দাসত্ব এবং রাসূলের আদর্শকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে তারই আলোকে গোটা জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালনার মাধ্যমেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি।

দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সেই সাফল্যজনক কল্যাণ ও মুক্তিই হোক আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন এবং সকল কর্মের উৎসধারা।■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] শানে মধ্যযুগের কবিতা

জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথা হৈল য়নুপাম ॥
জথ ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভুবন।
তারপরে মোহাম্মদ মাণিক্য সৃজন ॥
[শাহ্ মুহম্মদ সগীর]

প্রণমহু তান সখা মোহাম্মদ নাম।
এ তিন ভুবন নাহি যাহার উপাম ॥
আদি অন্তে মোহাম্মদ পুরুষ অতুল।
স্থল শূন্য না আছি আছিল রসূল ॥
[দৌলত উজির বাহরাম খান]

বন্দম নূর মোহাম্মদ হাবিব আল্লার।
চৌদ্দ ভুবনের পীর মহিমা অপার ॥
আউয়ালে আখেরে করি একিদা নূরের।
গুনা মাফ করাইব চৌদ্দ ভুবনের ॥
[সেখ চাঁদ]

নিরঞ্জন চিনিবারে নবীমাত্র লক্ষ্য।
নহে প্রভু চিনিবারে করিয়াছে সক্য ॥
দর্পণে দেখিও যেন আপনা বদন।
নবীকে ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন ॥
[মুহম্মদ খান]

সৃষ্টি করিয়াছে প্রভু প্রেম অনুভবি।
প্রেমভাবে মজিয়াছে মোহাম্মদ নবী ॥
ততক্ষণে মনে যদি উপজিল জ্ঞান।
প্রেমের ভাবিনী হৈয়া কৈল প্রেমদান।
[দোনাগাজী]

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা ॥
[সৈয়দ আলাওল]

www.pathagar.com

হৃদ এ জন্মিল যদি প্রেমের অঙ্কুর।
অন্ধকার দীপ্তি কৈল্লা সৃজি প্রেম নূর ॥
প্রেম বন্ধু, নূর নবী হোতে নিরঞ্জন।
সৃজিলেক তরঙ্গ ত্রিভুবন ॥
[আবদুল হাকিম]

নবীর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
যাহার চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
যাহার চরণ বিনে অন্য নাহি গতি ॥
মুক্তিপদ হত যার কলেমা পড়নে।
অন্তকালে উদ্ধারিব উম্মত আপনে ॥
[হায়াত মামুদ]

মোহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া।
আপনার নূরে তাকে রাখে ছাপাইয়া ॥
দুনিয়া করিল পয়দা তাহার কারণ।
আসমান জমিন আদি চৌদ্দ ভুবন ॥
[সৈয়দ হামজা]

একা সেই করতার কেহ নাহি ছিল পার
নূরে নবী কৈল পয়গাম্বর।
আপনার নূর দিয়া পহেলার পয়দা কিয়া
মেহের বড় হৈল তারপর ॥
[ফকির গরীবুল্লাহ]

কহিলেন রসূলুল্লা সবার হুজুর।
আগে আল্লা পয়দা কৈল আপনার নূর ॥
গুপ্তরূপে একা যবে ছিল পরওয়ার।
সেই নূর বিনে ছিল সব নৈরাকার ॥
আপন কুদরত আগে করিতে জাহের।
সে নূরে আমার নূর পয়দা কৈল ফের ॥
[তাজদ্দিন মহাম্মদ]

www.pathagar.com

নবীজীর নূরে সংসারে প্রচারে
প্রকাশিল দিবানিশি।
স্বর্গমর্ত্য আর কিরণ তাহার
দেখা দিলো রবিশশী ॥
ছিদ্দিকী অদীনে সে গুণ ব্যাখ্যানে
কেমনেতে পারে বলো।
নবীজী যে স্থানে বাখানিতে গুণে
সাধনে অক্ষম হলো ॥
[খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী]

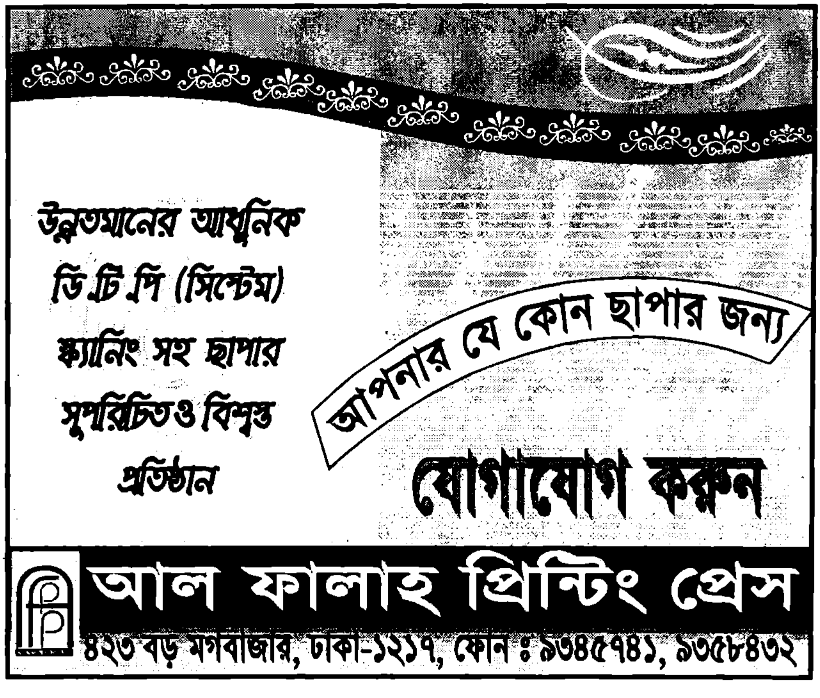

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশিত পত্রিকা

মাসিক পৃথিবী

[ইসলামী গবেষণা পত্রিকা]

সম্পাদনায় : এ.কে.এম. নাজির আহমদ

দাম প্রতি কপি : ১৫ টাকা

মাসিক নতুন কলম

[সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা]

সম্পাদনায় : মোশাররফ হোসেন খান

দাম প্রতি কপি : ১২ টাকা

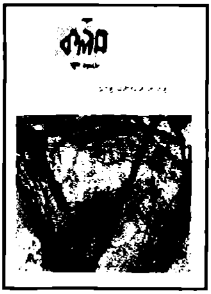

Monthly AL-ISLAM

[ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত পত্রিকা]

সম্পাদনায় : এ.কে.এম. নাজির আহমদ

দাম প্রতি কপি : ১০ টাকা

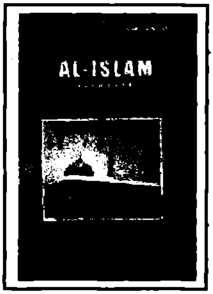

যোগাযোগ ঃ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

প্রধান কার্যালয় : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫।

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন ঃ ৮৬২৭০৮৬-৭, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬০৬৪৭

Web : www.bicdhaka.com, ই-মেইল : bic@accesstel.net

www.pathagar.com

আলোর আলো ॥ কাজী নজরুল ইসলাম

বিশ্ব তখনো ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন। তখনো বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে। তখনো গগন-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার মালা।

আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ময়
একাকী আছিল– ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।
অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা
ছিল নাকো সুখ-দুখ আনন্দ সৃষ্টির আকুলতা।
ছিল না বাগান, ছিল বনবালী– সহসা জাগিল সাধ
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।
অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যাজি– কে বুঝিবে তাঁর লীলা
বাহিরিয়া এলো সৃষ্টি-প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুল-খেলার মানুষ সৃষ্টি-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর সৃষ্টির ফুলবনে।
আদিম মানব আদমে সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, যাও কর খেলা ঐ ধরার আঙনে গিয়া।
সৃজিলা মানব আত্মা তাহার দানিল মানব দেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে "প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!"
আদমের মাঝে বারে বারে যায় বারে বারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, "ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।
আমা হতে ছিল প্রিয়তম যারা আমার আলোর আলো।
মোহাম্মদ সে, দিনু তাহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো।"

www.pathagar.com

মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহ-মাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এর রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি' এ কোন জ্যোতি পাথার।
বন্দনা করি সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
"অপরূপ জ্যোতি প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!
কেবা এ পুরুষ কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে?"

কহিলেন খোদা, "এই সে জ্যোতির পুণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময় সকল কলুষ-হরা
এই সে আলোর দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি'
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্বরী।
আমার হাবিব-বন্ধু এ প্রিয়, মানব-ত্রাণের লাগি'
ইহারে দিলাম তোমাতে–হইতে মানব-দু:খ ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল-প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।"
সিজদা করিয়া খোদার আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
"ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোন ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ
ধরার সকল ভয়েরে ইহারি পুণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়
মোর সাথে হল ধন্যা পৃথিবী।"-মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, "সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লাম।"

www.pathagar.com

বিশ্বনবী ॥ গোলাম মোস্তফা

যুগান্তরালে দাঁড়াইয়া আজি এই কবি
তোমার সালাম করে, হে মহান আরবের নবী!
ছিল যেথা মূর্তিপূজা, এল সেথা পবিত্র তৌহিদ
দেবতা-মন্দির হ'ল লা-শরীক আল্লার মসজিদ।
অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা ছিল যেথা নিরন্তর
সেথায় বহালে তুমি আলোকের পুলক-নির্ঝর।
নারী যেথা ছিল দাসী, তুমি তারে করে দিলে রাণী,
বসাইলে একাসনে পুরুষের পাশাপাশি আনি।

আসিল নতুন যুগ, কেটে গেল গভীর নিরাশা
মিটে গেল নিখিলের অন্তরের গোপন পিয়াসা।
থেমে গেল ব্যথিতের হাহাকার করুণ ক্রন্দন
বন্দী মন মুক্তি পেল, কেটে গেল সকল বন্ধন।
মূক সে মুখর হ'ল, কণ্ঠ পেল অপরূপ ভাষা
দেহে এল নব বল, প্রাণে এল নব সাধ-আশা
মানুষ দাঁড়ালো ফের ভালবেসে মানুষের পাশে
হিংসা নাই, ভেদ নাই, ভাই-ভাই এক ঠাঁই হাসে।
নগণ্য দুর্বল যারা এতদিন ছিল ধরণীতে
তারা আজি বাহিরিল দিগ্বিজয়ে অকুণ্ঠিত চিতে।
কত দেশ, কত জাতি, কত রাজা, সবর্ণসিংহাসন
লুটাল তাদের পায়ে, কেঁপে গেল নিখিল ভুবন।
মুষ্টিমেয় বীরদল চালাইল বিশ্ব-অভিযান
দুর্জয়-দুর্বার গতি-কার সাধ্য করে বাধা দান?
রাষ্ট্রে, শিল্পে, জ্ঞানে, গুণে, আবিষ্কারে ললিত কলায়
আসন লভিল তারা পুরোভাগে জগৎ-সভায়।
এইরূপে দিকে দিকে খুলে গেল কল্যাণের দ্বার
শ্বাপদ-সঙ্কুল ধরা স্বর্ণসম হইল আবার।

www.pathagar.com

মুক্ত হে আলো ॥ ফ র রু খ আ হ্ ম দ

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার সাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙালে কি, হে আলোর পাখী মহানীলিমায় ভ্রাম্যমান
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হতে ঝরবে এবার দিনের গান?
এবার কি সুর ঘন অশ্রুর কারাতট থেকে প্রশান্তির?
এবার সে কোন আলোর স্বপ্নে তাকাবে ক্ষুব্ধ প্রলয় নীর?
এ বোবা বধির আকাশ এবার ভুলবে কি তার নীরবতাকে
সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে?
ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হয়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে
থির-বিদ্যুৎ-আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।
হে অচেনা পাখী কোন আকাশের গভীরতা হতে এসেছ উঠি?
তোমার পক্ষ-সঞ্চারে ভাষা-ভাবের কুসুম উঠিছে ফুটি;
তোমার জরিন জরির ফিতায় নিখিল মানস করো জরিপ
কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা-মুখরিত তোমার পাখার সব সাগরের অশ্রুজল,
তোমার ছায়াকে চুম্বন করে তরুণ মনের লাল কমল,
আলো বিহঙ্গ। মুক্ত নীলের সকল রশ্মি ঝরোকা চেন,
তোমার গতির ইঙ্গিতে তাই নিখিল স্বপ্ন ফুটছে যেন।
অন্ধরাতের তুমি নও নও, তুমি নও মৃত স্থবিরতার
সব আকাশের দুয়ার খুলেছো, খুলেছো সকল আকাশ কাঁপে,
মুক্ত পক্ষ, হে আলো! ধন্য ধরণী তোমার আবির্ভাবে।
কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুসুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।

হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিনুরাইন, আলী নবীন
ঘুম ভেঙে যায় আল ফারুকের হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার আগমন শিক্ষা পায় যে প্রাণ।

[অংশবিশেষ]

www.pathagar.com

হিজরত ॥ আফজাল চৌধুরী

পৃথিবীর স্তম্ভসদৃশ এই পাথরের ওপরে পাথর
গৈরিক রঙ-পবর্তমালা ডিঙানো এই মরুপথ
লোহিত সমুদ্র-সমান্তরাল এই চলাচল
মক্কা ও মদীনার এই পথ, আদিকাল হতে এই যোগাযোগ
চলছে এখনো, কেবল উটের বিকল্প হয়েছে যন্ত্রযান
চারপাশে অন্তহীন মরুস্থল, ফারানের পর্বতমালা
অতিক্রম করে এসেছি, এখন
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের বিলাসী আসনের
সামনে-পেছনে উদার আরব যাত্রী
নেক নজর ফেলছেন আমার দিকে, আর
বাড়িয়ে দিচ্ছেন বেভারেজ, 'শুকরান' শুকরান'
বলছি ঘন ঘন
মক্কা হতে আমার যাত্রা এখন মদীনা অভিমুখে
উন্মুক্ত জানালায় তীব্র বেগে ছুটে আসছে হাওয়া
দু-চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি মরুময় হেজাজকে
অত্যাশ্চর্য, অন্তহীন, চিহ্নহীন এর বালুকা-বেলায়
মসৃণ এ্যাশফল্টের ওপর শত মাইল বেগে ছুটে চলছি
দু'পাশে ভগ্ন ট্যাক্সির উল্টানো চেসিস
একদা যেমন উটের হাড় ও নরকংকাল ছড়িয়ে থাকতো
লু-হাওয়া উজিয়ে ছুটতো মরুর কারাভাঁ ভ্রূক্ষেপহীন
আমরাও তেমনি ছুটছি পরন্তু দশ গুণ বেগে
বাবলাকুঞ্জ ও বালিয়াড়ির স্তূপ পার হয়ে যাচ্ছি
কৃত্রিম জলসেচ ও বৃক্ষায়ন চলছে বেশ, তবু
বিশাল, বিরান অন্তহীন প্রবল হাওয়া উচ্ছ্রিত
মরু স্থল
আজও তেমনি অবিকল, রুদ্র অহংকার ক্ষমাহীন

এই নির্দয় প্রকৃতি, এই উলঙ্গ পবর্তমালায়
এই বিষণ্ন, ক্ষিপ্ত মরুস্থলী, এই প্রচণ্ড অসহযোগিতায়
আগ্রাসী মরণসদৃশ এই রুক্ষ প্রতিবেশে
এমন জীবনবিধ্বংসী মরীচিকা আকীর্ণ খরগ্রাসে

www.pathagar.com

এই সবুজহীন, শষ্পহীন, নিষ্ঠুর বন্ধ্যা মৃত্তিকায়
মৃত্তিকায়ও নয়, বালিয়াড়ি, অন্তহীন বালির সমুদ্র
তরঙ্গিত, উৎক্ষিপ্ত, লু-র ঘূর্ণিচক্রের তাড়নায়
নিঃসঙ্গতায়, নিরাশস্তাহীনতায়, ক্রুর ভ্রূকুটিপূর্ণ
প্রচণ্ড সূর্যোত্তাপে, মহামার্তণ্ডের সার্বভৌম নিষ্পেষণে
দাবদাহ এবং নিষ্ঠুর নির্দয় সম্ভাষণে
পানীয়হীন কান্তারে এক ফোঁটা মহার্ঘ পানির তৃষ্ণায়
কলিজা তড়পানো আকণ্ঠ শুষ্কতায়, মরীচিকায়
শ্রান্ত প্রাণকণার বিয়োগান্ত কাহিনীর এ মহাচরাচরে
প্রশ্ন জাগে–
ততোধিক নিষ্ঠুর, নির্দয়, বর্বর মক্কাবাসীদের পশ্চাৎধাবনের মুখে
অশ্বারোহী ঘাতকের উন্মুক্ত বর্শার নাগালের নিচে
কী করে, কীভাবে মাত্র ক'জন মানুষ চলেছেন, উষ্ট্রারোহণে
এই সে মরুপথে, ইয়াসরেব অভিমুখে
হিজরতে?
ভাবা যায় নাকো না-না শুধু চিন্তার অগম্য এই যাত্রা
ভাবনার অতীত এই সত্য, কল্পনার অতীত এ বাস্তবতা
আর কে না জানে
সভ্যতার মৃত্যু সন্ধিক্ষণে
মানুষের বিজয়ের এই ছিলো শুভ নির্গমন
এই সেই পথ
এই সেই পাহাড়-পর্বত
এই দুস্তর কান্তার
একদা পার হয়ে গেলেন যে-জন
আমি তাঁর এক দফা দর্শনের ক্রয়মূল্যরূপে
আমার ধন ও মান
এবং পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত এ জান
ইনশাআল্লাহ্ দিতে রাজি আছি।

www.pathagar.com

রিসার্চ ফাউন্ডেশন পরিবেশিত গ্রন্থসমূহ

বাংলা

- অলৌকিক কিতাব আল-কুরআন- আহমেদ দিদাত, অনুবাদ : *এ কে মোহাম্মদ আলী*
- ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক- অনুবাদ : *এম.জি. কিবরিয়া*
- বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব- মূল : ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : *মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার*
- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআন ও বাইবেল
  মূল : ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : শফিকুল ইসলাম মাসুদ
- বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা- *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : মো: মনিরুল ইসলাম*
- কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : সংগতিপূর্ণ না সংগতিহীন
  ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : এন.আই. মল্লিক

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন রচিত- ড. এস.এম আজহারুল ইসলাম সম্পাদিত
আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-

- সিরিজ- (১) কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগব্যাংগ
- সিরিজ- (২) কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল
- সিরিজ- (৩) কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব
- সিরিজ- (৪) কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস
- সিরিজ- (৫) কুরআন, কোয়াসার ও শিংগায় ফুৎকার

- আদমের আদি উৎস- *আল মেহেদী*
- সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য- *আল মেহেদী*
- বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- *মুহাম্মদ নূরুল আমীন*
- মহাকাশ গাইড- *মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন*

ইংরেজী

- Towards Understanding Islam - *S A A Maudoodi*
- Fundamentals of Islam - *S A A Maudoodi*
- Nations rise and fall why - *S A A Maudoodi*
- The Quran & Modern Science : Compatible or incompatible - *Dr. Zakir Naik*
- The Quran & The Bible in the light of Science - *Dr. Zakir Naik*
- Concept of God in Major Religions - *Dr. Zakir Naik*
- Universal Brotherhood - *Dr. Zakir Naik*
- Answers to Non-Muslims Common Questions about Islam - *Dr. Zakir Naik*
- Is non-vegetarian food permitted or prohibited- *Dr. Zakir Naik*
- Is the Quran God's word - *Dr. Zakir Naik*
- Similarities Between Hinduism and Islam - *Dr. Zakir Naik*

THE RESEARCH FOUNDATION FOR QURAN & SCIENCE
দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স
২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০১৯১১ ০১২৯৭৬

যোগাযোগ করুন : কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০ এছাড়াও কাটাবন, মগবাজার ও বাংলাবাজারের ইসলামী বইয়ের দোকানসমূহে আমাদের বইসমূহ পাওয়া যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বই কিনুন বই পড়ুন

প্রিয়জনকে ইসলামী বই উপহার দিন

বিশ্ব নন্দিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন, সহীহ আল বুখারী, নির্বাচিত হাদীস গ্রন্থ, দাওয়াহ্ সংক্রান্ত ইসলামী সাহিত্য, মাসায়ালা-মাসায়েল, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইসলামী অর্থনীতি, মহিলা ও শিশু-কিশোর বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থরাজির বিপুল সমাহার

আধুনিক প্রকাশনী

প্রধান কার্যালয় :
২৫ শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৭১১৫১৯১
ফ্যাক্স : ০২-৭১৭৫১৮৪

বিক্রয় কেন্দ্র :
৪৩৫/২-এ, (ওয়ারলেস রেলগেট)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

বিক্রয় কেন্দ্র :
১০ আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
[মসজিদের মেহরাবের নিচে]

বিক্রয় কেন্দ্র :
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
শাহবাগ, ঢাকা।

www.pathagar.com

হে মহানবী [সা], আজ তোমারই একান্ত প্রয়োজন

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

এক.

আজকের এ অশান্ত দুনিয়ায় যতখানি বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] সময়ে তদানীন্তন বিশ্বের অবস্থা তার চেয়ে তেমন কিছু কম ছিল না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুঙ্গে আরোহণ করে, সভ্যতার চরম বিকাশের সময়, অর্থাৎ আমাদের এ কালে কি দেখি?

অপ্রিয় হলেও এ কথা সূর্যালোকের মত সত্য যে, আমরা আজ নানা রোগে ভুগছি। আমাদের সমাজে আজ নৈতিকতার ও মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব। চারদিকে হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব অক্টোপাসের মত আমাদের ঘিরে ধরেছে। মূল্যবোধের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য সর্বত্র, সবার মধ্যে এক অসাধারণ আর্তি।

মানুষের মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলো জীবন থেকে নির্বাসিত। ন্যায়বিচারের আশা, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের কামনা আজ প্রতারণার শিকার। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হতাশা ও নৈরাশ্যে জর্জরিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত। মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

সৎ-অসৎ চিন্তা বিবর্জিত আত্ম সর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতা আমাদের জীবনকে করে তুলেছে জীর্ণ। জীবাণু দূষিত গ্যাংগ্রিন সমাজ দেহের সর্বাঙ্গে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। চরিত্রহীনতা, শঠতা, কপটতা, চতুরতা, ছলনা, প্রতারণা, ভাঁওতা আর বল প্রয়োগই আমাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোজা কথায় বিশ্বের সকল মানুষ আজ মধ্যযুগীয় বর্বরতার আদিম প্রবৃত্তির অন্ধকার গুহায় অবস্থিত। প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া-মায়া, পরার্থপরতা, কল্যাণ ও সুন্দর আজ নির্বাসিত। বাহুবল ও মাসলম্যানদের রাজত্বে 'জোর যার মুল্লুক তার' এ মাৎসন্যায় নীতির আয়ত্তে মনুষ্যত্ববোধ বন্দি।

'এ-ই কি মনুষ্যজীবন? মানুষ না সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ– আশরাফুল মাখলুকাত? তাহলে তার এ দুর্দশা কেন? কেন অশান্ত এ দুনিয়া? এ অবক্ষয়ের মূল কোথায়? প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞানানুশীলন, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধের উৎকর্ষ পরিত্যক্ত কেন? কেন মানবিক, আত্মিক ও মানসিক প্রবণতা দুর্দশাগ্রস্ত? আত্মা-পরমাত্মার কথা কেন আজ নিরাপদ দূরত্বে? জৈবিক ও দৈহিক প্রবৃত্তি এবং পার্থিব ও ইহ জাগতিক নেশায় আজ সবাই উন্মাদ কেন? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব তার জ্ঞানানুশীলনে কি এর উৎসের সন্ধান করে, মূল কারণ চিহ্নিত করে, এ সর্বনাশা অবক্ষয়ের শেকড় শুদ্ধ উৎপাটনের উপায় নির্ধারণ করতে পারে না? এ কর্তব্য কি তারই নয়? বিশ্বের যাবতীয় উন্নতি, বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান, সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতি যদি তার সাধনায় সমৃদ্ধ হতে পারে, তবে এ কাজটিও কি তারই করণীয় নয়? এমন কোন আদর্শ পুরুষ কি নেই? নেই কি কোন মহামানব, যিনি এ জগদ্দল পাথর উন্মোচিত করে উদ্ধার করতে পারে রোরুদ্যমান মানবতাকে, দিতে পারে সত্য পথের সন্ধান? পারে না কি কোন অমোঘ শক্তি পিঞ্জিরাবদ্ধ মানবতার মুক্তি এনে দিতে? সীমাহীন অন্ধকারে আলো দিয়ে, দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে প্রকৃত মানবতার শৌর্য জাগ্রত করে, আমাদের চেতনায় ঘা মেরে মৃতকে পরমাত্মার জাদু পরশে পারে না কি জাগ্রত করতে কোন মহাপ্রাণ আদর্শ মহামানব? নিপীড়িত মানবতার কাতর গোঙানিতে কি আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে না? যুগে যুগে তিনি না পথভ্রষ্ট মানব উদ্ধারে বিশেষ দূত পাঠান এ মর্তে? কাকে, কোথায় সে অমিততেজ বীর, যিনি সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নতুন পৃথিবীর জন্ম দেবে?

শাস্ত্র বলে, যখনই বিশ্ব এমনি ধারার অচলাবস্থায় পতিত হয়েছে, যখনই নির্যাতিত মানবতার কান্না বিশ্ব পরিমণ্ডল-আকাশ-বাতাস ভরে তুলেছে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে উদ্ধারকর্তা পাঠিয়েছেন। তাঁরা স্রষ্টার তরফ থেকে মুক্তির বাণীসহ প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ পুরুষই রাসূল বা নবী। তাঁরা তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি আদর্শ সন্তানদের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাদর্শমণ্ডিত যে 'বাদ' ই ইজম' সেটিই অমোঘ শান্তির বাণীবহ– ইসলাম।

www.pathagar.com

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার বুকে মিথ্যা ও সত্যের, পাপ ও পুণ্যের, ঘৃণা ও প্রেমের দুর্যোগ নেমে এসেছে অসুর শক্তির পাশব প্রয়োগে। যুগ যন্ত্রণায় মানবতা বার বার কাতরিয়ে উঠেছে, কঁকিয়ে উঠেছে। হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে জীবনের সহজ সরল সাবলীলতা। আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হয়ে গেছে ভোঁতা, অকর্মণ্য। মাথাচারা দিয়ে উঠেছে অমানবিকতার দাম্ভিক পাশবিকতা। মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো তাদের দাপটে দুনিয়া থেকে অপসৃত হয়ে গেছে। কায়েম হয়েছে পশু প্রবৃত্তি। মানবতার করুণ আর্ত গোঙানি তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

মানবতা যখন এভাবে এক পাশে অবজ্ঞায় অবহেলিত পরিত্যক্ত তখন, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে এসেছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। যিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সামগ্রিক সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে যাবতীয় সমস্যা দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তোমার-আমার-তার'- প্রত্যেকের জন্য শান্তি। তাঁর কালের ও অনাগত ভবিষ্যতের কওমের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থার। তিনি নিজের জীবনে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম-অর্থ-সকল ক্ষেত্রে নীতির আদর্শ প্রয়োগ করে বড়-ছোট, ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, নর-নারী- সকলের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমোঘ শিক্ষা। তাঁর অতুলনীয় চরিত্রে ঘটেছে যার সম্যক বিকাশ, তারই অনুশীলনী করে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।" এ আদর্শের প্যাটার্নেই বাঁচাতে চেয়েছেন তিনি সমস্যা জর্জরিত মানব-সমাজকে। সমসাময়িক ও অনাগত ভবিষ্যৎকে মারণাস্ত্রে নয়, ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর নির্দেশিত সে অমোঘ অস্ত্রটি আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রয়োগের মাধ্যমেই কি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না বিশ্বময় প্রকৃত শান্তি?

দুই.

ইসলামী জীবনে মিথ্যার স্থান নেই। সত্যিকার মুসলিম কোন দিন কোন কারণে মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা জীবনকে কলুষিত, মনুষ্যত্বকে করে অবনমিত। বিশ্বের যত পাপ, সবই মিথ্যা থেকে উদ্ভূত। হযরত রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : মিথ্যাবাদীর দু'আ কবুল হয় না। মিথ্যাবাদী জান্নাতে যাবে না। জীবন থেকে ঘৃণিত ও গর্হিত মিথ্যা দূর করতে পারলে সকল পাপ থেকেই বেঁচে থাকা যায়।

একবার রাসূলুল্লাহর [সা] কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আমি চুরি ও জিনা করি এবং মিথ্যা বলি। আমি একটি দোষ ছাড়তে চাই, কোনটি ছাড়ব? রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, মিথ্যা। সে ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়ায় চুরি বা জিনা কোনটাই করতে পারেনি। এভাবে মানুষকে তিনি ক্রমান্বয়ে সংশোধনের পথে নিয়েছেন।

তিনি কেমন চরিত্রের ছিলেন দেখুন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে না

www.pathagar.com

[তা খিয়ানত করে] তার ঈমান নেই। আর যে ওয়াদা রক্ষা করে না তার কোন ধর্ম নেই।"

অত্যন্ত কঠোরভাবে এসব পালন করে তবে তিনি উম্মতের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কথা দিয়ে কথা না রাখাই তো আমাদের এখন 'ফরয' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ব্যবসায়ী- মিথ্যাই আমার বেসাতি; আমি উকিল- মিথ্যা আমার রুজি; আমি মৎস্যজীবী- মিথ্যা আর ওয়াদা ভঙ্গ না করলে তো আমার ভাত জুটবে না; আমি শিক্ষক, আমার কাজ তো কথামত কর্তব্য পালন নয়; আমি মৌলভী সাহেব, আমার ব্যবসা তো 'যখন যেমন তখন তেমন'- আমার ওয়াজ তো সব বানানো। অতএব আমরা কোন ধরনের মুসলিম তা বলে দিতে হবে না।

আমাদের পরিচিতি কী তা আজকের মুসলিম-অমুসলিম শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন মুসলিম রাষ্ট্র অপর কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে না। অথচ ইরাক ইরান আক্রমণ করে বসল। চলল সাত বছর ধরে দুই পক্ষের মুসলিম নিধন এবং মুসলিমের সম্পদ বিনাশন। এমনকি ইরাক কুয়েত দখল করল। নির্যাতন চলল। এক মুসলিম দেশ অন্য মুসলিম দেশকে পদানত ও দখল করে নিজ দেশের আওতাভুক্ত করে নিল।

এদিকে অন্য মুসলিম দেশ অমুসলিমদের ডেকে এনে নিজ দেশে সিন্দাবাদ সওদাগরের দৈত্যটিকে ঘাড়ে চাপিয়ে নিল। তাদের সঙ্গে কেবল যে বিধর্ম এল তাই নয়, এল মারাত্মক 'এইডস', এল হাজার হাজার 'সেবিকা'র ছদ্মবেশে চরিত্র হননকারী, ন্যায়নীতি হরণকারী, ইসলামী সভ্যতায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অশ্লীল 'সেক্স'।

নগ্ন বেহায়াপনার এক প্রতিযোগিতা চলল মধ্যপ্রাচ্যে, চলল অধর্মাচার পবিত্র ভূখণ্ডে।

ঈমানদার মুসলিম এ অসহনীয় অনাচার সহ্য করতে পারে না।

মহানবীর [সা] চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী ছিল, লক্ষ্য করুন। বদর যুদ্ধে এক মুশরিক তার বর্ম ও ঢাল হযরতকে [সা] দিতে চাইল। হযরত [সা] বললেন : তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছ? সে বলল : না। তিনি বললেন, ফিরে যাও। আমরা কোন মুশরিকের সহায়তা গ্রহণ করি না।

আর আমরা এখন ইসলামের ঘোরতর দুশমনদের আপন বলে গ্রহণ করে নিয়েছি। রাসূলের দেশে রাসূলের জন্মভূমিতেই তাঁর আদর্শের খেলাফত ও ন্যায়নীতির বিরোধিতা চলছে। আমরা কিভাবে আল কুরআনকেও ভুলে গেছি, বিশ্বাস করতে পারছি না আল্লাহর কালামও, এ তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের ওপর নির্ভর করাকে আমরা দুর্বলতা মনে করি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা আল কুরআনের সূরা মায়িদার ৫১ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলেছেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা গ্রহণ করো না ইয়াহূদ ও নাসারাদের বন্ধুরূপে, তারা

www.pathagar.com

পরস্পর পরস্পরের বন্ধু আর যে তাদের গ্রহণ করবে বন্ধুরূপে তোমাদের মধ্য থেকে, সে তো তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎ পথে পরিচালিত করেন না জালিম কাওমকে।"[১]

আপনি মুসলিম হয়ে আরেক মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করছেন। আপনি কেমন মুসলিম? আপনি মুসলিম হয়েও দুইদিন আগে আরেক মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে সহায়তা করেছেন। এ কেমন কথা? এখন আবার আপনার বিরুদ্ধে আপনারই গতকালের বন্ধু অস্ত্র ধারণ করায় আপনারা সমবেতভাবে ইয়াহূদ ও নাসারাদের ডেকে এনে নিজের ঘরে বসিয়েছেন। আপনাদের উভয় দলের কাছে মুসলিম বিশ্বের প্রশ্ন : আপনারা কি কুরআন পড়েন না, অথবা রাসূলুল্লাহর [সা] জীবনী জানেন না? নাকি কুরআন ও হাদিসের অর্থ আপনাদের কাছে অন্যবিধ? অর্থাৎ আল কুরআনের বাণী ও হাদিসের কথা এ সবের প্রভাব ফিকে হয়ে গেছে। এখন এগুলোর ওপর তেমন ভরসা করতে পারছেন না। তাই না?

তবে স্মরণ করুন ৫৭০ ঈসায়ী সালে, 'আমুল ফিল' এ হযরত মুহাম্মাদের [সা] জন্মের ৫০ দিন আগে, মুহররম মাসে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা। আবরাহা কাবা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তেরটি হাতিসহ ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। আবরাহার বিরাট বাহিনী 'মুযদালিফা' থেকে মিনার দিকে 'মুহাসসির' নামক স্থানে পৌঁছে। একদিকে কোরাইশগণ বিচলিত হয়ে নানাভাবে আবরাহাকে বারণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আবরাহা কিছুতেই নিরস্ত্র হলো না। অগত্যা কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লি কুরাইশ দলপতি আবদুল মুত্তালিব ও অপর কয়েকজন কুরাইশ সরদার কাবা ঘরের দরবার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে ধরনা দিলেন যেন আল্লাহই তাঁর ঘর হিফাজত করেন। তারা তখন কাবাঘরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তির কাছে ধরনা দেননি। একমাত্র আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন। ইয়া আল্লাহ আমরা দুর্বল মানুষ। আবরাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সেনাবাহিনী আমাদের নেই। তোমার ঘরের মর্যাদা তুমি রক্ষা করো।

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত তাদের দু'আ কবুল করেছিলেন। 'মুহাসসিরে' আসতেই আবরাহার নিজের হাতি 'মাহমুদ' আর এগোতে চায় না। মারধর করলে বসে পড়ে। শত চেষ্টা করেও মক্কামুখী তাকে এগিয়ে নেয়া গেল না। সে সময় অলৌকিকভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি এসে ঠোঁটে ও পায়ে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকর এনে আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর বৃষ্টির মতো বর্ষণ করতে থাকে। যার উপরই এ পাথর পড়ে তার গোশত খুলে যায়, শরীর পচে যায়, রক্ত পানির মত হয়ে যায়। এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে আবরাহা ও তার সমগ্র বাহিনী চর্বিত ঘাসের ন্যায় ভর্তা ভর্তা হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। আবরাহার নিজ রাজ্যে আর ফিরে যাওয়াও হলো না, কাবা শরীফও ধ্বংস হলো না।

এ ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরা এর বিশদ বিবরণ জানেন, প্রত্যক্ষদর্শী হাজার হাজার লোক যখন প্রায় অর্ধশতাব্দী পর হজরত মুহাম্মাদের [সা] প্রতি সূরা ফিল

www.pathagar.com

নাযিল হয় তখনো জীবিত ছিলেন এবং সূরায় বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ঘটনার অলৌকিকত্ব স্বীকার করেছেন।

এখন কি এর চাইতেও নাজুক অবস্থা না। ঈমানের দৃঢ়তা ও আমলে মুমিনের অভাব ঘটেছে। আক্ষেপ, আমরা মহানবীর উম্মত হয়েও তাঁর কথায় ও আল্লাহর বাণীতে আস্থা রাখতে ও নির্ভর করতে পারছি না।

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের আগে আরব দেশে ছিল কতিপয় বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও বিচ্ছিন্ন জনপদ। কোন সুষ্ঠু সংগঠন ছিল না। প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজেদের রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী শাসিত হত। গোত্রপতি সে গোত্রকে শাসন করতো। অনেক সময় তার ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা এত বেশি প্রবল হয়ে উঠত যে, স্বৈরাচারী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। ফলে চারদিকে লুঠতরাজ হত্যা, মারামারি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নির্বিচারে দুর্বলদের অধিকার হরণ ও যুলুম চালানো ছিল সবলের উত্তরাধিকার।

দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে আরবের এসব অনৈক্য ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি নির্মূল হয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত এ বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজকে সুসংঘবদ্ধ মানবতাবোধে উজ্জীবিত করা হয়। একটি মহৎ আদর্শিক ঐক্যই একটা বিশৃঙ্খল যাযাবর 'অসভ্য' জাতিকে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে সহায়ক হয়। আর এ কাজটি করেছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ [সা]। তারা তাঁর আদর্শের সাথে সাথে তার শাসন ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ ও তর্কাতীতরূপে মেনে নিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে তাদের সবার জীবনে এনে দিয়েছিল এক সোনার কাঠির পরশ।

বস্তুত মহানবী ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল, খাতামুন নাবিয়ীন। আল্লাহর তাওহিদ ও তাঁর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। এর অর্থ হলো, এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তোলা সেখানে আল্লাহর দলই হবে বুনিয়াদি আদর্শ আর আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ হবে আইনের উৎস। মহানবীর [সা] জীবদ্দশায়ই তারা সমগ্র আরবের বুকে তেমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সাফল্য এখানেই।

মহানবীর [সা] জীবনেই যেমন আরবের সকল অঞ্চল এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় এসে গিয়েছিল, তেমনি আরবের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চল মহানবীর [সা] আনুগত্য স্বীকার করে মদিনা রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। সে সময় যেসব অঞ্চল মদিনা রাষ্ট্রের আওতাধীন হয়েছিল সেগুলোকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায় :

১. যুদ্ধ জয়ের ফলে যেসব অঞ্চল মদিনা রাষ্ট্রের আওতাধীন হয়েছিল, সেসব অঞ্চলে মহানবী [সা] নিজের পক্ষ থেকে শাসক নিয়োজিত করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর

www.pathagar.com

মক্কা, হিজায ও নজদ এলাকার শাসনকর্তা নিয়োজিত হয়েছিলেন হযরত ইতাব ইবন ওসায়দ [রা]।

২. সন্ধির ফলে যে সকল এলাকা রাসূলের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং যে সকল এলাকায় জাহিলি যুগের রাজতন্ত্র ও স্থানীয় কর্তৃক সম্পন্ন প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, মহানবী [সা] সে সকল রাষ্ট্রের রাজা বা আমীরকে পদচ্যুত না করে তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছিলেন; কেননা সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য রাজ্য দখল করা ছিল মহানবীর [সা] নীতিবিরোধী।

অন্যের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া তাঁর আদর্শের পরিপন্থী। তাঁর রাজ্য জয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের দাসত্বের প্রভাব বিলুপ্ত করে মানবতার প্রভাব কায়েম করা। তাই যেসব এলাকার রাজা বা শাসক ইসলাম মেনে নিয়েছে, আদর্শের অনুসারী হয়েছে, তাদের রাজ্য শাসনের ভার তাদের হাতেই রেখে দেন। এমনকি সে সকল প্রশাসক দীন ইসলাম কবুল না করলেও ইসলামী বিধান অনুযায়ী জিযিয়া দিতে রাজি হলে তাদের হাতেই তাদের এলাকার শাসনভার ছেড়ে দেন।

মহানবীর পররাষ্ট্র নীতিও ছিল সমালোচনার উর্ধ্বে। তিনি পার্শ্ববর্তী সকল দেশের সাথে সমঝতার মাধ্যমে নিজ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালিয়ে যেতেন। আক্রমণ বা আগ্রাসন নয়, বন্ধুত্ব বা মিত্রতা তাঁর অন্যতম নীতি হিসেবে কাজ করেছে।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ এবং পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে সমস্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সবার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার বিধান।

আধুনিক কালের তথাকথিত সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতি নিজেদের মানবতার একমাত্র বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। অথচ এদের সবারই রাষ্ট্রীয় নীতি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা ও ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক। তাদের সেবা সকলের তরে নয়। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণেই তাদের যাবতীয় চেষ্টা পর্যবসিত। এরা অন্যের সাহায্যে এগিয়ে এলেও তা করে নিজ স্বার্থে। তারা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাদপদ জাতিকে নবতর দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সাহায্য করে, যাতে তারা প্রয়োজনের সময় তাদের হাতিয়াররূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।

মহানবী [সা] উপস্থাপিত আদর্শ বা ইজম অর্থাৎ ইসলামে কোন রূপ প্রতারণার সুযোগ নেই। এ আদর্শ কোন দেশ বা জাতির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবার সুযোগ দেয় না। আর এক দেশের নগদ ঐশ্বর্য বৈভব শস্য শ্যামল উর্বর ভূমি বা মহামূল্য খনিজ সম্পদের প্রতি কারো লোভ থাকা অনুচিত। ইসলামের লক্ষ্য বিশ্বমানবের কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালের নাজাতের জন্য হিদায়াত। কল্যাণ ও হিদায়াত এ দুটো একে অন্যের

www.pathagar.com

পরিপূরক। কল্যাণ চাইলে হিদায়াত গ্রহণ অপরিহার্য আর হিদায়াত সর্বদা কল্যাণধর্মী। একটি ছেড়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই-ই ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি।

ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতাও সাম্য প্রতিষ্ঠায়ও বদ্ধপরিকর। ভাষা ও অন্য কোন কারণে বা জাতীয়তার কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টির সুযোগ এতে নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই অনারব ও আরব সমান। নিগ্রো কৃষ্ণাঙ্গ হাবশি ও শ্বেতাঙ্গের সমান অধিকার। মানুষ হিসেবে তারা একই সমতলে। ইসলাম মূলত একটি আদর্শিক ও দীনি আন্দোলন।

এ নীতির কারণেই মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আরব ও অনারব সমানভাবে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। তাদের আনুগত্য সকল নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য ছিল, যতক্ষণ তাঁরা সৎ ও আদর্শের অনুসারী থাকতেন। তারা কোন পশ্চাৎপদ বা অবহেলিত জাতি থেকে এলেও তাঁদের সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার করা হতো না।

মহানবী [সা] এ আদর্শের বাস্তবায়নে স্বয়ং সচেতন ছিলেন। হযরত সালমান [রা] পারস্য দেশীয় হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী সমাজে তাঁর অবস্থান ছিল খুব উচ্চে। সুহায়ব রুমি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। কিন্তু মহানবী [সা] কি যুদ্ধ, কি সন্ধি, সকল অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। হাবশি গোলাম হযরত বিলাল ইবনে রিবাহ [রা] সম্পর্কেও একথা সত্য। ইসলামী রাষ্ট্রে তিনি যে কেবল মসজিদের মুয়াজ্জিনই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। আধুনিক পরিভাষায় তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদমর্যাদার অধিকারী।

এরূপ মহান ও আদর্শভিত্তিক মূল নীতির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণেই হযরত মুহাম্মাদ [সা] সকল দেশের সকল নেতার শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। মাইকেল হার্টস তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, নেতা ও মনীষীদের মধ্যে 'নাম্বার ওয়ান' বলে স্বীকার করেছেন। বার্নার্ড শ বলেছেন 'ইউনিক' বা অতুলনীয়। আর বার্ট্রান্ড রাসেল তাকে সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ 'রিফরমার' বা সমাজ সংস্কারক অভিধায় বিভূষিত করেছেন।

আমাদের জীবনের যাবতীয় অবিশ্বাস, নিপীড়নের অবসান সম্ভবপর একমাত্র হযরতের আদর্শ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে তা আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজে প্রয়োগের মাধ্যমে। বার্নার্ড শ বিশ্বাস করেন : হযরত মুহাম্মাদের [সা] মত কোন ব্যক্তি বর্তমান বিশ্বের একনায়কত্ব পেলে বিশ্ব সমস্যা এমনিভাবে সমাধান করতে পারতেন, যার ফলে বিশ্বে সুখ ও শান্তি বিরাজ করতে।[২] ■

তথ্যপঞ্জি :

১. আল কুরআন, ৫ সূরা মায়িদা : আয়াত ৫১।

২. জর্জ বার্নার্ড শ, Getting married, London.

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও লেখক।

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] ওহি প্রাপ্তি, আন্দোলনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

মুহাম্মাদের [সা] বয়স তখন চল্লিশ বছর। রামাদান মাস এসে গেলো। হেরা গুহায় অবস্থান নিলেন মুহাম্মাদ [সা]। বিশ্বজাহান এবং জীবন মৃত্যুর মহারহস্য নিয়ে তিনি ভাবছিলেন।

একদিন এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলেন মুহাম্মাদ [সা]। একজন সহসা এসে উপস্থিত হলেন তার সামনে। কিছু একটা লিখা ছিলো একখণ্ড রেশমী কাপড়ে। তা সামনে ধরে তিনি বললেন, 'পড়ুন!' মুহাম্মাদ [সা] বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' আগন্তুক তাঁকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন।' মুহাম্মাদ [সা] বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' আগন্তুক তাঁকে দ্বিতীয়বার চেপে ধরে ছেড়ে দেন এবং বলেন, 'পড়ুন!' মুহাম্মাদ [সা] বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' আগন্তুক তাঁকে তৃতীয়বার চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক [জমাট বাঁধা রক্ত খণ্ড বা জরায়ু গাত্রে ঝুলে থাকে] থেকে। পড়ুন এবং আপনার রব অতীব অনুগ্রহশীল। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন সব কিছু শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না।' [আল আলাক]

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা] এবার তাঁর সাথে বাক্যগুলো আওড়ান এবং এগুলো তাঁর অন্তঃকরণে গেঁথে যায়। আগন্তুক ছিলেন জিবরীল [আ]। ওহিবাহক। আর এই বাক্যগুলো ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] প্রতি অবতীর্ণ প্রথম বাণী।

মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন একজন সাহসী পুরুষ। কিন্তু এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় তিনি কাঁপছিলেন। তিনি গুহা থেকে নেমে দ্রুত ঘরে ফেরেন এবং খাদিজাকে [রা] বলেন, 'যাম্মিলুনি যাম্মিলুনি' [আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও]।

গায়ে তাঁর তখনো প্রবল কম্পন। খাদিজা [রা] তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর কম্পন দূর হলো। তিনি সুস্থির হলেন। কিন্তু এক অজানা শঙ্কা তাঁকে পীড়ন করছিলো। তিনি বলেন, 'আমার তো জীবনের ভয় ধরে গেছে।' খাদিজা [রা] তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আপনি আশ্বস্ত হোন। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন সর্বদা সত্য কথা বলেন। অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। নিজের উপার্জিত অর্থ দরিদ্রকে দান করেন। ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করেন।'

খাদিজা [রা] ছুটে গেলেন তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফিলের কাছে। ওয়ারাকা প্রতিমা পূজা করতেন না। তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খাদিজা [রা] ওয়ারাকাকে হেরা গুহার ঘটনা সবিস্তারে অবহিত করেন। সব শুনে ওয়ারাকা বলে ওঠেন, 'কুদ্দুসুন, কুদ্দুসুন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ। ওহে খাদিজা, তুমি যা বললে, তা যদি সত্য হয় তাহলে এইতো সেই নামুস [বার্তাবহ] যিনি মূসার সাথে কথা বলেছিলেন। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ এই জাতির নবী হবেন। তাঁকে বলো যে তাঁকে দৃঢ়পদ থাকতে হবে।'

পরে মুহাম্মাদের [সা] সাথে ওয়ারাকার সরাসরি আলাপ হয়। সব বর্ণনা শুনে ওয়ারাকা বলেন, 'এই তো সেই নামুস যাকে আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুওয়তকালে যুবক হতাম। আপনার জাতি যখন আপনাকে বের করে দেবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম।' মুহাম্মাদ [সা] বললেন, 'ওরা কি আমাকে বের করে দেবে?' ওয়ারাকা বলেন, 'হ্যাঁ, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা নিয়ে কেউ আসবে অথচ তার সাথে শত্রুতা করা হবে না এমন তো কখনো হয়নি। সেই সময় আমি যদি জীবিত থাকি বলিষ্ঠভাবে আপনার সাহায্য করবো।' উল্লেখ্য, যে অল্পকাল পরই ওয়ারাকা মারা যান।

প্রথম ওহির প্রতিক্রিয়া সামলাবার জন্য ছয় মাস কাল ওহি আসা বন্ধ থাকে। এরপর একদিন মুহাম্মাদ [সা] কোথাও যাবার পথে উপর দিকে একটি আওয়াজ শুনতে পান। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি জিবরীলকে [আ] দেখেন। যাঁর ডানাগুলো ছিলো আদিগন্ত বিস্তৃত। এই দৃশ্য দেখে তিনি আবার ভীত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত বাড়িতে ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

'যাম্মিলুনি, যাম্মিলুনি', তিনি খাদিজাকে ডেকে বললেন। তাঁর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দেয়া হলো। এই অবস্থাতেই জিবরীল [আ] তাঁর নিকট আসেন এবং আল কুরআনের কয়েকটি বাণী পৌঁছে দেন যার অর্থ নিম্নরূপ :

'ওহে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি,
ওঠ, লোকদের সাবধান কর।
এবং তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর।
এবং তোমার পোশাক পাক সাফ কর।
এবং মলিনতা থেকে দূরে থাক।
এবং বেশি পাওয়ার জন্য ইহসান করো না।
এবং তোমার রবের খাতিরে ধৈর্য অবলম্বন কর।' –আল মুদ্দাসসির

হেরা পর্বত গুহায় অবতীর্ণ সংক্ষিপ্ত বাণীটিতে গভীর তত্ত্ব জ্ঞান লুকিয়ে আছে। এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে যে অধ্যয়ন বা জ্ঞান চর্চা শুরু হয় এবং সম্পন্ন হয় তা মানুষকে সীমাহীন কল্যাণের দিকেই নিয়ে যায়। একমাত্র আল্লাহমুখী জ্ঞান চর্চাই মানুষকে যাবতীয় পথ ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে পারে, অন্য কোন ধরনের জ্ঞান চর্চা নয়। আল্লাহ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা। মানুষের স্রষ্টাও তিনি। মানুষের বংশধারা বিস্তারের জন্য তিনি একটি সৃষ্টি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন যার একটি স্তরে স্বামীর শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্ব জমাট বাঁধা অতি ক্ষুদ্র একটি রক্ত পিণ্ডের মতো স্ত্রীর জরায়ু গাত্রে ঝুলতে থাকে। এই তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞানদান করলেন এবং মানুষের পথ চলা যে কতো নগণ্য অবস্থায় শুরু হয় সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আবারো অধ্যয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ মানুষের সামনে এ মহা সত্যকেও উপস্থাপন করলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতীব অনুগ্রহশীল এক সত্তা। তিনি মানুষকে কলম ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র বিপুলভাবে প্রসারিত করে দিয়েছেন। তদুপরি তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহে মানুষকে এমন সব কিছু শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না। তাঁর দেয়া জ্ঞানের কারণে মানুষ প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। কোন বিষয়ে মানুষ যদি সত্য জ্ঞান বা নির্ভুল জ্ঞান পেতে চায় তাহলে তাকে আল্লাহর কাছেই ধরনা দিতে হবে, অন্য কোন উৎস থেকে তা পাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর [সা] প্রতি অবতীর্ণ দ্বিতীয় বাণীটিতে দুনিয়ার মানুষ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং মানুষের কাছ থেকে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব তথা সমাজের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে পবিত্রতা, নি:স্বার্থতা এবং ধৈর্য হচ্ছে এই পথে চলার বড়ো সম্বল।

এই নির্দেশ পাওয়ার পর মুহাম্মাদ [সা] শুরু করলেন ইসলামের মর্মবাণী উপস্থাপনের কাজ।

আল্লাহর রাসূল [সা] সর্বপ্রথম ইসলামের প্রদীপ জ্বাললেন আপন গৃহে। প্রথম মুসলিম হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ [রা]। একেবারে ছোটবেলা থেকে তাঁর গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিলেন আলী [রা]। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। যায়িদ ইবন হারিসাহ ছিলেন মুহাম্মাদের [সা] আযাদ করে দেয়া দাস। নবী গৃহেই থাকতেন তিনি। ইসলাম গ্রহণ করে তিনিও ধন্য হলেন।

এরপর ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে একান্ত ঘনিষ্ঠ মহলে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরার প্রয়াস চালাতে থাকেন মহানবী [সা]। অচিরেই আবু বকর আতিক ইবন আবু কুহাফা [রা], উসমান ইবন আফফান [রা], আবদুর রহমান ইবন আউফ [রা], যুবাইল ইবনুর আওয়াম [রা], সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস [রা] এবং তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ [রা] ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবু উবাইদাহ ইনবুল জাররাহ [রা], আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ [রা], আরকাম ইবন আবীল আরকাম [রা], উসমান ইবন মাযউন [রা], কুদামা ইবন মাযউন [রা], আবদুল্লাহ ইবন মাযউন [রা], উবাইদাহ ইবন হারিস [রা], সায়িদ ইবন যায়িদ ইবন আমার [রা], ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব [রা], আসমা বিনতু আবু বাকর [রা], আয়িশাহ বিনতু আবু বাকর [রা], খাব্বাব ইবন আরাত [রা], উমাইর ইবন আবু ওয়াক্কাস, [রা], আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ [রা], মাসউদ ইবন কারী [রা], সালিত ইবন আমর [রা], আইয়াশ ইবনু আবু রাবিয়া [রা], আসমা বিনতু সুলামা [রা], খুনাইস ইবন হুযাফা [রা], আমের ইবন রাবিয়া [রা], আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ [রা], আবু আহমাদ ইবন জাহাশ [রা], জাফর ইবন আবি তালিব [রা], আসমা বিনতু উমাইস [রা], হাতিব ইবন হারিস [রা], ফাতিমা বিনতু মুজাল্লাল [রা], হুতাব ইবন হারিস [রা] ফুকাইহা বিনতু ইয়াসার [রা], মামার ইবন হারিস [রা], সায়েব ইবন উসমান ইবন মাযউন [রা], মুত্তালিব ইবন আযহার [রা], রামলাহ বিনতু আবু আউফ [রা], নায়িম ইবন আবদুল্লাহ [রা], আমের ইবন ফুহাইরা [রা], খালিদ ইবন সায়িদ ইবনুল আস [রা], আমীনাহ বিনতু খালাফ [রা], হাতিব ইবন আমর [রা], খালিদ ইবন আমের [রা], আকিল ইবন আমের [রা], ইয়াস ইবন আমের [রা], আম্মার ইবন ইয়াসার [রা] এবং সুহাইব ইবন সিনান [রা]।

সত্য সন্ধানী এই লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের [সা] পবিত্র জামায়াতের প্রথম সারিতে শামিল হয়ে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন। সারা দুনিয়া জোড়া যে পৌত্তলিকতা, স্বার্থপরতা, যুলুম-নির্যাতন এবং অনৈতিকতার সয়লাব বইছিলো তার গতি রোধ করে দাঁড়াবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হন।

www.pathagar.com

এ যাবত নীরবে চলছিলো ইসলামী আন্দোলনের কাজ। এক একজন মানুষের কাছে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হতো। যিনিই ঈমান আনতেন তিনিই একই কাজে লেগে যেতেন। তখন প্রত্যেক মুমিনই ছিলেন ইসলামের নিষ্ঠাবান মুবাল্লিগ।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এলো সরবে ইসলামের আহ্বান জানাবার নির্দেশ। একদিন মহানবী মুহাম্মাদ [সা] কাবার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ে ওঠে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দেন 'ইয়া সাবাহাহ, ইয়া সাবাহাহ।' তখনকার দিনে আরবগণ লোকদেরকে কোন বিপদের কথা জানাতে হলে উঁচু স্থানে ওঠে চীৎকার করে এই শব্দ উচ্চারণ করতো। মুহাম্মাদের [সা] কণ্ঠে এই ধ্বনি শুনে দলে দলে ছুটে এসে বহু লোক সমবেত হয় পাহাড়ের পাদদেশে। মহানবী [সা] সমবেত জনম লীকে বললেন, 'হে কুরাইশগণ, আমি যদি বলি যে পাহাড়ের ওপাশে একদল অশ্বারোহী শত্রুসেনা অবস্থান করছে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?' উত্তর ভেসে এলো, 'নিশ্চয়ই! আমরা তো আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি।'

মুহাম্মাদ [সা] বললেন, 'তবে শোন, আমি একজন সাবধানকারী। এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি। ওহে আবদুল মুত্তালিব, ওহে বনু আবদ মানাফ, ওহে বনু জুহরাহ, ওহে বনু তামীম, ওহে বনু মাখযুম, ওহে বনু আসাদ, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সাবধান করতে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই]- এই সাক্ষ্য যদি তোমরা না দাও তোমরা দুনিয়ার অকল্যাণ এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না।'

মহানবীর [সা] চাচা আবু লাহাব বলে ওঠে, 'তোমার অকল্যাণ হোক, এই জন্য তুমি আমাদেরকে ডেকে এনেছো।' সে লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আল্লাহর রাসূল [সা] তাঁর গৃহে বনু আবদুল মুত্তালিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ভোজের দাওয়াত দেন। যথাসময়ে তারা আসে তার গৃহে। ভোজ শেষে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের একাংশে বলেন, 'গোটা আরবের এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমি এখন যা তোমাদের সামনে পেশ করছি তার চেয়ে উত্তম কিছু পেশ করতে পারে।' আমি এমন কিছু নিয়ে এসেছি যা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাপারে কে আমার সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' আবু তালিব, হামযা, আব্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সকলেই থাকে নিরুত্তর। কেউ আল্লাহর রাসূলের [সা] এই উদাত্ত আহ্বানের সাড়া দিলো না। এই নীরবতা অসহ্য মনে হচ্ছিলো কিশোর আলীর [রা] কাছে। তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন 'আমি আপনার সহযোগিতা করতে থাকবো।'

এদিকে ক্রমাগতভাবে নাযিল হচ্ছিলো আল্লাহর বাণী। মহানবী [সা] সেসব বাণী তুলে ধরছিলেন জনসমক্ষ। প্রবীণ সরদারগণ তা উপেক্ষা করলেও নবীনদের মাঝে তা আবেদন সৃষ্টি করে। তাদের অনেকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে ইসলামই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ।

www.pathagar.com

অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব যারা তারা সত্যকে সত্য জেনেও চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তারা শির উঁচু করে এগিয়ে এসেছে নিজেদের জীবন ও সমাজ জীবনে পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি করতে। সমভাবে এগিয়ে এসেছিলো যুবতীরা। আবার, অভিজাত ঘরের সন্তানেরা যেভাবে এগিয়ে এসেছে সেভাবে এগিয়ে এসেছে দাস-দাসীরা।

ইসলামের কট্টর দুশমন যারা তাদের ঘরেও লেগেছিল ইসলামী আন্দোলনের ঢেউ। বিস্মিত আবু জাহল দেখলো তার ভাই সালামা ইবন হিশাম [রা] মুসলিম হয়ে গেছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার চাচাতো ভাই হিশাম ইবন আবু হুজাইফা [রা] ও আইয়াশ ইবন আবু রাবিয়া [রা] এবং চাচাতো বোন উম্মু সালামা [রা]। আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবিবা [রা] পিতার চোখ রাঙানো উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রবীণ সরদার উতবা ইবন রাবিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ তার পুত্র আবু হুযাইফাকে [রা] ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। মাক্কার অন্যতম সেরা কূটনীতিবিদ সুহাইল ইবন আমরের কূটকৌশল ভোঁতা প্রমাণিত হলো তার কন্যা সাহলার [রা] সত্যপ্রীতির কাছে। উমাইয়া ইবন খালাফের বোন আমীনাহ বিনতু খালাফ [রা] ভাইয়ের প্রতিপক্ষ হয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দৃঢ়পদে এগিয়ে আসেন।■

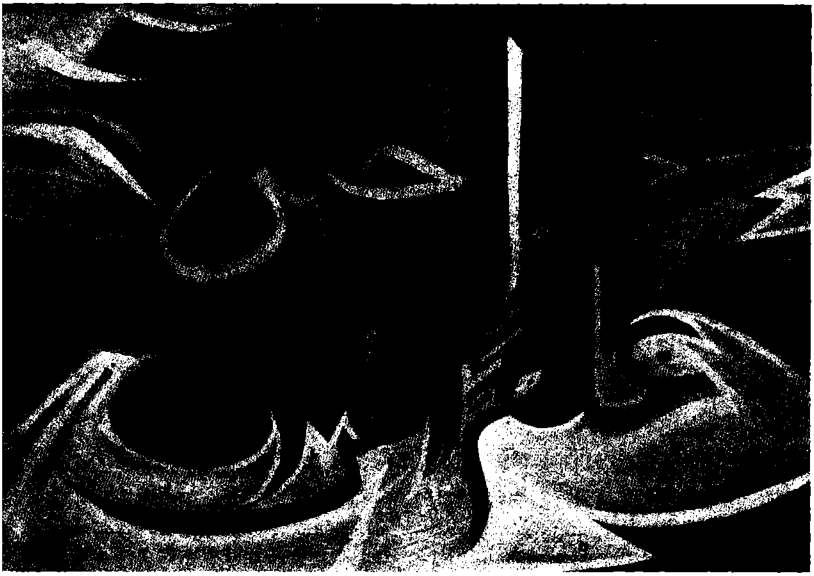

www.pathagar.com

ইসলাম ও রাসূলের [সা] বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

বিশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত সবচেয়ে বিতর্কিত, মারাত্মক এবং বিভ্রান্তিমূলক গ্রন্থটি হলো– The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order। লেখক স্যামুয়েল হান্টিংটন [Samuel P Huntington] অত্যন্ত চতুরতার সাথে, পূর্ব পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত তথ্যের সহায়তায়, পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব সুরক্ষিত রাখতেই এই গ্রন্থে তার প্রতারণামূলক যুক্তির অবতারণা করেন। তিনি সেই গ্রন্থের ২৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "শুরু থেকেই ইসলাম তার বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্যে নির্ভর করেছে তরবারীর উপর। এই ধর্ম [ইসলাম] সামরিক সৌকর্যকে মহীয়ান করেছে। ইসলাম জন্মলাভ করেছে যুদ্ধপ্রিয় যাযাবর বেদুইনদের মাঝে। এই সংঘাতমূলক পরিবেশেই ইসলামের ভিত্তি রচিত হয়েছে। মুহাম্মাদকে স্মরণ করা হয় একজন শক্তিশালী সৈনিক এবং কৃতি সামরিক পরিচালকরূপে। খ্রিস্ট বা বুদ্ধ সম্পর্কে এমন কথা কেউ বলবে না। ইসলামের মৌলতত্ত্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে"। ["Islam has from the start been a religion of the sword... it glorifies military virtues.

www.pathagar.com

Islam originated among warring Bedouin nomadic tribes and this violent origin is stamped in the foundation of Islam. Muhammad him self is remembered as a hard fighter and a skillful military commander... on would say this about Christ or Buddha... The doctrines of Islam dictate war against unbelievers."]। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরে যখন বিশ্বময় শান্তির সুবাতাসে চারদিকে প্রশান্তির আবহ সৃষ্ট হচ্ছিল তখনই হান্টিংটনের মত গবেষকরা এগিয়ে এলেন ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্বকে প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করে নতুন যুদ্ধের শ্লোগান রচনা করতে। ইসলামে যে সন্ত্রাসের বীজ রয়েছে তা অসত্য হলেও তাদের শক্তিশালী এবং বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে চারদিকে তা ছড়িয়ে দিল।

অথচ মাত্র পাঁচ দশক পূর্বে তৎকালীন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব জর্জ বার্নার্ড শ [George Bernard Shaw] এ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা নিশ্চয় হান্টিংটনের অজানা থাকার কথা নয়। তিনি লিখেছিলেন : "আমি সব সময় মুহাম্মাদের [সা] ধর্মকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখি তার অদ্ভুত প্রাণ প্রাচুর্যের জন্যে। আমি মনে করি এইটি একমাত্র ধর্ম যার রয়েছে সকল যুগের পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের ধারাকে ধারণ করার ক্ষমতা। আমি তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছি। আমার মনে হয়েছে, তিনি এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তিনি খ্রিস্টের বিরোধী তো নিশ্চয় নন, বরং তাঁকে বলা যেতে পারে মানব জাতির মুক্তিদাতা। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মতো ব্যক্তি আধুনিক বিশ্বের একনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে যেসব সমস্যায় জর্জরিত আজকের পৃথিবী তা তিনি সমাধানে সক্ষম হতেন এবং বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতেন বহু প্রত্যাশিত শান্তি ও সুখের পরিবেশ। আমি ভবিষ্যৎ বাণী করেছি যে মুহাম্মাদের [সা] ধর্ম আগামীতে ইউরোপে গৃহীত হবে যেভাবে আজকের ইউরোপে তা ক্রমে ক্রমে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করেছে।" ["I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phases of existence which can make its appeal to every age. I have studied him-the wonderful man, and in my opinion far from being an anti-Christ, he must be called the savior of humanity. I beilive that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable Europe of today."]

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের হান্টিংটনেরা হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন কেন? কেন তারা ইসলামের মধ্যে সন্ত্রাসী কাজকর্মের মূল অনুসন্ধানে ব্যস্ত হলেন? কোন কোন উৎস থেকে তারা তাদের মনের মতো সত্য উদ্ধার করলেন? এসব প্রশ্নের কোন যথার্থ উত্তর নেই, তবে এও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে আগ্রাসী পাশ্চাত্য মুসলিম বিশ্বকে এক ধরনের প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করেছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি সোভিয়েট ইউনিয়ন খণ্ডছিন্ন হলে এবং সমগ্র পূর্ব ইউরোপব্যাপী সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হলে মুসলিম বিশ্বকে তারা শুধু প্রতিপক্ষ নয়, শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হান্টিংটন প্রমুখ গবেষক-পর্যালোচকেরা সে ক্ষেত্রে ইন্ধন যুগিয়েছেন তাত্ত্বিক সূত্র রচনা করে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড়শো কোটি। বিশ্বমানের প্রায় এক চতুর্থাংশ। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য রাষ্ট্রের ৫৭টিতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য রাষ্টেও মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য নয়। পাশ্চাত্যেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা প্রায় কোটি খানেক। যুক্তরাজ্যে প্রায় অর্ধ কোটি। জার্মানীতে ৩৫ লক্ষের মতো। ফ্রান্সেও ৫০ লক্ষের মতো। এক কথায়, ইসলাম বিস্তৃত হচ্ছে অতি দ্রুত। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, আগামী দুই দশকে বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রায় দু'শো কোটি, সমগ্র মানব সন্তানের এক তৃতীয়াংশ। এটিও পাশ্চাত্যের জন্যে সৃষ্টি করেছে গভীর এক উদ্বেগ, কেননা পাশ্চাত্যে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

তাছাড়া, মুসলিম জনসমষ্টি প্রধানত কেন্দ্রিভূত রয়েছে এমন সব ভৌগলিক অঞ্চলে যাদের কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এমন সব অঞ্চল যা কারো নিয়ন্ত্রণে গেলে তা হয়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধানতম নিয়ন্ত্রক। অতীত ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠায় চোখ বুলান, দেখবেন, মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেই ব্রিটেন এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যেখানে সূর্য অস্ত যেত না। মধ্য এশিয়া দখল করেই রাশিয়া গড়ে তোলে বিরাট সোভিয়েট সাম্রাজ্য। আজকের যুক্তরাষ্ট্রের শৌর্য-বীর্য-সমৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধির অন্যতম মৌলসূত্র নিহিত রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার ফসিল ফুয়েলের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অবস্থা বর্তমানে তেমন সন্তোষজনক নয় বটে, কিন্তু যেসব ভৌগলিক এলাকায় মুসলমানদের বসবাস, সেসব অঞ্চলের সম্পদের সার্থক সদ্ব্যবহার মুসলমানরা করতে সক্ষম হলে বিশ্ব মুসলিমের কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনার শত বাতায়ন উন্মুক্ত হতে বাধ্য। অন্যদিকে মুসলমানদের যারা প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করেছে, তাদের শ্যেন দৃষ্টি এসব সম্পদের উপর। আর তাদের শ্যেন দৃষ্টি ঐসব ভৌগলিক অবস্থানের দিকে, যেন গুরুত্বপূর্ণ ঐসব কৌশলগত অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তারা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। প্রধানত এসব কারণেই মুসলিম বিশ্বকে শত্রুজ্ঞান করে পাশ্চাত্য যে কোন

www.pathagar.com

অভিযোগে, তা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গ্রাস করতে চায়। না পারলে বিধ্বস্ত করে চারদিককে তছনছ করতে চায়।

মুসলিম বিশ্বের একটা অতীত আছে। মুসলমানদের উজ্জ্বল অতীত আছে বলেই তাদের প্রতি পাশ্চাত্যের রয়েছে গভীর সন্দেহ। রয়েছে এক ধরনের আক্রোস। অষ্টম শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৃহত্তম ১৪টি নগরীর [অন্যূন ৫০,০০০ জন অধ্যুষিত] ১৩টি ছিল মুসলিম বিশ্বে [উদাহরণস্বরূপ, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাগদাদ, মক্কা, বোখারা]। শুধুমাত্র একটি ছিল পাশ্চাত্যে [রোম]। তা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল সর্বপ্রথম আলেকজান্দ্রিয়ায়। পৃথিবীর সেরা গ্রন্থাগারগুলোর সব ক'টিই ছিল মুসলিম বিশ্বে। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতক সময়কালে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় সকল গবেষক ছিল মুসলমান। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন সম্পর্কিত বিজ্ঞান পর্যন্ত। যে উদার নৈতিক চিন্তাভাবনায় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপ আন্দোলিত হতে থাকে তারও মূল উৎস মুসলিম পণ্ডিতদের পর্যালোচনা-পর্যবেক্ষণ। ইউরোপের রেনেসাঁর ভিত্তি মূল নিহিত রয়েছে তাঁদেরই সৃজনধর্মী গবেষণা এবং বিশ্লেষণে। সুতরাং পাশ্চাত্য যে মুসলিম বিশ্বের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ঐ আমলে মুসলমানরা শুধু শিক্ষা-সংস্কৃতি-সৃজনমূলক কর্মেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন তাই নয়, এশিয়া-আফ্রিকার বৃহত্তর ভূখণ্ডে তাঁদের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপের একাংশ পর্যন্ত তাঁদের শাসনাধীনে চলে আসে। শৌর্য-বীর্য-বিক্রম-পরাক্রমে তাঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়। এসবই রয়েছে পাশ্চাত্যের স্মরণে। বিশেষ করে তাদের স্মরণে রয়েছে কয়েকশো বছরব্যাপী মুসলিম বিশ্ব এবং খ্রিস্টান জগতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রলম্বিত সেই ক্রুসেড [Crusade] বা ধর্ম যুদ্ধের তিক্ত স্মৃতি যে যুদ্ধে পাশ্চাত্য বারে বারে পরাজিত হয়েছে মুসলমানদের দ্বারা এবং খেয়েছে বেধড়ক মার হাজারো ঘাটে। এসব বারে বারে পাশ্চাত্যকে, বিশেষ করে ইউরোপের বর্ধিতাংশ যে যুক্তরাষ্ট্র তাকে অস্থির করে তোলে। জর্জ বুশ জুনিয়র নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ [War against Terrorism] শুরু করার সময় নিজেই তাকে 'ক্রুসেড' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয় বটে, কিন্তু কয়েকশো বছরের নির্যাতন-বঞ্চনা-প্রতারণার পরে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে এক ধরনের জাগৃতি। সচেতনভাবে দাঁড়াবার এক দৃঢ় প্রয়াস। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, নৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রেও ইসলাম এবং ইসলামী মূল্যবোধ হয়েছে তাদের প্রেরণার উৎস। তাই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ইসলামকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে। গ্রহণ করেছেন ইসলামী নীতির প্রবক্তা রাসূলুল্লাহকে [সা] আক্রমণ করার নীতি। লক্ষ্য দ্বিবিধ : এক. মুসলিম বিশ্বে বিভেদ-বিভাজন ছড়িয়ে তাদের নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করা। দুই. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী জোটকে শক্তিশালী

www.pathagar.com

করে চূড়ান্ত মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। স্যামুয়েল হান্টিংটন, ফ্রানসিস ফুকুয়ামা প্রমুখ লেখকরা এ কাজটিই করে চলেছেন।

ইসলাম কিন্তু শান্তির ধর্ম। সকল ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের প্রতি সহিষ্ণুতা ইসলামের বড় অলঙ্কার। সাম্য এবং মৈত্রীর বন্ধন ইসলামের মৌল মূলধন। পাশ্চাত্যও এসব জানে। শুধু জানে তা নয়, তাদের বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনায় তা স্বীকৃত হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার তেরটি কলোনী ১৭৭৬ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে সংবিধান রচনা করে সে ক্ষেত্রেও তারা ইসলামের নীতিকে গ্রহণ করে। আমেরিকার সংবিধানে গৃহীত মূলনীতিতে– সাম্য, স্বাতন্ত্র্য ও সুখের অন্বেষণ [Equality, Liberty and Pursuit of Happiness] তা প্রতিফলিত। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের শ্লোগান ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব [Liberty, Equality and Fraternity] এবং এতেও প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামের মর্মবাণী। যে গণতন্ত্র আজ পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতম অর্জনরূপে স্বীকৃত হচ্ছে, তা ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বেই সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আরব ভূমিতে, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে। মদীনা রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান [Madina Charter] হলো বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। মুসলিম বিশ্বের এই ঐতিহ্য ভুলে কার সাধ্য?

সত্যি বটে, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্ধকার থেকে পাশ্চাত্য এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসেছে আলোর রাজ্যে। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, তাঁরা আলোর পথ পরিহার করে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার ডোবায় নিমজ্জিত হয়েছে। ফলে আজ তারা সবার দয়ার পাত্র। উপেক্ষিত। অসহায়ত্বের গহ্বরে নিমজ্জিত। ইসলাম কিন্তু সব সময় আলোকোজ্জ্বল, পথের দিশারী। ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। ইসলাম সব সময় সন্ত্রাসকে ঘৃণা করেছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে : "হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ ব্যতীত অথবা দেশে মারাত্মক ক্ষতিসাধনে লিপ্ত ব্যক্তিকে ছাড়া কেউ যদি একজনকেও হত্যা করে তাহলে সে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করলো এবং কেউ যদি একজনকে রক্ষা করে তাহলে সে সমগ্র মানবকুলের জীবন রক্ষা করলো।" ["If anyone killed a person not in retaliation of murder, or to spread mischief in the land, it would be as if he killed all manking, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind" (Verse 5 : 32)"]। সামাজিক জীবনকে শান্তি পূর্ণ করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : "ধর্মে জোর প্রয়োগের কোন স্থান নেই। সত্য সত্যই সঠিকপথ ভ্রান্তপথ থেকে ভিন্ন" [There is no compulsion in religion. Verily, the Right path has becomedistinct from the wrong path". (2 : 256)]। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত হয়েছে : "আমি এক প্রকৃত আল্লাহকে ইবাদত করি। তিনিই সবার প্রভু, তোমার এবং আমারও। আমি তোমাদের সত্যের পথ প্রদর্শন করেছি। তুমি তা গ্রহণ করতে পার, নাও করতে

www.pathagar.com

পার। তোমার তোমার পথ ও মতের দায়িত্ব তোমারই। আমার পথের জন্যে দায়িত্ব আমার" ["I am a worshipper of the One True, God, the lord of all, you as well as of my self. I have shown you the Truth. It is up to you whe ther you accept it or not. For your ways the responsibility is yours, for my ways the responsibility is mine" (109 : 6)]। সমাজে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের জন্যে পবিত্র কুরআনের মূল সুর হলো : "লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদীন" ["To you be your way, to me mine"]।

ইসলামের এমন নীতির প্রকাশ যখন সুস্পষ্ট, দিবালোকের মতো উজ্জ্বল, তখন হান্টিংটনদের মুখে ভিন্ন কথা শুনলে ভীত হই। হই সন্ত্রস্ত। ভীত এই এজন্যে যে, আবার কোন ষড়যন্ত্রের জালে হয়তো জড়িয়ে পড়ছে বিশ্ব মুসলিম। পাশ্চাত্যের প্রবল প্রতাপের এই মুহূর্তে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সঠিক জবাব দেয়া এখনো হয়তো সম্ভব নয়, কেননা মুসলমানরা পিছিয়ে রয়েছে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায়, অর্থনৈতিক মানে, বিশেষ করে সঠিক কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে। তাই মুসলিম বিশ্বকে এই সময়কে গ্রহণ করতে হবে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে। আগে নিজেদের সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে। তারপর সঠিক উত্তর ছুঁড়ে দিতে হবে তাদের মুখের উপর। এখন কিন্তু ধৈর্যধারণের সময়। এখন শুধু নিজেদের যথাযথভাবে তৈরি করার সময়। এই মুহূর্তে একটি ভুল হাজার যোজন পিছিয়ে দিতে পারে মুসলমানদের। একথা যেন সবার স্মরণে থাকে।■

www.pathagar.com

মহানাবিক ॥ আ ল মু জা হি দী

বলো
কবে আসবে আবার এ বাংলায়
আঁধারের পর্দা ছিঁড়ে জ্বলন্ত আভায়
আসবে কখন
সূর্যকরোজ্জ্বল জীবন্ত রেখায়।
ইতিহাসে নেমে আসে
গাঢ়তম অন্ধকার
সম্মুখে দাঁড়ানো স্ফীতকায় কুৎসিত তিমির পাহাড়
বিদীর্ণ বিথার, আমাদের উত্তরাধিকার-
সূর্য আসেনি এখানে
বহুদিন বহুকাল-
গ্রহ-তারা, নক্ষত্র নিলয় ছিন্নভিন্ন। এখানে ওড়েনি
কাল-সেতু
কেউ বাঁধেনি মিলন সেতু
বহুদিন বন-বনান্তরে গান নেই। সাড়া নেই প্রাণে
এতো কঠিন প্রহর
নির্জন, নিথর
এখানে কাটেনা বন্দরের কাল
বলো, হে নাবিক
কবে আসবে আবার এ-বাংলায়
আরব সাগর পার হয়ে
আমার সমুদ্রে
বঙ্গোপসাগরে ভাসাবে জাহাজ
টালমাটাল!
কবে দেখা হবে? দেখা দেবে কালের মাস্তুল
কবে শেষ হবে বন্দরের কাল
শোধ হবে দিবসের ঋণ
মেটাবে মাশুল-
হে মহানাবিক,
আমরা তো ভুলে গেছি সমুদ্রের চিহ্ন, দিক
দিন রাত্রি, আহ্নিক বার্ষিক-
গতি। কালচক্র-
আমরা বিস্মৃত সময়ের পাদবিক

www.pathagar.com

দিক চিহ্নহীন
আকাশে ওড়াই মিথ্যে ফানুশ রঙিন
শুধু ঘোরাফেরা তমসায়-গাঢ়তম কুয়াশায়
দিশেহারা। আমরা তো বিপ্রতীপ নান্দনিক
পৃথিবীর প্রান্তসীমা
কখনো ছুঁয়ে দেখি না
দিগন্তের সুপ্রভ ইংগিত
ফিরে পাইনা সংবিৎ
নি:সঙ্গ নির্জীব অবসাদে ভেঙে পড়ে প্রতিটি প্রত্যুষ
পাহাড়, পর্বত হিন্দুকুশ
জীবনের চারপাশে ঘেরা
আমরা বাঁধিনি কখনো ডেরা
মৃত্যুর কফিন
              ম্লান করে দেয় জীবিতের দিন
আমরা কেন মৃত্যুর কায়া গড়ি,
কালো কুটিল শর্বরী
ছায়া ফেলে প্রতিদিন
কঠোর কুঠার কেটে ফেলে দিক
কালোগ্রীবা পাহাড়ের মৃতস্তূপ হিম, সুকঠিন
বলো, কবে আসবে আবার এ বাংলায়
রুপোলি মেঘের ছায়ায়
              নদী মেখলা এ বাংলায়
হে মহানাবিক,
ভাসাবে আলোর ভেলা
কখন রোদেলা
প্রজ্জ্বল আকাশ
আলো, শুধু আলো একরাশ
ছড়াবে বিদ্যুৎ রেখা
বলো, কবে হবে দেখা
বলবে সুদীপ্র ধ্রুবতারা
কেবল বলবে প্রাণে-প্রাণে
নিখিল আস্তির সাড়া।

www.pathagar.com

পরমার্থ ॥ কে. জি. মো স্ত ফা

আমাদের প্রাণে আজ মূর্ছিত দিন
ভালবেসে কে বাজাবে আলোকের বীণ ॥

ভয় হয় যদি সেই আলোর গানে
শুকনো পাতায় কোন দহন আনে
তাই ভাবি যতবার
নেই সমাধান তার
অবশিত মন থাকে আঁধারে বিলীন ॥

সেই ভয় সেই দ্বিধা সরিয়ে ফেলে
প্রথম আলোর মতো কে তুমি এলে
যদি আমি মুছে যাই
যেন তোমাতে হারাই
অসীমের অনুগ্রহে শোধ ঋণ ॥

www.pathagar.com

আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ॥ মা হ ফু জ পা র ভে জ

মানুষের একটি নেপথ্য আছে:
মানুষ বিগত ইতিহাস ছিঁড়ে উদ্ভূত সত্তার উদ্বোধন
মানুষ বহতা বর্তমান আলিঙ্গন করা জ্বলন্ত সপ্রাণ সমারোহ
মানুষ আগামী ভবিষ্যৎ ছিনিয়ে আনার অবিরত চেষ্টারত একটি অস্তিত্ব

মানুষের একটি নেপথ্য আছে
মানুষের বর্তমান আছে
মানুষের ভবিষ্যৎ আছে
মানুষের সব আছে; সব কিছুই তো থাকার কথা!
তবু যেন মানুষ বিষণ্ন বাতাসে সাঁতাররত হাহাকার মাছ!
আদি থেকে অন্তে অস্থির জাতক এক লক্ষ্যের সন্ধানে–

কেউ তাদের থামাতে পারে নাই
দিতে পারে নাই অতীতের পাঠ
বর্তমানের পথ নির্দেশ
ভবিষ্যতের আগাম মানচিত্র–
মানুষকে কেউই জানায় নাই আদি-অন্তহীন ঠিকানার খোঁজ
মানুষকে কেউই দেখায় নাই অনি:শেষ সম্ভাবনার সোপান

সত্যরূপে, সুন্দররূপে, কল্যাণরূপে মানুষের কৃতিত্ব ও সফলতা
অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় আপনারই মাধ্যমে পেয়েছে স্বর্ণরেখা:
জীবনের অন্ধকার থেকে জান্নাতের আলোকিত উত্তরণ
হে রাসূল সালাম জানাই আপনাকে কৃতজ্ঞ আবেশে–

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] দেশ শাসন : শৃঙ্খলা বিধান

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

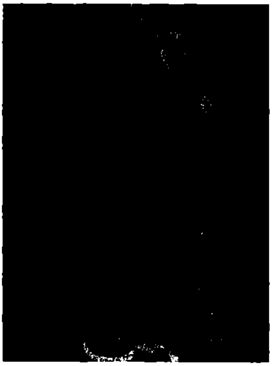

মহানবীর [সা] বয়স তখন ষাট বছর। এ বয়সেও রাষ্ট্রের সকল গুরুদায়িত্ব নিজেই সম্পাদন করতেন। প্রশাসক ও রাজকর্মচারী নিয়োগ, মুয়াযযিন ও ইমাম নির্দিষ্টকরণ, যাকাত ও জিযিয়া আদায়কারীদের নিযুক্তি, বিজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, মুসলমান গোত্রসমূহের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন, সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, মামলা-মোকদ্দমায় রায় প্রদান, উপজাতীয়দের গৃহযুদ্ধ দমন, প্রতিনিধি দলের জন্য ভাতা নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় আদেশ জারিকরণ, নওমুসলিমদের ব্যবস্থা, শরীয়াতের মাসআলাসমূহে ফাতওয়া দান, অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশ কার্যকরীকরণ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপারে শৃঙ্খলা স্থাপন, কর্মচারীদের দেখাশোনা এবং তাদের কাজের হিসাব গ্রহণ প্রভৃতি ছিল এ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দূরবর্তী প্রদেশসমূহে কয়েকজন সাহাবীকে প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মদীনা ও পার্শ্ববর্তী ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের দায়িত্ব মহানবী [সা] নিজেই সম্পন্ন করতেন।

ইসলামী খেলাফতের এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য মহানবীর [সা] উপর বিরাট চাপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, তাঁর দৈহিক কর্মশক্তিতেও দারুণ

www.pathagar.com

ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শেষ জীবনে শারীরিক দুর্বলতার কারণে অনেক সময় বসে বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। এ শারীরিক দুর্বলতার কারণ কি ছিল, তা হযরত আয়েশার [রা] মুখে শোনা দরকার। কারণ, মহানবীর [সা] জীবনের কর্মধারা সম্বন্ধে তিনিই সঠিক বর্ণনা দিতে পারেন।

"আবদুল্লাহ ইবনে শফীক [র] বলেন : আমি হযরত আয়েশাকে [রা] জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী [সা] বসে বসে নামায পড়তেন কি? তিনি বললেন : হাঁ। তবে তখন, যখন জনগণ তাঁর স্বাস্থ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।"

সেনাপতি

ছোটখাট যুদ্ধ ও সামরিক অভিযানে সেনাপতি নির্বাচিত হতেন বিশিষ্ট সাহাবীগণ; কিন্তু যে কোন বড় সংঘর্ষ দেখা দিলে তাতে মহানবী [সা] নিজেই নেতৃত্ব দিতেন। বদর, ওহুদ, খায়বার, মক্কা বিজয়, তাবুক ইত্যাদিতে তিনিই সেনাপতি ছিলেন। এর উদ্দেশ্য শুধু সেনা পরিচালনা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনই ছিল না, বরং সৈন্যদের সাধারণ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি দেখাশোনা করাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সে মতে মহানবী [সা] ইসলামী সৈন্যদের যেসব খুঁটিনাটি সীমালঙ্ঘনেরও হিসাব নিতেন, তা হাদীস গ্রন্থসমূহে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণেই ইসলামী যুদ্ধনীতি অস্তিত্ব লাভ করেছিল।

ফাতওয়া দান

মহানবীর [সা] যুগে কয়েকজন সাহাবী ও ফাতওয়া দানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তিনিই এ দায়িত্ব পালন করতেন। ফাতওয়া দেয়ার জন্য তিনি কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি বরং উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি ইসলামী আহকাম সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দান করতেন। ইমাম বুখারী 'কিতাবুল ইলমে' এসব ফাতওয়াকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। খেলাফতের এ দায়িত্বকে হযরত উমর [রা] নিজের খেলাফতকালে অত্যন্ত উন্নতি সাধন করেন এবং এর জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম করেন।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি

মহানবীর [সা] আমলেই বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী ও হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে হুযূর [সা] নিজেই [কাজী] নিযুক্ত করে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মহানবী [সা] নিজেই করতেন। তাঁর নিকট বিচার চাওয়ার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত করেছে যার শিরোনাম এরূপ :

'মহানবীর দরজায় কোন দারোয়ান না থাকা প্রসঙ্গে।'

এ কারণে মহানবী [সা] ঘরের ভেতরেও নিশ্চিন্ত মনে বসতে পারতেন না। মহিলাদের

www.pathagar.com

অভাব অভিযোগ সাধারণত অন্দর মহলেই শুনতেন। মহানবীর [ফায়সালাসমূহের এত বিরাট সম্ভার হাদীস গ্রন্থে রক্ষিত আছে সেগুলো সংগ্রহ করলে একটি বিরাট গ্রন্থে পরিণত হবে। সাধারণত হাদীসের 'কিতাবুল বুয়ূ'-এ দেওয়ানী মোকদ্দমা এবং 'কিতাবুল কিসাস ও ওয়াদ্দিয়াত'-এ ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ফরমান

এ কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহানবীর [সা] আমলে অন্যান্য বিভাগের জন্য কোন স্বতন্ত্র দফতর ছিল না; কিন্তু ফরমান বিভাগের ক্ষেত্রে দফতরের প্রাথমিক রূপরেখা কায়েম হয়েছিল। এ কাজের জন্য প্রথমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত এবং শেষদিকে হযরত মুয়াবিয়া আদিষ্ট হন। এছাড়া অন্যান্য সাহাবীও মাঝে মাঝে এ দায়িত্ব পালন করতেন। মহানবী [সা] সমকালীন সম্রাট ও বাদশাহদের নামে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে যেসব চিঠিপত্র প্রেরণ করেন, বিজাতীয়দের সঙ্গে যেসব চুক্তি সম্পাদন করেন, মুসলমান গোত্রসমূহের নামে যেসব নির্দেশ জারি করেন, প্রশাসক ও যাকাত আদায়কারীগণের হাতে যে সমস্ত ফরমান সমর্পণ করেন, সেনাবাহিনীর যে রেজিষ্টার প্রস্তুত করান, কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যেসব হাদীস লেখান, তা সবই এ শ্রেণীভুক্ত। যুরকানী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে মহানবীর লিখিত নির্দেশ ও ফরমানসমূহের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

অতিথি সেবা

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর মহানবীর [সা] ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, যারা তাঁর খেদমতে আগমন করত, তারা খেলাফত ও নবুওয়তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হত। তিনিও এ হিসেবেই তাদের মেহমানদারী করতেন। অতিথিদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ইসলাম গ্রহণের জন্য আসত। তাদের আতিথ্যের জন্য মহানবী [সা] প্রথম থেকেই বিশেষভাবে বেলালকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। কোন অভাবগ্রস্ত মুসলমান যখন মহানবীর [সা] খেদমতে আসত এবং তিনি তাকে খালি গায়ে দেখতেন, তখন হযরত বেলালকে টাকা ধার করে হলেও তার জন্য অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিতেন। পরে কোথাও থেকে তাঁর কাছে অর্থকড়ি এলে তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হত। কেউ তাঁকে ব্যক্তিগত উপঢৌকন দিলে তাও এ খাতে ব্যয় করা হত। মহানবী [সা] মাঝে মাঝে সাহাবীগণকে সাদাকা ও খয়রাত দানের প্রতি উৎসাহ দিতেন। এ পথে যে অর্থ আসত, তা সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরদের সাহায্যার্থে ব্যয় হত। একবার মুহাজিরদের একটি ছিন্নমূল দল মহানবীর [সা] নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেকের দেহে একটি করে চাদর ও কোমরে তরবারি ঝুলছিল। মহানবীর [সা] নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেকের দেহে একটি করে চাদর ও কোমরে তরবারি ঝুলছিল। মহানবী [সা] তাঁদের এহেন দুরবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ বেলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নামায সমাপনান্তে মহানবী [সা] একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাহাবীদেরকে

www.pathagar.com

এই ছিন্নমূলদের সাহায্যের প্রতি উৎসাহ দিলেন। যার সুফল দেখা গেল। জনৈক আনসারী বাড়ি থেকে খুব ভারী একটি থলে-যা বহন করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল– এনে হযরতের সামনে রেখে দিলেন। এতে অন্যান্য সবার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরদের সামনে অন্ন ও বস্ত্রের স্তূপ লেগে গেল। [মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৮ পৃ.]

মক্কা বিজয়ের পর চারদিক থেকে প্রচুর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধিদল আগমন করতে থাকে। মহানবী [সা] স্বয়ং তাদের আতিথ্য করতেন এবং প্রয়োজন মত ভাতা ও পথ খরচ দান করতেন। প্রতিনিধি দলের উপর এর ভাল প্রভাব দেখা যেত। তিনি এদিকে এত বেশি লক্ষ্য রাখতেন যে ওফাতের সময় অন্যান্য ওসিয়তের মধ্যে একথাও বলেছিলেন :

"আমি যেভাবে আগন্তুকদের উপঢৌকন দিতাম, তোমরাও সেভাবে দিও।" [বুখারী]

রোগী দেখা

রোগীদের দেখাশোনা করা এবং কেউ মারা গেলে তাদের দাফনকার্যে শরীক হওয়া একটি ধর্মীয় কর্তব্য। মহানবীর [সা] মদীনা আগমনের পর একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। তখন থেকে কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আত্মীয়রা মহানবীকে [সা] সংবাদ দিত। তিনি তাদের কাছে গিয়ে মাগফেরাতের দোয়া করতেন, [মুসনাদ, তৃতীয় খণ্ড, ৬৬ পৃ.]। কোন কোন দিক দিয়ে রোগী দেখার বিষয়টি খেলাফতের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কেননা কোন কোন সাহাবী মৃত্যুর সময় আপন বিষয়-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ কিংবা সাদাকা করতে চাইতেন। মহানবী [সা] এ সময়ে উপস্থিত থেকে তাঁদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত সহীহ্ নিয়ম-কানুন বলে দিতেন। যারা ঋণ রেখে মারা যেত মহানবী [সা] তাদের জানাযায় শরীক হতেন না। এ কারণে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা কিংবা অন্যান্য সাহাবীরা বাধ্য হয়ে সে ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে এ ধরনের উদাহরণ বিদ্যমান আছে।

ধরপাকড়

ইসলামী তমদ্দুনের উন্নতির যুগে এটা একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এ বিভাগটি ব্যাপক ভিত্তিতে সমগ্র জাতির চরিত্র, অভ্যাস, কেনাবেচা, লেনদেন ইত্যাদির প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখত। কিন্তু মহানবীর [সা] আমলে এরূপ কোন স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম ছিল না। তিনি নিজেই এ দায়িত্ব পালন করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয় এবং ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে মাঝে মাঝে ধরপাকড় করতেন। তদানীন্তন আরবে ব্যবসায়ের রীতিনীতি বহুল পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। মহানবী [সা] মদীনায় আগমন করার পর পরই ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারমূলক আদেশ জারি করেন। কিন্তু সবাইকে সংস্কার পালনে বাধ্য করাও ধরপাকড় বিভাগেরই কাজ ছিল। মহানবী [সা] অতি কঠোরতার সঙ্গে এসব

www.pathagar.com

বিষয়ের দেখাশোনা করতেন এবং সবাইকে সংস্কার পালনে বাধ্য করতেন। যারা পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করত না, তাদের শাস্তি দিতেন। সহীহ বুখারী কিতাবুল বুয়ূতে বর্ণিত আছে :

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রা] বলেন, আমি নবী করীমের [সা] আমলে অনুমান করে খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখেছি। ক্রেতারা যেখানে খাদ্যশস্য ক্রয় করত, কোথাও স্থানান্তরিত না করে সেখানেই তা বিক্রয় করে দিত। এ ফটকাবাজারি ধরনের ব্যবসায়ের জন্য তাদের সাজা দেয়া হতো।"

মাঝে মাঝে সরেজমিনে অবস্থার দেখার জন্য মহানবী [সা] বাজারে যেতেন। একবার বাজারে খাদ্যশস্যের একটি স্তূপ দেখে তিনি তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতেই ভেতরের দিকে আর্দ্রতা অনুভব করলেন। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি। দোকানদার বলল : হুযুর, বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। ইরশাদ হল : "তবে ভিজা শস্যগুলো উপরে রাখা নাই কেন, যাতে প্রত্যেকেই দেখতে পেত? জেনে রাখ, যারা প্রতারণা করে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।" [মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.]

ধরপাকড় সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে মহানবীর [সা] প্রধান কাজ ছিল কর্মচারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। অর্থাৎ, কর্মচারীগণ যখন যাকাত ও সাদাকা আদায় করে আনতেন, তখন তাঁরা কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেছেন কিনা, তা দেখার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের পরীক্ষা নিতেন। একবার মহানবী [সা] ইবনুল লুতাইবাকে সাদাকা আদায় করার নির্দেশ দেন। তিনি কর্তব্য সম্পন্ন করে ফিরে এলে মহানবী [সা] তাঁর পরীক্ষা নিলেন। ইবনুল লুতাইবা বললেন : এ অর্থ মুসলিম জনগণের এবং এগুলো আমি উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছি। মহানবী [সা] বললেন : তুমি যখন ঘরে অবস্থান করেছিলে তখন এ উপঢৌকন পাওনি কেন? অত:পর এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। [বুখারী, প্রথম খণ্ড, ১৬৮ পৃ.]

ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি

ইসলাম সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের ভেদাভেদ মেটানোর উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। এ কারণে মহানবী [সা] প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদের মধ্যকার সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী সৌহার্দ্র স্থাপন করাকে একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে গণ্য করতেন। যখন কোন ঝগড়া-বিবাদের সংবাদ আসত, তখন তিনি তার নিষ্পত্তিকে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। একবার আমর ইবনে আওফ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া দেখা দিল। মহানবী [সা] এ সংবাদ পেয়ে কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে করে ঝগড়া নিষ্পত্তি করে চলে গেলেন। এ কাজে অনেক বিলম্ব হয় এবং নামাযের সময় হয়ে গেলে হযরত বেলাল আযান দিলেন, কিন্তু আযানের পর মহানবী [সা] এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সবাই হযরত আবু বকরকে ইমাম বানিয়ে নামায আদায় করলেন। এমন সময় মহানবী [সা] এসে উপস্থিত হলেন

www.pathagar.com

এবং কাতার ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত আবু বকর [রা] হুযুর [সা] এসে উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারলেন না। কিন্তু পেছনের মোক্তাদিগণ যখন জোরে জোরে তালি বাজাতে লাগল, তখন তিনি পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখলেন। প্রত্যেককেই আপন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য মহানবী [সা] হাতে ইশারা করা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর [রা] তাঁর উপস্থিতিতে নামাযের ইমামতকে ধৃষ্টতা জ্ঞান করলেন এবং পেছনে সরে এলেন। অত:পর মহানবী [সা] এগিয়ে গিয়ে ইমামের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। [বুখারী, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃ.]

একবার কু'বাবাসীদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয় এবং একদল অন্যদলের প্রতি ইট পাটকেল বর্ষণ করে। সংবাদ পেয়ে মহানবী [সা] কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। [বুখারী]

এ দু'টি ঘটনাকে ইমাম বুখারী পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু হাদীসের টিকাকারগণ একে একই ঘটনার দু'টি অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বুখারীর অন্যান্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, মহানবী [সা] পায়ে হেঁটে ঐ পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

ইবনে আবু হদরদের কাছে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের কিছু পাওনা ছিল। তিনি মসজিদে তার তাগাদা দিলেন। হদরদ পাওনার কিছু অংশ মাফ করাতে চাইলেন; কিন্তু কা'ব তাতে সম্মত হলেন না। কথা কাটাকাটির ফলে কিছু শোরগোল হল। মহানবী [সা] ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। ঘর থেকে বাইরে এসে কা'বকে ডাকলেন। কা'ব উত্তর দিলে বললেন : অর্ধেক পাওনা মাফ করে দাও! এতে কা'ব রাযী হয়ে গেলেন। অত:পর মহানবী [সা] হদরদকে বললেন : যাও, এখন অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করে দাও।

এমন শত শত ঘটনা প্রত্যহই মহানবীর [সা] সামনে আসত।

মহানবী [সা] মদীনা এবং মদীনার বাইরে অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রধান সাহাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করলেন। ওহী লিপিবদ্ধকরণ, চিঠিপত্র এবং নির্দেশ ও ফরমান জারি করার জন্য কয়েকজন লেখকের প্রয়োজন ছিল সর্বাগ্রে। ইসলামের পূর্বে আরবে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ইসলাম আরবের জন্য বিভিন্নমুখী কল্যাণের যে বিরাট ভাণ্ডার বয়ে এনেছিল তার মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল অন্যতম।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যারা নি:স্ব ছিল, তাদের মুক্তিপণ শুধু এটাই ধার্য করা হয় যে, তারা মদীনার বালকদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত [রা] যিনি ওহী লেখকের মত পবিত্র দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন– এভাবেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। আবু দাউদের এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে আসহাবে সুফ্‌ফাকে যেসব বিষয় শিক্ষা দেয়া হত, তার মধ্যে লিখন শিক্ষাও ছিল।

www.pathagar.com

লেখকগণের জামাআত

লেখকের পদ যেন একদিক দিয়ে মহানবীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে প্রধান প্রধান সাহাবীকে এ কার্যে নিযুক্ত করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে শুরাহবিল ইবনে হাসানা কেন্দী সর্বপ্রথম এ গৌরবে ভূষিত হন। তিনি প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় তিনিই সর্বপ্রথম ওহী লিপিবদ্ধ করেন। কুরাইশদের মধ্যে সর্বপ্রথম লেখক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ। মদীনায় সর্বপ্রথম এ গৌরব উবাই ইবনে কা'ব অর্জন করেন।

হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়র, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, হযরত আমর ইবনুল আ'স, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, ইবনে শাম্মাস, হযরত হানযালাহ ইবনে রবিউল আসাদী, হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আ'স, হযরত আলা ইবনে হাযরামী, হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত প্রমুখ সাহাবীগণ বিভিন্ন সময়ে এ পদে নিযুক্ত হন।

উপরোক্ত সাহাবীকেই মাঝে মাঝে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত। হুদাইবিয়ার সন্ধির মুসাবিদা হযরত আলী [রা] নিজ হাতে লিখেছিলেন। বাদশাহের নামে চিঠিপত্র হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা লিখতেন। আরব সরদারদের নামে মহানবী [সা] যেসব পত্র পাঠিয়েছিলেন তা হযরত উবাই ইবনে কা'বের হাতে লিখিত ছিল। কুত্ ইবনে হারেসার নামে যে চিঠি প্রেরণ করা হয়, তা ছিল হযরত সাবেত ইবনে কায়েসের হাতে লেখা। কিন্তু সাধারণভাবে এ দায়িত্বটি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল। সাহাবীদের মধ্যে তাঁর নাম এ দিক দিয়েই অধিক খ্যাত। [যুরকানী]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত মহানবীর [সা] নির্দেশে সকল সাহাবীর উপর আরও একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন। তা হল হিব্রু ভাষা শিক্ষা করা। এর প্রয়োজনে এভাবে দেখা দেয় যে, মদীনায় মহানবীকে [সা] ইহূদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। ইহূদীদের ধর্মীয় ভাষা ছিল হিব্রু। এ কারণে তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। তিনি পনের দিনের চেষ্টায় এ ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

শাসনকর্তা ও প্রশাসক

মোকদ্দমার বিচার, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি স্থাপন ও ছোটবড় মতভেদ নিষ্পত্তির জন্য একাধিক শাসনকর্তা ও প্রশাসকের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশে মহানবী [সা] কয়েকজন সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁদের বিবরণ নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

নাম	বিবরণ
বাযান ইবনে সামান	ইনি বাহ্রাম গোত্রের বংশধর। অনারব বাদশাহ্গণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মহানবী [সা] তাঁকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
শহ্র ইবনে বাযান	বাযান ইবনে সামানের পর মহানবী [সা] তাঁকে সান'আর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
খালেক ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স	শহ্র ইবনে বাযান নিহত হওয়ার পর হুযূর [সা] তাঁকে সান'আর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
মুহাজির ইবনে উমাইয়া	তাঁকে কেন্দা ও সদক এলাকায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর কর্মস্থলে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই মহানবী [সা] ইন্তিকাল করেন।
যিয়াদ ইবন লবীদুল আনসারী	তিনি হাযরামাওতের প্রশাসক ছিলেন।
আবূ মূসা আশ'আরী	তিনি যুবায়দ, আদন, যাম'আ ইত্যাদি অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন।
মু'আয ইবনে জাবাল	জুন্দের প্রশাসক।
ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান	তাইমার প্রশাসক।
উত্তাব ইবনে সাইদ	মক্কার প্রশাসক।
আলী ইবনে আবু তালেব	ইয়ামেনের রাজস্বের মুতাওয়াল্লী।
আমর ইবনুল আ'স	আম্মানের প্রশাসক।
আলা ইবনে হাযরামী	বাহ্রায়েনের প্রশাসক।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিস্তৃতি ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব শাসক নিযুক্ত করা হত। মহানবীর [সা] আমলে ইসলাম অধিকৃত আরব এলাকাসমূহের মধ্যে ইয়ামেন সবচাইতে বেশি বিস্তৃতি ও তাহ্যীব-তমদ্দুনে উন্নত ছিল। এ দেশটি দীর্ঘদিন হতেই একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীন ছিল। এ কারণে মহানবী [সা] একে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক পৃথক প্রশাসক নিযুক্ত করেন। খালেদ ইবনে সাঈদকে সান'আর, মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে কেন্দার, যিয়াদ ইবনে লবীদকে হাযরামাওতের, মু'আয ইবনে জাবালকে জুন্দের এবং আবূ মূসা আশ'আরীকে যুবায়দ, যাম'আ, আদন ও সমুদ্রোপকূলতবর্তী অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। [ইস্তিআব]

সাধারণত যখন কোন মুহাজিরকে কোন অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হত, তখন সঙ্গে একজন আনসারীকেও নিয়োগ করা হত; [মুসনাদে ইবনে হাম্বল, ৫ম খণ্ড, ১৮৬ পৃ.]।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপন, মোকদ্দমার বিচার, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ছাড়াও প্রশাসকগণের প্রধান কর্তব্য ছিল ইসলাম প্রচার করা এবং সুন্নাত ও ফরয শিক্ষা দেয়া। এদিক দিয়ে তাঁরা দেশের শাসনকর্তা এবং প্রদেশের প্রশাসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচারক এবং চরিত্রের শিক্ষাদাতার মর্যাদাও রাখতেন। ইস্তিয়াব গ্রন্থে মু'আয ইবনে জাবাল [রা] সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে :

"মহানবী [সা] তাঁকে ইয়ামেনের এক অংশ জুন্দের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠান, যাতে তিনি লোকদের কুরআন ও ইসলামী শরীয়াতের শিক্ষা দেন। ইয়ামেনে যেসব কর্মচারী ছিল, তাঁদের সংগৃহীত রাজস্ব একত্র করার দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়।"

প্রশাসকগণ যখন কর্মস্থলে রওয়ানা হতেন, তখন মহানবী [সা] কর্তব্য কাজ নির্দিষ্ট করে দিতেন। মু'আয ইবনে জাবালকে পাঠাবার সময় মহানবী [সা] এরূপ উপদেশ দেন :

"তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। প্রথম তাদের তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা তা মেনে নিলে বলবে যে আল্লাহ্ দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যখন তাও মেনে নেবে তখন তাদের যাকাত ফরয হবার কথা বলবে। এটা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। তারা এতেও সম্মত হলে বেছে বেছে উত্তম মাল গ্রহণ করতে বিরত থাকবে। মযলুমের বদদু'আকে ভয় করবে। কারণ, তার ও আল্লাহর মধ্যে অন্তরাল নেই।"

এসব কর্তব্য পালনের জন্য গভীর জ্ঞান, প্রশস্ত দৃষ্টি এবং ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই মহানবী [সা] শাসনকর্তাদের গভীর জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতির পরীক্ষা নিতেন। সে মতে হযরত মু'আযকে পাঠানোর পূর্বে তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা তথা উদ্ভাবনী শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করেন।

তিরমিযীতে বলা হয়েছে :

"মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামেনে পাঠাবার সময় মহানবী [সা] বললেন : তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন : কুরআন মজীদের ভিত্তিতে। মহানবী [সা] বললেন : যদি তুমি কুরআনে সে ফয়সালা খুঁজে না পাও? তিনি বললেন : তবে হাদীসের ভিত্তিতে। মহানবী [সা] বললেন : যদি হাদীসেও না পাও? তিনি বললেন : তবে আমি নিজস্ব রায় দ্বারা ফয়সালা করব। এতে মহানবী [সা] বললেন : আল্লাহর শুকরিয়া যিনি রাসূলের প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন, যা রাসূল পছন্দ করেন।"

কিন্তু আরবদের অন্তর জয় করার জন্য এ সমস্ত বিষয়ের চাইতেও নম্রতা, দয়ার্দ্রতা, সহনশীলতা ও সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। অথচ রাজনীতি ও শাসন ক্ষমতার ক্ষেত্রে এসব গুণ ছিল প্রায় দুর্লভ। এ কারণে মহানবী [সা] প্রশাসকগণের মনোযোগ বার বার এসব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করতেন। হযরত মু'আযকে জনৈক সাহাবীর সঙ্গে

www.pathagar.com

ইয়ামেনে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় প্রথমে উভয়কেই সাধারণভাবে উপদেশ দেন :

"সহজভাবে শাসন পরিচালনা করো, জটিলতা সৃষ্টি করো না। মানুষকে সুসংবাদ দেবে, তাদের মনে বিতৃষ্ণা জাগাবে না, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে মতভেদ করবে না।" [মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃ.]

এ পর্যন্ত বলেও মহানবী [সা] নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। মু'আয ইবনে জাবাল [রা] ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে রেকাবে পা রাখার পরও মহানবী [সা] বিশেষভাবে একথাগুলো বলে দিলেন : "মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে।

কোন রাষ্ট্রক্ষমতা যতই দয়ার্দ্র হোক না কেন, 'কোন দেশ' অধিকারভুক্ত করার পর প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ধত লোকদের বশে আনবার জন্য অনেক বাধ্য হয়েই কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়– এ নীতি নির্ভুল হলে আরবরা সবচাইতে বেশি কঠোরতার যোগ্য ছিল। কিন্তু মহানবীর [সা] এ উপরোক্ত পবিত্র শিক্ষার ফলস্বরূপ বালুকাময় আরবের একটি বালুকণাও নবীজীর শাসকগণের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়নি। এমনকি, পরবর্তীকালে সাহাবীগণ তৎকালীন শাসকদের সামান্যতম একটু ব্যতিক্রম করতে দেখলে বিস্ময়ের অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং মহানবীর [সা] শিক্ষার আলোকে তাদের বাধা দান করতেন। একবার সাহাবী হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিশাম দেখতে পান যে সিরিয়ার কিছু সংখ্যক নিবতী বংশোদ্ভূত লোককে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি অন্যান্য লোককে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল : জিযিয়া আদায় করার জন্য তাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি একথা শুনে বললেন :

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহানবীকে [সা] বলতে শুনেছি : "যারা মানুষকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়, আল্লাহ তাদের কঠোর সাজা দেবেন।" [মুসলিম]

যাকাত ও জিযিয়া আদায়কারী দল

আরবদের আন্তরিকতা ও ঈমানী জোশ তাদের স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে যাকাত দানে উৎসাহিত করত। সে মতে ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গোত্র নিজেদের যাকাত নিজেরাই মহানবীর [সা] নিকট উপস্থিত করত এবং তারা দু'আ নিয়ে কৃতার্থ হত। কিন্তু একটি বিশাল দেশ ও একটি বিরাট রাষ্ট্রের জন্য এ নীতি যথেষ্ট হতে পারে না। তাই প্রশাসক নিয়োগ ছাড়াও নবম হিজরীর পহেলা মুহাররম মহানবী [সা] যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করার নিমিত্তে প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী দল নিযুক্ত করেন। তারা গোত্রে গোত্রে ঘুরে লোকদের কাছে থেকে যাকাত ও খেরাজ আদায় করতেন এবং মহানবীর [সা] কাছে পেশ করতেন। সাধারণত গোত্রের সরদারগণই আপন আপন গোত্রের আদায়কারী নিযুক্ত হতেন। হাদীস পাঠে জানা যায়, তাদের সাধারণত সাময়িকভাবে নিয়োগ করা হত।

www.pathagar.com

মোটকথা, এ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মহানবী [সা] নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন গোত্রে ও শহরে নিযুক্ত করেন–১

নাম	নিয়োগস্থল
আদী ইবনে হাতেম	তাই ও বনী আসাদ
সাফওয়ান ইবনে সফওয়ান	বনী আমের
মালেক ইবনে ওয়াইনা	বনূ হান্‌যালাহ্
বরিদা ইবনে হাসীব	গেফার ও আসলাম
ওব্বাদ ইবনে বিশর আশহালী	মুলায়ম ও মুযায়না
রাফে' ইবনে মুকাইল জুহানী	জুহায়না
যবরকান ইবনে বদর	বনূ সাদ
কায়স ইবনে আসেম	,,
আমর ইবনুল আ'স	বনূ ফেযারা
যাহহাক ইবনে সুফিয়ান	বনূ কেলাব
বুশর ইবনে সুফিয়ান কা'বী	বনূ কা'ব
আবদুল্লাহ ইবনুল্লাতাইবা	বনূ যুবাইর
আবু জহম ইবনে হুযায়ফা	বনূ লায়ম
হুযায়মী	হুযায়মী গোত্র
উমর ফারূক	মদীনা শহর
ওবায়দা ইবনে জাররাহ	নাজরান শহর
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা	খায়বার শহর
যিয়া ইবনে লবীদ	হাযরামাওত
আবূ মূসা আশ'আরী	ইয়ামেন প্রদেশ
খালেদ	,,
আবান ইবনে সাঈদ	বাহরায়েন
আমর ইবনে সাঈদ	তায়মা
ইবনুল আ'স	,,
মাহমা ইবনে জুযউল	এক-পঞ্চমাংশ
আসাদী	আদায়
ওয়াইনা ইবনে হিসন ফেযারী	বনূ তামীম

১. এ তালিকায় অধিকাংশ নাম ইবনে সাআদ গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। ওমর ফারুক, মাহ্সা ও ওবায়দা ইবনে জাররাহর উল্লেখ বুখারীতে এবং আরও কয়েকজনের উল্লেখ আবু দাউদে আছে। অবশিষ্টদের নাম যাদুল মাআদ এবং ফুতুহুল বুলদান ও বালাযুরী গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এসব আদায়কারীগণের নিয়োগের ব্যাপারে মহানবী [সা] নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন।

১. তাঁদেরকে একটি ফরমান দেয়া হত। তাতে এসব স্পষ্ট উল্লেখ করা হত যে কি শ্রেণীর মাল কত সংখ্যক হলে তাতে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব। বেছে বেছে মাল নেয়ার অথবা প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি মাল নেয়ার অনুমতি ছিল না। সাধারণ নির্দেশ : "বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেবে না।" কর্মচারীগণ কঠোরভাবে এ ফরমান পালন করতেন এবং এক চুল পরিমাণও সীমালঙ্ঘন করতেন না। কেউ কেউ প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি দিতে চাইলে কিন্তু আদায়কারীরা তা গ্রহণ করতেন না। সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ্ বর্ণনা করেন : আমাদের গোত্রে মহানবীর [সা] একজন আদায়কারী আগমন করলে আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি প্রথমে সেসব জন্তুর নাম উল্লেখ করলেন, যেগুলো গ্রহণ করার অনুমতি ফরমানে ছিল না। ঠিক তখনই কুঁজবিশিষ্ট উট এনে আদায়কারীর সামনে পেশ করা হল। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, [নাসাঈ, ৩৯০ পৃ.]। তেমনি জনৈক ব্যক্তি এক আদায়কারীকে বাচ্চাওয়ালী বকরী দিতে চাইলে তিনি বললেন এটা নিতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। [নাসাঈ, ৩৯৩ পৃ.]

২. আরবদের অর্থকড়ি, ছাগল ও উটের পালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসব ছাগল ও উট জনশূন্য প্রান্তর ও পাহাড়ের পাদদেশে ঘাস খেয়ে বেড়াত। সাধারণ কোন রাষ্ট্রের কড়া নির্দেশ বলে মালিকদের স্বয়ং জন্তু নিয়ে আদায়কারীদের সামনে হাজির হতে বাধ্য করাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু তা না করে আদায়কারীদের স্বয়ং এসব গিরিপথে গিয়ে যাকাত আদায় করতে হত। জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন : আমি একটি গিরিপথে ছাগল চরাচ্ছিলাম। দু'জন উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি এসে বলল : আমরা আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত দূত। এখানে আপনার ছাগলের যাকাত নিতে এসেছি। আমি একটি বাচ্চাওয়ালা ও দুগ্ধবতী বকরী পেশ করলাম। তাঁরা বললেন : আমাদের প্রতি এটা নেয়ার নির্দেশ নেই। আমি অন্য একটি ছাগল দিলে তাঁরা তাকে উটের পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। [নাসাঈ]

৩. অন্তরের পবিত্রতা ও শুচিতার কারণে সাহাবীগণ যাবতীয় অবৈধ অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। একবার মহানবী [সা] আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে খায়বরের ইহূদীদের নিকট প্রেরণ করেন– যাতে তিনি চুক্তি মোতাবেক সেখানকার কৃষি উৎপাদনের অর্ধাংশ ভাগ করিয়ে আনেন। ইহূদীরা তাঁকে উৎকোচ দিতে চাইলে তিনি বললেন : খোদার দুশমনরা, তোমরা আমাকে হারাম অর্থ খাওয়াতে চাও [ফুতুহুল বুলদান]। কিন্তু সাহাবীগণের এ রকম পবিত্রতা ও হারাম অর্থের প্রতি উদাসীনতা সত্ত্বেও যখন কোন আদায়কারী সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন স্বয়ং হুযূর [সা] তাঁর কৃতকর্মের দোষ গুণ বিচার করতেন। একবার সাহাবী ইবনুল লুতাইবাকে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি ফিরে এলে মহানবী [সা] তাঁর কর্মের দোষ গুণ

www.pathagar.com

যাচাই করলেন। হিসাব দিতে গিয়ে তিনি বললেন : এটা আপনার অর্থ এবং এটা আমি উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেছি। একথা শুনে মহানবী [সা] বললেন : তুমি গৃহে বসে বসে এ উপঢৌকন পেলে না কেন? এতে সান্ত্বনা না হওয়ায় তিনি এক ভাষণ দিলেন এবং সকলকেই এ রকম অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিলেন। [মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১১৩ পৃ.]।

৪. মহানবী [সা] আপন পরিবারের লোকজনের জন্য সাদাকা ও যাকাত হারাম করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর পরিবারের কাউকেও যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করা হয়নি। একবার মহানবীর [সা] চাচাত ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মোত্তালেব ইবনে যাম'আ ইবনে হারেস ও ফযল ইবনে আব্বাস উভয়ে মহানবীর [সা] কাছে আবেদন জানালেন যে এখন আমরা পরিণত বয়সে পৌছেছি, সুতরাং অন্যান্য লোকের ন্যায় আমাদেরও যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেন, যাতে পারিশ্রমিক হিসাবে যে অর্থ পাব তা বিয়ের জন্য সঞ্চয় করতে পারি। উত্তরে মহানবী [সা] বলে দিলেন : "আমার পরিবারের জন্য সাদাকা ও যাকাত জায়েয নয়। কারণ, এটা জনগণের সঞ্চিত সম্পদের ময়লা।" [সেহাহ্]

৫. মহানবী [সা] স্বয়ং প্রশাসক নির্বাচন করতেন। এ পদের জন্য যারা নিজেরাই দরখাস্ত করত, তিনি তাদের দরখাস্ত নামঞ্জুর করতেন। একবার আবু মূসা আশ'আরীর সঙ্গে দু'ব্যক্তি এসে প্রশাসকের পদ লাভের জন্য দরখাস্ত করল। মহানবী [সা] আবু মূসাকে বললেন : তুমি কি বল? তিনি বললেন : আমার আগে জানা ছিল না যে তারা এ উদ্দেশ্যে এসেছে। মহানবী [সা] উভয়ের প্রার্থনা নামঞ্জুর করে বললেন : যারা নিজে প্রার্থনা করে, আমি তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করি না। কিন্তু পরক্ষণেই আবু মূসা আশ'আরীকে প্রার্থনা ব্যতিরেকেই ইয়ামেনের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হল। [মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃ.]

৬. কর্মচারী ও প্রশাসকগণ প্রয়োজন পরিমাণে পারিশ্রমিক পেতেন। মহানবী [সা] সাধারণ ঘোষণা প্রচার করিয়ে রেখেছিলেন যে, কেউ নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তা আর্থিক খেয়ানত বলে গণ্য হবে। প্রয়োজনের পরিমাণ কতটুকু তা মহানবী [সা] নিজেই পরিষ্কার বলে দেন :

"যে ব্যক্তি আমাদের প্রশাসক হবে, সে একজন স্ত্রীর খরচ গ্রহণ করবে। তার কাছে চাকর না থাকলে চাকরের এবং বাসস্থান না থাকলে বাসস্থানের খরচও পাবে। কেউ এর চাইতে বেশি গ্রহণ করলে সে আত্মসাৎকারী বলে বিবেচিত হবে।" [আবু দাউদ, ২য় খণ্ড]

মহানবীর [সা] আমলে হযরত উমরও [রা] এ রকম পারিশ্রমিক পেতেন। তাঁর খেলাফতকালে একবার যখন সাহাবীদের কেউ কেউ সংসারের অনাসক্তির কারণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি মহানবীর [সা] এ কর্মপন্থাকেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেন।

www.pathagar.com

বিচারক দল

উপরোক্ত পদ ছাড়া আরও কতিপয় পদ সাদাসিধাভাবে কায়েম ছিল। উদাহরণবশত মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য বিচারকের পদ। যদিও মহানবী [সা] নিজেই বেশিরভাগ সময় এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন, তবুও মাঝে মাঝে তাঁর নির্দেশে নিম্নোক্ত সাহাবীগণও এ কর্তব্য পালন করেছেন। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয ইবনে জাবাল [রা]।

পুলিশ

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও নিয়মিত পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বনূ উমাইয়ার রাজত্বকালেই স্বতন্ত্রভাবে এ বিভাগটির সূচনা হয় [ফাতহুল বারী]। তবে মহানবীর [সা] আমলেই এর প্রাথমিক সূচনা হয়। তাঁর আমলে কায়স ইবন সা'দ এ দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদাই প্রিয় নবীজীর [সা] সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

মৃত্যুদণ্ড

অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার দায়িত্বে হযরত যুবায়র, হযরত আলী, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আসেম ইবনে সাবেত এবং যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী নিযুক্ত ছিলেন। [যাদুল মা'আদ]

বিজাতীয়দের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

ইসলামী রাষ্ট্র পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরবের বুকে সরাসরি মূর্তি পূজার আর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোথাও কোথাও শুধু অগ্নি উপাসক, খ্রিস্টান ও ইহূদীদের বসতি ছিল। তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোকের অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হলেও সমষ্টিগতভাবে তারা তখনও বিভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। এতদসত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তির সামনে তারা মাথা উঁচু করতে সক্ষম ছিল না। হিজাযের ইহূদীরা ব্যতীত আরবের সকল জাতি সানন্দে ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে। তাই ইসলামও তাদের জানমাল, ইয্যাত-হুরমত ও ধর্মের হিফাযতের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এর বিনিময়ে ইসলাম তাদের যিম্মায় সামান্য পরিমাণে জিযিয়া কর [অর্থাৎ, প্রত্যেক সামর্থ্যবান, বুদ্ধিমান, পরিণত বয়স্ক পুরুষদের উপর বার্ষিক এক দীনার] ধার্য করে। এ কর নগদ টাকায় আদায় হওয়া জরুরী ছিল না; বরং সাধারণত যে জায়গায় যে বস্তু উৎপন্ন হত; কিংবা যে বস্তু প্রস্তুত হত, তাও জিযিয়া হিসেবে দেয়া যেত। [যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড]

বিজাতীয়দের মধ্য থেকে মহানবী [সা] সর্বপ্রথম সপ্তম হিজরীর খায়বার, ফদক, ওয়াদিউল কুরা ও তায়মার ইহূদীদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। তখনও জিযিয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ কারণে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব শর্তাদি

www.pathagar.com

নির্ধারিত হয়, জিযিয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও তা বলবৎ রাখা হয়। [যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড] আসল শর্ত ছিল এই যে, তারা প্রজা হিসেবে বসবাস করবে এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নিজেরা নেবে এবং অর্ধেক মালিকদের দেবে। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ফুতুহুল বুলদান]

নবম হিজরীতে জিযিয়ার আয়াত নাযিল হলে পর সমস্ত চুক্তি তারই ধারা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। নাজরানের ইহূদীরা মদীনায় এসে শান্তি চুক্তির আবেদন জানালে মহানবী [সা] তা মঞ্জুর করেন। চুক্তির শর্ত ছিল এরূপ : তারা মুসলমানদের প্রতি বছর দু'হাজার প্রস্থ বস্ত্র দেবে এবং তা দু'কিস্তিতে অর্থাৎ অর্ধেক সফর মাসে এবং বাকি অর্ধেক রজব মাসে প্রদান করবে। ইয়ামেনে কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিলে তার ধার হিসেবে ত্রিশটি লৌহ বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট এবং ত্রিশ-ত্রিশটি প্রত্যেক প্রকারের অস্ত্র দেবে। মুসলমানগণ তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এর বিনিময়ে যতদিন পর্যন্ত তারা সুদের কারবার অথবা বিদ্রোহ না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না, পাদ্রীদের বহিষ্কার করা হবে না এবং তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালনে কোন রকম বাধার সৃষ্টি করা হবে না। [আবু দাউদ]

সিরিয়ায় খ্রিস্টান ও ইহূদীদের বহু গ্রাম ছিল। দুমাতুল জান্দাল, ঈলা, মুকনা, জাররা, আযরাহ, তাবালা ও জাবাশের যেসব খ্রিস্টান ও ইহূদী ভূ-স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করে জিযিয়া দিতে সম্মত হয়, নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুক যুদ্ধের সময় তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর বার্ষিক এক দীনার হিসাবে জিযিয়া ধার্য করা হয়। এছাড়া তাদের এলাকা দিয়ে গমনকারী মুসলমানদের খাদ্য সরবরাহ করাও তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ধার্য করা হয়।

ইয়ামেনের যেসব ইহূদী ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের উপরও উপরোক্ত পরিমাণে জিযিয়া ধার্য করা হয়। তাদের এমন একটি সুবিধাও দেয়া হয় যে, নগদ মুদ্রা দিতে না পারলে সমমূল্যের গৃহনির্মিত বস্ত্রও দিতে পারবে। [আবু দাউদ] বাহরায়েনের অগ্নি উপাসকদের সঙ্গে এ পরিমাণ জিযিয়া করের বিনিময়েই চুক্তি সম্পাদন করা হয়। [আবু দাউদ, বালাযুরী]

খাজনা ও শুল্কের প্রকারভেদ

বিভিন্ন উদ্দেশ্যবশত ইসলামে তখন আয়ের উৎস ছিল মাত্র পাঁচটি– গনীমাত [যুদ্ধলব্ধ মাল], ফায়, যাকাত, জিযিয়া ও খেরাজ। প্রথম ও দ্বিতীয়টি ছাড়া অবশিষ্ট উৎসগুলো ছিল বার্ষিক।

গনীমতের মালসম্পদ শুধু যুদ্ধে জয়লাভের সময়ই পাওয়া যেত। আরবে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, সেনাবাহিনীর সরদার গনীমতের এক চতুর্থাংশ নিজে গ্রহণ করত। তাদের পরিভাষায় একে মেররা বলা হত। অবশিষ্ট অর্থ যে যেভাবে পারত নিয়ে যেত।

www.pathagar.com

কোনরূপ সুষ্ঠু বণ্টন পদ্ধতি ছিল না। বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ গনীমতের অর্থের নিজের মালিকানা আখ্যা দেন। তন্মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাসূলের নামে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। বলা হয় :

"হে রাসূল, তারা আপনাকে গনীমতের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এটা আল্লাহ ও রাসূলের মালিকানা।" [সূরা আনফাল]

আল্লাহ ও রাসূলের মালিকানার উদ্দেশ্য এই যে, এটা সৈনিকদের মালিকানা নয়; বরং কল্যাণের ভিত্তিতে খলীফা যেভাবে সমীচীন মনে করবেন, ব্যয় করতে পারবেন। তদ্রূপ এক-পঞ্চমাংশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে– "মুসলমানগণ, জেনে নাও, তোমরা গনীমতের যে অর্থ পাও তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসূল, ইসলামী সমাজের পোষ্যবর্গ, ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট।" [সূরা আনফাল]

দু'একটি ঘটনায় মহানবী [সা] গনীমতের অর্থ বিশেষভাবে মুহাজিরদের অথবা মক্কার নওমুসলিমদের দান করেছেন। এছাড়া অন্যান্য সবক্ষেত্রেই এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর সমুদয় অর্থ পাই পাই হিসাব করে সৈনিকদের সমভাবে বণ্টন করেছেন। অশ্বারোহী সৈনিকগণ দুই অংশ পেত। [আবু দাউদ]। এক-পঞ্চমাংশ থেকে সামান্যই মহানবী [সা] ব্যক্তিগত খরচের জন্য গ্রহণ করতেন। উল্লিখিত আয়াতে ব্যয়ের যেসব খাত বর্ণিত হয়েছে, তাতেই বেশিরভাগ ব্যয় করা হত।

যাকাত

যাকাত শুধু মুসলমানদের উপর ফরয ছিল এবং দু'চারটি খাতে আমদানি হত– নগদ টাকা, ফলমূল, উৎপন্ন ফসল, জীবজন্তু [ঘোড়া ব্যতীত] এবং পণ্যসামগ্রী [আবু দাউদ]। দু'শ দেহরাম রৌপ্য, বিশ মেসকাল স্বর্ণ এবং পাঁচটি উটের কম হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে পাঁচ ওসক [ইমাম তিরমিযীর মতে তিন শ' সা'] অথবা ওসক থেকে বেশি হলেই যাকাত নেয়া হত, নতুবা নয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে নেয়া হত। জীবজন্তুর যাকাতের হারও বিভিন্ন প্রকার জন্তুর বিভিন্ন সংখ্যার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়েছিল। হাদীস ও ফিকহর গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে। যমীনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম প্রকার যা বৃষ্টি অথবা প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত হত। এ ধরনের যমীনের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ [উশর] নেয়া হত। দ্বিতীয় প্রকার যা পানি সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হত। এ ধরনের যমীন থেকে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ, উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ নেয়া হত [বুখারী]। তরিতরকারি ও শাক-সব্জির উপর কোন যাকাত ছিল না।

স্বয়ং কুরআন মজীদের বর্ণনানুযায়ী যাকাত ব্যয় করার খাত ছিল আটটি– ১. ফকীর, ২. মিসকীন, ৩. নওমুসলিম, ৪. ক্রীতদাস, [ক্রয় করে মুক্ত করার জন্যে], ৫. ঋণগ্রস্ত

www.pathagar.com

ব্যক্তি, ৬. মুসাফির, ৭. যাকাত আদায়কারীর বেতন, ৮. অন্যান্য জনহিতকর কাজ। সাধারণত যে এলাকা থেকে যাকাতের অর্থ আদায় করা হত, সেখানকার হকদার ব্যক্তিদের মধ্যেই বন্টন করা হত। সাহাবীগণ এ নির্দেশের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। একবার প্রশাসক যিয়াদ জনৈক সাহাবীকে যাকাত আদায় করার জন্য এক জায়গায় প্রেরণ করেন। সাহাবী ফিরে এলে যিয়াদ তাঁর কাছে টাকা চাইলেন। তিনি বললেন : মহানবীর [সা] আমল থেকে আমরা যা করতাম তাই করে এসেছি [আবু দাউদ]। মু'আয ইবনে জাবাল প্রশাসকরূপে ইয়ামেনে প্রেরিত হলে মহানবী [সা] যাকাত সম্পর্কে তাঁকে বলেন :

"যাকাত গোত্রের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে সে গোত্রের গরীবদেরকে ফিরিয়ে দেবে।"

জিযিয়া

এটা অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে তাদের হেফাযত ও দায়িত্বের বিনিময়ে নেয়া হত। এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। মহানবীর [সা] আমলে প্রত্যেক সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কাছ থেকে বার্ষিক এক দীনার আদায় করার নির্দেশ ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও মহিলা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল না। ঈলা অঞ্চলের জিযিয়ার পরিমাণ ছিল তিনশ' দীনার। মহানবীর [সা] আমলে সবচাইতে বেশি অংশ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হত; একে খেরাজ বলা হয়। খায়বর, ফদক, ওয়াদিউল কুরা, তায়মা ইত্যাদি স্থান থেকে খেরাজই আদায় হত। ফলমূল অথবা উৎপন্ন ফসল পাকার সময় হলে মহানবী [সা] কোন সাহাবীকে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বাগান ও ক্ষেত দেখে ফসলে অনুমান করতেন। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আন্দাজকৃত পরিমাণ থেকে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেয়া হত। অবশিষ্ট পরিমাণ থেকে শর্ত অনুযায়ী খেরাজ আদায় হত। খায়বর ইত্যাদি স্থানে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বায়তুলমালে জমা দেয়ার শর্তে চুক্তি হয়েছিল।

জিযিয়া ও খেরাজের অর্থ সৈনিকদের বেতন ও অন্যান্য সামরিক খাতে ব্যয় করা হত। সকল সাহাবীই প্রয়োজনের মুহূর্তে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতেন। এ কারণে জিযিয়া ও খেরাজ বাবত যা আদায় হয়ে আসত, মহানবী [সা] তৎক্ষণাৎ তা বন্টন করতে দিতেন। যারা এককালে ক্রীতদাস ছিলেন, মহানবী [সা] প্রথমে তাদের দিতেন। একটি খাতায় সবার নাম লেখা থাকত এবং ঐ ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী নাম ডাকা হত। যাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকত তাদের দুই অংশ, অবিবাহিত ব্যক্তিকে এক অংশ দেয়া হত। [আবু দাউদ]

জায়গীর ও পতিত ভূমি আবাদ

আরব দেশের অধিকাংশ ভূমি ছিল বালুকাময়, প্রস্তরময়, লবণাক্ত ও অনুর্বর। সবুজ ও শস্যশ্যামল ভূমি যতটুকু ছিল, তা সমস্তই বহি:শক্তির অধিকারে ছিল। অবশিষ্ট সবই ছিল পতিত ভূমি। মদীনা ও তায়েফে অবশ্য কৃষিকাজ হত। অন্যান্য এলাকার আরবরা

৫—

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা লুটতরাজের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করত। আরবদের নৈরাজ্যময় জীবনের প্রকৃত কারণ এটাই ছিল যে, তাদের স্থায়ী কোন পেশা ছিল না। এ কারণে শান্তি স্থাপনের জন্য ভূমির নতুনভাবে বন্দোবস্ত করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। হেজায ও ইয়ামেনে বিজাতীয়দের বাস্তুত্যাগের ফলে এবং এমনিতেও অনেক ভূমি খালি পড়েছিল। এ সবের বন্দোবস্ত ছিল অপরিহার্য।

মহানবী [সা] সাধারণভাবে সাহাবীগণকে এসব পতিত জমি আবাদ করার প্রতি উৎসাহ দেন :

"যে ব্যক্তি পতিত ভূমিকে আবাদ করবে, সে-ই তার মালিক হবে। যে ব্যক্তি কোন ভূমিকে প্রাচীর বেষ্টিত করে নেবে তা তার মালিকানায় চলে যাবে।"

সাধারণ উৎসাহ দানের সঙ্গে মহানবী [সা] বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্তও করেন। বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযার খেজুর বাগান বিশেষভাবে মহানবীর [সা] মালিকানায় আসে। তিনি তা নিজের পক্ষ থেকে মুহাজির ও কতিপয় আনসারীকে বণ্টন করে দেন। খায়বরের ভূমিও কিছু পরিমাণে মহানবীর [সা] মালিকানায় আসে এবং অবশিষ্ট ভূমি সেসব মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়ত, যারা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কিন্তু কার্যত ইহূদীদের সঙ্গে এসব ভূমির বন্দোবস্ত রইল। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা নিত এবং অর্ধেক মালিকদের দিত। এছাড়া যেসব ভূমি আবাদ ছিল কতিপয় শর্তসহ তা আসল মালিকদের হাতে রাখা হয়। যুখাইওয়ান, ঈলা, আযরাহ, নাজরান প্রভৃতি এলাকার ভূমি সম্পর্কেও এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মহানবী [সা] পতিত ভূমিও সাহাবীগণকে জায়গীর হিসাবে দান করেন। হযরত ওয়ায়েলকে হাযরামাওতে একখণ্ড ভূমি দেন এবং বেলাল ইবনে হারেস মুযনীকে চাষাবাদযোগ্য ভূমির একটি বিরাট অংশ এবং কিছু খনি দান করেন। হযরত যুবায়রকে মদীনার নিকটবর্তী এবং হযরত উমরকে খায়বারে জায়গীর দেন। বনূ রেয়ায়াকে দুমাতুল জন্দলের নিকটে ভূমি দান করেন।

এসব জায়গীর অত্যন্ত উদার ভিত্তিতে দেয়া হত। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সামর্থ্য অনুযায়ী তা বেছে নিতেন এবং তার সীমানা নির্ধারণ করতে পারত না। একবার মহানবী [সা] হযরত যুবায়রকে নির্দেশ দিলেন যতদূর পর্যন্ত তোমার ঘোড়া দৌড়াতে পারবে, ততদূর পর্যন্ত ভূমি তোমাকে জায়গীর হিসাবে দেয়া হবে। হযরত যুবায়র ঘোড়া ছুটালেন, একটি বিশেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যখন ঘোড়া থেমে গেল, তখন তিনি চাবুক ফেলে দিলেন। চাবুক যেস্থানে পড়ল সে পর্যন্ত তাঁর জায়গীরের সীমা নির্ধারিত হল। আরবের শুষ্ক মাটিতে পানির ঝর্ণা প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। একবার মহানবী [সা] নির্দেশ দিলেন :

"কোন মুসলমানের অধিকারভুক্ত নয়– এমন ঝর্ণা যে কেউ অধিকার করে নেবে, সে-ই তার মালিক বলে গণ্য হবে। এতে দৌড়ে সবাই নিজ নির্জ ঝর্ণার সীমা নির্ধারিত করে নিলেন।"

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] এমন উদারতার সংবাদ দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ফলে, দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে মহানবীর [সা] নিকট জায়গীরের প্রার্থনা জানাতে লাগল। ইয়ামেন থেকে আবইয়াস ইবনে হাম্মাল এসে একটি লবণের খনির জন্য আবেদন করলে মহানবী [সা] তা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু জনৈক সাহাবী বললেন– আপনি তাকে জায়গীর হিসাবে যা দান করেছেন, তা পানির একটি বড় ঝর্ণা। যেহেতু সেটি জনসাধারণের কাজে লাগত, তাই মহানবী [সা] নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, শুধু এমন বিষয়-সম্পত্তির ক্ষেত্রেই মহানবী [সা] উপরোক্ত রূপ উদারতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু যেসব বিষয়-সম্পত্তি জনহিতকর কাজে লাগতে পারত, সেগুলো পুরানো অবস্থায়ই রেখে দেন। আরবদের প্রাচীন রীতি ছিল যে তারা নিজেদের জীবজন্তুর জন্য চারণভূমি নির্দিষ্ট করে নিত। এসব চারণভূমিকে 'হেমা' বলা হত। আরবের পীলু বৃক্ষ ছিল উটের সাধারণ খাদ্য। ফলে, এ বৃক্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা-নিষেধ ছিল না। আবইয়াস ইবনে হাম্মাল যখন এ বৃক্ষকে নিজের ব্যক্তিগত হেমার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন, তখন মহানবী [সা] তাকে এ বলে নিষেধ করে দিলেন– "পীলু বৃক্ষের ব্যাপারে কোন হেমা নেই।"

আরবে এমন রীতিও প্রচলিত ছিল যে জন্তু জানোয়ার চরাবার জন্য সরদার ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা চারণভূমি নির্দিষ্ট করে নিত। তাতে অন্য কাউকেও আসতে দিত না। যেহেতু এ ব্যবস্থায় জনসাধারণের জন্য অসুবিধার কারণ ঘটত, তাই মহানবী [সা] তা রহিত করে দেন। [আবু দাউদ]

আরবের একটি জায়গার নাম দাহ্‌ন। এরই এক পাশে বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্র এবং অপর পাশে বনূ তামীম গোত্র বসবাস করত। হোরায়স ইবনে হাসসান বকর গোত্রের জন্য এ ভূমি চেয়ে দরখাস্ত করলেন। মহানবী [সা] ফরমান লেখার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় বনু তামীমের এক মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিল। মহানবী [সা] তার দিকে দেখলেন। মহিলা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি উট ও ছাগলের চারণভূমি এবং তার নিকটে তামীম গোত্রের মহিলা ও শিশুরা বসবাস করে। মহানবী [সা] বললেন– বেচারী বলছে, ফরমান লিখো না। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং একটি ঝর্ণা ও একটি চারণভূমি সকলের জন্যই ব্যবহার করার অধিকার আছে।■

www.pathagar.com

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলের [সা] অবদান

অধ্যাপক আবু জাফর

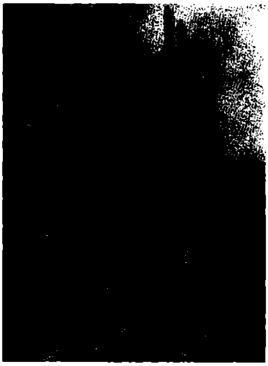

আশা করি এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, রাসূল [সা] নিজে কোন ধর্ম প্রবর্তক নন; তাঁর আনীত দীন ও ধর্ম একান্তভাবেই আল্লাহর। পৃথিবীকে শান্তি ও ইনসাফের পৃথিবীরূপে গড়ে তুলতে যে নির্ভুল সাংবিধানিক পথ নির্দেশ, তার একটি বাক্যও রাসূলের [সা] নিজস্ব নয়। আদ্যোপান্ত সবই আল্লাহপাক কর্তৃক প্রণীত ও প্রেরিত। তাঁর নিজস্ব কিছু নয়, তিনি শুধু আল্লাহপাক কর্তৃক মনোনীত বিশ্বস্ত বার্তাবহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সহজ কথাটি বুঝতে ভুল হয় বলেই আরো অনেক ভুল আমাদের বিশ্বাস ও কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ, বহু পাশ্চাত্য নিবাসী প্রাচ্যবিদ রাসূলের [সা] প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আল কুরআনের প্রণেতা হিসাবে ধরে নিয়ে একটা বিরাট ভুল করে বসে। আর এই ধারণার বশবর্তী হওয়ার কারণেই, তারা মুহাম্মাদ [সা] ও তাঁর অবদানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে সত্য, কিন্তু ইসলামকে বুঝতে পারে না। ইসলাম তাদের কাছে অপরাই থেকে যায়; শান্তির সুপ্রশস্ত রাজপথে দাঁড়াবার সৌভাগ্য ঘটে না। দ্বিতীয়ত, অমুসলিম বিশ্বের একটা বড়

www.pathagar.com

ভ্রান্তি হলো, তারা মুসলমানকে দেখে ইসলামকে বুঝতে চায়। অর্থাৎ আল কুরআনের পথ নির্দেশ ও রাসূলের [সা] জীবনাদর্শকে সম্মুখে না রেখে, মুসলমানদের গুণাগুণ, আপাত দৃশ্যমান ক্রটি ও দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদ অবস্থাকে ইসলামের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছে; যে কারণে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যকে তারা অবলোকন করতে পারছে না। অথচ খুব যৌক্তিক কারণেই এই অক্ষমতা অনভিপ্রেত। কারণ, চিকিৎসকের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য খারাপ হলেও হতে পারে, কিন্তু সেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অস্বীকারকরত ডাক্তার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রকে অবজ্ঞা করা মূর্খতা। বর্তমান মুসলিম মিল্লাতের অবস্থা যাই হোক, আল কুরআনের ও রাসূলের [সা] জীবনাদর্শের যে উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, পৃথিবী যদি সেদিকে সমনস্ক অনুরাগ নিয়ে পার্থিব ব্যবস্থাপনাকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে, সকল রোগ নির্মূল হতে বাধ্য এবং পৃথিবী জুড়ে শান্তি নেমে আসতেও বাধ্য। কারণ আল্লাহর নির্দেশিত পথই যে একমাত্র শান্তির পথ, এটা পরীক্ষিত।

অনেক আগের কথা, আল্লাহপাক যখন মানব সৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন, ফেরেশতারা বলেছিলেন, তারা পৃথিবীতে অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। আল্লাহপাক বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা জানো না।' অর্থাৎ ফেরেশতাদের আশঙ্কার মধ্যে বাস্তবতা কিছু ছিল, কিন্তু আল্লাহপাক জানতেন, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সকল অশান্তির অব্যর্থ প্রতিষেধক হিসাবে তিনি যে হেদায়াত প্রেরণ করবেন, সেই হেদায়াতই হবে বিশ্ব শান্তির গ্যারান্টি, সকল অশান্তি ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অব্যর্থ রক্ষাকবচ এবং বলাই বাহুল্য, এই চূড়ান্ত রক্ষাকবচই হলো আল কুরআন ও আল কুরআনের হুবহু বাস্তব প্রতিবিম্ব রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ। এই দু'টি বস্তু যদি হয় মানব গোষ্ঠীর একমাত্র পথ ও পাথেয়, সকল অশান্তি, সকল দু:খ ও দুর্ভাবনা পৃথিবী থেকে নি:শেষে অন্তর্হিত হবেই। এটা কোনো অনুমান কি কল্পনা নয়; এটা আল্লাহপাকের ওয়াদা, এটা সর্বতোভাবে পরীক্ষিত একটি বিজ্ঞান।

আল্লাহপাক প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ ও সংবিধানসহ রাসূলকে [সা] প্রেরণই করেছেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর জীবন ও জীবনাদর্শের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন বিকল্পই নেই এবং এই জন্য তিনিই কেবল 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। অতএব তাঁকে পরিহার কি অস্বীকার করে কুরআনুল কারীমের অভাবনীয়। কিন্তু কী সমূহ বদনসীব এই পৃথিবীর, শান্তির অন্বেষণে শুধু অসম্ভবের পশ্চাদ্ধাবনই তার প্রিয়তম কর্মসূচী। ফলত, যা হবার তাই-ই হলো। পুরো পৃথিবী পরিণত হলো এক নির্ভুল নিরঙ্কুশ জাহান্নামে। আল্লাহপাক বলেন, 'রাসূল [সা] যা প্রদান করেন, তোমরা গ্রহণ করো। যা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন, তা বর্জন করো' [সূরা হাশর]; অর্থাৎ রাসূলকে [সা] নি:শর্তভাবে মান্য করার মধ্যেই মানব সমাজের কামিয়াবি। অথচ কী দুর্ভাগ্য এই মানব জাতির, বিশেষ করে এই আধুনিক পৃথিবীর, সে তার সকল চেষ্টা-শ্রম ও অধ্যবসায় সম্পূর্ণরূপে সক্রিয়

www.pathagar.com

রেখেছে রাসূলের [সা] সকল আদেশ ও নিষেধের বিপরীত মেরুতে। অথচ রাসূলের [সা] আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য। অতএব আল্লাহ যদি তাঁর এই অবাধ্য, আনুগত্যহীন বিদ্রোহী বান্দাহদের বেপরোয়া অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিদানস্বরূপ এই পৃথিবীকে একটি অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে দেন, সেটাই আধুনিক মানুষের উপযুক্ত প্রাপ্য।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যেহেতু 'বিশ্বশান্তি ও রাসূলের [সা] অবদান', আমার মনে হয়, আমাদের পর্যবেক্ষণ ও তৎসন্নিহিত আলোচনা যথাসম্ভব একটু বিশদভাবেই পেশ করা প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বের যে দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ, যা মূলত সকল অশান্তির কারণ, তার নিরাময়কল্পে রাসূলের [সা] জীবনাদর্শ ও শিক্ষার নি:শর্ত আনুগত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ যে সত্যই নেই, সংক্ষেপে হলেও তার একটি তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ জরুরি। প্রথমে যীশুখ্রিস্টের কথাই বলি। কোনো সন্দেহ নেই, তিনি [হযরত ঈসা আ.] একজন বিশিষ্ট নবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এই দুর্ভাগ্যজনক কাজটি সংঘটিত হয়েছে যীশুখ্রিস্টের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর যে বাণীসমূহকে বাইবেল বা 'ইঞ্জিল শরীফ' বলে গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে যীশুখ্রিস্টের কোনো সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। সেটা আসলে সেন্ট পল ও তৎপরবর্তী কিছু লোকের মনগড়া New Testament. উপরন্তু এটাও সত্য যে, হযরত ঈসাকে [আ] আল্লাহপাক পাঠিয়েছিলেন প্রধানত তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং মহানবী মুহাম্মাদের [সা] আসন্ন আবির্ভাবের সুসংবাদদাতারূপে। স্বল্পকালীন নবুওয়তী যিন্দিগীতে এটাই ছিল তাঁর কাজ। অতএব বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরাসরি ভূমিকা ও অবদান খুব বেশি নয় এবং ইতিহাসও এই কথাই বলে। যাই হোক, New Testament যেমন মনগড়া, ইহূদীদের হাতে হযরত মূসার [আ] তাওরাত এরও [Old Testament] হুবহু একই দশা হয়েছে। অতএব ইহুদী-খ্রিস্টানেরা যাই বলুক, হযরত মূসা [আ] কি হযরত ঈসার [আ] কাছে আল্লাহর প্রেরিত যে মানব শান্তির দিক দর্শন, তার প্রকৃত কোনো রূপরেখা আজ আর অবশিষ্ট নেই। বরং বিকৃতির কারণে এমন এক ভয়াবহ 'সুসমাচার' তৈরী হয়েছে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যা থেকে শান্তি তো দূরের কথা, পুরো খ্রিস্টান জগৎ পাপ ও অপরাধ, অশ্লীলতা ও বন্যতার আজ এক মনোরম অভয়ারণ্যে পরিণত এবং এই বিষয়টি এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট যে, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য পশ্চিমা জগৎ এখন ধর্মকে ধর্মের মতো এবং পৃথিবীকে পৃথিবীর মতো চলার এক ধর্মাধর্মহীন নিরপেক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয়েছে। 'ওল্ড' হোক আর 'নিউ' হোক, কোনো টেস্টামেন্টেই যেহেতু কোনো সমস্যারই কোনো বাস্তবানুগ সমাধান নেই, পাদ্রি পাদ্রির মতো চলে, রাজা রাজার মতো। বড় সুন্দর এক ইবলিসী সহাবস্থান! পশ্চিমাদের এই দুর্ভাগ্য লাঞ্ছিত ব্যবস্থাই আমাদের অনেক নামকরা বুদ্ধিজীবীদের সার্বক্ষণিক তপস্যা ও একান্ত কাঙ্ক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

বৌদ্ধ ধর্মের জনক সিদ্ধার্থের আন্তরিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নবী

www.pathagar.com

ছিলেন না এবং তিনি তা কখনো দাবীও করেননি। অর্থাৎ তাঁর কাছে কোনো Divine Message ছিল না। এক ডুমুর গাছের ছায়ায়, যাকে 'বোধিবৃক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়, দীর্ঘ একাগ্র ধ্যানমগ্নতার মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থ একটি মানব মুক্তির সত্য আবিষ্কার করলেন। 'সত্য'টি কতখানি সত্য সে অন্য কথা, তবে বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় একে বলে 'নির্বাণ', যা 'অষ্টমার্গ' অর্থাৎ আটটি সদাচারের অনুশীলন থেকে মানুষ শান্তি ও মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু এই 'আলোকপ্রাপ্ত' প্রজ্ঞাঋদ্ধ বুদ্ধকে নিয়ে এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, তাঁর ব্যবস্থাপত্র যদিও অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্ভাবনা সমৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পুরোপুরিই অন্তর্মুখী। অর্থাৎ আত্মমুক্তি বা মোহমুক্তি একটি বিষয় বটে, কিন্তু কর্মচঞ্চল অতিবাস্তব যে বিস্তৃত বহির্জগতের স্তরে স্তরে অশান্তি ও হাহাকার প্রতি মুহূর্তে মানব সমাজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে রাখছে, সেই দিকটি গৌতম বুদ্ধের আদৌ নজরে আসেনি এবং এই না আসার কারণেই আমরা আজ যখন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে অস্থির ও দিশাহীন, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ ধর্মের ভূমিকার সেখানে খুব গৌণ।

মহাবীর প্রণীত ও প্রচারিত জৈন ধর্মের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। অহিংসা, অস্বাভাবিক শারীরিক কৃচ্ছ্রতা, যে কোনো ধরনের জীব হত্যাকে মহাপাপ জ্ঞান, জন্মান্তর বিশ্বাস মোটামুটি এসবই হলো সতত-উলঙ্গ মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য। এই ধর্মের কিছু আধ্যাত্মিক মূল্য ও প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেহেতু একেবারেই বাস্তবতা নিরপেক্ষ, যেহেতু পৃথিবীর বহুমাত্রিক সমস্যার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় এই জৈন ধর্মের মধ্যে কোনরূপ ঝুঁকি গ্রহণের তাকিদ ও তৎপরতা নেই। প্রাচীন ইরানে খ্রিস্টপূর্বকালে জরথ্রুস্ট নামে একজন ধর্ম প্রবর্তকের আবির্ভাব ঘটে। দিনে দিনে এক সময় তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম মতের যথেষ্ট প্রসারও ঘটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই জরথ্রুস্টীয় ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। অতএব আধুনিক পৃথিবীর যে সমস্যা ও সংকট, সেই প্রেক্ষিতে এই ধর্মের কার্যকারিতা নিয়ে যে কোনো রূপ আলোচনা এক রকম নিরর্থক।

বর্তমান বিশ্বে একটি অতিশয় উল্লেখযোগ্য ধর্ম হলো সনাতন হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মাশ্রিত লোকসংখ্যাও বিপুল; তাদের ধর্মানুরাগও প্রবল। কিন্তু সমস্যা হলো, ধর্ম গ্রন্থ গীতায় কি বেদ-উপনিষদে যাই থাক, এই ধর্ম প্রায় আদি থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী রক্ষণশীলতার দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে এমন এক চতুর্বর্ণীয় অমানবিক সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে, যা মানবতার অপমান ও সমাজ দেহের একটি স্থায়ী ক্ষত হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। এই ধর্মেও অনেক নৈতিক শিক্ষা ও মানব কল্যাণের কথা আছে। কিন্তু অপরিহার্য পৌত্তলিকতা, উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণদের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য রক্ষায় নানা ধরনের ধর্মীয় অনুজ্ঞার কারণে, হিন্দু ধর্মকে গুরুতরভাবে উগ্র ও অসহিষ্ণু, বৈষম্য লাঞ্ছিত ও সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছে। এজন্যই এই ধর্মে শান্তির উপাদান যতটা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে নিরন্তরভাবে অপমানিত মানবাত্মার ক্রন্দন।

একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন-অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের এক আমন্ত্রিত কিশোর সহপাঠীকে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ হওয়ার 'অপরাধে' অনুষ্ঠান থেকে নিষ্ঠুরভাবে বহিষ্কার করেছিলেন। অথচ তিনি মহর্ষি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর নথীনকে তিনি একাদিক্রমে তিন দিন গৃহে অন্তরীণ রেখেছিলেন শুধু এজন্য যে, কোনো নিম্নবর্ণীয় হিন্দুর সঙ্গে যেন 'অশুভ' দৃষ্টি বিনিময় না ঘটে। অথচ তিনি বিশ্বপ্রেমের বিশ্বকবি। বস্তুত, এটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অপরাধ নয়, তাঁরা আসলে অনতিক্রম্য ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এই ব্যর্থতা উচ্চবর্ণের কাছে উপভোগ্য হলেও, নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে তা এতই অন্তর্দাহী ও ভেতরে ভেতরে রক্তস্রাবী যে, কষ্টে-দু:খে-অপমানে আম্বেদকর তাঁর তিন লক্ষাধিক অনুসারী নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ 'সনাতন' বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিক সমস্যায় হিন্দু ধর্মের নিজস্ব অস্তিত্বই মাঝে মাঝে বিপণ্ন হবার উপক্রম ঘটেছে; যে কারণে বিশ্বশান্তি, বিশ্বমানবতা অনেক পরের কথা, নিতান্ত আত্মরক্ষার্থেই বাধ্য হয়ে আবির্ভাব ঘটেছে সমন্বয়বাদী শ্রীচৈতন্য বা শঙ্করাচার্যের, উদ্ভব ঘটেছে ব্রাহ্ম ধর্মের।

যাই হোক, মোটামুটি এই হলো সর্বমানবিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আধুনিক বিশ্বে অনুসৃত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রধান ধর্মসমূহের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা জরুরি যে, পৃথিবী আজ ইসলামের মুকাবিলায় ধর্ম নিরপেক্ষতাকে একটি বড় আশ্রয় ও অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে। তার একমাত্র কারণ, যে সকল সমস্যা নিয়ে আধুনিক পৃথিবী আজ বিপর্যস্ত, তার কোনো একটিরও সমাধান কোনো ধর্মে নেই। ইসলামই একমাত্র দীন, যেখানে সকল জীবন সমস্যার সর্বোত্তম তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমাধান বিরাজ করছে এবং এজন্যই ইসলামের প্রায়োগিক সাফল্য থেকে পৃথিবীকে মাহরুম রাখার একটি মোক্ষম কৌশল হিসাবে ইবলিস তার বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছে যে এক নতুন মন্ত্র তুলে দিয়েছে, তারই নাম 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। পুরো পৃথিবীর জন্যই এ এক মহাপাপের ছাড়পত্র। মুসলমান যদি এই ফাঁদে পা দেয়, অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ। কারণ মুসলিম উম্মাহ ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো পরিচয় বা উত্তরাধিকার বহন করে না; তার একমাত্র উত্তরাধিকার, পৃথিবীর যাবতীয় দীন ও বিশ্বাসের মুকাবিলায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আল্লাহপাকের মনোনীত একমাত্র দীন ইসলাম এবং রাসূলের [সা] কাছে চূড়ান্তভাবে অবতীর্ণ এই অবিনশ্বর ইসলামই হলো বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি; সুখ ও স্বপ্নময় ও ব্যাধিমুক্ত পৃথিবীর একমাত্র রূপরেখা।

আলোচনার পরিসর বৃদ্ধি না করে, এবার আমরা দেখতে চাই, বিশ্বমানবিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলের [সা] ভূমিকা ও অবদান কী এবং কতখানি। পুনরায় উল্লেখ করি, তাঁর যে প্রদর্শিত সেটা তাঁর নিজের নয়, সেটা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রেরিত পথ নির্দেশ। তাঁর তেইশ বছরের সংগ্রামী যিন্দিগী, তাঁর পেশকৃত জীবনাদর্শ, সবই আল্লাহর এই পথ

www.pathagar.com

নির্দেশেরই যথাযথ প্রতিবিম্ব। আবারও উল্লেখ করি, মুহাম্মাদ [সা] এই ধরাপৃষ্ঠে প্রেরিতই হয়েছিলেন শয়তানের সকল কুহক ও প্ররোচনামুক্ত এক সর্বমানবিক শান্তি ও নিরাপত্তা ও ইনসাফের পৃথিবী নির্মাণের জিহাদী রূপকার হিসাবে। তাঁর প্রকৃত কাজই হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা, যে কারণে আল্লাহপাক নিজেই তাঁকে বলেছেন, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' নিখিল বিশ্বের আশীর্বাদ ও রহমত।

রাসূল [সা] পৃথিবীতে এসেই দেখলেন, এখানে অনেক কিছু আছে, শুধু শান্তি নেই সখ্য নেই ভালোবাসা নেই। সর্বত্র শুধু অসত্য অনাচার দ্বন্দ্ব বৈরিতা হানাহানি স্বার্থপরতাও মানবতার অপমান, এসব নিয়ে এক নিবিড় নিশ্ছিদ্র জাহিলিয়াত। জীবনের শুরু থেকে চল্লিশ বছ পর্যন্ত তিনি এই রকমই দেখলেন, কিন্তু দেখলেন এক অসহায় দর্শকের মতো এবং দীর্ঘ সময়ে সর্বমানবিক মুক্তির কোনো দিশাই তিনি খুঁজে পেলেন না। তারপর আল্লাহপাকের নিকট থেকে তাঁর কাছে একটু একটু করে মানব মুক্তির পথরেখা উন্মোচিত হতে লাগলো, তিনিও একটু একটু করে অগ্রসর হলেন এবং তেইশ বছরের নাতিদীর্ঘ নবুওয়তী যিন্দিগীর একাগ্র পথ-পরিক্রমায় তিনি পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেলেন আল্লাহপাকের প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত, পৃথিবীর জন্য এক অনন্য শাশ্বত নির্ভুল পথরেখা।

আগেই বলে রাখি, অশান্তি তো শুধু শুধুই সৃষ্টি হয় না, ভুল এবং অজ্ঞতার কারণেই হয় এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন থেকে সমাজ দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পর্যন্ত যে বিস্তৃত সমস্যা সংকুল মানব জীবন, তার পরতে পরতে অনেক ভুল অনেক অজ্ঞতা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে বলেই পৃথিবীময় আজ এই অশান্তি, আজ এই ঘন অন্ধকার জাহিলিয়াত। কিন্তু আল্লাহপাকের অনুগ্রহ, তাঁর প্রেরিত পয়গামকে সামনে রেখে রাসূল [সা] বিজ্ঞানসম্মত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল ব্যর্থতা ও অশান্তির এমন সহজ ও সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিলেন, যা অনুসরণ করলে কোথাও কোনো অশান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান ও পুত্রকন্যার আদন-আবদার থেকে শুরু করে জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পর্যন্ত সবকিছু এক অনাবিল শান্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে বাধ্য এবং এটা কোনো অপরীক্ষিত তত্ত্বীয় হাইপোথেসিস নয়, কোনো কষ্ট সংকুল উপপাদ্য নয়, এটা বিশ্বসমক্ষে সর্বতোভাবে প্রমাণিত ও উপস্থাপিত একটি সহজ প্রায়োগিক সম্পাদ্য। অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। খুলাফায়ে রাশেদার সময়কালই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

যাই হোক রাসূল [সা] এসেই যে অশান্তি পরিকীর্ণ আইয়ামে জাহিলিয়াতের প্রত্যক্ষ করলেন, তার নিরাময়ের উপায় কী? বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এক বিশাল কার্যক্রম, কিন্তু তার প্রথম সবকটি কী, যা বিশ্বকে ধীরে ধীরে তার প্রতীক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আল্লাহপাকের সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ থেকে তিনি অনুধাবন করলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই হলো সেই প্রথম পাঠ, যা

www.pathagar.com

সর্বান্ত:করণে আত্মস্থ করলে, অন্য যা কিছু শান্তি ও মানব বিধ্বংসী এক একটি প্রবল উপসর্গ, তার বিদায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অবধারিত। অতএব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের প্রথম কথাটিই হলো, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রীতিভাজন প্রতিনিধি মাত্র, একক অখণ্ড অবিভাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। দ্বিতীয় কথাটি হলো রিসালাত। অর্থাৎ মানুষ যেহেতু খুব যৌক্তিকভাবেই একেবারে স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন এবং অদূর অপরিণামদর্শী, আল্লাহপাকের নির্দেশিত হেদায়াতই মানুষের জন্য চূড়ান্ত কল্যাণের পথরেখা। আর এই নির্ভুল দিক নির্দেশনা দিয়েই আল্লাহপাক তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি এই বিশ্বাসটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সমানভাবে অবশ্যমান্য এবং সর্বশেষ তৃতীয় কথাটি হলো, মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন, তাঁর সুমহান দরবারে পার্থিব এই নশ্বর জীবনের অপরিহার্য জবাবদিহিতা এবং অনন্তদিনের জন্য জান্নাত-জাহান্নামের অবশ্যম্ভাবী ফয়সালা।

এই তিনটি পরস্পর সন্নিবিষ্ট বিশ্বাস, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত, যদি একীভূত হয়ে অন্তরে দৃঢ়তা লাভ করে, কোনো সন্দেহ নেই, জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দৃশ্যমান সকল শান্তির আবিলতা এমনিতেই অতিদ্রুত ও প্রায় অক্লেশে অপসারিত হয়। এজন্যই ইসলামে ঈমানের এত মূল্য ও এত অপরিহার্যতা! এবং এজন্যই বিশ্বব্যাপী মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূল [সা] প্রথম যে পাঠ দান করলেন, তা হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের জবাবদিহিতা। বিশ্বশান্তি বিশ্বমানবতার এটাই মূল ভিত্তি। পৃথিবী যে আজ এত বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের পরেও এক দু:খী দুর্দশাগ্রস্ত আগ্নেয় জাহান্নামে পরিণত হয়ে গেল, তার একটিই মাত্র কারণ, পৃথিবীর অন্তর্দেশে উপরোক্ত তিনটি বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। যেটুকু যা আছে, তা এতই দুর্বল, যা প্রায় না থাকারই সমতুল্য।

রাসূল [সা] সম্পর্কে আমরা অনেক কথা বলি, তাঁর জীবনাদর্শ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আঁকড়ে ধরার চেষ্টাও করি, কিন্তু কোনো কিছু থেকেই কোনো ইতিবাচক ফল লাভ সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবী বরং ক্রম নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেই অপ্রতিহতভাবে ধাবিত হচ্ছে। এই কারণ এই নয় যে, রাসূলের [সা] প্রতি পৃথিবীর কোনো মুহাব্বত নিয়ে দিন গুজরান করলে প্রকৃত কাজের কাজ কি কিছু হয় অথবা হওয়া সম্ভব? মনে রাখা দরকার, রাসূল [সা] এসেছিলেন, বলা উচিত প্রেরিত হয়েছিলেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত একটি তাওহীদী পৃথিবী রচনার দায়িত্ব নিয়ে এবং এই তাওহীদই হলো পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। কুরআনুল কারীমে আল্লাহপাক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, 'মুশরিকরা হলো নাপাক' এবং তারা 'জগতের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি' এবং তারা এত নিকৃষ্ট যে, পিতামাতা আত্মীয় পরিজন হলেও 'তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ' [সূরা তাওবা, সূরা বায়িনাহ, সূরা তাওবা]।

www.pathagar.com

সুতরাং এই নাপাক নিকৃষ্ট অংশীবাদ যদি পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে থাকে, তাহলে সেই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হবে, এটা দুরাশা। কারণ কোনো মৌলিক জিনিসই আল্লাহপাক মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত রাখেননি। শান্তি যেহেতু একটি মৌলিক জিনিস, এটা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ থেকে নেমে আসে। অতএব আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য সবচেয়ে অপবিত্র যে বস্তু শিরক, সেই শিরকে আচ্ছাদিত পৃথিবীতে রহমত আসার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে এবং সেটাই স্বাভাবিক।

অতএব রাসূলের [সা] প্রথম শিক্ষাই হলো, শান্তি ও কল্যাণের স্বার্থে অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতাকে সর্বাগ্রে বর্জনকরত জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়া। অন্যথায় যতভাবেই চেষ্টা করা যাক, পৃথিবীকে শয়তানের আধিপত্যমুক্ত করাও সম্ভব হবে না, শান্তিও আসবে না। কারণ এটাই তো সাধারণ যুক্তির কথা, যে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি 'আশরাফুল মাখলুকাত', যে মানুষ 'খলীফাতুল আরদ' অর্থাৎ বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহর প্রতিনিধি, সে যদি স্বেচ্ছায় বা অজ্ঞতায় তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে লাত-উজ্জার মতো প্রাণহীন দেবদেবীকে, মাজার কবর পীর পুরোহিতকে অথবা অপর কোনো আপাত ক্ষমতাবান মানব শক্তিকে পূজ্যপাদ ও প্রণম্য জ্ঞান করে, তাহলে বুঝতে হবে মানুষ নিজেই তার নিজের উচ্চাসনকে উন্মাদের মত অতল গহ্বরে নামিয়ে এনেছে। এই ধরনের আত্মমর্যাদাহীন তাওহীদী প্রেরণাশূন্য মানুষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরামের জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু তার নৈতিক অবস্থান চতুষ্পদ বন্যজন্তুর থেকেও অনেক নিম্নে।

অতএব, ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই যে মানুষের অধীন [সূরা জাসিয়া], একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মানুষের যে কোনো অর্থেই কোনো দ্বিতীয় উপাস্য নেই, এই তাওহীদী চেতনা ছাড়া মানুষের আদৌ আত্মমুক্তি ঘটে না, বিশ্ব মানবতার মুক্তি তো অনেক পরের ব্যাপার। অতএব অংশীবাদ, যার কারণে মানুষ নীচে নামতে নামতে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, যখন সে আর মানুষই থাকে না, হয়ে পড়ে হীনতম দীনতম ও নিম্নতম জগতের এক পশ্বাধম, পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'আসফালা সাফিলীন'। শান্তি প্রত্যাশী যে কোনো মানুষ স্বীকার করবেন যে, এর একটি যথাবিহিত অবসান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। জরুরি এজন্য যে, এই পশ্বাধম মানুষের হাতে সারা পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য তুলে দিলেও কোনো লাভ নেই, কারণ ক্ষুদ্রতা ও নীচতা ও নির্বিবেক-স্বার্থপরতা দ্বারা গঠিত এই বিশাল পশুসম্পদ আসলে দৃশ্যতই মানুষ। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদী চেতনারিক্ত এই পশুসদৃশ মানুষগুলো সর্বব্যাপী অশান্তি সৃষ্টিরই উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। আল্লাহপাকের নির্দেশানুসারে রাসূল [সা] সর্বপ্রথম এই জায়গাটিতেই ঔষধ প্রয়োগ করলেন, সবাইকে আহ্বান জানালেন এই অব্যর্থ কালেমার দিকে : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যাঁরা সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আনুগত্য নিয়ে এই পবিত্র কালেমার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, ইতিহাস

www.pathagar.com

সাক্ষ্য দেয়, তাঁরা শুধু নিজেরাই লাভবান হলেন না, সমগ্র বিশ্বের সামনে তাঁরাই প্রবাহিত করে দিলেন সর্বমানবিক শান্তি ও নিরাপত্তার এক অমল সুবাতাস। এটাই বিশ্বশান্তির প্রথম পাঠ, যা আল্লাহর অনুগ্রহধন্য সওগাত হিসাবে পৃথিবীকে উপহার দিলেন রাসূল [সা]।

দ্বিতীয়, রিসালাতের প্রতি নিখাদ বিশ্বাস। মানব মুক্তি ও বিশ্বশান্তির জন্য এটা অপরিহার্য। 'বিশ্বাসের জন্যই বিশ্বাস' এ রকম নয়, এটা সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত একটি নিখাদ সত্য বলেই নি:শর্তভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূল [সা] আনীত ও উপস্থাপিত যে পথ নির্দেশনা, সেটাই শান্তি ও বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ। সর্বান্ত:করণে বিশ্বাস করতে হবে, দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই। আর এই পথ যেহেতু তাঁর নিজস্ব কোনো রচনা নয়, স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পথ রেখা, এই নির্দেশনার মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের অকাট্য রূপরেখা। অতএব আল্লাহপাকের প্রত্যক্ষ পয়গামঋদ্ধ রাসূলের [সা] জীবনাদর্শের মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সার্বিক সাফল্য, এই কথাটি পরম আনুগত্যে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হবে এবং এজন্যই তিনি 'উসওয়াতুন হাসানা' জগদ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অর্থাৎ তাঁর আদর্শরিক্ত যে পৃথিবী, তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসহীন যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী অন্ধকার অভিশপ্ত এক পথভ্রষ্ট জাহিলিয়াতের পৃথিবী। অবশ্য এটা মনে রাখা জরুরি যে, রাসূলকে [সা] শুধু রাসূল বলে মেনে নিলেই আমরা শান্তি ও কল্যাণের স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করতে পারবো তা নয়, তাঁকে মেনে নেয়া মানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা, নি:শর্ত আনুগত্যে একমাত্র আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ জীবন ও জগতের গতিপথে রাসূল [সা] ও তাঁর আনীত কুরআনই হবে একমাত্র পথ নির্দেশক কম্পাস, একমাত্র আলোকবর্তিকা।

তৃতীয়, আখিরাত। একদিন অবশ্যই এক ভয়ংকর বিচার দিবসে কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া যে মানুষের জন্য অবধারিত, এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। এ নিয়ে কোনোরূপ দ্বিধা ও শৈথিল্যের কোনো অবকাশ নেই। অর্থাৎ অনন্তদিনের জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা যে একটি অকাট্য সত্য, এ বিষয়ে সংশয় মানেই সর্বনাশ, এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

এই তিনটি মৌলিক সত্য, অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের সবক দিয়েই রাসূল [সা] বিশ্বশান্তির পথ রচনা করলেন। এই পথ আল্লাহপাকের নির্ধারিত পথ, অতএব সর্বাংশে নির্ভুল। আর এই আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল পথ নির্দেশনায় রাসূলের [সা] যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপরেখা, মানব মুক্তির সেটাই একমাত্র পথ।■

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] আদর্শ রাষ্ট্র

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময় আরব দেশ বহু গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন এলাকা গোত্রপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো শাসনকার্য পরিচালনা করত। মূলত সেটাকে শাসন না বলে নৈরাজ্য বলাই অধিকতর সমীচিন। কারণ কোথাও কোন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না, নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ইত্যাদি কোন কিছুর বালাই ছিল না সেখানে। সর্বত্র এক নৈরাজ্যকর, শোষণ-যুলুম, অন্যায়-অবিচার, অনৈতিক-অশ্লীল অবস্থা বিরাজমান ছিল। সমগ্র দেশে কোন কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। তাই এ সময়কে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য আরব দেশ ভিন্ন জগতের অন্যান্য দেশের অবস্থাও তখন মোটামুটি এ রকমই ছিল। সভ্যতার আলো তখন পৃথিবী থেকে প্রায় দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। আরব দেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে যখন এরূপ এক অন্ধকার যুগ বিরাজমান তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] আরব দেশের মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হলেন ৫৭০ ঈসায়ীতে। তিনি এ অধঃপতিত সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করে এটাকে এক আলোকিত

www.pathagar.com

সুসভ্য সমাজে পরিণত করলেন। সমগ্র বিশ্বও সে আলোকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জগতের এ বিস্ময়কর বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হলো তা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

মহানবীর [সা] আদর্শ সমাজ পরিগঠনের বিষয় জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই তাঁর সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া প্রয়োজন। তিনি অন্যদের মতই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তি। মানবজাতির মধ্যে তিনি সর্বোত্তম, সর্বগুণে গুণান্বিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল [সা] অর্থাৎ মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে একজন মনোনীত ব্যক্তি। সমগ্র মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তাছাড়া, তিনি শুধু একজন রাসূলই ছিলেন না, সকল নবী-রাসূলদের [সা] মধ্যেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। মহানবীর [সা] এ পরিচিতি প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন এ জন্য যে, তিনি পৃথিবীতে যে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন, তা মানুষের মনগড়া কোন রাষ্ট্র ছিল না। সেটা ছিল মহান স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই প্রদত্ত বিধানানুযায়ী রাসূল [সা] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র।

মহানবীর [সা] পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ আল কুরআনে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' [সূরা কালাম, আয়াত-৪]

'এবং তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।' [সূরা ইনশিরাহ, আয়াত-৪]

'[হে রাসূল] আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সারা জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ।' [সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭]

'বল হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।' [সূরা আ'রাফ, ১৫৮ নং আয়াতের আংশিক]

'যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।' [সূরা বাকারা, আয়াত-১৫১]

উপরে উদ্বৃত আয়াতসমূহে মহানবীর [সা] পরিচয় দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, আল কুরআনে বিভিন্ন স্থানে তাঁর সম্পর্কে আরো বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। মহানবীর [সা] কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহের উদ্বৃতিই যথেষ্ট মনে করি। তিনি কিভাবে আল্লাহ-প্রদত্ত মিশন মানব সমাজে প্রচার করেছিলেন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিগঠনে সক্ষম হয়েছিলেন, এখানে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবে সে বিষয়টি আলোচনার পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে আরবের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] পূর্বে আরব সমাজের অবস্থা

মহানবীর [সা] নেতৃত্বে আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র আরব উপসাগরীয় এলাকার সমাজ-কাঠামো সম্পূর্ণ ধসে পড়েছিল। তারা তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রে বিভক্ত ছিল, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, ছোট ছোট বিষয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো এবং সে যুদ্ধ চলতো কখনো যুগ যুগ ধরে। তাদের নৈতিকতা ছিল অতি নিম্নমানের। চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুণ্ঠন, মদ-জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদি সমাজ ও চরিত্র-বিধ্বংসী নানা তৎপরতায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

এক. শতধা বিভক্ত জাহিলিয়াতের সমাজ-ব্যবস্থায় তখন অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এক আল্লাহর পরিবর্তে সেখানে অসংখ্য মনগড়া দেব-দেবী এবং হাতে বানানো মূর্তির পূজা করা হত। প্রত্যেক গোত্রের প্রতিভূ হিসেবে এক একজন প্রধান দেবতা বা দেবী ছিল। তারা এসব কাল্পনিক দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা-অর্চনা করতো। আরব উপসাগরীয় এলাকায় তখন ৩৬০টি প্রধান গোত্রের প্রতিভূ হিসেবে পবিত্র কাবা-গৃহে মোট ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

দুই. তৎকালীন আরবে চরম অজ্ঞতা ও নির্মম বর্বরতা বিরাজমান ছিল। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও শোষণ ছিল সাধারণ ব্যাপার। এ ধরনের আচরণে সমাজের বিবেক আহত হওয়া দূরে থাক, বরং এগুলোকে হাসি-তামাশার বিষয় বলেই গণ্য করা হতো।

তিন. ছোট-খাট বা তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটত। এ ধরনের অর্থহীন রক্তপাত বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের অনেক সময় চলতো বংশানুক্রমে যুগ যুগ ধরে।

চার. সমাজে নারী জাতি ছিল সবচেয়ে নিগৃহীত ও অবহেলিত। নারীর অধিকার ও মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। পরিবারের অর্থ-সম্পদে নারী বা কন্যা সন্তানের কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। তাদেরকে কেবল ভোগ-লালসার উপকরণ মনে করা হতো। যে কোন সামাজিক উৎসব-আনন্দে নারীদেরকে নাচ-গান ও সুরা পরিবেশনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্মকে মনে করা হত চরম অভিশাপ ও অবমাননাকর। এ অভিশাপ ও অবমাননার হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে অনেক সময় জন্মের পর শিশু কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করে পরিবারের মান-সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা করা হতো।

পাঁচ. ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দাস-দাসীরা তাদের প্রভুদের গৃহবন্দী হয়ে অসহায় ও চরম লাঞ্ছনাপূর্ণ জীবন যাপন করতো। পশুরা যেরূপ ব্যবহার পেত, অনেক সময় দাস-দাসীরা সেরূপ ব্যবহারও পেত না, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো তাদেরকে।

www.pathagar.com

ছয়. চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন-রাহাজানি, পরস্পর হরণ, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি ছিল তখন সমাজের স্বাভাবিক চিত্র।

সাত. মদ্যপান, ব্যভিচার, নাচ-গান ও চরম নৈতিকতা-বিরোধী আচরণ, অসংযত আনন্দ-উৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ফলে সমাজে পাপবোধ এক রকম তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল।

আট. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল, নৈতিকতা-বিরোধী শোষণমূলক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে আসন করে নিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থাও ছিল না এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল পর্বতপ্রমাণ।

নয়. সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অসংখ্য ছোট-বড় গোত্রে বিভক্ত সমাজে তাই সবলের রক্ত-চক্ষু ও খড়গ-কবলে দুর্বলের জীবন ছিল ত্রস্ত-বিপন্ন। বিধবা, ইয়াতীম, দরিদ্র-নিঃস্ব লোকদের কোন নিরাপত্তা ছিল না।

দশ. আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও ন্যায়বিচার না থাকায় অন্যায়-অনাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় মানুষের জীবন ছিল সর্বদা বিপদাপন্ন। বর্বরতা, নৃশংসতা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ছিল সর্বব্যাপক।

মহানবীর [সা] সমাজ-সংস্কার বা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়ত লাভের সময় পর্যন্ত আরব দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল উপরে সংক্ষেপে তার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরা হলো। এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। তৎকালীন আরবদের অবশ্য একটা খ্যাতি ছিল, সেটা হলো তাদের কাব্য-প্রীতি। মুখে মুখেই তারা কাব্য রচনা করতো, কবিতা আবৃত্তি করতো, আসর বসিয়ে কবিতার বাহাস হতো। বিভিন্ন উৎসব-আনন্দের অনুষ্ঠানে কবিদের ডাক পড়তো। কবিরা সেখানে তাদের কাব্য-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের বাহবা কুড়াতেন। শ্রোতারাও ছিল কাব্য-রসিক। কবিতার গুণাগুণ বিচারে তাদের পারদর্শিতাও কম ছিল না। এসব আসরে শ্রোতাদের প্রশংসাধন্য কবিরাই তৎকালীন আরব সমাজে খ্যাতিমান কবির মর্যাদা পেতেন। কিন্তু ঐসব কাব্য-কবিতার মধ্যেও নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় ছিল সুস্পষ্ট। কবিতার আসরেও চলতো অঢেল মদ্যপান ও অশ্লীল নাচ-গানের জমজমাট মহড়া।

মহানবীর [সা] আদর্শ রাষ্ট্র

এরূপ চরম অধঃপতিত, অনাচারগ্রস্ত ও অজ্ঞতার নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর সমাজে মহানবী [সা] এলেন ঐশী আলোর উজ্জ্বল বর্তিকা নিয়ে। অমা-রজনীর জমাট অন্ধকার যেমন উষার সোনালি আলোর বন্যায় অপসৃত হয়, মহানবীর [সা] নবুওয়তী আলোকধারায় তেমনি আরব সমাজের নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার রাশি ধীরে ধীরে অপসৃত হল। পৌত্তলিক-মুশরিক সমাজে আল্লাহর একত্ববাদ কায়েম হল। শত-সহস্র বছরের

www.pathagar.com

অনাচার, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, পাপ-পঙ্কিলতার অবসান ঘটে এক সুস্থ-সুন্দর শান্তিপূর্ণ মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল।

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মূলে প্রধানত দু'টি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত এ সমাজ বা রাষ্ট্রের মূলভিত্তি ছিল ইসলাম বা আল্লাহর দেয়া ঐশী-বিধান। দ্বিতীয়ত এ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূল কারিগর ছিলেন মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহানবী [সা]। আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে মহানবীর [সা] সর্বোত্তম জীবনাদর্শের আদলে এ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিগঠিত হয়। তাই এ আদর্শ সমাজ শুধু আরব জাতির ইতিহাসে নয়, বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসেও সকল মানুষের জন্য এক দীপ্ত প্রেরণার অনন্ত উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

তার ঈপ্সিত শান্তি, কল্যাণ ও সুন্দর সমাজ গঠনে আগ্রহী হলে মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই হতে পারে তার জন্য একমাত্র মডেল। সে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষ সমঅধিকারের ভিত্তিতে সুখী-সমৃদ্ধ নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা পেতে পারে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, অসহায়-দুর্বল, ইয়াতীম-বিধবা, শ্রমিক-মনিব ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এ ধরনের নিশ্চয়তা রয়েছে সেখানে। সংক্ষেপে এ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা যায় :

এক. বিশ্ব-জাহান, জিন-ইনসান তথা কুল-মাখলুকাতের যিনি স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা সেই এক, অদ্বিতীয়, লা-শারিক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন এবং সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা।

দুই. সকল অর্থহীন, মনগড়া দেব-দেবী ও হাতে বানানো মূর্তির পূজা-অর্চনা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। পৌত্তলিক-মুশরিকী চিন্তা-চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফত কায়েম করা।

তিন. 'কানান্নাছু উম্মাতাও ওয়াহিদাতান'– অর্থাৎ সকল মানুষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত। আদি পিতা হযরত আদম [আ] থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বংশ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ ইত্যাদি কোন কিছুর ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা অযৌক্তিক। একমাত্র তাকওয়া [পরহেজগারি] অর্থাৎ মানবিক সদগুণাবলির ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। ঐক্যের এ মূলনীতির ভিত্তিতে মহানবী [সা] পারস্পরিক সমস্ত বিভেদ ও কোন্দল ভুলে গিয়ে শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে তথা সমগ্র মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজের বাণীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মহানবী [সা] বিদায় হজের বাণীতে বলেন :

'হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রে ভাগ করে দিয়েছি যেন তোমরা পৃথকভাবে পরিচিত হতে পার।

৬—

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে চলে এবং তাঁকে বেশি স্মরণ রাখে। সুতরাং কোন আরব কোন অনারব বা আজমীর তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নয়। পক্ষান্তরে কোন অনারব বা আজমীও তদ্রূপ কোন আরবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় ব্যক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। হাঁ, মর্যাদা ও সম্মানের যদি কোন মাপকাঠি থাকে তাহলে তা হলো একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারি [সকল কাজ ও কথায় আল্লাহকে সচেতনভাবে মেনে চলা]। মহানবীর [সা] স্পষ্ট ঘোষণা : 'সমগ্র মানব জাতি এক আদমের সন্তান এবং আদমের প্রকৃত পরিচয় এই যে তাঁকে মাটির দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এখন থেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবি, রক্ত ও বিত্ত-সম্পদের সকল দাবি ও সকল প্রতিশোধ স্পৃহা আমার পায়ের নিচে পদদলিত হলো।'

চার. নারীর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদার কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। পরিবারের সম্পত্তিতে [পিতা, মাতা এবং পরবর্তীতে স্বামী] নারীর ন্যায্য অধিকার, পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানকে ভিন্ন দৃষ্টিতে না দেখা, স্বামী-স্ত্রীর সমঅধিকার এবং সর্বোপরি মাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা এটাই মহানবীর [সা] শিক্ষা বা ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। নারীকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী না বানিয়ে, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্ভ্রম ও মর্যাদার ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ, পর্দা প্রথার প্রচলন, ব্যভিচার-অনাচার-নগ্নতা-অশ্লীলতার মূলোৎপাটন করে সুস্থ সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার শিক্ষা আমরা মহানবীর [সা] সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই পাই।

পাঁচ. দাস-প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে ক্রীতদাসদেরকে মুক্তিদানে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান, গোলাম-মনিবের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টি, সকল শ্রেণীর মানুষের সমমর্যাদা দান এবং সকল মানুষের স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের সুযোগ প্রদান করেছে ইসলাম। তাই দেখা যায়, হাবশী গোলাম যোগ্যতার বলে ইসলামী সমাজে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। গোলাম-মনিবের স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ক সম্পর্কে মহানবীর [সা] সুস্পষ্ট ঘোষণা : 'হে লোক সকল! নিজের দাস-দাসী সম্পর্কে তোমরা খেয়াল রাখবে। তাদেরকে তাই খেতে দাও যা কিছু তোমরা আহার করবে, তোমরা যে ধরনের জামা-কাপড় পরিধান করবে তেমন জামা-কাপড়ই তাদেরকে পরিধান করাতে হবে।' [বিদায় হজের বাণী]

ছয়. চুরি, ডাকাতি, যুলুম, শোষণ, হত্যা, অনর্থক রক্তপাত ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাত. মদ্যপান, ব্যভিচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা, নাচ-গান ও অন্যান্য সকল প্রকার নৈতিকতা-বিরোধী অসামাজিক কার্যকলাপ রহিতের ব্যবস্থাকরণ।

আট. মানুষের সকল মৌলিক মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

নয়. সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

দশ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ-বৈষম্যের হাতিয়ার সুদ, জুয়া, অসম বন্টন, মজুতদারি, মুনাফাখোরি ইত্যাদি জনস্বার্থ-বিরোধী অর্থনৈতিক প্রথার বিলোপ সাধন করে সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন-ব্যবস্থা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমঅধিকার, শ্রমের মর্যাদা প্রদান, যাকাত, ওশর ও সদকা ইত্যাদি প্রচলনের মাধ্যমে সুষম ও কল্যাণময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এগার. আখিরাতের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। সামাজিক শান্তি, সাম্য, সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও সর্বক্ষেত্রে কল্যাণধর্মী প্রবণতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তৌহিদ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস একান্ত অপরিহার্য। মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজ এ দু'টো মূল দর্শনের ভিত্তিতেই বিরচিত।

মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজের মূল ভিত্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপরে বিবৃত হলো। মূলত আল্লাহর রাসূল হিসেবে মহান স্রষ্টার নির্দেশ বা তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী মহানবী [সা] যে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা কেবল আরব দেশেই নয়; বিশ্বের ইতিহাসে তা ছিল এক অনন্য সাধারণ মহত্তম বিপ্লব। অনন্তকাল পর্যন্ত সে বিপ্লবের সমুজ্জ্বল বিভা বিশ্ব-মানবকে অনুপ্রাণিত করবে।

উপসংহার

উপরে মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা করা হলো তা এক দিনে বা হঠাৎ করে সম্পন্ন হয়নি। সে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দীর্ঘ তেইশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কঠোর আত্মত্যাগ, অবর্ণনীয় দু:খ-কষ্ট-যুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করে বিজয়ের স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছেন। অতি নিষ্ঠার সাথে তিনি ক্রমাগত ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সে দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তিনি তাঁদেরকে তৌহিদের চেতনায় ও ইসলামের বিধান অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মন-মানসিকতা ও চরিত্র গড়ে উঠেছে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে। এরপর তিনি তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করে সমাজের সকল অনাচার, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, বিশৃঙ্খলা, অনৈতিক ব্যবস্থা দূর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। মক্কার জমীনে কাজটি খুব সহজ পরিগণিত না হওয়ায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেছেন। মহাবিপ্লবের জন্য, মানব জাতির মহত্তম কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে প্রিয় স্বদেশভূমি ছেড়ে হিজরত করা মানব জাতির ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। মদিনায় গিয়ে তিনি প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সীমিত ভৌগোলিক এলাকায় ইসলামের বিধি-বিধান চালু করেন। তারপর ধীরে ধীরে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, ভয়-ভীতি ও তাগুতী শক্তির তাণ্ডব উপেক্ষা করে তিনি মাত্র দশ বছরের মধ্যে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। সে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের তিনিই ছিলেন প্রধান অধিকর্তা। সে রাষ্ট্রের নীতি, আইন-কানুন, বিচার-শালিস, প্রশাসন সবকিছু তিনি পরিচালনা করেছেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। পররাষ্ট্র নীতি, যুদ্ধ

www.pathagar.com

অথবা শাস্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ইসলামের শাশ্বত বিধান অনুযায়ী। যে কোন বিচারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সর্বকালের জন্য আদর্শস্থানীয়।

রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলনীতি অনুসরণ করেছেন, সেটাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায়, হিকমাতের সাথে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা উপলব্ধি করা যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ মাত্র একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু তা একবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আল কুরআনে পর্যায়ক্রমে তিনবার এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। প্রথমবারে মদের মধ্যে কী কী উপাদান আছে, তা বলা হয়েছে এবং ভাল উপাদানের তুলনায় তাতে মন্দের পরিমাণ যে বেশি সে ধারণা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মদ্যপান অবস্থায় নামাযে শামিল হতে বারণ করা হয়েছে। এভাবে মদ সম্পর্কে এবং এর অপকারিতার বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার পর তৃতীয় পর্যায়ে মদকে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং ধীরে ধীরে মন-মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের নমুনা মানব জাতির সামনে বিদ্যমান। সেটা কীভাবে, কিসের ভিত্তিতে পরিগঠিত হয়েছিল তার পুংখানুপুংখ বিবরণও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানব জাতি সর্বদা কল্যাণের প্রত্যাশী। সে ঈপ্সিত কল্যাণ কীভাবে আসতে পারে সে সম্পর্কেই যত বিতর্ক ও মতবিরোধ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা মানুষের সংগ্রামের বিষয় অবগত হয়েছি। তাদের সীমাহীন ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের পরিণতি কখনো তাদেরকে কাংক্ষিত মঞ্জিলে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি। কল্যাণ ও শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র স্রষ্টার বিধান অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। মহানবী [সা] তাঁর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর উজ্জ্বল প্রমাণ রেখে গেছেন। শুধু মুসলমান নয়, যে কোন মানুষই যদি প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশী হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই স্রষ্টার বিধান মেনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

তাই কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ, বিভ্রান্তি-বিতর্ক নয়, মানব জাতিকে আজ সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে, সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবন তথা মানব কল্যাণমুখী শাশ্বত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহর [সা] আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। শান্তি ও কল্যাণের অন্য কোন বিকল্প নেই।■

www.pathagar.com

নামবে কখন সে আবাবীল ॥ আ ব দু ল মু কী ত চৌ ধু রী

এক.

তাত্ত্বিকতার বুলি-বচন উদ্দেশ্যিক প্রচারণায়
ধর্ম-ধ্বজায় ছলে-কৌশলে রূপ পায় তা প্ররোচনায়;
উম্মা' শত পথ ও মতে বিভক্তিতে ধ্বংস হয়,
ব্যাখ্যা-ভাষ্যের বদৌলতে কে কার প্রতিপক্ষ নয়?
অন্য ধর্মে আঘাত করা নিষিদ্ধ যার বিধান, তার
স্ব-সমাজে উস্কে বিভেদ কে দিয়েছে এখতিয়ার?

দুই.

পরের ধনে পোদ্দারী আর মাথায় কাঁঠাল ভাঙার কাল,
মগের মুল্লুক জুড়ে ওদের পালে হাওয়া কী উত্তাল!
শাসন-ত্রাসন জেঁকে বসা পিঠে কুলো, নির্বিকার
আশীর্বাদের আসন পাকা কানে তুলো গুঁজে তার!
দেশে দেশে লুটেরাদের সেপাই-সান্ত্রী এরা সব
নিঃস্ব করে দেশ-জনতা দেয় বিত্ত ও বৈভব।

তিন.

ঘরে-বাইরে প্রচণ্ড মার—   শেষ যে এরা,
নামবে কখন সে আবাবীল   বিহঙ্গেরা?
আগ্রাসী এই আবরাহাদের   হস্তী থামাও,
আসমানী সেই পাথরগুলোর   বর্ষা নামাও।

তাঁকে বড় প্রয়োজন ॥ আ মি ন আ ল আ সা দ

সংকটময় পৃথিবীতে আজ তাঁকে বড় প্রয়োজন
তাঁর আদর্শে মুক্তি খুঁজছে দুর্গত জনগণ
মানুষ অনেক এগিয়েছে বটে মানবতা নেই তবু
নেই ইনসাফ মানুষ সেজেছে আজ মানুষের প্রভু
নানা রূপে নানা ছলনায় শোষণ করছে বিশ্ব
শক্তিধরের দাপটে দুনিয়া নিষ্পেষিত নিঃস্ব
বিভীষিকাময় এই পৃথিবীতে তাঁকে বড় মনে পড়ে
ন্যায়ের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে যার জীবন কেটেছে লড়ে।

www.pathagar.com

জঙ্গে বদর ॥ শ ফি কু র র হ্ মা ন র ঞ্জু

বদর নামে
মাঠের ছবি
দেখতে
যে চায় মন
নবীর সাথে
লড়াই করে
বাধায়
কাফের জন
তিন'শ তের
বদর সেনা
নবীর
সাথী ছিলেন
আর সাথীরা
ফেরেস্তা তার
অলক্ষ্যে
যোগ দিলেন
দশ হাজার
কাফের ফৌজ
বিপুল
বিরাট দল
আবু জেহেল
দলের নেতা
সাহস
কাফের বল
তিন'শ তেরো
নবীর মোটে
একটু
বদর সেনা
বর্বর সব
কাফের সেনা
সাহস
সবার চেনা

www.pathagar.com

লড়াই চলে
তুমুলভাবে
উড়ায়
ধূসর ধুলি
খুনে ভিজায়
রাঙা দেহের
উড়ায়
মাথার খুলি
আবু জেহেল
কোনটা চাচা
বলুন
দেখান আজ
দাঁড়ায় পাশে
পিচ্ছি দু'টি
কিশোর
সেনার সাজ
চিনতে পেরে
ছুটলো ওরা
করলো
আঘাত যেই
আবু জেহেল
জঙ্গে বদর
মরলো
বেঁচেই নেই
পালিয়ে বাঁচে
কাফের সেনা
পালিয়ে
বাঁচায় প্রাণ
নবীর সাথী
বিজয় পেলো
বিজয়
নতুন ঘ্রাণ ॥

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] দৃষ্টি ॥ সা' দ ত সি দ্দি ক

আমি তাঁর সপ্রতিভ দৃষ্টির অপেক্ষায় বসে থাকি–
আমার অন্তরে নির্ভীক পশুটা জেগে থাকে
বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে করুণার বাতাস ঠেলে জ্বেলে দেয় হিংসার আগুন।

আমার হাত আমার প্রতিভায় আমি লালন করেছি আজীবন
মিথ্যার প্রলেপ, মিথ্যার সুউচ্চ দালান বাড়ি এ যেন
তাই তো অপেক্ষার দিন শেষ হয় না, অপেক্ষার কষ্ট শেষ হয় না
হয় না নিয়তিকে দোষারোপ করার শেষ বেলা।

আজ আমার দু'হাতে খামচে ধরে মাটির জমিন
চোখের পানিতে মাটিতে নদীর স্রোত হয়
বিশ্বাসের বাতাস ছটফট করে ওঠে
আমার আত্মার লাল কালেমার পতাকা তুলে চেয়ে থাকে
এবার রাসূল আমার– তোমার দৃষ্টি ফেরাও এখানে
আমার জ্বলে ওঠা অন্তরে তৃষ্ণার পানি ঢাল এক ফোঁটা।

ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো আমার কেটে দিয়েছে সব ঘোর
এখন দীর্ঘ সিজদায় কাটাই দরবারে প্রভুর
শুধু প্রার্থনায় রত আছি
আর স্বপ্নের মত দেখি আজ সেই ছবি সেই মমতা
আমার নিষ্প্রভ দৃষ্টি হে রাসূল
তোমাকেই খুঁজে ফেরে অনুক্ষণ।

www.pathagar.com

আবার এসো ॥ হু সা ই ন আ ল জা ও য়া দ

হে রাসূল! কেন তুমি এলে না ধরায় তবে
এসময়। দিকে দিকে অশান্তির দাবানল
জ্বলে কুচক্রীর জালে। সেই এসেছিলে কবে!
ভুলে গেছে এই জাতি। ভারী হচ্ছে শত্রুদল।

আবার এসোনা তুমি হে আমার প্রিয়নবী!
হৃদয়ের বিছানাটা বিছিয়ে জমিনে ফের
উড়াব বিজয় চিহ্ন পতপত আমাদের
কবিতা শোনাতে বসে আছে অগণিত কবি।
তাবৎ পৃথিবী কত ঢঙ্গে ছিল সেই যুগে
জোসনা রাতের প্রতিযোগী তুমি আর আ'শা
কুটিরে ছিল না অন্ন ঠিক– ছিল ভালোবাসা
এ যুগের গৃহে গৃহে ভোগে মানসিক রোগে।

যারা আছে মুসলিম মুখে মুখে জপে
ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নাম শাণিত স্বাধীন শির
দেয় না কখনো আন্দোলনে জীবনটাকে সপে
আত্মস্বার্থের বিপরীতে বড় বেশি ধীর।

মরু ফুল ॥ সু ম ন মা হ মু দ

আরব দুলাল মরুর ফুল
নেই যে তোমার কোনো তুল
সব মানুষের নবী তুমি
মোহাম্মাদ রাসূল।
তোমার নামে দরুদ পড়ি
শান্তি সুখের জীবন গড়ি।
তুমি সবার আলোর দিশা
মদিনার বুলবুল ॥

www.pathagar.com

জ্ঞানই রাসূলের [সা] চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার

শাহাবুদ্দীন আহমদ

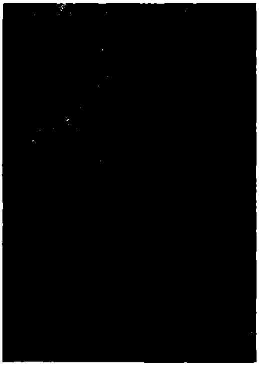

আমরা অধিকাংশ মানুষকে শুধু জ্ঞান-বর্জিত দেখি না; দেখি কা জ্ঞান বর্জিত। এই বিষয়টি জন্মগতভাবে মানুষ লাভ করে থাকে। মানুষ যদি নিজের চরিত্রে এই গুণটিকে বাড়াতে পারে তাহলে সে সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের সৃষ্টি করে সমাজে শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। মহাজ্ঞানসম্পন্ন এই মানুষের মধ্যে রাসূল [সা] ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁর অসংখ্য হাদিসে আমরা এই চরিত্র স্বরূপের পরিচয় পাই।

আমরা কয়েকটি হাদিসের উল্লেখ করে তাঁর এই অসাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেখব। একটি হাদিসে তিনি বলেছেন– "আমাকে প্রশংসা করিতে সীমা ছাড়াইও না, যেমন খ্রিস্টানরা করে মরিয়ম-পুত্রকে প্রশংসা করিতে, তাঁহাকে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলিয়া; আমি আল্লাহর ভৃত্য মাত্র; তাই আমাকে আল্লাহর ভৃত্য ও বার্তাবাহক বলিও।"

আর একটি হাদিসে বলছেন– "আমি বনু আমেরের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদের [সা] কাছে গেলাম এবং আমরা বললাম, 'আপনি আমাদের প্রভু!' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের প্রভু'!

www.pathagar.com

আমরা বললাম, আপনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের মহত্তম ব্যক্তি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "এটা বা এর চেয়ে কম বলতে পার, কিন্তু প্রশংসার সঙ্গত সীমা অতিক্রম করো না।"

মানুষের মধ্যে আমিত্বের একটা অহঙ্কার প্রায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। আমরা সাধারণ, মধ্যম ও উত্তম মানুষের অধিকাংশের মধ্যে আত্মগৌরবের একটা রূপ দেখতে পাই। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে থাকতে দেখা যায় যে, তার নিজের কোন দোষ নেই, সে নিজে কোন ভুল করে না; এবং সে নিজেকে অন্যের চেয়ে ক্ষুদ্র ভাবতে দ্বিধা করে। কিন্তু রাসূলের [সা] হাদিস দু'টিতে দেখছি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানুষ হয়েও তিনি এ বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন যে তিনি মানুষ ছাড়া আল্লাহ নন। প্রথম হাদিসটিতে তিনি মুসলমানদের জানালেন যে তারা যেন ঈসার [আ] মতো তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে চিহ্নিত না করে; যে ভুল খ্রিস্টানরা করেছে সেই একটি ভুলের ফাঁদে যেন তারা পা না দেয়। কারণ এটা করার অর্থ মুসলমানদের লা-শরিক আল্লাহর চিন্তাদর্শনকে বিনষ্ট করা হয়।

দ্বিতীয় হাদিসটিও শিক্ষণীয়। অধিকাংশ মানুষ প্রশংসা-প্রিয়। কবি হাফিজকে তৈমুর লঙ্গ ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কেন তার কবিতার বিভিন্ন স্থানে তৈমুর লঙ্গের জন্মস্থান বিকিয়ের দেয়ার কথা বলেছেন। কারণ কবি বলেছিলেন, 'প্রাণ যদি মোর দেয় ফিরিয়ে তুর্কী মোতয়ার মনচোরা/প্রিয়ার বেদীর কপোল তলে/একটি কালো তিলের তরে দেই বিলিয়ে সমরখন্দ ও রত্নখচা এই বোখারা!" বিপদ আঁচ করে চতুর কবি উত্তরে বলেছিলেন, 'এমনি দানই ত আমাকে ফকির করেছে সম্রাট!' খুশি হয়েছিলেন তৈমুর লঙ্গ। কবিকে রাজকীয় পোশাকে আর মণিমুক্তায় ভূষিত করেছিলেন। অবশ্য রাসূলও [সা] একবার কাব বিন যুহাইর [রা]-এর কবিতা শুনে তাঁকে নিজের কাঁধের চাদর উপহার দিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহ লিখছেন–

আরবি সাহিত্যে "বর্ণিত মুহাম্মাদ" সুবিখ্যাত কবিতা। এই কবিতাটির দুই আদ্য শব্দ হইতে এই কবিতার নামকরণ হইয়াছে। কাব বিন যুহাইর এর রচয়িতা। পরে তিনি হযরত মুহাম্মাদের [সা] একজন সহচর হন। ইহার রচনার উপাখ্যানটি চমৎকার। কাবের পিতা যুহাইর আরবির বিখ্যাত কবিতা সপ্তকের অন্যতম কবি। পুত্র কাব উত্তরাধিকারী সূত্রে কবিত্ব শক্তি পাইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁর শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর রণভেরীর ন্যায় কার্য করিত। পৌত্তলিক আরব যদি কোন পার্থিব শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিত, তবে তাহা এই কবিত্ব শক্তি। কাব ইসলামের শত্রুগণকে ওজস্বিনী কবিতা দ্বারা ইসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য সকল সময়ে উত্তেজিত করিতেন।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] নিজের প্রাণের শত্রুকে অম্লান বদনে ক্ষমা করিতেন। কিন্তু ধর্মের শত্রুকে ক্ষমা করিতে তাহার কোন অধিকার ছিল না। এই জন্য যেমন তিনি স্বাভাবিক দয়া-দাক্ষিণ্যে 'কুসুমাদপি মৃদু', তেমনি ধর্ম সংস্থাপনে বজ্রাদপি কঠোর' ছিলেন। মক্কা

www.pathagar.com

বিজয়ের পর তিনি গুরুতর ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে যে দশ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করেন, তাদের মধ্যে কাব বিন যুহাইর অন্যতম। [অনুতপ্ত হইলে ইহাদের অধিকাংশকে ক্ষমা করা হয়।]

প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কাব ভ্রাতা বুজাইরের সহিত ইরাক প্রদেশে পলায়ন করিলেন। কিছুদিন পর বুজাইর মদীনায় আসিয়া পূর্ব পরিচয়ক্রমে হযরত আবু বকর [রা] এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি প্রেরিত মহাপুরুষের হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

কাব ভ্রাতার ধর্মান্তর গ্রহণে দু:খিত হইয়া তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া পৈত্রিক ধর্মে পুনরাবর্তন করিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠান। শেষ পত্রে তিনি হযরত মুহাম্মাদকে [সা] পিশাচসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার ধর্মের নিন্দা করেন। ইহাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

পত্রোত্তরে বুজাইর হযরত মুহাম্মাদের [সা] গুণাবলী ও ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করিয়া কাবকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং ভক্তগণ তাঁহার ওপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে দয়ার অবতার প্রেরিত মহাপুরুষের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত তাহার আর নিস্তার নাই, এইরূপ সংবাদ প্রদান করেন।

ভয়ে ভক্তিতে কাব একটি উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া মদীনায় আসিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ [সা] মসজিদে বসিয়া শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। কাব সেই মসজিদের নিকট অবতরণ করিয়া উষ্ট্রী বন্ধন করিলেন। উষ্ট্রীর চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া বাহিরে কে আসিয়াছে জানিবার জন্য রাসূল [সা] হযরত আলীকে পাঠাইলেন। হযরত আলী [রা] কাবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'আমি একজন বিদেশী, প্রেরিত মহাপুরুষের দর্শনপ্রার্থী।'

কাব মসজিদের ভেতর আসিয়া দেখিলেন এক ...মহাপুরুষ শিষ্যগণকে ধর্মোপদেশ দিতেছেন। দেখিয়াই বুঝিতে পারলেন ইনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ [সা]। কাব অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, যদি আমি অনুতপ্ত কাবকে আপনার নিকট আনিয়া দিই, তবে আপনি কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন?' মহাপুরুষ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' তখন কাব বললেন, 'আমিই কাব।' কাবের নাম শুনিয়া কতিপয় ভক্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। হযরত তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কাবকে বলিলেন, 'তুমি কি সেই কাব যে আমাকে মামুর বলিয়াছে?' কাব বলিলেন, 'আপনি মামুন [বিশ্বস্ত]। কোন নির্বোধ মামুন স্থানে মামুর লিখিয়া থাকিবে।' কাবের উত্তরে হযরত সন্তুষ্ট হইলেন।

তখন কাব হযরতের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া কালিমা পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর স্বরচিত এই কবিতাটি পাঠ করিতে লাগিলেন–

আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের নিকট ক্ষমা আশা করা যায়।

www.pathagar.com

অনন্তর আল্লাহর রাসূলের নিকট আমি অনুযোগকারী হইয়া আসিয়াছি, কেননা আল্লাহর রাসূলের নিকট ওজর গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

আমাকে ক্ষমা করুন, সেই আল্লাহ আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, যিনি আপনাকে কুরআন- অতিরিক্ত অনুগ্রহরূপে দান করিয়াছেন। তাহাতে উপদেশ ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

এবং হযরত ও ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে কাবের সুললিত কবিতাটি শুনতে লাগিলেন। যখন কাব পড়িলেন, 'আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, যে নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের নিকট ক্ষমা আশা করা যায়।' তখন হযরত বললেন, 'বরং আল্লাহর নিকট ক্ষমা!' তারপর যখন কাব পড়িতে লাগিলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল এমন এক জ্যোতি, যে তাহা হইতে আলোক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। তিনি হিন্দুস্তানের তরবারিসমূহের মধ্যে এক কোষমুক্ত তরবারি সদৃশ।' তখন হযরত বললেন,– 'বরং আল্লাহর তরবারিসমূহের মধ্যে।' তৎপরে তিনি নিজ স্কন্ধ হইতে চাদর উন্মোচন করিয়া কাবকে প্রদান করিলেন। এই চাদর অনেক হস্ত পরিবর্তনের পর এখনও তুর্কীর সুলতানের জাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে।"

লক্ষ্য করা যায় তিনি প্রশংসাকে অতি প্রশংসায় রূপান্তরিত করাকে পছন্দ করতেন না। উদ্ধৃত দ্বিতীয় হাদিসটিতে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রভু নই, আল্লাহ তোমাদের প্রভু!' কাবের প্রশংসাধর্মী কবিতায় আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের নিকট ক্ষমার পরিবর্তে বলা হোক আল্লাহর নিকট ক্ষমা। মানুষের জন্য এটা উচ্চতম জ্ঞান প্রদর্শনের একটি অনন্য উদাহরণ। এই জ্ঞানের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন হযরত আলীও [রা]। সেজন্যই তিনি শত্রু ইয়াহূদিকে সুযোগ পেয়েও হত্যা করেননি যখন সে তাঁর মুখে থুথু দেয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, তিনি ইসলামের জন্য শত্রু হত্যা করেন, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয় এবং হযরত আলীর [রা] এই জ্ঞানের জন্য রাসূল [সা] বলেছিলেন, 'আমি জ্ঞানের শহর আর প্রবেশদ্বার আলী!'

আমরা জানি একজন বেদুঈন যখন মসজিদে পেশাব করে তখন সাহাবীদের অনেকেই তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে তিনি তাদের নিরস্ত্র করেন। কারণ তখন ঐ প্রস্রাব নি:সরণে বাধা দিলে লোকটি একটি রোগে আক্রান্ত হতে পারত।

হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে কুরাইশরা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ কাটতে বলেছিলেন এই কারণ দেখিয়ে যে তাহলে তো তাকে রাসূল বলে স্বীকার করাই হলো; এতে সাহাবীরা ক্রুদ্ধ হলেও তিনি তাঁদের নিরস্ত্র করে বাক্যটি কেটে দেন এবং তাতে দেখা যায় মুসলমানদেরই বিজয় হয়েছে। তার এই ভারসাম্যবোধের শিক্ষাই তাদের চিত্ত-উন্নতির শিক্ষা। তিনি বাস্তবভাবে দেখিয়েছেন, সত্যিকার ইসলাম বলতে কী বোঝায়!■

www.pathagar.com

'মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবি'

শফি চাকলাদার

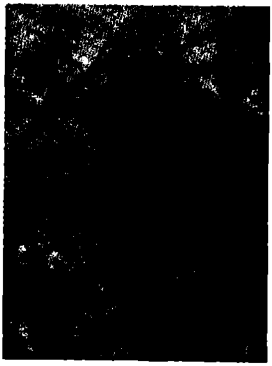

প্রতিবার ফিরে আসে এই ১২ই রবিউল আউয়াল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস এবং মৃত্যু দিবস। যথাযোগ্য মর্যাদা ও গাম্ভীর্য নিয়েই সমগ্র মুসলিম জাহান দিবসটি পালন করে আসছে। এবারও আমাদের মাঝে সুযোগ এসেছে দিবসটিকে পালন করতে। শ্রদ্ধা ভালোবাসা মিশ্রিত সম্মান জানাতে আকুল হয়ে ওঠে সারা দুনিয়া জাহান। যিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মানুষকে কি করে ভালোবাসতে হয়, প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানবতা, নারীকে কি করে শ্রদ্ধা জানাতে হয়– শিখিয়ে গিয়েছেন–

"সকল ক্ষুদ্রতা হতে বাঁচাও প্রভু উদার
হে প্রভু শেখাও নীচতার চেয়ে নীচ পাপ নাহি আর।"

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী প্রচারে বাংলা সাহিত্যের সর্ববাঙ্গন পূর্ণ করে গিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। উল্লেখিত লাইন দুটো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করা। উল্লেখিত বাণীগুলো মনের কোণে গেঁথে থাকলে একজন মানুষ নিজেকে ভালো রাখার পথে চালাতে সক্ষম হতেই পারে। নজরুল বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পরিচিত একটি নাম।

www.pathagar.com

অসাধারণ অসংখ্য কিছু অবদানে নজরুল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে। সাহিত্যের আনাচে কানাচে নজরুল এই 'ইসলামী চেতনাকে যেভাবে ঠাঁই দিয়েছেন তাতে পাঠকবর্গ উপকৃত হয়েছেন। জনম জনম ধরে এমন উপকৃত হবেন সাহিত্য রসিকেরা। অনন্য এমন কিছু অবদানের মধ্যে নজরুল ইসলাম ধর্মকে নিয়ে তাঁর সাহিত্যে প্রায়শই যে বক্তব্য রেখেছেন, মন্তব্য করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন কিম্বা কাব্য-কবিতা, সঙ্গীত গেঁথেছেন তা সমাজকে করেছে উপকৃত। বিশেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত লেখাগুলোর তুলনা শুধুমাত্র নজরুল স্বয়ং। অপূর্ব কিছু কবিতা এবং অসংখ্য অসাধারণ সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুল তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে গেঁথে রেখেছেন। যা প্রতিবার এই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম-মৃত্যু দিবসে তো বটেই বছরের অন্যান্য দিনগুলোর পাঠকবর্গ পাঠ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করে থাকেন। নাত-এ-রাসূলগুলো অমর হয়ে রবে চিরকাল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখতে নজরুল 'মরু-ভাস্কর' নামে নবী জীবনী রচা শুরু করেন। এই জীবনী গ্রন্থ সম্পূর্ণ নয় বিধি খাদীজা পর্যন্তই কবি রচে যেতে পেরেছেন। চারটি ভাগে গ্রন্থটির পূর্ণতা বলা যায় এই অসম্পূর্ণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনীটিতে। প্রথম সর্গতে রয়েছে সাতটি কবিতা, দ্বিতীয় সর্গে চারটি কবিতা, তৃতীয় সর্গে দুইটি কবিতা এবং চতুর্থ সর্গে রয়েছে পাঁচটি কবিতা– সর্বমোট আঠারটি কবিতা। উল্লেখ করতে হয় নবী [সা] করীমকে শ্রদ্ধা জানানোতে নজরুল যা লিখে গেছেন তা যেন সকল উম্মতেরই মনের কথা– যেন নজরুলই তা চলে গেলেন আমাদের প্রতিনিধি হয়ে।

'মরু-ভাস্কর' গ্রন্থের 'স্বপ্ন' এমনি একটি কবিতা। আশি লাইনে সমৃদ্ধ। শুধু আমার কাছেই নয় সকলের কাছেই অসামান্য লাগবে কবিতাটি। এর বর্ণনা, এর ছন্দ, এর শব্দ-চয়ন-গাঁথা ইত্যাদিতে অসাধারণতার স্বাক্ষর রয়েছে– কটা বর্ণিল লাইন তুলে দিচ্ছি– যা পড়লে বুঝা যাবে নবী [সা] করীমকে নিয়ে নজরুলের বর্ণনা-শক্তি কতটা কাব্য-মিশ্রিত-অসাধারণ–

"মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবি"
গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্ব-কবি।
আসিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ দানব
পশিল অন্ধ-গুহায় ঐ পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল বন্যাধারায় 'দজলা' 'ফোরাত' কন্যা মরুর,
সাহারায় নৌবতেরি বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা ছুঁড়ে অশ্ব-ছেড়ে

www.pathagar.com

খেলিছে গোণ্ডুয়া-খেল্ রক্ত ছিটায় বক্ষ কেড়ে।
আরবের কুজা বঁধূ উট ছেড়ে পথ সবজী-ক্ষেতী
খুঁজছে আজকে ঈদে খোরমা আঙুর খেজুর-মোতি।
খর্জুর কণ্টকে আজ বন্ধ খুলি যুক্ত বেণীর
ঢালিছে মুক্ত-কেশী আরবি-নির্ঝর কলসি পানির।
জরিদার নাগরা পায়ে গাগরা কাঁখে ঘাগরা ঘিরা
বেদুইন বৌরা নাচে মৌ-টুসকির মৌমাছিরা।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে যে দিক-নির্দেশনা পেলেন তা দিয়ে তিনি আইয়ামে জাহিলিয়াহ থেকে আরব ভূমিকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন তা কি শুধু আরব ভূমিই রক্ষা পেয়েছে? মোটেও নয়। আজ সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত হয়ে এগিয়ে চলেছে। নারীকে মুক্তি দিয়েছেন। সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন নারীকে সুন্দর জীবন যাপনের। নিষ্ঠার সাথে তিনি সমগ্র আরব জাহানকে আলোকিত করেছেন। পৌত্তলিকতাকে চিরতরে বিসর্জন করেছেন। অসংখ্য বাণী দিয়েছেন মানব জাতির কল্যাণে। গণতন্ত্র থেকে শুরু করে খাওয়া-পরা, কি নেই যা তিনি শিখিয়ে যাননি। নজরুল সেসব আহরণ করে আমাদের মাঝে দিয়ে গেছেন ছড়িয়ে। অথচ আজ আমরা পিছিয়ে কেন? নজরুলের এই কাব্য-গীতিটি সেই কথাই ক্ষোভে উচ্চারণ করেন–

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা কর হজরত।
মোরা ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমারি দেখানো পথ ॥
বিলাস-বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু;
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা-নবাব কভু।
এই ধরনীর ধন-সম্ভার, সকলেরই তাহে সম অধিকার;
তুমি বলেছিলে ধরনীতে সবে সমনে পুত্র-বৎ ॥
প্রভু তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে,
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন্ ধর্মীর পূজা-মন্দির, ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
প্রভু আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনা'ক পর-মত ॥
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি;
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা, সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥

www.pathagar.com

হযরত খাদীজাকে নিয়ে বিয়ের প্রসঙ্গতে নজরুল "মরু-ভাস্কর" গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে "শাদী মোবারক" শিরোনামে একটি গজল গান বাঁধেন। সুন্দর বর্ণনা আর যথার্থ শব্দ-চয়নে গীতি-কবিতাটিতে নবীর [সা] সাথে বিয়ের বর্ণনাসহ সুন্দর কিছু দৃশ্যের অবতারণা করেছে–। কিছু কিছু অংশ তুলে ধরছি পাঠকবর্গ যা পড়ে আনন্দ-উপভোগ করতে পারবেন–

মোদের নবী আল-আরবি/সাজল নওশার নওল, সাজে;
সে রূপ হেরি' নীল নভেরই/কোলে রবি লুকায় লাজে ॥

এমন সময় এল আহমদ তরুণ অরুন ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো-ঝলমল ফুল্ল-হাসে।
পঁচিশ বছরী যুবক তখন নবী আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ কুলের নয়ন-মণি।

প্রথম সর্গে 'অভ্যুদয়' কবিতায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন-সময়ের আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে–

আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তণুতে তণুতে, কেন কে বলিতে পারে?
সুরা বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মত
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত?

আইয়ামে জাহিলিয়া– ক্ষত আরব জাহানে যখন মহামানব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ধ্বনিত হল, তখন এমন আশাই তো হবার কথা– 'পরভৃত' কবিতার শেষ দুটো লাইন যেন সে কথাই বলে দেয়–

তরুণ অরুণ আসিল আকাশে ত্যাজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর ফুটুক নতুন দিনের নতুন কোল।

নবী করীম [সা] যে বাণী দিয়ে ইসলাম ধর্মকে সজ্জিত করলেন সেই বাণীগুলোর সমাহার নজরুল একটি সঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। ধ্বনিত হয়েছে সেই সঙ্গীত নবীর [সা] উম্মতদের মুখে মুখে। জ্ঞাত হয়েছে সকলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মহান বাণী মাধ্যমে– ইসলাম ধর্মকে আরো হৃদয়ঙ্গমে করতে সাহায্য করেছে এমন রচনাগুলোর মাধ্যমে–। এই গানটি কি তেমনি বিশালতা বহন করে না?

৭—

www.pathagar.com

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি,
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি ॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি-ধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষ পাতি ॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম
আমীর ফকিরে ভেদ নাই– সবে ভাই, সব এক সাথী ॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতির বোরখা উতারি এনেছি আশার-বাতি ॥

আমাদের প্রিয়নবীর [সা] জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আরো দু'টি কবিতা রয়েছে। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' আবির্ভাব এবং তিরোভাব। নজরুলের এই দুটি কবিতায়ও প্রিয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মহামানব নবী করীম [সা]-এর তাঁর কত যে অকৃত্রিম ভালোবাসা-শ্রদ্ধা কাজ করত তা প্রতিটি শব্দ-চয়নে অনুভব হয়। 'আবির্ভাব' পর্ব-তে পাঁচটি স্তবক রয়েছে, এর প্রথম চার স্তবক ১৬ লাইন করে পঞ্চমটি ১৮ লাইনের মোট ৮২ লাইনে গাঁথা এই অমূল্য কবিতাটি। 'তিরোভাব'-এরও রয়েছে ৭টি স্তবক। এর প্রথম ৬টিতে ১০ লাইন করে ৬০ লাইন এবং সপ্তম স্তবকের ১২ লাইন নিয়ে মোট ৭২ লাইনের। দুটো পর্ব থেকেই দুটো স্তবক তুলে দিচ্ছি। আরবি ফারসি শব্দ যুক্ত লাইনগুলো কখনোই কারো বুঝতে অসুবিধে হয় না। কবিতার গতিতে ছন্দের স্পন্দন বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। নবী করীম [সা] -এর প্রতি নজরুলের কত যে গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি জড় হয়ে ছিল তার সবই অকৃপণভাবে দিয়ে গেছেন এই ৮২+৭২=১৫৪ লাইনের প্রতিটি ছন্দ-মাধুর্যে-আবির্ভাব পর্ব থেকে চতুর্থ অংশটি তুলে দিচ্ছি–

জঞ্জ জাল্
কঞ্জ কাল
ভেদি'– ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি'– মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার।
বেদী– পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ডঙ্কার!
শঙ্কারে কবি' লঙ্কার পার কার' ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
ভূমা– নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার!

www.pathagar.com

মর– মর্মরে
বড় কর্মরে দিল ঈমানের জোর কর্মরে,
ভর দিল জান্ - পেয়ে শান্তি-নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্যরে!
রণে তাইত বিশ্ব - বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ–
"ওয়ে মারহাবা ওয়ে মারহাবা এয় সরওয়ারে কায়েনাত।"

'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' কবিতাটির 'তিরোভাব' থেকে পঞ্চম স্তবকটির উদ্ধৃতি করছি–

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মসজিদে?
মুয়াজ্জিনের হোশ্ নাই, নাই জোশ চিতে, শেষ হৃদে।
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে
নাড়ি-ছেঁড়া একি জানাযার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে।
উসমানে আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজিরে বেদনার চোটে ধুঁকে!
আজ ভোঁতা সে দুধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার।
আহা রসূল-দুলালী আদরিনী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
"কোথা বাবাজান!" বলি' মাথা কুটে কুটে এলো-কেশে নাহি বাঁধে।

শেষ করছি এই বলে যে নবীর [সা] জন্ম-মৃত্যু দিবস প্রতি বছরই আসছে– আসবে। কিন্তু তাঁর এই মহান বাণীগুলোকে বর্তমান প্রজন্মদের নিকট ঠিকভাবে পৌছাতে পারছে কিনা– সে দায়িত্বও সমাজের গুরুজনদেরই পালন করে যেতে হবে। যুগে যুগে কবি-পণ্ডিত-মৌলভীরা নবীর [সা] বাণীগুলো যেমন পৌছে দিতে নিজেরা কলম ধরেছিলেন বর্তমানেও এ দায়িত্ব আরো নিষ্ঠার সাথে করতে আহ্বান জানাতে হবে। নজরুল-ফররুখ-গোলাম মোস্তফা-আশরাফ আলী খান-আকরাম খাঁ সাহেব এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও নজরুল ইসলাম নবী [সা] প্রশংসায় সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সিপাহসালার। বর্তমানের প্রজন্মদের কাছে নবীর [সা] জীবনী বেশি করে প্রচার ও প্রসার হোক তবেই আমাদের এই জাতি সঠিক গন্তব্য পৌছাতে পারবে, ইনশাল্লাহ্।■

www.pathagar.com

রাসূলকে [সা] নিবেদিত সর্বাধিক পঠিত কবিতার কাব্য ভাবনা ও ভাবনার কাব্য

আ. জ. ম. ওবায়েদুল্লাহ

এক.

মানবতার মুক্তিদূত, আখেরি নবী, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ [সা] বিশ্ব সভ্যতার এক যুগ সন্ধিক্ষণে আগমন করেন এ মাটির ধরায়। তাঁর আগমনপূর্ব কালটি মানব ইতিহাসের সত্যিকারের কৃষ্ণ অধ্যায়। তিনি শেষ নবী, নবুওয়তের সীলমোহর। তাঁর ৫৭০ বছর আগে আসেন সে সময়কার শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা [আ]। হযরত ঈসা [আ] এর পর এই দীর্ঘ সময়ে কোন নবী রাসূল না আসায় এবং খ্রিস্ট জগতে ক্রমাগত বিকৃতি, বিচ্যুতি ও অন্যায় প্রবণতার কারণে মানবতার করুণ দুর্দশা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। ঘনঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত এ পৃথিবী যেনো এক টুকরো আলোর জন্য অধীর উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। দুঃখ, কষ্ট, জরা ও হতাশাগ্রস্ত বনী আদম মুক্তির আশায় চাতকের মতো চেয়েছিলো আকাশের দিকে।

অবশেষে জাযিরাতুল আরবের উষর মরুর ধূসর প্রান্তরে আল্লাহর ঘর কাবার খাদেম কুরাইশ বংশের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে মা আমিনার ঔরসে এ পৃথিবীর বুক

www.pathagar.com

আলো করে তিনি এলেন। তিনি এলেন পূর্ণ শরীর জ্যোতি নিয়ে, রোম-পারস্য সাম্রাজ্যে তাঁর আগমনের বার্তা জানিয়ে। অগ্নি উপাসক পারসিকদের 'শিখা চিরন্তন' মুহূর্তের জন্য নিভে গেলো, কেঁপে উঠলো রোম সম্রাটের প্রাসাদ। এসব কোন কবির কল্পনা নয়, ইতিহাসের অমোঘ সত্য। আবদুল্লাহর ঘর আলো করা প্রিয় নাতির আগমনে আবেগাপ্লুত আবদুল মুত্তালিব এ শিশুর নাম রাখলেন- 'মুহাম্মাদ' প্রশংসিত। আর আবু লাহাব যখন তার দাসীর মুখে এ সুসংবাদ শুনলো আযাদ করে দিলো দাসীকে।

এভাবে যার পৃথিবীতে আগমন তিনিই যে পৃথিবীর বহু কাঙ্ক্ষিত প্রশংসিত 'আহমদ' এটি সবাই বুঝতে পেরেছিলেন। রাসূলে আকরাম [সা]-এর জন্ম হতে ওফাত অবধি ৬৩ বছর এর জিন্দেগির সব বিষয় খুঁটিনাটিসহ সংরক্ষিত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। রাসূল [সা] বলেছেন- 'আমার কাছ থেকে একটি আয়াতও যদি জানো তা ছড়িয়ে দাও'। তাঁর জীবনের সকল কিছুই অনাগত মানবের কাছে পৌঁছে দেয়ার এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মোজেযা। তিনি যেন এক খোলা কিতাব, মানবতার Open Book.

পৃথিবীর অনেক মনীষী রাসূলের [সা] প্রশংসা, স্তুতি ও মূল্যায়ন করে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, লিখেছেন প্রবন্ধ, কবিতা, গান, গল্প, এমনকি নাটক। বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর অসামান্য জীবন নিয়ে রচনা করেছেন জীবনী গ্রন্থ। মনীষী কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Hero and Hero worship'- এ মানব সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ে অবদান যারা রেখেছেন তাদের নিয়ে লিখেছেন। সেখানে তিনি একটি অনন্য সুন্দর লেখা লিখেছেন- 'Mohamet hero as Prophet' শিরোনামে Hykal, Barnard Shaw সহ অনেকেই রচনা করেছেন খ্যাতিমান বই। তাদের কার কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না। একজন সমালোচক বলেছেন, 'এসব ব্যক্তি শাশ্বত নবীর ব্যাপারে লিখে নিজেদেরকে ইতিহাসে অমর করার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ তাদের কিছু বলা না বলায় রাসূলের [সা] কিছু বৃদ্ধি-ঘাটতি হয়নি। তবে তারা এতো যাকে ভালবেসেছেন তার আদর্শকে কেন গ্রহণ করলেন না'।

বার্নার্ড শ ঠিকই বলেছেন যে- মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন যার জন্য ইসলাম কবুল করেননি।

দুই.

বিতর্ক আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের উদ্দেশ্য নবী করীম [সা]-এর আদর্শকে বিজয়ী করা। এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজ নবীজীর ব্যাপারে একটি ভিন্নধর্মী উপলব্ধি ও সে আলোকে আত্ম গঠনের সিদ্ধান্ত, জাতি গঠনের সিদ্ধান্ত এবং সমাজ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বময় রাসূলের [সা] প্রশংসা করে শেখ সাদীর একটি কবিতা

www.pathagar.com

পাঠ করা হয়। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের যেখানেই মিলাদ মাহফিল হয় সেখানেই এ কবিতাটি সুর করে এক সাথে পাঠ করা হয়।

বিখ্যাত কবিতাটি হলো–

"বালাগাল উলা বি কামালিহি
কাশাফাদ্দোজা বি জামালিহি
হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।"

এর বাংলা তরজমা হতে পারে এরূপ :

শিখরে পৌঁছলেন তিনি তাঁর সফলতায়
অন্ধকার করলেন দূর তাঁর আলোকচ্ছটায়
সুন্দর করলেন সব তার চরিত্র প্রভায়
দরূদ তাঁর প্রতি এবং তাঁর আহলের প্রতি।

এ কবিতাটির একটি সুন্দর ইতিহাস আছে।

শেখ সাদী চিন্তা করলেন এমন এক কবিতা লিখবেন যা তাঁকে অমর করে রাখবে।

অত:পর রাসূলের [সা] শানে একটি অনন্য সুন্দর কবিতা লেখা শুরু করলেন তিনি। প্রথম তিনটি লাইন লেখার পর সাদী আর চতুর্থ চরণটি ভাবতে পারছিলেন না। যাই মনে আসে তিনি লিখে দেখেন কিন্তু মন ভরে না। বলা হয় অবশেষে ক্লান্ত সাদী জায়নামাযের উপরই শুয়ে পড়লেন। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে দেখলেন নবীকে। সাদীর এ চারটি লাইন ছড়িয়ে পড়লো দেশ-দেশান্তরে, লোক-লোকান্তরে এবং এক জনপ্রিয় নাতে রাসূলে পরিণত হলো এটি।

এই জনপ্রিয় নাত বা কবিতাটির চারটি চরণে রাসূলের [সা] জীবনের চারটি দিক আলোকপাত করা হয়েছে।

ক. প্রথম চরণে আছে– 'পূর্ণতায় তিনি আরোহণ করলেন সর্বোচ্চ শিখরে'

একবার ভেবে দেখুন বিষয়টি। এক অনাথ ইয়াতিম বালক যে তার বাবাকে হারিয়েছে জন্মের পূর্বে, মাকে হারিয়েছে মাত্র ৬ বছর বয়সে, স্নেহময়ী দাদাকে হারিয়েছে মাত্র ৮ বছর বয়সে, যার আশ্রয়, সহায় বলতে তেমন কেউই ছিলো না। তিনি কী অবলীলাক্রমে শিখরে আরোহণ করলেন। কুরআন তাঁকে এভাবে প্রশ্ন করছে- "আমি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পেয়ে অতঃপর আশ্রয় দেইনি"?

হ্যাঁ, রাসূলকে [সা] ইয়াতিম বালক থেকে লালন পালন করে আল্লাহ সমস্ত ইয়াতিমের অভিভাবক করে দিয়েছেন তাঁকে। এ জন্যই রাসূল [সা] নির্দেশ দিয়েছেন ইয়াতিমের প্রতি সদয় হতে এবং যারা সদয় হবে তাদের সাফল্যের কথা রাসূল [সা] বলেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবীকে আল্লাহ্ তাআলা পাঠিয়েছেন 'পূর্ণতা দানের জন্য'। রাসূল [সা] বলেছেন, সব নবী একটি ঘরের অসংখ্য ইটের মতো যে ঘরের একটি ইট বাকি ছিল। তিনি এসেছেন সে ঘরের পূর্ণতা দানকারী ইট হিসেবে।

আল্লাহর নবী আরো বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি চারিত্রিক দিকের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য।' পৃথিবী সাক্ষী আল্লাহর নবীর চেয়ে পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী কাউকে তার আগে কেউ দেখেনি আর তারপরও কাউকে দেখার নেই।

তিনি আদল, ইনসাফ, হক, জিহাদ ও দাওয়াতসহ মানুষের সকল দিক ও বিভাগের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ওহি নাযিল হলো– "আজ আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করলাম"। অতঃপর বিদায় হজের ভাষণে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত সব মানুষের কাছে প্রশ্ন করলেন- "আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি"? সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।" আকাশের দিকে তাকিয়ে নবী আরাবি বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক, আমার দায়িত্ব পালন করেছি"। একজন মানুষ নানাভাবে পূর্ণতা লাভ করেন। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের নানা অধ্যায়ে নানাভাবে পূর্ণতা আসে। প্রিয় নবী এসব বিবেচনায় পূর্ণতায় শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

খ. দ্বিতীয় চরণে আছে 'তাঁর আলোতে বিদূরিত হলো সব অন্ধকার'

রাসূলের [সা] আগমনের প্রাক্কালে যে অন্ধকার, জাহিলিয়াত, তিমির তমসা পৃথিবীকে গ্রাস করেছিলো তার অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর বিন আবু তালিবের বর্ণনাটি যেন সে অন্ধকারের এক আয়নায় বিম্বিতস্বরূপ। ইতিহাস বলছে- প্রিয়নবী [সা] এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে এসে সে সমস্ত জাহিলিয়াতের পর্দা ছিন্ন করে এক আলোকময় পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিলেন।

আল কুরআনে আল্লাহর নবীর পরিচয় এসেছে এভাবে- "হে নবী, আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর ইচ্ছায় একজন দায়ী হিসেবে। আর পাঠিয়েছি এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে"।

বাংলা কবিতায় গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত নাতে এ কথাটি মূর্ত হয়েছে এভাবে-

"তুমি যে নূরের রবি, তুমি যে ধ্যানের ছবি, তুমি না এলে দুনিয়ায়, আঁধারে ডুবিত সবি"।

আল্লাহর নবী মানব মনের সকল কালোকে দূর করে দাওয়াতের রশ্মিতে সকল হৃদয় আলোকিত করে তুলেছিলেন, তাদের চোখের পর্দা সরিয়ে কুরআনের আলোতে দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। তিনি তথাকথিত চন্দ্র সূর্যের মতো আলোকিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যুজ্জ্বল এক আলোকবর্তিকা যার ছটায় সব 'অন্ধকারের বস্ত্র হরণ' হয়ে আলোর বন্যায় ভেসে গেছে এই পৃথিবী। তিনি একদল আলোকিত মানুষ enlightened

www.pathagar.com

people তৈরি করেছিলেন যারা পৃথিবীর সর্বকালের বিস্ময় পুরুষ ও নারী হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত অতুলনীয় হয়ে থাকবেন।

কোন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-মক্তব কিংবা পাঠশালা নয়, তিনি গড়ে তুলেছিলেন সুফফা আর সেখানে জড়ো হয়েছিল একদল একনিষ্ঠ, নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র- আসহাবে সুফফা। এই স্কুলের ছাত্রগণ কোন ডিগ্রি অর্জন করেননি। কিন্তু আলোকিত জীবনের সন্ধানে মানুষেরা যুগে যুগে তাদের কাছে থেকে জ্যোতি ও দ্যুতি গ্রহণ করবে।

গ. তৃতীয় চরণটি হলো- 'সুন্দর করলেন সব তার চরিত্র প্রভায়'

আল্লাহর নবীর সকল কাজে কুল-আলম হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু, কোন গোত্র, জাতি, গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র জগতের, সৃষ্টি লোকের জন্য রহমতস্বরূপ'। সেজন্য সব সৃষ্টি জগতের তিনি রহমত কেবল মুসলমানের নয়।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-স্থান-কাল-পাত্রসহ সব ধরনের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে রাসূল [সা] এসেছিলেন সকলের প্রতি দয়ার আধার হিসেবে।

অসম্ভব সুন্দর একটি বিষয় চিন্তা করুন–

পৃথিবীতে নবীর যারা চরম বিরোধী ছিল তারাও কিন্তু কেউ কখনও নবীর [সা] ব্যাপারে, তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কথা তোলেনি। বরং তারা সাক্ষী দিয়েছে তাঁর মহত্ত্বের, শ্রেষ্ঠত্বের ও বড়ত্বের। হেরাক্লিয়াসের দরবারে যখন আবু সুফিয়ানকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয় প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে সে রাসূলের [সা] প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে।

একবার ভাবি- কি ছিলেন উমর বিন খাত্তাব, আর কি পরশ পাথরে পরিণত হলেন তিনি নবী করীম [সা] এর উষ্ণ সান্নিধ্যে এসে। এ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এভাবে রাসূলের [সা] সাহাবীদের একজন একজন করে বিবেচনা করলেই ভেসে উঠবে কেমন করে নবী তাদের সকলের জীবন সুন্দর করে তুললেন তাঁর চরিত্রের সুষমা দিয়ে।

চারিত্রিক অধঃপতনের চরম প্রান্তিক অবস্থান ছিলো আরবের মানুষেরা নবী আসার আগে। তাদের ভাষায়– 'আমরা ছিলাম অজ্ঞতায় অন্ধকারে, আমরা নিজের মায়ের হায়েযের রক্ত পান করতাম।'

সেই অধ:পতিত আরবগণ নবীর [সা] ছোঁয়ায় খোদাভীতিসম্পন্ন এক দল চরিত্রবান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো যারা কোন জনপদে গেলে সেই জনপদের মানুষ স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পেতো। মা আয়েশাকে একদল সাহাবী বললেন, আমাদেরক নবীর চরিত্র সম্বন্ধে বলুন। মা আয়েশা তাদের বললেন, "তোমরা কী কুরআন পড়নি? আল কুরআনই হচ্ছে নবীর চরিত্র"। আল কুরআনের সমস্ত আদেশ নিষেধ মূর্ত হয়ে উঠেছিল নবীর জীবনে।

www.pathagar.com

ঘ. চতুর্থ ও শেষ চরণটি হলো- 'দরূদ তাঁর প্রতি এবং তাঁর আহল ও অনুসারীদের প্রতি'

দরূদ একটি বিশেষ দু'আ। কুরআনে বলা হয়েছে হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর [সা] প্রতি দরূদ পড়ছেন সুতরাং তোমরাও তাঁর ও তাঁর আহলের প্রতি সালাম ও দরূদ পড়। নবী করীম [সা] এর নাম উচ্চারিত হলেই তাঁর প্রতি দরূদ পড়া তোমাদের জন্য ওয়াজিব। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে আমরা তাশাহুদ ও দরূদ পড়ে থাকি। এই দরূদে আমরা নবী করীম [সা], তাঁর পূর্ববর্তীগণ ও আহলের জন্য দু'আ করি।

এর যে শাব্দিক অর্থ রয়েছে এর বাইরেও এর ব্যাপকতা আছে।

তিন. শেখ সাদীর এই কবিতাটি বিশ্বময় বহুল পঠিত ও নন্দিত একটি কবিতা

এ কবিতার প্রধান সুর নবীর প্রশংসা ও তাঁর বন্দনা।

পৃথিবীর ১২৫ কোটি মুসলিম, নবীর উম্মাত এই দরূদ পাঠ ও কাব্যস্তূতি অব্যাহত রেখেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন ঘাটতি নেই।

কিন্তু তারপরও বিশ্বময় নবীর আদর্শ বিজয়ী নয়, কুরআন প্রতিষ্ঠিত নয়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিজয়ী নয়, ইসলাম নন্দিত নয় বরং নিন্দিত।

এর প্রধান কারণ মুসলিম উম্মাহর 'lip service' নির্ভর জীবন যাত্রা।

আমরা ইসলামকে, নবীকে, কুরআনকে ভালবাসার কথা শত মুখে শত ভাষায় শতভাবে বলে থাকি কিন্তু সেই আমরা নিজেদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের অনুসরণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। আজ যারা কাব্য, গান, নাটক করে থাকেন তাদের নতুন করে ভাববার দিন।

যারা ইসলাম, নবী, কুরআন, হাদিস আর শেখ সাদীদের নিয়ে গর্ব করেন তাদের নতুন সিদ্ধান্ত নেবার দিন।

সে সিদ্ধান্ত আর কিছুই নয়-

'কথায় কাজে মিল দাও আমায় রাব্বুল আলামীন
আল জিহাদ ফি সাবীলিল্লায় রাখো বিরামহীন।'

আর অপেক্ষায় বসে না থেকে আসুন 'নিজে শুরু করি'। রাসূলের [সা] আদর্শের আলোকে নিজের জীবন গড়ি।

রাসূল প্রেমের আবেগে রচিত অমর কবিতার ভাবনায় তাড়িত হই আমরা সকলে।■

www.pathagar.com

যে আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে

জাফর তালুকদার

গল্প নয়, অতি পুরনো একটি ঘটনা। কিন্তু এর সারটুকু কখনই পুরনো হবার নয়।

নবীজী হিজরতের জন্যে হযরত আবু বকরকে [রা] সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়েছেন। এই ঘটনা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল মক্কায়। জালিম গোত্র-প্রধানের কঠিন হৃদয় জ্বলে উঠল মহা-ক্রোধে, 'ওরে কে কোথায় আছিস তোরা। যেখানে পাবি পাকড়াও করে নিয়ে আয় মুহাম্মাদকে। এর বিনিময়ে উটই দেব না কেবল, অর্থকড়ি ঢেলে ধনী বানিয়ে দেব তোদের।"

লোকগুলো ছিল গরিবের হদ্দ। টাকার লোভে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল সবাই। কোথায় মুহাম্মাদ লুকিয়ে আছে আঁতিপাতি করে খুঁজেও কোনো দিক-নিশানা করতে পারল না।

এদিকে নবীজী আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে হেরা পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন।

এমন সময় শত্রু দলও পৌঁছে গেল সেখানে। বিধাতার কী অপার রহস্য– সেই গুহামুখে রাতারাতি বাসা বাঁধল মাকড়সা আর পায়রা। কে বলবে মানুষ আছে ভেতরে!

www.pathagar.com

লোকগুলো এই দেখে দিকভ্রান্ত হল। কোথায় ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে গেল মানুষটা! এখন তাহলে কি করবে ওরা? এখানে তো কেউ নেই। মনে হচ্ছে।

'বেশ তো চল অন্যদিকে খুঁজে দেখি।' একজন শত্রু বলল ঝাঁঝাল কণ্ঠে।

গুহার ভেতর নবীজী আর আবু বকর শত্রুর কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে আল্লাহর প্রিয় নবী মানসিকভাবে অবিচল থাকলেও হযরত আবু বকর কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, 'প্রিয় নবী' এখন কী করা যায় বলেন তো। আমরা মোটে দু'জন মানুষ। ওদের সঙ্গে পারব কী করে!'

নবীজী ধীর কণ্ঠে বললেন, 'কে বলল এ কথা! আমরা নিশ্চয় তিনজন। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। তবে ওদের সঙ্গেও অবশ্য আছেন তিনি। কেননা আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।'

হযরত আবু বকর রচিত কবিতায় এই আশ্বাস বাণী প্রতিফলিত হয়েছে চমৎকারভাবে :

গুহার আঁধারে আমরা তখন
আমি শংকিত হইনি;
নবীজী আমাকে দিলেন আশ্বাস,
বললেন : ভয় নেই কিছুরই,
আল্লাহ্ আমাদের তৃতীয়জন।
আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি
ঘোষণা দিলেন আমাকে, সকলকে–
তিনিই তো সাফল্যের জামিনদার।

পরদিন ভোরে নবীজী বেরিয়ে এলেন গুহা ছেড়ে। তাঁরা ইয়াতরিবের পথে যাত্রা শুরু করলেন। শহরে এসে পৌঁছলে সমস্ত নগরবাসী গুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে।

নবীজী উঠের পিঠে চড়ে শহরে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগমনে উল্লসিত জনগণ হর্ষধ্বনি দিয়ে সংবর্ধনা জানালেন। কেউ কেউ তালের পাতার ছাতা তুলে ধরলেন মাথার ওপর।

একজন যুবক বর্শা ফলার সঙ্গে তার পাগড়ি বেঁধে চলছিলেন নবীজীর সামনে সামনে। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম পতাকা। নবীজী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মহিলা-পুরুষ-শিশু সবাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'খোশ আমদেদ প্রিয় নবী। আপনি দয়া করে এখানে থাকুন। আমরা সবরকম সেবাযত্ন করব আপনার। শুধু আমাদের মাঝে থাকুন।'

মানুষের ভালবাসায় সিক্ত নবীজী অভিভূত হলেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তবে আমি কোথায় থাকব সেটা উটই নির্ধারণ করুক।'

www.pathagar.com

অবশেষে আবু আইউবের বাড়ির কাছে গিয়ে উট থামল এবং নবীজী সেখানেই আশ্রয় নিলেন।

এরপর থেকে ইয়াতরিবের নাম বদলে রাখা হল মদিনাতুন্নবী অথবা নবীর শহর। বর্তমানে শহরটি মদিনা নামে পরিচিত।

নবীজী তাঁর পরবর্তী জীবন এখানে কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং মদিনা আলো করে পবিত্র মাটিতে সমহিত হন আল্লাহর প্রিয় রাসূল।

মদিনার লোকজন আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী হিসেবে পরিচিত। কেননা নবীজী দুর্দিনে তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মক্কা থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে হিজরত করেন তাদের বলা হত মুহাজির। এদের অবদান কম নয়।

মুসলমানদের ইতিহাসে হিজরত একটি বড় ঘটনা। এরপর থেকে দ্রুত ইসলামের বিস্তার ঘটে এবং শান্তির আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।■

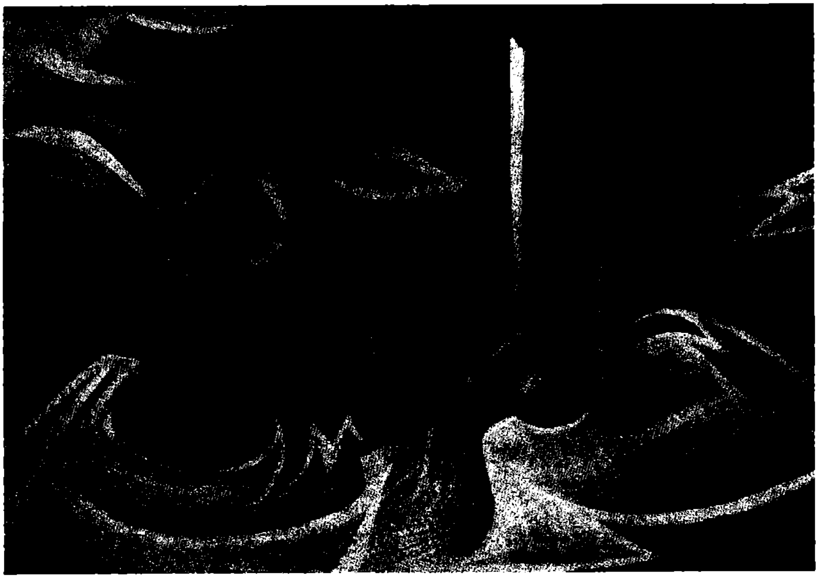

www.pathagar.com

সুবাতাস : প্রজাপতি ও মৌমাছি

মাহবুবুল হক

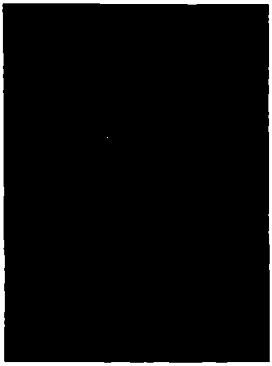

এক.

এই শুনেছিস মুহাম্মাদ আসছে। আরে আগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল। হাঁ, হাঁ ঠিক বলেছিস। মাত্র তো শুনলাম। মুখস্থ হতে সময় লাগবে। আমি তো আবার তোর মতো ব্রিলিয়ান্ট না।

খোঁচা দিস্ কেন? ওস্তাদজী না সেদিন বলেছেন কাউকে মুসলমানরা কাউকে খোঁচা দিয়ে কথা বলে না। কাউকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

উসামা, জাবেরকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই তো দেখছি ভালো মুসলমান হয়ে গেছিস। তোকেই আমাদের নেতা বানাতে হবে।

জাবের উসামার কপালে চুমো খেয়ে বলে, আবারত তুই খোঁচা দিলি?

উসামা : নারে না, তোকে আমরা সবাই ভালোবাসি। কেনো ভালোবাসি জানিস? তুই ভালো জিনিসকে সহজে গ্রহণ করতে পারিস। আবার মন্দ জিনিসকে সহজে বর্জনও করতে পারিস। আমরা তোর মতো অতো সহজে সবকিছু গ্রহণ-বর্জন করতে পারি না।

জাবের উসামার বুকে মুখ লুকায়। তোরা দেখছি আমাকে ভালো করেই ছাড়বি। তোদের কারণেই আমাকে ভালো মানুষ হতেই হবে।

www.pathagar.com

উসামা জাবেরকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে। দু'বন্ধুর চোখে বালুচরের মতো রূপালি রেখা চিকচিক করে ওঠে।

পাশ থেকে উসামা খলখলিয়ে উঠে। বাহ্ খুব আলিঙ্গন করা হচ্ছে। খুশির খবরটি কি ভাইরা?

উসামা : তুমি মেয়ে মানুষ। সব কথা তোমার জানতে নেই!

উমামা : তাই নাকি? তুমি আবার করে পুরুষ মানুষ হলে?

উসামা : পুরুষ মানেই তো মানুষ। তাকে আবার নতুন করে মানুষ হতে হয় নাকি?

উমামা : মেয়েরা তো মানুষ। তাকেও কি আবার মানুষ হতে হয়?

জাবের : আচ্ছা বুবু, আমরা যদি এখন বলি পাহাড়ের কোলঘেষে এজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। তাহলে কি তুমি চট করে বুঝবে একজন মেয়ে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বুঝবে না। আমরা সবাই বুঝবো একজন পুরুষ মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। মানুষ বলতে প্রথমে পুরুষ মানুষই বুঝা যায়।

উমামা দু'জনের মাথায় টোকা দিয়ে বলে, তোরা তো দেখছি খুব বুঝদার হয়ে গেছিস। নারী জাতির বিরুদ্ধে এখনই নানা মতামত তৈরী করে ফেলেছিস। তোদেরকে এখন বিয়ে দিতে হবে।

তোমারী এখনও বিয়ে হয়নি, আমাদের আবার বিয়ে। কথাটা বলেই উসামা-উমামাকে লক্ষ্য করে বলে, পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। দফ নিয়ে বসো। তোমার গলাটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়াসাল্লামের সামনে ফ্যাস ফ্যাসে গলায় গান গাইবে কি করে? তোমার মতো মেয়েরা দিনরাত রিহার্সেল দিচ্ছে। আর তুমি কিনা অযথা সময় নষ্ট করছো।

: হায়রে আমার মুরুব্বী! বলেই উসামার গাল টেনে উমামা পানির পাত্র কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির পথে এগিয়ে যায়।

উসামা ও জাবের বোনের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

উসামা আফসোসের সুরে বলে, বোনটার জন্য এখনও দুলাভাই জুটলো না। বিভিন্ন দল আসে আর যায়। আব্বা-আম্মা এই নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

জাবের বলে, সবাই বলাবলি করছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়াসাল্লাম আসার পর এখানে নিরন্তরভাবে আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। যার পর দু:খ আছে– দু:খ ঘুচে যাবে। যাবে। স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাগুলো উজ্জীবিত হবে।

উসামা : ঠিকই বলেছিস। খেয়াল করেছিস কিনা ক'দিন ধরে আবহাওয়াটা খুব সুন্দর লাগছে। মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ও পড়ছে। একটা মৃদুমন্দ বাতাস। আমাদের এই ইয়াসরিবের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাগানে গিয়েছিস? খেজুরের গাছগুলো দেখেছিস? কেমন খেজুরে ভর্তি হয়ে গেছে। খেজুরের ভারে গাছগুলো যেনো নুয়ে পড়ছে। বাগানে বাগানে এতো মৌমাছি আর প্রজাপতি কে কখন দেখেছে! ঐ দেখ এই অসময়ে আকাশে মেঘ ধরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বৃষ্টি পড়বে। আমাদের রুক্ষ

www.pathagar.com

জগতটা সুচিস্নিগ্ধ হবে। একটা নরম-পেলব মাখনের মতো হয়ে উঠবে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিটা।

জাবের : তোরা তো মুসলিম পাড়ায় থাকিস। সেখানে তো মুহাম্মাদকে [সা] ঘিরে একটা উৎসাহের বন্যা বইছেই। আমাদের পাড়াটাতো মিক্সড পাড়া। এখানেও তো উৎসাহের কমতি নেই। আমাদের পাড়ায় এখনও প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ ইহুদী। কিছু খৃস্টানও রয়েছে। আমরাও তো মুসলিম হয়েছি মাত্র কিছুদিন আগে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ মুসলিম হচ্ছে। মুহাম্মাদ [সা] আসছেন শুনে মুসলিম হওয়ার সংখ্যাও বেশ বেড়েছে। যাদের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিলো, তারা তা ঝেড়ে-মুছে সত্যের পথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে। আমাদের পাড়ায় এখন অনেকেই বলাবলি করছে, রাসূলই [সা] সত্য এবং শেষ নবী। ইহূদীদের কাজ হলো শেষ নবীর পথ অনুসরণ করা। বৃদ্ধদের মধ্যে কিছুটা আড়ষ্টতা থাকলেও কিশোর এবং যুবক যুবতীর মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নেই।

উসামা : জাবের, তোদের পাড়ায় আমার বোনটার জন্য একটা বর দেখ না। বোনটা কি আমার দেখতে খারাপ বল?

জাবের : একটু অপেক্ষা কর। আমাদের এলাকায়ও তো একটা সুবাতাস বইছে। বংশ, অর্থ, যুদ্ধ এ সবের অহংকার বোধ হয় আর বেশি দিন থাকবে না। যারা আপা মনিকে দেখে গিয়েছিলো দেখবি তাদের মধ্যে কেউ না কেউ ফিরে আসবে। নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে।

দুই.

ঘরে ফিরতেই প্রবল বেগে বৃষ্টি নামে। পাহাড়ের ঢালুতে উসামাদের বাড়ি। বৃষ্টি মানেই এখানে ঢল। পাহাড়ের সব পানি উসামাদের বাড়ির উপর দিয়ে যায়। প্লাবনের সৃষ্টি হয়। উমামাও উমামার মা আসেমা ভেড়া, ছাগল, দুম্বা ও উট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোথায় এখন এদেরকে রাখবে? এদিকে বৃষ্টির পানিও রাখা দরকার। সোম ও মেয়েটা প্রতিদিন অনেক দূরের কূয়া থেকে পানি আনে। কখন যে কী হয়। বিয়ের ব্যাপারটাও ঝুলে আছে। হয় হয় করেও হচ্ছে না। সবাই খালি বলে আমাদের এটা নেই, ওটা নেই। ওদের বাবাতো মরে গিয়ে বেঁচেই গেছে। আহ! বেচারা যদি আজ থাকতো। মুসলমান হয়ে যদি মরতে পারতো। এদিকে উসামাটা যে কী? বন্ধু পেলেই সব কিছু ভুলে যায়! মা ও উমামার কষ্ট একদম সে মনে রাখে না। দেখছে তো বৃষ্টি হচ্ছে।

বৃষ্টি একটু কমতেই দমকা হাওয়া শুরু হয়। এর মাঝেই এক রকম দৌড়াতে দৌড়াতে উসামা প্রবেশ করে। লজ্জাজনিত কণ্ঠে বলে :

মা কী করতে হবে বল্, ভিজে গেলাম।

: কিচ্ছু করতে হবে না তোকে! যা তুই বন্ধুদের সাথে আড্ডা মার।

— ক্ষোভের সাথে কথাগুলো বলেন আসেমা।

: না, মা, তুমি রাগ করো না, আমরা মুহাম্মাদকে [সা] নিয়েই আলাপ করছিলাম। আমাদের যে কী খুশী লাগছে মা...।

www.pathagar.com

: তা তো বুঝলাম, আমরাও কী কম খুশী। উটটা যদি আমাদের দোর গোড়ায় এসে বসে পড়ে? তখন কী করবি?

: এটা তো মহাখুশীর মহা আনন্দের খবর মা, তুমি বিচলিত হচ্ছো কেন?

: আহ! এমন যদি হতো, বলেই উমামা মায়ের গালে চুমু দেয়। উসামাও গভীর আবেগে মাকে জড়িয়ে ধরে।

: এই তোরা খাবি না? কতটা বেলা হয়ে গেলো।

: না মা খাবো না, খেজুর খেয়েছি। বড় বড় টসটসে খেজুর। এখন আমি রাসূলের শানে কবিতা লিখবো। কাল যে আমাদের কবিতা প্রতিযোগিতা!

: পাগল ছেলে আমার, বলেই উসামার কপালে আলতো করে চুমু খান আসেমা।

তিন.

রাসূলের উট ঘুরে-ফিরে আবু আইউব আনসারীর বাড়ির সামনে থামে। অভ্যর্থনার আয়োজন ছিলই। অভ্যর্থনা শেষওহয়। উমামা গুন গুন করতে করতে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। মনটা এখন তার হালকা, ফুরফুরে। ভীড় ঠেলে একটা প্রশান্ত মন নিয়ে সে ধীরে ধীরে আগায়। সইরা সব আগলে ধরে। পরিবেশটা মুহূর্তে আবার কলকলিয়ে ওঠে। তোর গান না আজ খুব ভাল হয়েছে। আরো কিছুক্ষণ আমাদের সাথে থাক্ না সই। ক'দিন পর তো তুই শ্বশুর বাড়ি চলে যাবি। তোর সাথে তো আমাদের আর এভাবে দেখা হবে না। থাক না সই কিছুক্ষণ!

: শ্বশুর বাড়ি যাবো, কে বললো তোদের? কায়েসরা তো আর আসেনি, খোঁজ-খবরও নেয়নি। ওরা হয়তো আমাদেরকে পছন্দ করেনি, আমরা গরীব কীনা! তাছাড়া আমরা যৌতুক দেবো কোত্থেকে?

: এখন আর ওসবের বালাই থাকবে না। আশরাফ-আতরাফ এখন সব একাকার হয়ে যাবে। মানুষে মানুষে আর কোন ভেদাভেদ থাকবে না। এ সবইতো আজ আলাপ হলো, শুনলাম।

: কায়েসরা তো এসব শোনেনি। তারা তো আর এ মজলিসে আসেনি।

: তুই পাগল হয়েছিস। এ মজলিসে আসেনি, বা প্রতিনিধি পাঠায়নি, এমন কবিলা এ তল্লাটে আছে? ক্ষীণকায় সায়েরা কথাগুলো জোরে-শোরে বলে ফেলে।

হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল কায়েস ও ছিদ্দিক এসে হাজির। সইরা ভয়ে যে যার মত ছিটকে পড়ে। উমামা ভয় পেলেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে : আপনারা রাস্তা ছাড়ুন, আমি বাড়ি যাবো।

: তুমি যাও, কেউ আর তোমার পথ আগলাবে না। তুমি প্রস্তুতি নাও, আমরা আর দেরী করবো না।

উমামা মুখ তুলতেই কায়েসের সাথে চোখাচোখি হয়, যে চোখে ক্ষমার আর্তি, দহনের আর্তি, ভালবাসার আর্তি। ■

www.pathagar.com

হে রাসূল [সা] ॥ সু জা উ দ্দি ন কা য় সা র

আমি অনুভবে জ্যোতিস্পন্দন বুঝি, নিগূঢ় মহিমা টের পাই
একান্ত বিহ্নে আলোকিত বিকাশে অন্তর গহিনে
আমার সত্তার মৌন ধ্যানে
স্পষ্ট ফোটে নূরানী জীবনের বিভাবরী–
যা অমলিন হে রাসূল [সা]
তুমি ফুলে ও ফসলে সূর্য ও চাঁদে
অলৌকিক গতি বিস্তার :

হে মহামানব জ্যোতিষ্মান, হে চিরমহিয়ান নূরানী নূর
আপ্লুত আমার এ-হৃদয় প্রতিক্ষণ
উৎকীর্ণ হই সত্য পথে–
অপার এ-দুনিয়ায় অসীম এ-সৃষ্টির প্রপূর্ণতায়
আমি দীনহীন গুনাগার
আমি সুন্দরের বিভাসে মগ্ন হই
তোমার হিরন্ময় দীপ্তির
শাণিত দেদীপ্যমান প্রভা বিন্দুসম প্রাণে মেখে :

আমি ধারণ করি অদৃশ্য শিহরণ
আমার নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে তোমাকে স্মরি :
আমার অস্তিত্বমুখর শব্দরাজি শুধু ঝরে পরমাবেগে
মুহাম্মাদ-মুহাম্মাদ বলে :

আলোর পরশ ॥ আ নো য়া রু ল ই স লা ম

আলোর পরশ এলো আঁধারের বুকে
শান্তির সুধা ঝরে ব্যথিতের দুখে।
ঝিরিঝিরি তটিনীর উল্লসিত ঢেউ
কার আগমনী গায় জানে না তা কেউ।
ফুল ফোটে অলি জোটে কার অনুরাগে
কোন্ মধু নামে হৃদে ভালোবাসা জাগে!

www.pathagar.com

বিশ্বনিখিল যাঁর আসার আশায়
বিধাতার দরবারে ছিলো সেজদায়।
যিনি না সৃষ্টি হলে হতো না এ ধরা
হতো না যে নীলাকাশ তারকায় ভরা।
তিনি যে বিশ্বনবী প্রেমের আঁধার
এসেছেন তিনি আজ দুনিয়া মাঝার।
এসো পড়ি তাঁর নামে দরুদ হাজার
সত্য ন্যায়ের পথে যে তিনিই রাহবার।

মুহাম্মাদ [সা] ॥ সা মু য়ে ল ম ল্লি ক

আমি রাসূল [সা] বলতে বুঝি ধৈর্য পাথর, সূর্য রেণু, সমুদ্র সাহস
এক সীমাহীন পাললিক দৃঢ়তা
আমি মুহাম্মাদ [সা] বলতে বুঝি ভালোবাসা, নিখাদ প্রেম, চাদর নিভাঁজ
এক ক্লান্তিশোধক বাতাস বহতা

আমি মুহাম্মাদ [সা] বলতে বুঝি আকাশ শান্তি, স্ফটিক বৃষ্টি
সবুজ প্রকৃতি, সোনালী রৌদ্র নৃত্য
আমি বুঝি স্নেহের চুম, কোমল পরশ, হৃদয় আদর
স্নিগ্ধ-শান্ত জাফলঙ চিত্ত

আমি মুহাম্মাদ [সা] বলতে বুঝি আদর্শ নেতা, রাষ্ট্র-সমর নায়ক
দুর্নীতিহীন সুশৃঙ্খল রাজনীতি
আমি মুহাম্মাদ [সা] বলতে বুঝি কলকল ধ্বনিময় তরঙ্গিত শব্দাবলী
ছন্দের দোলাচল– কবিতা, গীতি

আমি মুহাম্মাদ [সা] বলতে বুঝি কর্ণফুলীর বিশুদ্ধ নির্জনতা
মাধবকুণ্ডের মনোলোভা নৈসর্গিক দৃশ্য
আমি মুহাম্মাদ [সা] বলতে বুঝি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
প্রাকৃতির শুদ্ধ শস্য।

www.pathagar.com

নবীজীর শানে ॥ মা ন সু র মু জা ম্মি ল

পৃথিবীর
সেরা লোক পৃথিবীর সেরা
এই পৃথিবীটা তার আলো দিয়ে ঘেরা।

ছোটকাল
থেকে তিনি কথা কাজে সৎ
সকলেই জানে তাঁকে অতীব মহৎ।

শান্তির
লোক তিনি শান্তির দূত
তাঁর কাজে ছিলোনা তো একটুও খুঁত।

ভালো কাজে
সারাদিন ছিলো তাঁর চিত্ত
অভাবটা তাঁর ঘরে ঢুকে যেত নিত্য।

আমাদের
মহানবী হাসিখুশি লোক
নবীজীর শানে কাঁপে দ্যুলোক-ভূলোক।

www.pathagar.com

সোনার পেণ্ডুলাম ॥ রফিকুল ইসলাম ফারুকী

শতাব্দী সময় গলে যায় বরফের মতো
ঈসার ইঞ্জিল বিবর্ণ হয় নষ্ট ব্রাজকদের মেধায়
দু:স্বপ্নের গোলক ধাঁধাঁয়
মানবিক সৌন্দর্য চুপসে যায় রুদ্র কাপালিকের হাতে
ধ্বংসের অশনি সংকেত বাজতে বাজতে মহাধ্বংস
মূর্খতার আজদহা গিলে খায় মেধার জোসনা
গিলে খায় মানুষের সুখ-শান্তি, ঈমানের দীপ্তিময় শিখা।

আবদুল মুত্তালিব তখন নিরুপায়
তাঁর বুক ফাটা আকুতি ছড়িয়ে পড়ে আকাশের অধিপতি বরাবর
"এমন ভয়ালো সময় পীঠে কতক্ষণ থাকা যায় সওয়ার হয়ে প্রভু,
কন্যা হন্তারক এই সমাজের আমূল বদলে দাও তুমি"।
তারপর.....
তারপর সময়ের পীঠে সওয়ার হয়ে ফিরে এলো
ইতিহাসের সেই শ্রেষ্ঠ রজনী
বারো তারিখের রজনী।
এক অলৌকিক স্বপ্নে বিভোর হলেন আবদুল মুত্তালিব
তিনি দেখলেন;
পবিত্র কাবাঘর মাকামে ইবরাহিমের দিকে ঝুঁকে
সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে সবুজ ভালোবাসায়
আর তার পাশেই ভুবন আলোকারী
একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সোনার পেণ্ডুলামের মত দুলছে।

www.pathagar.com

দাওনা একটু সাড়া ॥ না র্গি স চ ম ন

তোমার নামটি স্মরণ করে
ঐতো পুবের হাওয়া,
সবুজ ঘাসে শিশির হাসে
তাইতো এ গান গাওয়া।

ফুলেরা সব দুলে দুলে
তোমার কথা বলে,
মেঘের বুকে কালো ছায়া
চোখ যে ভাসে জলে।

তোমার নামে গন্ধে পাগল
রাতের হাসনা হেনা
সেই সুবাসের গন্ধ দিয়ে
যায় যে তোমায় চেনা।

তোমার নামে ঝরনা ধারা
খিল খিলিয়ে হাসে,
ঝিলের জলে নীলপদ্ম
প্রতিক হয়ে ভাসে।

তোমার নামে রাতের তারা
দেয় যে ভরে আলো,
মনের মাঝে জমাট আঁধার
সরিয়ে দাও কালো।

রাসূল তোমার প্রেমে পাগল
আমি যে পথহারা,
সকল সময় ডাকি তোমায়
দাওনা একটু সাড়া।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর [সা] একটি পত্র ও মু'জিযা

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

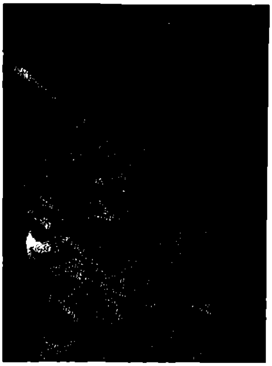

হিজরি ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ [সা] আরবের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ দূত পাঠান। দিহইয়া ইবন খলীফা আল-কালবীকে রোমান সম্রাট হিরাকল, আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আসসাহমীকে পারস্যের কিসরা, উমার ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে হাবশার নাজ্জাশী, হাতিব ইবন আবী বালতা'আ আল লাখমীকে মিসরে রোমান সম্রাট হিরাকলের প্রতিনিধি শাসক মুকাওকাস, সুলায়ত ইবন আমর আল-আমিরীকে ইয়ামামার শাসক হাওয়া ইবন আলী আল-হানাফী, শুজা ইবন ওয়াহাবকে আল-হারিছ ইবন আবী শিমার আল-গাসসানী, আলা'-ইবন আল-হাদরামীকে বাহরায়নের শাসক আল মুনযির ইবন সাওয়া এবং আমর ইবন আল আসকে আল জানাদীর দুই পুত্র জায়ফার ও আব্বাসের নিকট পাঠান। [তারিখ আত তাবারী ৩/৮৪-৮৫; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-২/১৫৮-১৫৯]

রাসূলুল্লাহ [সা] যে সকল রাজা-বাদশা ও আমীর উমারার নিকট পত্র পাঠান তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। তারা যদি রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে ইসলাম তাদের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু আরব উপদ্বীপের বাইরে একমাত্র হাবশার নাজ্জাশী ছাড়া কোন রাজা-বাদশা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ কথা জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ [সা] প্রেরিত দূতের সাথে ভালো আচরণ করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে পত্র গ্রহণ করেন। উত্তর দানেও তারা শিষ্টাচারের পরিচয় দেন। আবার অনেকের আচরণ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কেবল পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট লিখিত পত্রটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে।

পারস্য সম্রাট কিসরা আবরুভেজের নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহর [সা] পত্র নিম্নরূপ :

'এ পত্র মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্যের মহান সম্রাট কিসরার প্রতি। যারা সত্য-কঠিন পথের অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি আপনাকে মহান আল্লাহর আহ্বানের দ্বারাই আহ্বান জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি গোটা মানব জাতির প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। যাতে, যারা জীবিত আছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহর বাণী সত্যে পরিণত হয়। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপদে থাকুন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে এই মাজুসিদের [অগ্নি উপাসক] সকল পাপ আপনার ওপর বর্তাবে।'

পারস্য সম্রাট কিসরা আবরুভেজ বংশীয় উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর পবিত্র সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেন। স্বভাবতই তিনি ও তার জনগণ আরবদের অনুগত ও অধীন হওয়া মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া সম্রাট ও সাম্রাজ্য ছিল পারস্যের জনগণের নিকট অতি পবিত্র, তাই ব্যক্তি সম্রাটও ক্ষমতার জন্য আরবদের এই দীনকে ভীতি ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা ছিল অতি স্বাভাবিক। তা ছাড়া পারসিকরা আরবের এ দু'টি অঞ্চল হিজায থেকে কোন অংশে কম ছিল বলে মনে করতো না।

এসব কারণে রাসূলুল্লাহর [সা] পত্র পেয়ে কিসরা প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দূতের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন। সাথে সাথে তিনি ইয়ামনে তার প্রতিনিধি শাসক বাযানকে লিখলেন, 'তুমি হিজাযের এই ব্যক্তির [মুহাম্মাদ] নিকট দু'জন এমন সাহসী লোক পাঠাও যারা তাকে পাকড়াও করে আনতে পারে।' কিসরার এ পত্রের প্রেক্ষিতে 'বাযান' রাসূলুল্লাহর নিকট একটি পত্রসহ দু'জন দূত পাঠান। পত্রে তিনি বাহকদ্বয়ের সাথে রাসূলুল্লাহকে [সা] তাঁর নিকট উপস্থিত হবার নির্দেশ দেন। পত্রসহ বাহকদ্বয় তায়িফে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা মক্কার কুরায়শ বংশের কিছু লোকের দেখা পায় এবং তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ [সা] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে অবগত হন যে, তিনি মদিনায়। কুরায়শ ব্যক্তিবর্গ লোক দু'টির পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে দারুণ উৎফুল্ল হয়। তাদের একজন আনন্দের আতিশয্যে এমনও বলে : তোমাদের জন্য সুসংবাদ! এবার শাহেনশাহ ইরান কিসরা তাকে দেখে নেবেন। লোকটির জন্য তিনিই উপযুক্ত।

www.pathagar.com

লোক দু'টি মদিনার পথে রওনা হলো এবং এক সময় রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললো : কিসরা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। রাসূল [সা] তাদেরকে মদিনায় আগামীকাল আবার দেখা করতে বললেন। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট আসমান থেকে এই খবর এসে গেল 'আল্লাহ কিসরা আবরুভেজের ওপর তার পুত্র শীরাওয়ায়হিকে ক্ষমতাবান করেছেন। সে তার পিতাকে হত্যা করেছে।' পরের দিন লোক দু'টি রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট এলে তিনি তাদেরকে এ সংবাদটি জানালেন। তারা বললো : আমরা কি আপনার পক্ষ থেকে এ সংবাদ আমাদের রাজাকে জানাবো? বললেন; 'হ্যাঁ তোমরা আমার পক্ষ থেকে তাঁকে এ সংবাদ অবহিত কর। তাঁকে এ কথাও বল যে, আমার এ দীন, আমার এ রাষ্ট্র কিসরার সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাকে আরো বলবে, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে যেসব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী আপনার শাসনাধীনে আছে তা সবই ঠিক থাকবে।

লোক দু'টি ইয়ামনে ফিরে গেল এবং বাযানের নিকট রাসূলুল্লাহর [সা] সব কথা খুলে বললো। বাযান সব কথা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম! এ কোন রাজা-বাদশার কথা নয়। তিনি যেমন বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি একজন নবী। আমরা তাঁর কথার সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্য অপেক্ষা করবো। যদি সত্য হয় তাহলে তিনি অবশ্যই একজন নবী। আর সত্য প্রমাণিত না হলে পরবর্তীতে তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। এ কথা বলার অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর হাতে 'শিরাওয়ায়হি' এর একখানা পত্র এসে পৌঁছে : 'অত:পর এই যে, আমি কিসরাকে [আবরুভেজ] হত্যা করেছি। আমার এ পত্র আপনার নিকট পৌঁছার পর আপনি ও আপনার নিকট যারা আছে, আমার আনুগত্য মেনে নেবেন। আর ইতিপূর্বে কিসরা যে ব্যক্তির ব্যাপারে [রাসূলুল্লাহ সা.] আপনাকে লিখেছিলেন, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত তাকে কোন রকম বিরক্ত করবেন না।' শীরাওয়ায়হির এ পত্র পাঠ শেষে বাযান বলে ওঠেন : নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল, অত:পর তিনি এবং তার সাথে ইয়ামনের মাটিতে পারস্যের যত লোক ছিলেন সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তা ছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি অল্পকালের মধ্যে ইসলামী খিলাফতের অধীনে আসে। [তারিখ আত-তাবারী ৩/৯০, ইবন কাছির, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-২/১৫৮-১৬১]■

www.pathagar.com

শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবীর [সা] ভূমিকা

মোঃ আতিকুর রহমান

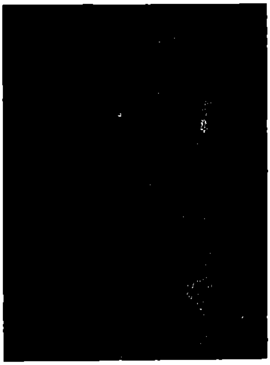

নিরক্ষরতা বা মূর্খতা একটি জাতির জন্য বিরাট অভিশাপ। নিরক্ষরতা জাতিকে সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অক্ষর জ্ঞান না থাকলে ব্যক্তি তার কর্মপন্থা ও মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের প্রণালী ও নিয়মনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয় না। আর এ কারণেই বর্তমানে আমাদের দেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মহানবীর [সা] এ ধরায় আগমন ঘটেছিলো বিশ্ব-মানবতার শান্তি ও কল্যাণের বাহক হিসেবে বিশ্ববাসীর উন্নতি ও অগ্রগতির সকল পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য। আর এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি নিজেকে একজন সফল নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মানবীয় সফলতার সকল ক্ষেত্রে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দানের মাধ্যমে তিনি গোটা উম্মতকে একটি ফলপ্রসূ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়ে গেছেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই মহানবী [সা] শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সাথে সাথে আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণেও জাতিকে যথার্থ

www.pathagar.com

দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবীর [সা] ভূমিকা ও বহুবিধ অবদানের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

মহানবী [সা] নিজে ছিলেন উম্মি বা নিরক্ষর। মনে রাখা দরকার যে, উম্মি আর মূর্খ কখনো এক কথা নয়। উম্মি বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেননি। মূলত এটিও মহান আল্লাহ্ তাআলার হিকমত যে, তিনি মহানবীকে [সা] উম্মি বা নিরক্ষর হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যাতে পবিত্র কুরআন তার রচিত বলে কেউ সন্দেহ পোষণ করতে না পারে এবং দুনিয়ার কোন মানুষ যাতে তাঁর উস্তাদ হয়ে তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে না পারে। তাই বলা যায়, দুনিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে লেখাপড়া করেননি বলে তিনি উম্মি হলেও স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছিলেন তার সরাসরি শিক্ষক। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তাআলার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সফল ছাত্র। আল্লাহপাকের দেয়া সে শিক্ষার আলোকেই মহানবী [সা] শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন, "হে নবী! আমি আপনাকে এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা আপনি জানতেন না এবং আপনার পূর্ব-পুরুষরাও জানতো না।" [সূরা আন'আম-৯২] প্রিয়নবী [সা] নিজেই এরশাদ করেন– "আমি বিশ্ববাসীর শিক্ষকরূপে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি।"

শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে মহানবীর [সা] অসাধারণ ভূমিকায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শুধু তার অনুসারী ভক্তবৃন্দের মুখ নি:সৃত বক্তব্য থেকেই নয় বরং ইসলামের ঘোর বিরোধী এবং ইসলামের প্রতিপক্ষদের সারিতে অবস্থানকারী অনেক নিরপেক্ষ গবেষকদের স্বীকারোক্তিতেও এর প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে টমাস কারলাইলের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। টমাস কারলাইল বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ। কোন শিক্ষকের সামনে তিনি বসেননি কোনদিন, প্রচলিত পন্থায় তিনি কোন আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করেননি, অথচ তারই মুখ নি:সৃত প্রতিটি বাক্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসাধারণ ও বৈচিত্র্যময় উপকরণ। প্রয়োজন ছাড়া তিনি কোন কথাই বলতেন না এবং তখন তিনি নীরব থাকতেন। যখন কোন কথা বলতেন তখন তা হতো বুদ্ধিদীপ্ত ও বিচক্ষণতা সমৃদ্ধ।" [Life of the holy Prophet]

শিক্ষার প্রতি মহানবীর [সা] অনুরাগ ও তা বিস্তারে তিনি কতটুকু আগ্রহী ছিলেন, বদর যুদ্ধ পরবর্তী একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বদর যুদ্ধে যেসব কাফির সৈন্য মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হয় তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলো যারা লেখাপড়া জানতো, নবী করীম [সা] তাদের মুক্তিপণ স্থির করলেন– দশটি ছেলেকে অক্ষর জ্ঞান দান করা। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলিম সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লেখাপড়া শেখাবে। এরপর তারা মুক্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এখানে লক্ষণীয় যে, মহানবী [সা] মুক্তিপণ হিসেবে মোটা অংকের অর্থ-সম্পদ বা অন্য কিছুও নির্ধারণ করতে পারতেন। বিশেষ করে মুসলমানদের আর্থিক সঙ্কটের সে মুহূর্তে এমনটা করাই ছিলো স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুসলিম জাতির মহান শিক্ষক বিশ্ববাসীর মুক্তির মহান বার্তাবাহক প্রিয়নবী [সা] অর্থের লোভ করেননি। শিক্ষাকে তিনি অর্থের ওপর প্রাধান্য দিলেন। এমনকি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি কট্টর ইসলাম বিদ্বেষীদেরকেও শিক্ষকের মহান মর্যাদা দানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না। বরং জীবনের সর্বপ্রথম সুযোগেই তিনি শত্রুদের দ্বারা মদিনার প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সকলকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। মূলত শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে নবী করীমের [সা] এ অসাধারণ ভূমিকার ফলেই তৎকালীন আরবের চরম মূর্খ ও বর্বর জাতিকে তিনি বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা মানে হচ্ছে সুশিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা, তৎকালীন আরব সমাজে মূলত এই আদর্শ শিক্ষারই অভাব ছিলো প্রকট। তাই সে যুগে ইমরুল কায়েসের মত প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তা ইতিহাসের পাতায় জাহিলি যুগ হিসেবেই খ্যাতি লাভ করে। কারণ তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আদর্শ ও নৈতিকতার কোন বালাই ছিলো না। মহানবী [সা] এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং বুঝতে পারলেন এ অধ:পতিত জাহিলি জাতিকে একমাত্র নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই তারা একটি সভ্য সমাজে পরিণত হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি মূলত: দু'টি ধারায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। প্রথমত: শিক্ষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরব জাতিসহ অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। দ্বিতীয়ত: বহুবিধ বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করার মাধ্যমে শিক্ষার আলো-বঞ্চিত একটি জাতিকে সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন।

শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা

শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী করার জন্য এবং শিক্ষার প্রতি জন-মানসকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মহানবী [সা] পবিত্র কুরআনের বাণী উদ্বৃত করে বলেন, "যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহা কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।" [সূরা বাকারা-২৬৯] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না এ দু'ব্যক্তি কি সমান হতে পারে?" আরো ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের মাঝে যারা জ্ঞানী মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।" [সূরা মুজাদালাহ-১১] এ ছাড়াও শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী [সা] হাদিস শরীফে ইরশাদ করেন :

"পৃথিবীতে জ্ঞানী [আলিম] ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আকাশের তারকার ন্যায় যা পানি ও স্থলভাগকে করে আলোকিত।"

www.pathagar.com

"জ্ঞান [ইলম] অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয।"

"রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারারাত জেগে ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।"

মূলত শিক্ষাকে ব্যাপক করার মাধ্যমে একটি সভ্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গড়াই ছিলো নবী করীমের [সা] উপরোক্ত বাণীসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শিক্ষা বিস্তারে মহানবীর [সা] বাস্তব কর্মসূচি

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের লক্ষ্যে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী [সা] যেসব বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন তা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো :

শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন : পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য মহানবী [সা] ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত দারুল আরকামকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করেন এবং সেখানে দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটিই ছিলো সর্বপ্রথম বেসরকারি শিক্ষা কেন্দ্র। এমনিভাবে হিজরতের পূর্বে মদিনার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য নবী করীম [সা] হযরত মূসা ইবনে উমাইরকে [রা] শিক্ষক হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর [রা] মদিনায় আবু উসামা ইবনে যুরারার বাড়িতে একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে নবীজির [সা] নির্দেশমত সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। মদিনায় এটিই ছিলো সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র।

হিজরতের পর প্রিয়নবী [সা] দীর্ঘ আট মাস যাবৎ আবু আইউব আনসারীর [রা] দ্বিতল ভবনের নিচ তলাকে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তথায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। এটি ছিলো মদিনার দ্বিতীয় ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র।

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : নবী করীম [সা] শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর ব্যাপক ও সার্বক্ষণিক করার জন্য সাহল ও সুহাইল নামের দুই ভাই থেকে একটি জমি খরিদ করে সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা সুফ্‌ফা নামে সর্বাধিক পরিচিত। সেখানে তিনি সার্বক্ষণিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। সে শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রদেরকে বলা হতো আহসাবে সুফ্‌ফা। নিরক্ষর লোকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ছিলো সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই শিক্ষা কেন্দ্রে মহানবী [সা] নিজে শিক্ষাদানসহ সার্বক্ষণিক শিক্ষক হিসেবে হযরত সাঈদ ইবনে আ'সকে [রা] নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক আল্লামা বালাজুরীর বর্ণনা মতে হিজরি দ্বিতীয় সনে মহানবী [সা] দারুল কুররা নামে আরো একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, শুধু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি বরং দাওয়াত ও জিহাদি কর্মসূচির শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মহানবী [সা] নিয়মিত এসব শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের মাঝে কোন বেমানান কাজ পরিলক্ষিত হলে কিংবা কোন বিষয়ে তাদেরকে তর্ক-বির্তকে লিপ্ত দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তা বন্ধ করে দিতেন এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হবার উপদেশ দিতেন। একবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে অকারণে হাসাহাসি করতে দেখে প্রিয়নবী [সা] সাথে সাথে তাদের মৃত্যু পরবর্তী কঠিন অবস্থার কথা বলে হাসাহাসি থেকে বিরত থাকতে বলেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি : মহানবীর [সা] শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে কয়েকবার উচ্চারণ করে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদেরকে বিষয়টি কণ্ঠস্থ করিয়ে দিতেন। আবার কখনো লিখে রাখার পরামর্শ দিতেন এবং ছাত্ররা তা লিখে রাখতেন। নবী করীম [সা] যাদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতেন তাদেরকেও তিনি এ বলে উপদেশ দিতেন যে, তোমরা শিক্ষার্থীদের মেধানু-যায়ী বিষয়াবলী উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক প্রেরণ : নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে অশিক্ষিত ও মূর্খ জাতিকে একটি সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার জন্য মহানবী [সা] প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি ভ্রাম্যমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি দূর-দূরান্তে শিক্ষক প্রেরণ করেন। যার ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। হিজরি ১১ সালে মহানবী [সা] হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে [রা] ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করেন এবং একজন ভ্রাম্যমান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। এমনভাবে হযরত আবু মূসা আশ'আরীকেও [রা] একটি এলাকায় পাঠানো হয়। [বুখারী]

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : যারা অন্যদেরকে শিক্ষা দেবেন তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া অতীব জরুরি। তাই মহানবী [সা] মদিনার কেন্দ্রীয় শিক্ষালয়ে একটি প্রশিক্ষণ সেল স্থাপন করেন। দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহ থেকে মেধাবী যুবকদেরকে বাছাই করে মদিনায় এনে তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। অত:পর তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা : নবী করীম [সা] সাহাবায়ে কেরামকে নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেসব মসজিদকে ভিত্তি করে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করার নির্দেশ প্রদান করেন। ওমানের নওমুসলিমদেরকে মসজিদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে নবী করীম [সা] যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বুখারী শরীফসহ নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রহসমূহে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাষা শেখা : প্রিয়নবী [সা] মাতৃভাষার লিখন ও পঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোক নির্বাচন করে তাদেরকে অন্যান্য রাষ্ট্রের ভাষা শিক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা করেন। হযরত যায়েদকে [রা] নবী করীম [সা] হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দেন এবং মাত্র সতের দিনে তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অনুরূপভাবে

www.pathagar.com

হাবসী, ফার্সি, সুরইয়ানী, গ্রিক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও মূর্খতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। [যেমন বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ, কাব্য ও সাহিত্য চর্চা, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর প্রশিক্ষণ, শিশু শিক্ষা ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।]

উপসংহার : বলবো, মহানবী [সা] এক বিশেষ হিকমতের জন্য উম্মি হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরিত হলেও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত করেন। তার নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই গণ্ড মূর্খতায় আচ্ছাদিত আরব জাতি অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে সুশিক্ষার সম্মানজনক আসনে সমাসীন হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতের হার কম না হলেও আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতের অভাব যথেষ্ট। যার ফলে গোটা দেশ আজ নানাদিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত। তাই আসুন, আমরা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মহানবীর [সা] নীতি ও আদর্শের অনুসরণে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হই এবং অশিক্ষা, কুশিক্ষার ফলে বিরাজিত দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে দেশকে রক্ষা করি।■

www.pathagar.com

মাদায়েন সালেহ
অলৌকিক এক উটের দেশে

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

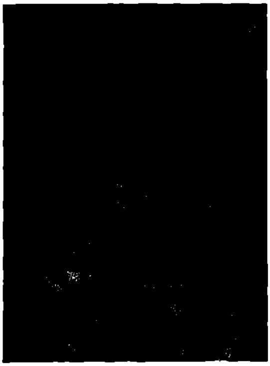

৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ বৃহস্পতিবার বাদ আছর আমরা শহীদ ভাইর মক্কার বাসা থেকে মদীনার উদ্দেশে রওনা হলাম। শহীদ ভাই অভ্যস্ত হাতে তাঁর টয়োটা ক্রেসিডার স্টিয়ারিং ধরেছেন। তার পাশে আমি। গত সপ্তাহে একাধিক বার পুরনো সড়ক ধরে মদীনার পথে যাতায়াত করেছি। আল জুহফা মীকাত, রাবেগ, মাস্তুরা ও বদর হয়ে মক্কা-সিরিয়া প্রাচীন সড়ক। সে যাত্রায় আমাদের সাথে আরো একজন যাত্রী ছিলেন মুজাহিদ ভাই। আজ আমরা নতুন সড়কে মদীনা যাচ্ছি। বেশ কয়েক বছর যাবত এই নতুন এক্সপ্রেস সড়ক মক্কা-মদীনা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এই নতুন সড়ক পথটি কিছুদূর পর্যন্ত পুরনো সড়কের সাথে সমান্তরালে এগিয়েছে। তারপর পুরনো সড়ক ধীরে ধীরে সরে গিয়ে চলে গেছে রাবেগের দিকে।

আমরা পথে একটি সরাইখানায় থেমে মসজিদে মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে আদায় করলাম। তারপর রেস্টুরেন্টের বাইরে খোলা আকাশের নীচে বসে এক পেয়ালা গরম কফিতে চুমুক দিয়ে শরীরটাকে বাকী সফরের জন্য চাঙ্গা করে নিলাম। লক্ষ্য করলাম, পুব দিগন্ত আলোকিত করে পাহাড়-পর্বত ভেদ করে উঠে আসছে এক রক্তিম আলোকপিণ্ড। আজ কি পূর্ণিমা? হয়তো তাই।

www.pathagar.com

এখন থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের সফরের সঙ্গী হলো। পার্বত্য পথে পূর্ণিমার চাঁদ আমি আগেও দেখেছি। আল-বুর্জ পর্বত মালার ভিতর দিয়ে ইরানের তেহরান থেকে মাজান্দারান যাবার পথে দু'শ কি.মি. সড়কে পূর্ণিমার চাঁদের যে রূপ দেখেছিলাম তা কখনো ভুলার নয়। সেটা ছিল তিরানব্বুই সালের কথা। এখন দেখছি মরুভূমিতে চাঁদের ভিন্ন রূপ। পাহাড় পর্বত মরু-বেষ্টনীর এ পথে... বিশেষ করে এ যখন মদীনার পথ, তখন চাঁদের রূপ আমার কাছে ভিন্ন বিভায় স্ফূর্ত হলো। এ মুহূর্তে এ চাঁদের মধ্যে আমি যেন নজরুলের চোখ দিয়ে শিশু ইসলামের দোল খাওয়া পরখ করছি।

মদীনার পথে যেতে যেতে হাইওয়ের বামপাশে একটি স্বর্ণ খনির পথ। এক্সপ্রেস ওয়ের ধারে একটি পেট্রোল পাম্পের পাশে কয়েকটি বাকালা ও রেস্টুরেন্ট। প্রাচীন আমলের সরাইখানার আধুনিক সংস্করণ। এসব সরাইখানায় ঘোড়ার আস্তাবল নেই। নেই উটের বাথান। যাত্রীরা এখানে দীর্ঘ সময় যাত্রা বিরতি করেন না। তবু মরুভূমির দীর্ঘপথ চলতে চলতে এসব সরাইখানায় আজো আমি যেন প্রাচীন মুসাফিরদের কল-কাকলী শুনতে পাই। শুনি আস্তাবল থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার হ্রেসাধ্বনী আর উটের গলার ঘণ্টার আওয়াজ।

সরাইখানায় আমরা নাশতার পর কফির অর্ডার দিলাম। একটি বাংলাদেশী ছেলে। কফি চাইলে ছেলেটি বললো এক কাপ দুই রিয়াল। বাংলা জবানে কথা বলে আমরা যেন নিজেদের দাম কমিয়ে ফেলেছি। তাই দুই রিয়াল দামে কফি খাওয়ার যোগ্যতা আমাদের আছে কি না তা সে আগেই পরখ করে নিচ্ছে। অগত্যা তাকে অভয় দেয়ার জন্য বললাম, সবাই তো দুই রিয়ালে কিনে। আপনি দেশী মানুষ, আমরা না হয় চার রিয়াল করে দেব। ছেলেটি কি ভাবলো, তা তার ভাবভঙ্গি থেকে কিছুই বুঝা গেল না।

দাম পরিশোধ করে এই বাঙ্গালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরাইখানার ভেতরই একটি বাকালায় [স্টেশনারি দোকান] গেলাম। সেখানে মুখোমুখি হলাম বৃহত্তর কুমিল্লার নবী নগরের পিয়ার আলী ওরফে পিরু মিয়ার সাথে। ব্যস্ত দোকান। নানা দেশী খদ্দেরের সাথে অনর্গল আরবীতে কথা বলে চলেছে। আমরা সেখান থেকে নানা ধরনের কিছু বিচি ভাজা কিনলাম। এগুলো দীর্ঘ যাত্রার পথের সম্বল। আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলার সময় পিরু মিয়া আন্তরিক উচ্ছ্বাসে বিগলিত হয়ে গেল। তার ঘরে বেড়ানোর জন্য দাওয়াত দিল। সরাইখানার ব্যস্ততা ভুলে তার নানা অভিজ্ঞতার কথা আমাদেরকে শুনালো। আমরা তাকে কাছের স্বর্ণখনি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। বললো, কিছুদিন আগে এক লোক খনি থেকে স্বর্ণের একটা বড় আকরিক পিণ্ড নিয়ে আসে। কিন্তু বাকী পথ সে এটি বয়ে নিতে ভয় পায়। সে কারণে পিরু মিয়াদেরকে দিয়ে চলে যায়। পিরুরা চার পাঁচজন সে পাথরটি ভেঙ্গে ভাগ করে দেয়।

আমরা মদীনায় পৌঁছলাম রাত দশটায়। মদীনায় আমাদের ঠিকানা ত্বরীক সাইয়েদুশ শুহাদা। সাইয়েদুশ শুহাদা সড়ক। সেখানে আমাদের অনেক দিনের আতিথেয়তার স্মৃতি

www.pathagar.com

বিজড়িত একটি মেসে আমরা ডাঃ সাইফুল ইসলাম ও ডাঃ আনিসুল করিমের সাথে মিলিত হলাম।

৪ ডিসেম্বর ১৯৯৮ শুক্রবার সকালে ফজর পড়লাম পাশের মসজিদে। মসজিদে নববীতে জুমার নামায আদায় করলাম। শুক্রবার জুমার পর মদীনার যে কোন রেস্টুরেন্টে বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল। বাংলাদেশী হোটেলের অবস্থা আরো খারাপ। এ সময় তারা যা পরিবেশন করে খদ্দেরদেরকে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হয়। আমরাও সেভাবেই সন্তুষ্ট হয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। ঘরে ফিরে আমরা আছর পর্যন্ত বিশ্রাম নিলাম। সূর্যের তাপ কমে এলে আছরের পর আমরা আল উলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ডাঃ আনিস আল উলার দু'জন পরিচিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে রেখেছেন। আর ডাঃ সাইফুল ভাই আমাদেরকে পথ সম্পর্কে কিছু ধারণা দিলেন। তার মতে মদীনা থেকে তাবুকগামী চেক পোস্টে কঠোর কড়াকড়ি করা হয়। কাগজপত্রে সামান্য ত্রুটি থাকলে কিংবা অন্য কোন সামান্য কারণে পুলিশ এই চেক পোস্ট থেকে গাড়ীর গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে পারে।

আমি ও শহীদ ভাই আরেক দফা আমাদের সফরের কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিলাম। মুনতাকাতুশ শারকিয়া, মুনতাকাতুল গারবিয়া, মুনতাকাতুল জুনুব এবং মুনতাকাতুশ শিমাল। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে সমগ্র সৌদি আরবের সর্বত্র অবাধে সফরের ব্যাপারে আমার বৈধ কাগজপত্র আছে। সেই কাগজে এই চার প্রদেশ ছাড়াও আলাদাভাবে মধ্যবর্তী প্রদেশ আল কাসিম আর হাইলের নামও লেখা আছে। পুরো ছয় মাসের ওরাকা। ওরাকা মানে কাগজ। এখানে ওরাকা মানে বিশেষ কাগজ। ট্রাভেল পারমিট। ভ্রমণের অনুমতিপত্র। বড় গুরুত্বপূর্ণ এ ওরাকা। ওরাকা ছাড়া এখানে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়, এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করা যায় না।

কাগজপত্র সব ঠিক থাকার পরও ডাঃ সাইফুল ভাইর সাবধান বাণী কিছুটা টেনশন সৃষ্টি করলো। ...তাবুকের পথে মূল সড়কে উঠার আগ পর্যন্ত ডাঃ সাইফুল আমাদেরকে তার গাড়ি নিয়ে পথ দেখালেন। এর পর আমরা প্রধান সড়ক ধরে এগুতে থাকলাম।

হাফরী নামক চেক পোস্ট আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালো। সেখানে প্রতিটি গাড়ী থামিয়ে কড়াকড়িভাবে চেক করা হচ্ছে। এ ধরনের চেক পোস্ট রয়েছে সমগ্র সৌদি আরবে। তবে এখানকার কড়াকড়ি আমাদের কাছেও একটু বেশি মনে হলো। গাড়ীর কাগজপত্র, শহীদ ভাইর ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং আমাদের 'ইকামা' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো। তারপর আলাদা আলাদাভাবে দেখা হলো আমাদের ভ্রমণের অনুমতি পত্র। এই চেক পোস্ট অতিক্রম করে আমরা বুক ভরে নিঃশ্বাস টানার মওকা পেলাম। রাস্তার দু'পাশে চোখ মেলে তাকানোরও যেন এখন থেকেই অবসর মিললো।

মদীনা থেকে আমাদের পথ পার্বত্য উপত্যকার ওপর দিয়ে। এই উপত্যকায় নানা স্থানে

৯—

www.pathagar.com

সবুজের সমারোহ। বামে ঘন সবুজ খেজুর বাগান। এছাড়া কৃষি খামারও চোখে পড়লো। শহীদ ভাই এ পথে বারো-তেরো বছর আগে একবার সফর করেছেন। ৮৫/৮৬ সালের দিকে তার সফরের সময় এ উপত্যকায় ছিল শুধু বালু আর বালু। এখন সেখানে নয়ন জুড়ানো সবুজ। শহীদ ভাই বার বার তার আগের দেখা আর এখনকার দেখা পথ-ঘাট আর চারপাশের অবস্থার মধ্যে জমা-খরচ মিলিয়ে নিচ্ছিলেন।

শহীদ ভাইর সে সফরের প্রায় তিন দশক আগের একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমি পড়েছি মুহাম্মদ আসেমের লেখা 'কুরআনের দেশে মওলানা মওদূদী' নামক বইতে। মুহাম্মদ আসেম মাওলানা মওদূদীর সফর সঙ্গী হয়ে ১৯৫৯ সালে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক এলাকা সফর করেন। তাঁরাও মদীনা থেকে আল উলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। মুহাম্মদ আসেম লিখেছেন : "কয়েক মাইল পাকা সড়কে চলার পর বাম দিকে মোড় নিয়ে হেজাজ রেল সড়কের গাঁ ঘেঁষে কাঁচা সড়কে চলি। দেড়টার দিকে একটা স্টেশনে নেমে যুহর ও আছরের নামায আদায় করি। খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রায় আড়াইটার দিকে রওনা হই। রাত নয়টা পর্যন্ত একটানা গাড়ি চলে। বেশ ঠাণ্ডা পড়ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কোন স্টেশন পেলে রাত কাটাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টেশন না পেয়ে এক জায়গায় খোলা মাঠেই নামি। স্টোভে খানা পাকাই। নামায আদায় করে সেখানেই বালির ওপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি। সকালে জানতে পারলাম রেলওয়ে স্টেশন নিকটেই ছিল। পরদিন ২০ ডিসেম্বর ভোরে নামায এবং নাস্তা সেরে আবার রওনা করি এবং ১টার দিকে আল উলা পৌঁছি।"

মুহাম্মদ আসেম লিখেছেন : "মদীনা শরীফ থেকে আল উলা পর্যন্ত গোটা রাস্তাটাই কাঁচা। কোথাও পাহাড়ি রাস্তা। কোথাও বালুময়। গোটা রাস্তার চারিদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। ৫২০ মাইলের দীর্ঘ সফরে কোথাও পাহাড়মুক্ত খোলা ময়দান চোখে পড়েনি। গোটা এলাকা অনাবাদী। মাঝখানে শুধু একটা উপত্যকা পড়েছে। যাতে ছোট খেজুর বাগান রয়েছে। মদীনা থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর আল উলা পর্যন্ত গোটা রাস্তাই চলে গেছে হেজাজ রেল লাইনের গাঁ ঘেঁষে। স্থানে স্থানে স্টেশন পড়ে সম্পূর্ণ অনাবাদী এলাকায়। স্টেশনগুলো পাকা এবং পাথরের তৈরী। বদ্দুরা দরজা জানালা খুলে নিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসল কাঠামো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অতি সহজে এসব মেরামত করা যায়।"

এখন অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে। পুরোটাই পাকা সড়ক। রেল লাইনের চিহ্ন নেই।

মওলানা মওদূদী ও তার সফর সঙ্গী ১৯৫৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর সকাল এগারোটায় মদীনা থেকে রওনা হয়ে পরদিন দুপুর ১১টায় আল উলা পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ ২৬ ঘণ্টার যাত্রা ছিল সেটি। আর আমরা আশা করছি, ঘণ্টা চারেক সফর করে গন্তব্যে পৌঁছে যাব। আমাদের এই যাত্রায় পথে রাত কাটাবার প্রয়োজন নেই। স্টোভ জ্বালাবারও দরকার নেই। সড়কের দৃশ্যপটও এখন অনেক বদলে গেছে।...

www.pathagar.com

১৯৫৯ থেকে ১৯৯৮। চার দশকের ব্যবধানে মসৃণ হাইওয়ে ধরে দ্রুতগতিতে আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি। চার দশক আগে পথ ছিল পুরাপুরি জনমানব শূন্য। এখনো প্রায় জনমানব শূন্য। তখনকার মুসাফিরগণ স্থানে স্থানে দু'একটি মরা উট পড়ে থাকতে দেখেছেন। এখন সে দৃশ্যও নেই।

সবুজ উপত্যকার পর পাথুরে মাটির নিরস প্রান্তর। তারপর থেকে চারদিকে শুধু পাহাড়-পর্বতের সারি। পাহাড়গুলো দেখে মনে হয় এগুলো এক সময় গভীর সমুদ্রের নীচে ছিল। পার্বত্য এলাকা পার হয়ে আমরা একটি বড় সমতল উপত্যকায় পৌঁছলাম। সেখানে কিছু ঘরবাড়ী, দোকান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সেই সাথে মসজিদ। এই উপত্যকার নাম সালসালাহ্।

আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে খয়বর পৌঁছলাম। খয়বর মদীনা থেকে ১৭০ কি.মি. দূরে। হুদায়বিয়ার সন্ধি হযরত মুহাম্মাদের [সা] জন্য যে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে তিনি মদীনার উত্তর দিকে মনোযোগ দেয়ার মওকা পেয়েছিলেন। খয়বরে ছিলো ইসলামের প্রথম সহজ বিজয়। খয়বর শহর হাতের বাঁয়ে রেখে আমরা তাবুকের পথ ধরে আল উলার দিকে এগিয়ে চললাম।

এরপর আমরা চলছি তো চলছিই। পথের দু'পাশের অন্ধকারে কালো দৈত্যের মতো সারিবদ্ধ পর্বত শ্রেণী ছাড়া আর কোন জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই। কিছুক্ষণ আগেও থেকে থেকে গাড়ির চোখ ঝলসানো আলোর মুখোমুখি হয়েছি। এখন কোন গাড়ীর সাথেও দেখা মিলছে না। পথ ক্রমেই ভয়াল মনে হতে লাগলো। এভাবে বহুদূর চলার পরও আল উলার কোন নির্দেশ চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না আমরা। আমরা কোথায় আছি, আমাদের অবস্থান স্থল সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাবারও উপায় নেই।

পর্বতাকীর্ণ অন্ধকার পথে মাইলের পর মাইল এভাবে নির্দেশনাহীন ছুটে চলা নিরাপদ নয়। পথের দুই পাশে কোন ঘরবাড়ী কিংবা দোকান পাট দূরে থাক, কোন প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত নযরে পড়লো না। এভাবে প্রায় তিরিশ কি.মি. অতিক্রম করার পর একটি পেট্রোল পাম্প বা 'মাহাত্তা'র আলো দেখতে পেলাম দূর থেকে। জায়গার নাম সাহালা। সেখানে জিজ্ঞাসা করে আমরা নিশ্চিত হলাম, আমরা সঠিক পথেই চলছি। এবার কিছুটা আশ্বস্ত মনে আরো কিছু পথ এগিয়ে ডানদিকে একটি এক্সিট। এই এক্সিটের সাহায্যে বাম দিকের পথ চলে গেছে আল উলার দিকে। এই এক্সিট থেকে আল উলার দূরত্ব একশ সত্তর কিলোমিটার।

মদিনা-তাবুক হাইওয়ে থেকে ডানদিকে এক্সিট নিয়ে পশ্চিম-উত্তর কোনাকুনি চলে গেছে আল উলার পথ। শহীদ ভাই এ সময় ডানে ইশারা করে দেখালেন প্রাচীন পর্বতমালা ভেদ করে চারদিক আলোড়িত করে রহস্যময় এক জ্বলন্ত অগ্নিগোলক সেখানে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। চারদিকে যতদূর চোখ যায় পাহাড়-পর্বত আর তার মাঝখানে অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে আসছে এ অগ্নিপিণ্ড। চাঁদের এমন তীব্র অভ্রভেদী জ্যোতির্ময়

www.pathagar.com

রূপ না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতে পারতাম না। এতক্ষণ পার্বত্য অন্ধকারের যে রূপ দেখেছি, এখন সেখানে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে চাঁদের জ্যোৎস্নালোক।

এর আগে আমি বারবার, বহুবার জ্যোৎস্নাস্নাত মরুভূমিতে শত শত কি.মি. পথ পাড় হয়েছি। কত পর্বতবেষ্টনী পাড়ি দিয়েছি। কিন্তু কখনো চাঁদের এমন রূপ দেখেছি বলে মনে হয় না। চাঁদের সৌন্দর্য দেখে আমি সবচে বিস্মিত হয়েছিলাম আল বুর্জ পর্বত মালায়- তেহরান থেকে মাজান্দারান যাবার পথে। আল বুর্জের চূড়ায় চাঁদের মুকুট শোভা দেখেছিলাম। আর কল্পনায় মনে হয়েছিল, রুস্তমের শাহরুখ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমি ছুটে চলেছি কোন অজানা দিগন্তে। কিন্তু আজকের অন্ধকার অজ্ঞাত পথে পৃথিবীর এক অন্যতম প্রাচীন জনপদ দিদান ও নিদিয়ান সভ্যতার লীলাভূমির পথে চলতে গিয়ে চাঁদকে যে রূপে দেখলাম তার কোন তুলনা নেই।

আজকের চাঁদ ধীরে ধীরে পর্বত চূড়ায় মুকুটের মতো দীপ্ত হয়ে উঠলো আর প্রাচীন পথের আমরা দু'জন পথিক নানা প্রকার বিচি ভাজা আর বাদাম চিবাতে চিবাতে বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। সাহালা পেট্রোল পাম্প পার হয়ে আসার পর আমরা এই গহিন পার্বত্য পথে একশ সত্তর কি.মি. পথ পাড়ি দিলাম। এর মাঝে রাস্তার ডানে বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় কোথাও কোন জনপদ বা সরাইখানা কিংবা একটি পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত নযরে পড়লো না। এমনকি একটি বিদ্যুৎ বাতিও কোথাও দেখলাম না। পুরো পথ ধরে মরু-পর্বতের চাঁদের দ্যুতি আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো।

আল উলা শহর থেকে পনেরো কি.মি. দূরে থাকতেই আমরা একটি চেক পোস্ট পেলাম। এখান থেকে বামে চলে গেছে আল উমলাজ এর পথ। আর সোজা সড়ক চলেছে আল উলার দিকে। এই চেক পোস্টেও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলাম। তারা শুধু কাগজপত্র দেখেই ছাড়লেন না। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি ইত্যকার বিষয়েও জবাবদিহি করতে হলো। শহীদ ভাই এসব পরীক্ষায় জীবনে আমার চেয়ে অনেক বেশি অবতীর্ণ হয়েছেন। চোস্ত আরবীতে তিনিই সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং পাশও করলেন।

আল উলায় প্রবেশ করে একটি ছিমছাম, নিটোল ছোট্ট শহরের সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। মুসাফির যাত্রী আমরা। আগে খুঁজে পেতে একটি খাবার দোকানে গেলাম। 'মাতআম জামিল বুখারিয়া'। আফগানদের পরিচালিত এ দোকানে কাবাব, বাসমতি চাউলের পোলাও আর সবজি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। এরপর শোবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলাম 'ফনদুক মাদায়েন' বা মাদায়েন হোটেল। শহীদ ভাই তার বারো তেরো বছর আগেকার আল উলা সফরের কাহিনী বয়ান করছিলেন। এখানে তখন থাকার কোন হোটেল ছিল না। তখনকার সফরে সারারাত তাকে গাড়ীতে রাত কাটাতে হয়েছে।

আমরা হোটেল থেকে ডা: হাবিবকে ফোন করলাম। জানালাম আমরা সহি সালামতে

www.pathagar.com

আল উলায় পৌঁছে গেছি এবং মাদায়েন হোটেলে উঠেছি। তিনি অনুযোগ করলেন, তার বিরাট বাসা পড়ে আছে। তার বাসা ফেলে আল উলায় আমরা হোটেলে থাকতে পারি না।

ডা: হাবিব-এর ফোন ছেড়ে আমরা শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। শহীদ ভাই বাতি নিভাতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, এক ধরনের বিষাক্ত পোকা আছে আল উলায়। সেই পোকা ও বিছা দংশন করতে পারে। শহীদ ভাইর অভিজ্ঞতার কাছে সমর্পিত হলাম। বাতি জ্বালিয়ে রাখলাম। একদিকে বাতি, সেই সাথে পোকার ভয়। দুই মিলে আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিল। কিন্তু শহীদ ভাই অল্পক্ষণের মধ্যেই নাসিকায় কিঞ্চিত শব্দের তরঙ্গ তুলে জানিয়ে দিলেন, তিনি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছেন। তারও বেশ কিছুক্ষণ পর হোটেলে এসে হাজির হলেন ডা: হাবিব। তিনি এক প্রকার জোর করেই আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তার স্ত্রী আমাদের জন্য এত রাতে রান্না চরিয়েছেন। ভাবির কষ্টের কথা বিবেচনা করে শারীরিক অসামর্থ্য আর মানসিক অবসাদ ঠেলে আমরা গাত্রোত্থান করতে বাধ্য হলাম।

ডা: হাবিবের বাসাটি আল উলার হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ডাক্তার। অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী খাবার দাবারের পুরো আয়োজন করে সেরেছেন। কাবাব, ইলিশ মাছ, পাঙ্গাস মাছ, মুরগী আর মনে রাখার মতো চমৎকার ডাল। ডাক্তার সাহেবদের দুই বাচ্চা। বড়টি দেশে গেছে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে। আর ছোট বাচ্চাটি সাথিহীন বিড়াল ছানার মতো এই গভীর রাতেও মিউ মিউ করছে। দাদী-নানার আদর বঞ্চিত প্রবাসী এই শিশুর একাকীত্ব আমার কাছে বড়ই কষ্টকর মনে হলো।

আমরা ভরা পেটে আরেক দফা খেলাম। আফগানী হোটেলের খাওয়াটা চমৎকার ছিল। কিন্তু এখন আফসোস হলো আগে খেয়েছি বলে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত একটা। শহীদ ভাই এসে সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর আমি পোকার আক্রমণের ভয়ে নির্ঘুম শুয়ে গত কয়েক দিনের আমার শাটল কর্কের মতো রিয়াদ-মক্কা-জেদ্দা-মদীনা-জেদ্দা-তায়েফ-মক্কা-ইয়ানবু-মক্কা-জেদ্দা-মদীনা-খাইবার-আল উলা পরিভ্রমণের কথা ভাবছিলাম। কখনো ডুব-সাঁতার কাটছিলাম সুদূর অতীতে ইব্রাহিম-ইসমাঈল-সামূদ জাতি ও সালেহ নবীর মাদায়েন সালেহ আর শোয়েব আলাইহিস সালামের মাগায়েরে শোয়েব-এর ইতিহাসের গভীরে। কিংবা উঁকি দিচ্ছিলাম ঢাকায় আমার ছোট্ট গৃহকোণে। এভাবেই এক সময় পোকার ভয় অতিক্রম করে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নে দেখলাম আমি ছোট্টটি হয়ে স্কুলের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছি। কিন্তু পরীক্ষা অনেক আগে শুরু হয়ে গেছে। দেরীতে ঢুকার কারণে পরীক্ষার খাতা আর প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে আমি কেবলই ঘামছি...।

পাঁচই ডিসেম্বর শনিবার সকাল নয়টায় ডা: শাহ আলম ও ডা: মুহাম্মদ আখতার আমাদেরকে হোটেল থেকে তুলে নিলেন। ডা: শাহ আলম দশ বছর আর ডা: আখতার

www.pathagar.com

চৌদ্দ বছর আল উলায় চিকিৎসক হিসাবে আছেন। আজ সকালে তাদের ডিউটি নেই। তাই তারা আমাদের মেহেমানদারির দায়িত্ব নিয়েছেন। ডাঃ হাবিব তার ডিউটির কারণে আমাদের সাথি হতে পারেননি।

নাশতা সেরে প্রথমেই আমরা আল উলা জাদুঘরে গেলাম। জাদুঘর দেখা এবং মাদায়েন সালেহ সফরের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাই ছিল উদ্দেশ্য।

জাদুঘরটি তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে আরব সভ্যতার বিবর্তনের নানা নিদর্শন প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত মৃতপাত্র, অলঙ্কার ও হাতিয়ার পত্র-এ সবই গবেষকদের জন্য মূল্যবান। প্রস্তর যুগের হাতিয়ার-পত্র দিদানী বা সামুদীয় সভ্যতার জীবন-আচরণের চিত্র তুলে ধরেছে।

এসব বস্তুগত উপকরণ ছাড়াও ছবি ও গ্রাফের সাহায্যে সেখানে এক লাখ বছরের সভ্যতার বিবর্তন ধারা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই চিত্র অবশ্য আল উলার নিজস্ব নয়। সৌদি আরবের সবক'টি জাদুঘরে প্রায় অভিন্ন চিত্রমালা। এর বাইরে এখানে মাদায়েন সালেহর বিভিন্ন ইমারত ও প্রাসাদের ওপর মূল্যবান বিবরণী রয়েছে। সময়ের অভাবে এসব মূল্যবান তথ্য ভালোভাবে পরখ করা সম্ভব হলো না।

জাদুঘরের কর্মচারীরা আমাদের সাথি ডাক্তাদের অনেক দিনের পরিচিত। এ কারণে বেশ সমাদর পেলাম। তবে তারা জাদুঘর সম্পর্কে মুদ্রিত কোন উপকরণ সরবরাহ করতে পারলেন না। জাদুঘরের কর্মচারীরা জানালেন, মাদায়েন সালেহ পরিদর্শনের অনুমতি পত্র খোদ আমিরের দফতর থেকে সরবরাহ করা হয়।

জাদুঘর থেকে আমরা দ্রুত আমীরের দফতরের উদ্দেশ্যে ছুটলাম। সেখান থেকে অনুমতি না পেলে আমাদের এতদূর আসার আসল উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যাবে।

আল উলার আমীরের দরবার

জাদুঘরের কাছেই আমীরের অফিস। প্রাচীন আমলের একটি বেশ বড় ভবন। তবে রিয়াদের কোন আধুনিক বাড়ীর সাথেই আল উলার এ প্রাসাদ তুলনীয় নয়। প্রাসাদের গেটে নানা তকমাধারী পাহারাদার। নিরাপত্তার চাইতে প্রাচীন রাজকীয় জৌলুসের ভাবটাই বেশী ফুটে উঠেছে। তারা কেউ কেউ আমাদের সঙ্গী ডাক্তারদের পূর্ব পরিচিত। ভবনের ভিতরে এক কর্মকর্তা আমাদেরকে চা-খেজুর দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। ডাঃ শাহ আলমের বন্ধু এক পুলিশ কর্মকর্তার ছোট ভাই তিনি। তিনিই আমাদের চারজনের 'ইকামা' হাতে নিয়ে বিভিন্ন কামরায় ছুটাছুটি করলেন। আমাদের মাদায়েন সালেহ সফরের কাগজপত্র অনুমোদনের প্রাথমিক কাজ শেষ হলো।

সবশেষে আমরা আল উলার আমীরের সেক্রেটারীর কক্ষে গেলাম।

বিরাট হল ঘরের শেষ প্রান্তে সেক্রেটারীর টেবিল। কক্ষের চারদিকে ঘুরিয়ে সোফাতে অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা। আমরা ডান পাশ থেকে মুসাফাহা শুরু করলাম। মাঝখানে

www.pathagar.com

সেক্রেটারীর সাথে করমর্দন সেরে বাম দিকে ঘুরে বাকীদের সাথেও হাত মিলালাম। এটাই সৌদি সৌজন্য। কোন ঘরে ঢুকলে সেখানে সবার সাথে মুসাফাহা করতে হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দায়িত্ব শেষ করা সৌজন্য বিরোধী। আমরাও এক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা এবং সাম্যের অনুশীলন করলাম। এরপর সোফায় বসে চারদিকে ভালো মতো তাকানোর অবসর পেলাম।

সেক্রেটারীর সামনে একপাশে সোফায় বসে চা পান করছেন চারজন সশস্ত্র ব্যক্তি। তাদের কোমরে ঝুলানো সুদৃশ্য খাপবদ্ধ তলোয়ার। বুকের কাছে আটকানো কারুকার্য খচিত খাপের ভেতর ডেগার। তলোয়ার আর ডেগার তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আর বিশেষ মর্যাদার প্রতীক। এছাড়া তাদের রয়েছে রিভলভার ও স্টেন গান। তারা ফেদাইন ও মুজাহিদীন বাহিনীর সদস্য। তাদের সাজ-পোশাক জানান দিচ্ছে, তারা এ মাহফিলের বিশেষ সম্মানিত মেহমান।

বাদশাহ আবদুল আযীযের সময় এক যুদ্ধে রাজতন্ত্রের পক্ষে লড়তে গিয়ে একটি কবিলার প্রায় নব্বই ভাগ লোক জীবন দেয়। রাজার প্রতি আনুগত্য ও কুরবানীর এ ছিল এক বিরাট পরাকাষ্ঠা। আল উলার কয়েকটি গোত্রের লোককে সেই থেকে পুরুষানুক্রমে ফেদাইন ও মুজাহিদীন বাহিনীর সদস্য নিযুক্ত করা হয়। সৌদি রাজতন্ত্র এভাবে এই গোত্রগুলোর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করছে। ফেদাইন পদবী তাদের বিশেষ বিশ্বস্ততার প্রতীক।

ফেদাইন ও মুজাহিদীনের এ যুগের প্রতিনিধিদেরকে পরখ করছিলাম। তারা প্রত্যেকে আলাদা কবিলার লোক। তাদের একজনের চেহারা অন্যজন থেকে আলাদা। তাদের নাক, চোখ, মুখের আদল আর গায়ের রঙের পার্থক্য স্পষ্ট। এক কবিলা থেকে অন্য গোত্র যেন হাজার বছর ধরে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মরুভূমির ইতিহাসে সমান্তরালে সাঁতার কেটে চলেছে।

ফেদাইন প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন অফিসে আসেন। সেক্রেটারীর কক্ষে বসে চা-গাওয়া-খেজুর খান। গল্প করে সময় কাটান। এরপর বাসায় চলে যান। এভাবেই পুরুষানুক্রমে চলতে থাকবে তাদের বিশেষ হাজিরা। আল উলার বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা রিয়াদ থেকে রাজা বা রাজপুত্র এলে সেখানেও তাদের একটা ভূমিকা থাকে। বাদশাহ আযীযের সময় থেকেই পুরুষানুক্রমে তারা তাদের কবিলার পক্ষ থেকে সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এসেছেন। এ আনুগত্যে চিড় ধরলে যে কোন সময় মরুভূমিতে লু হাওয়া বইতে শুরু করবে।

মাদায়েন সালেহর পথে

সেক্রেটারীর স্বাক্ষরে আমাদের চারজনের জন্য মাদায়েন সালেহ প্রবেশের অনুমতি মিলল। পাস নিয়ে আমরা দ্রুত গাড়ি হাঁকালাম সালেহর [আ] নগরীর উদ্দেশে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আসেম তার বইতে আল উলা থেকে মাদায়েন সালেহর দূরত্ব লিখেছেন আনুমানিক ৩০ মাইল। তখনকার পথ-ঘাট কেমন ছিল জানি না। তবে এখনকার দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ কি.মি.।

আল উলা থেকে মাদায়েন সালেহ যাওয়ার পথে দু'ধারে পাহাড়-পর্বতের গায়ের রঙ ঝলসানো মাটির মতো। সারা গা ক্ষত-বিক্ষত। প্রচণ্ড অগ্নুৎপাত আর ভূমিকম্প দীর্ণ-বিদীর্ণ করে রেখেছে প্রাচীন এ শৈল শ্রেণীকে। এই পথে চলতে চলতে মনের ভিতর প্রাচীন সামূদীয় সভ্যতার ইতিহাস ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো। আমার বুকের ভেতর হযরত সালেহর [আ] সময়কার এক অলৌকিক উটের ঘণ্টা ধ্বনি যেন বেজে উঠলো।

প্রাচীন জনপদের এই রাস্তাটি খুব মসৃণ নয়। চারপাশের বিদীর্ণ প্রকৃতির সাথে মিল রেখে রাস্তাটি গ্রেটার দিয়ে কিছুটা এবড়ো-থেবড়ো করা। শহীদ ভাই শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন। মৃদু ঝাকুনী দিতে দিতে গাড়ি চলছে ধীর গতিতে। আর আমরা যেন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি প্রাচীন ইতিহাসের অতল গভীরে।

আল কুরআনে বারবার বলা হয়েছে মানবেতিহাসের সাতটি প্রাচীন বিশেষ নিদর্শনের কথা। বারবার উল্লেখ করা সে নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সামূদীয় সভ্যতার নিদর্শন মাদায়েন সালেহ। মাদায়েন সালেহ সম্পর্কে আমি কিছুদিন যাবত বুঝার চেষ্টা করছিলাম। এ সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা আমার কাছে বিস্তারিত আর মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। আমি বললাম সে কথা। আমাদের ডাক্তার বন্ধুরা উৎসাহের সাথে সে আলোচনায় যোগ দিলেন।

শহীদ ভাই বলছিলেন : সব নবীদের কাছে তাদের জাতির লোকেরা নিদর্শন দেখতে চেয়েছে। হযরত মুহাম্মাদকেও [সা] মক্কার সরদার ব্যক্তিরা নিদর্শন দেখাতে বলেছে। তাদের সামনে নাকি কোন নিদর্শনই তুলে ধরা হয়নি!

আল কুরআনে এসব কথাকে বলা হয়েছে স্রেফ বাহানাবাজি। বলা হয়েছে : মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নিদর্শন। এসব দেখে যে কোন মানুষ সত্য উপলব্ধি করতে পারে। এছাড়া কিছু বিশেষ নিদর্শন সম্পর্কে আল কুরআনে বারবার নানা বর্ণনা ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে : এসব নিদর্শন নূহের [আ] কাওম দেখেছে। হূদের [আ] সময় আদ জাতির লোকেরা দেখেছে। সালেহর [আ] সময় সামূদ জাতি দেখেছে। ইবরাহীমের [আ] বংশধররা দেখেছে। লূতের [আ] কাওম দেখেছে। শোয়ায়েবের [আ] সময় আইকা বা তাবুকবাসী দেখেছে। মূসার [আ] সময় ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় দেখেছে।

এসব নিদর্শন সম্পর্কে মক্কাবাসী বেখবর ছিল না। কিন্তু তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি। অবিশ্বাসীরা শিক্ষা না নিলেও আল কুরআনে বারবার এসব নিদর্শন কেন উল্লেখ করা হয়েছে? সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

"এই যে আমি নবীদের কাহিনী আপনাকে শুনাই, এসবের দ্বারা আমি আপনার দিলকে মজবুত করি। এর মাধ্যমে আপনি সত্যের জ্ঞান লাভ করলেন এবং ঈমানদার লোকেরা নসীহত আর চেতনা পেল।" [সূরা হূদ : ১২০]

শহীদ ভাই এভাবেই আমাদের মাদায়েন সালেহ সফরের যুক্তি তুলে ধরলেন।

নূহ [আ] ও তাঁর কাওমের বয়ান

ডা: আখতার বরাবরই চুপ করে শুনছিলেন। এবার তিনি সরব হলেন। নূহের [আ] জাতির কাহিনী বর্ণনার জন্য তিনি আল কুরআনের একাত্তর নম্বর সূরা তিলাওয়াত করলেন। 'নূহ' শিরোনামের এই সূরায় বলা হয়েছে :

"আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, একটি কষ্টদায়ক আযাব আসার আগেই আপনি তাদেরকে সাবধান করে দিন।'

"তিনি বললেন : 'হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সাবধানকারী। তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাপ মাফ করে দেবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় এসে গেলে তা বিলম্বিত হয় না। যদি তোমরা তা জানতে!'

"তিনি বললেন : 'হে আমার রব! আমি আমার কওমের লোকদেরকে দিনরাত আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের দূরে সরে যাওয়াকে কেবল বাড়িয়েই তুলেছে। আপনি যাতে তাদের ক্ষমা করেন এ উদ্দেশ্যে আমি যখনই তাদের আহ্বান করেছি তখনই তারা কানে আঙুল দিয়েছে এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে। নিজেদের আচরণে অনড় থেকেছে এবং বড় বেশি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। এরপর আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছি। প্রকাশ্যে তাদের কাছে দাওয়াত দিয়েছি। আর গোপনে চুপে চুপে বুঝিয়েছি।

"আমি বলেছি : 'তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। নি:সন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী-নালা প্রবাহিত করে দিবেন। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করছো না। অথচ তিনিই তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।-তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে আসমান সৃষ্টি করেছেন? ওগুলোর মধ্যে চাঁদকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্ভূত করেছেন। আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন। আল্লাহ দুনিয়ার জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানার মত বিছিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা এর প্রশস্ততার মধ্যে বিচরণ করতে পার।'

www.pathagar.com

"নূহ বললেন : 'হে প্রভু! তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঐ সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে আরো বেশি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আর এসব লোক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে রেখেছে। তারা বলেছে, তোমরা নিজেদের দেব-দেবীদের কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাস্‌রকেও পরিত্যাগ করো না। অথচ এসব দেব-দেবী বহু লোককে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। আপনিও এসব জালেমদের জন্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেন না।'

"নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের করা হয়েছিল নিমজ্জিত এবং তারপর আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এরপর তারা কাউকে আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

আর নূহ বললেন : 'হে আমার রব! এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রাখবেন না। আপনি এদের ছেড়ে দিলে এরা আপনার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মলাভ করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী ও কাফের। হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দিন। জালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।" [সূরা নূহ]

নূহের [আ] কিশতীর বর্ণনা

নূহের [আ] ঘটনা সম্পর্কে এরপর ডাক্তার আখতার আল কুরআনের সপ্তম সূরার অষ্টম রুকু তিলাওয়াত করলেন। সেখানে বলা হয়েছে একটি নৌকার সাহায্যে হযরত নূহ [আ] ও তাঁর সাথিদের রক্ষা করার কথা :

"নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই।

তিনি বললেন : 'হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।'

"তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা জবাব দেয় : 'আমরা তো দেখতে পাচ্ছি তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছো।'

"নূহ বললেন : 'হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমি কোন গোমরাহীতে লিপ্ত হইনি, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতকামী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। তোমরা কি এ কারণে অবাক হয়েছো যে তোমাদেরই কওমের এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যেন সে তোমাদেরকে সতর্ক করে আর তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে যাও। হয়তো তোমাদের উপর রহমত নাযিল করা হবে।'

www.pathagar.com

"কিন্তু তারা মানতে অস্বীকার করলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার সাথিদেরকে একটি নৌকায় রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করলো তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। অবশ্যই তারা ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠী।" [আল আরাফ : ৫৯-৬৪]

চুলা যখন ঝর্ণা হলো

ডাক্তার আখতার এর পর তেলাওয়াত করলেন আল কুরআনের এগারোতম সূরা 'হূদ' থেকে। সূরা হূদ-এ নূহের [আ] জাতির সাথে তাঁর দীর্ঘ সংলাপের বিষয়ে বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর নৌকা তৈরির বিবরণ। আর এ নিয়ে লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়। আর তার পর নূহ [আ] ও তার সাথিদের প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা ও অবাধ্য লোকদের ডুবে মরার কাহিনী। বলা হয়েছে :

"আমি নূহকে তার কাওমের কাছে পাঠালাম।"

"[তিনি বললেন] : 'আমি তোমাদেরকে সাফ সাফ সাবধান করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করো না। আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।'

"[এ কথার জবাবে] তার কাওমের সরদারদের মধ্যে যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা বললো : 'আমরা তো দেখছি যে, তুমি আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আমরা আরও দেখছি যে, আমাদের জাতির শুধু ছোট লোকেরাই না বুঝে-শুনে তোমাকে মেনে চলছে। আমরা তোমাদের মধ্যে এমন কোন কিছুই পাচ্ছি না, যেদিক দিয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

"তিনি [নূহ] বললেন : 'হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখ যে, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম থেকে থাকি আর তিনি যদি তাঁর খাস রহমত দিয়ে আমাকে ধন্য করে থাকেন, কিন্তু তা তোমাদেরকে দেখতে দেওয়া না হয়ে থাকে [তাহলে আমার কী করার আছে]? তোমরা মানতে না চাইলে আমি কি জোর করে তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি?'

"হে আমার কাওম! আমি তো এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোন মাল-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর দায়িত্বে আছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে পারি না। তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে হাজির হবে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা জাহেল কাওম।'

"হে আমার কাওম! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে? এতটুকু কথাও কি তোমাদের বুঝে আসে না?'

"আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী ইলম রাখি। আমি এ দাবিও করি না যে, আমি

www.pathagar.com

ফেরেশতা। আর একথাও আমি বলতে পারি না যে, তোমাদের চোখ যাদেরকে তুচ্ছ হিসেবে দেখে, আল্লাহ তাদের মধ্যে কোনো মঙ্গলই রাখেননি। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি যদি এমন কথা বলি, তাহলে অবশ্যই যালিম হব।'

"অবশেষে তারা বললো : 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ এবং অনেক বেশী ঝগড়া করে ফেলেছ। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ধমক দিচ্ছ তা নিয়ে এস।'

"[নূহ] জবাবে বললেন : তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান। তোমাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, তোমরা বাধা দেবে। আল্লাহ নিজেই যদি তোমাদেরকে পথহারা করার ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে যদি আমি তোমাদের কোন মঙ্গল করতেও চাই তবুও আমার কল্যাণ-কামনা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

"[হে নবী!] এরা কি বলে যে, এ লোকটি সব কিছু নিজেই রচনা করে নিয়েছে? তাদেরকে বলুন, 'আমি যদি নিজেই এসব রচনা করে থাকি তাহলে এ অপরাধের দায়িত্ব আমার উপরই থাকবে। আর তোমরা যে অপরাধ করছ এর জিম্মাদারি থেকে আমি মুক্ত।'

"নূহের নিকট ওহী পাঠানো হয়েছে : 'আপনার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা যা কিছু করেছে এর জন্য আপনি দু:খিত হবেন না।'

"[হে নূহ!] আমার ওহী মোতাবেক আমার তদারকীতে একটা নৌকা তৈরি করুন। যারা যুলুম করেছে তাদের পক্ষে আমার কাছে সুপারিশ করবেন না। এরা সবাই এখন ডুবে মরবে।'

"নূহ নৌকা তৈরি করছিলেন। তাঁর কাওমের সরদারদের মধ্যে যারাই এ দিক দিয়ে যাতায়াত করছিল তারাই তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল।

নূহ বললেন : 'তোমরা যদি আমাদের প্রতি ঠাট্টা কর, তাহলে আমরাও তোমাদের প্রতি তেমনি বিদ্রূপ করছি যেমন তোমরা করছ।'

"শিগ্‌গিরই জানতে পারবে, কার উপর ঐ আযাব আসবে, যা তাদেরকে অপদস্ত করবে এবং কার উপর ঐ বিপদ এসে পড়বে যা স্থায়ী হয়ে থাকবে।'

"তারপর যখন আমার আদেশ এল এবং ঐ চুলা ফেটে টগবগ করে উঠল, তখন আমি বললাম, 'প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া প্রাণী নৌকায় তুলে নিন এবং আপনার পরিবারকেও নিন। অবশ্য তারা ছাড়া, যাদের সম্পর্কে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও [নৌকায় উঠিয়ে নিন]। অবশ্য খুব কম লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছে।'

www.pathagar.com

"নূহ বললেন : 'এর মধ্যে উঠে পড়। আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।'

"নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল এবং একেকটি ঢেউ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আসছিল। নূহের ছেলে আলাদা জায়গায় ছিল।

নূহ তার ছেলেকে ডেকে বললেন, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে উঠে এস, কাফিরদের সাথে থেকো না।'

"সে জবাবে বলল : 'এখনি আমি এক পাহাড়ে চড়ে যাব, যা আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে।'

"নূহ বললেন : 'আল্লাহ্ কারো উপর রহম করলে আলাদা কথা। তা না হলে আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচানোর মতো কোনো জিনিস নেই।'

"এর মধ্যে এক ঢেউ এসে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল এবং সে ডুবন্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।"

"হুকুম হলো : 'হে জমিন! তোমার সকল পানি গিলে ফেল। হে আসমান! থেমে যাও।'

"সুতরাং পানি মাটিতে বসে গেল এবং ফায়সালা হয়ে গেল। নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে ভিড়ল এবং বলা হলো, যালিমদের কাওম দূর হয়ে গেল।"

"নূহ তাঁর রবকে ডেকে বললেন : 'হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারেরই একজন এবং আপনার ওয়াদা সত্য। আর আপনি সকল বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক।"

"জবাবে বলা হলো : 'হে নূহ! সে আপনার পরিবারের মধ্যে শামিল নয়। সে তো এক বদ কাজের নমুনা। তাই আপনি যার আসল কথা জানেন না সে বিষয়ে আমার কাছে দরখাস্ত করবেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি জাহেলদের মধ্যে শামিল হবেন না।'

"নূহ সাথে সাথেই আরয করলেন : 'হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার ইলম নেই তা আপনার কাছে চাওয়া থেকে আপনার নিকট আমি আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে মাফ না করলে এবং আমার উপর দয়া না করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।'

"হুকুম হলো : 'হে নূহ! [নৌকা থেকে] নেমে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর ও যেসব লোক আপনার সাথে রয়েছে তাদের উপর শান্তি ও বরকত রইল। আর কতক লোক এমনও রয়েছে, যাদের আমি কিছুদিন জীবিকা দান করব। এরপর তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছবে।'

"[হে নবী!] এ সবই গায়েবী খবর, যা আমি আপনার নিকট ওহী করে পাঠাচ্ছি। এর আগে এসব কথা আপনিও জানতেন না, আপনার কাওমও জানত না। সুতরাং আপনি সবর করুন, নিশ্চয়ই শেষ ফলাফল মুত্তাকীদের পক্ষেই হবে।" [হূদ : ২৫-৪৯]

www.pathagar.com

'এতে রয়েছে নিদর্শন'

ডাক্তার আখতার আল কুরআন থেকে উদ্ধৃত করছিলেন একটির পর একটি সূরা। নূহের [আ] ঘটনা সম্পর্কে একটির পর একটি আয়াত। আল কুরআনের একটির পর একটি আয়াতের মালা গেঁথে তিনি উপস্থাপন করছিলেন এক অনবদ্য কাহিনী। তাঁর সাথে যোগ দিলেন তাঁর সাথি ডাক্তার শাহ্ আলম। তিনি বললেন, আল কুরআনের ছাব্বিশতম সূরার ছয় রুকুতেও নূহের [আ] জাতির লোকদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ডাক্তার আলম সূরা শুয়ারা থেকে উদ্ধৃত করলেন :

"নূহের কাওম রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন : 'তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।'

"তারা জবাবে বলল : 'আমরা কি তোমাকে মেনে চলব? অথচ অতি নীচু মানের লোকেরা তোমাকে মেনে চলছে।'

'নূহ বললেন : 'তাদের আমল কেমন, তা আমি কি জানি? তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব তো আমার রবের। হায়! যদি তোমরা একটু সচেতন হতে! যে ঈমান আনে তাকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমি তো মূলত একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

"তারা বললো : 'হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও তবে তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দেয়া হবে।'

"নূহ দু'আ করলেন : 'হে আমার রব! আমার জাতি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এখন আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে নাজাত দাও।'

"শেষে আমি তাকে ও তার সাথিদেরকে একটি জাহাজে তুলে বাঁচিয়ে নিলাম। তারপর বাকী লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশীর ভাগ লোকই মুমিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।" [আশ শুয়ারা : ১০৫-১২২]

বাংলাদেশের 'জাকির নায়েক'

ডাক্তার আখতার ও ডাক্তার শাহ্ আলম আল কুরআন থেকে একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের আলোচনাকে অনেক গভীরে নিয়ে গেলেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম।

আমি ভারতীয় চিকিৎসক ডা: জাকির নায়েককে জানি। আল কুরআনের ওপর তাঁর অসাধারণ দখল দেখে বিশ্বখ্যাত মনীষী আহমদ দীদাত তাঁকে 'দীদাত-প্লাস' উপাধি দিয়েছিলেন। আমি ঠাট্টা করে আমাদের ডাক্তারদেরকে বললাম, আপনাদের মধ্যে কে

www.pathagar.com

আহমদ দীদাত আর কে জাকির নায়েক? আমি আরো প্রশ্ন করলাম তাঁরা কুরআনের মর্মবাণীর এতটা গভীরে ডুব দেয়ার সামর্থ্য কিভাবে অর্জন করেছেন।

ডাক্তার আখতার একটা লাজুক হাসি উপহার দিয়ে বললেন : বাংলাদেশে আমি স্কুল-কলেজে কুরআন জানার সুযোগ পাইনি। সৌদি আরবে এসে আরবী ভাষার সাথে কিছুটা পরিচিত হই। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই আল উলাতেই কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী নিয়মিত কুরআন ক্লাসের আয়োজন করছেন। আমরা দু'জন সেই অধ্যয়নশীল লোকদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

ডাক্তার শাহ আলম বললেন, প্রবাসে কুরআন চর্চা আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে। আমি জীবনকে নতুন ব্যঞ্জনায় অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি। এখানে আসার কারণেই কুরআন আমার জীবন-চলার আলোকবর্তিকা হয়েছে।

শহীদ ভাইও কুরআন বুঝার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার কথা বললেন। সেই সাথে তিনি বললেন, ডাক্তার আখতার আর ডাক্তার শাহ আলম যা অর্জন করেছেন, এটা তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ আর অধ্যবসায়ের ফল। এখানে এসেও অনেকে কুরআন বুঝার ব্যাপারে আগ্রহী হননি। 'লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাক নুড়ি!' নজরুলের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করলেন শহীদ ভাই।

'বাঁচিয়ে দিলাম ও উত্তরাধিকারী বানালাম'

আমরা আবার ফিরে এলাম আগের আলোচনায়। ডাক্তার শাহ আলম বললেন, নূহ [আ] তার জাতির মধ্যে সাড়ে নয়শ বছর বাস করেন। তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তারা অধিকাংশ ছিলেন গরীব ও পেশাদার শ্রেণীর যুবক। জাতির মধ্যে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। অন্যদিকে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিল সমাজের বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী লোক। নূহের [আ] আহ্বানের মূল বিষয় ছিল খুব সহজ, সরল আর সংক্ষিপ্ত। তা হলো আল্লাহর দাসত্ব কবুল করা, সব কাজে আল্লাহকে ভয় করা আর সব কাজে রাসূলের আনুগত্য করা।

হযরত নূহ [আ] যুগ যুগ ধরে এই তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দেয়ার পর বুঝতে পারেন তার জাতির লোকদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খতম হয়ে গেছে। আর তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও সৎ ও ঈমানদার মানুষের জন্ম হবার আশা নেই। তখন তিনি মুনাজাত করলেন :

"হে পরওয়ারদিগার! তুমি তাদেরকে ছেড়ে দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশে যে-ই জন্ম নেবে সে-ই হবে চরিত্রহীন ও কঠোর সত্য অস্বীকারকারী।" [সূরা নূহ : ২৭]

ডাক্তার আখতার এরপর পর্যায়ক্রমে সূরা ইউনুস, সূরা মুমিনুন, সূরা আনকাবূত, সূরা আস-সাফফাত ও সূরা আল কামার থেকে হযরত নূহের [আ] কাহিনী আমাদেরকে শুনিয়ে গেলেন :

www.pathagar.com

আল কুরআনের দশম সূরা 'ইউনুস'। তাতে বলা হয়েছে :

"তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনিয়ে দিন। ঐ সময়কার কথা যখন তিনি তার কাওমকে বলেছিলেন : 'হে আমার দেশবাসী! যদি তোমাদের মধ্যে আমার থাকা ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদেরকে সচেতন করা তোমাদের জন্য অসহনীয় হয়ে গিয়ে থাকে তবে [জেনে রাখ] একমাত্র আল্লাহরই উপর আমি ভরসা করি। তোমরা তোমাদের শরীকদের সাথে নিয়ে এক সাথে ফায়সালা করে নাও এবং তোমরা যে পরিকল্পনাই করেছ তা ভাল করে ভেবে দেখ, যাতে কোন দিক দিয়ে তা তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর তোমরা তা আমার বিরুদ্ধে কাজে পরিণত কর এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। [এতে আমার কী ক্ষতি হয়েছে?] আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছেই আছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, [কেউ মানুক, আর নাই মানুক] আমি নিজে যেন মুসলিম থাকি।'

"তারা তাঁকে মানতে মানতে অস্বীকার করল। এর ফলে আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানালাম। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল [তবু যারা মেনে নিল না] তাদের কী দশা হয়েছে।" [সূরা ইউনুস : ৭১-৭৩]

আল কুরআনের তেইশতম সূরা 'মুমিনুন'। তাতে বলা হয়েছে :

"আমি নূহকে তার কাওমের নিকট পাঠালাম।

"তিনি বললেন : 'হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?'

"তার কাওমের সরদারদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল : 'এ লোকটি তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তোমাদের উপর নেতা হতে চায়। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতে চাইতেনই তাহলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। [মানুষ রাসূল হয়ে আসে] এমন কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের সময়ও শুনিনি। আসলে কিছুই না, লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু সময় অপেক্ষা কর [হয়তো ভালো হয়ে যাবে]।'

"নূহ বললেন : 'হে আমার রব! এরা যে আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল, এখন আপনিই আমাকে সাহায্য করুন।

"আমি তার প্রতি ওহী পাঠালাম : 'আমার তদারকীতে আর আমার ওহি অনুসারে একটা নৌকা তৈরি করুন। তার পর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলায় পানি উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে যান। আপনার

www.pathagar.com

পরিবার-পরিজনকে সাথে নিন, একজন ছাড়া, যার বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে। আর যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলবেন না। তারা অবশ্যই ডুবে মরবে।'

"তার পর যখন আপনি ও আপনার সাথীগণ নৌকায় সওয়ার হয়ে যাবেন তখন বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দিয়েছেন।' আরও বলুন : 'হে আমার রব! আমাকে বরকতময় জায়গায় নামিয়ে দিন এবং আপনিই নামার জন্য ভালো জায়গা দিতে পারেন।'

"নিশ্চয়ই এ কাহিনীতে ভালো নিদর্শন রয়েছে। আর আমি তো পরীক্ষা করতেই থাকি।" [সূরা মুমিনুন : ২৩-৩০]

পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর

ঊনত্রিশতম সূরা 'আনকাবূত'-এ বলা হয়েছে :

"আমি নূহকে তার কাওমের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে ফেলল, যখন তারা যালিম ছিল। তারপর আমি নূহকে এবং নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং [ঐ নৌকাটিকে] আমি দুনিয়াবাসীর জন্য একটা শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।" [সূরা আনকাবূত : ১৪-১৫]

'সালাম নূহের প্রতি'

আর সাইত্রিশতম সূরা 'আস-সাফফাত'-এর বর্ণনা তো একটি সদ্য-রচিত অনুপম সনেটের মতো :

"আমাকে [এর আগে] নূহ ডেকেছিলেন। [তোমরা লক্ষ্য কর] আমি কত ভালো জবাবদাতা ছিলাম।

"আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহাবিপদ থেকে নাজাত দিলাম।

"শুধু তার বংশধরকেই বাকী রাখলাম।

"আর তার পরের বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ও গুণের চর্চা জারি রাখলাম।

"সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম।

"আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।" [সূরা সাফফাত : ৭৫-৮০]

কে আছে শিক্ষা নেবার?

আল কুরআনের চুয়ান্নতম সূরা 'আল কামার'-এ বলা হয়েছে :

"এদের আগে নূহের জাতিও অস্বীকার করেছে। তারা মিথ্যা আরোপ করেছে আমার বান্দা নূহের প্রতি; আর বলেছে 'এ লোকটি পাগল'। এ ছাড়া তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে।

১০—

www.pathagar.com

"শেষে সে তার রবের উদ্দেশে বলল : 'আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। এখন তুমি প্রতিবিধান কর।'

"তখন আমি আসমানের দরজাগুলো খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; আর যমীন বিদীর্ণ করে পরিণত করলাম প্রচণ্ড ঝর্ণাধারায়। সব পানি এক জায়গায় মিলিত হলো এক পরিকল্পিত কাজে।

"আর নূহ্‌কে আমি কাঠ ও পেরেক দিয়ে তৈরি কিশতীতে চড়িয়ে দিলাম যা আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে চলছিল। এ ছিল সে ব্যক্তির জন্য আমার একটি পুরস্কার যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিল।

"সে বাহনকে আমি [পরবর্তী মানুষদের জন্য] একটি নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। কে আছে [আজ তা থেকে] শিক্ষা গ্রহণ করার?" [সূরা আল কামার : ৯-১৫]

'জাকির নায়েক'-এর আলোচনা শুনতে শুনতে আমি শৈশবে ফিরে যাই। দাদার কাছে প্রথম আমি নূহ নবীর কিস্‌সা শুনি। এরপর আমার চাচাতো ভাই জনাব সিরাজুল হক সুন্দর শক্ত মলাটের একটি বই আমাকে উপহার দেন। বইটির নাম মনে নেই। তবে তাতে ছিল নবীদের কিস্‌সা। তখন আমি প্রাইমারীর ছাত্র। আমি সে বই পড়ে নূহের কিশতীতে ভেসে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করি। সে আনন্দে আমার সাথে শরিক ছিল নানা জাতের পাখির কলরব।

এর পর নূহ [আ] সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করেছি। নূহ [আ] সম্পর্কে মানুষের এখনো অফুরান আগ্রহ। বিশ্ব সংস্কৃতিতে নূহ নবী দখল করে আছেন এক বিশিষ্ট স্থান। কিছুদিন আগেও খবর দেখেছি নূহ নবীর জাহাজের খোঁজে মানুষ অভিযান চালাচ্ছে। একজন মহাকাশ অভিযাত্রী নাকি নূহ নবীর জাহাজের কিছু চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন আরারাত পর্বতমালার জুদা পাহাড়ে।

নূহ নবীর সেই কিশতী যেন আজো বিশ্বাসী মানুষদের বহন করে ছুটে চলেছে নানা অবিশ্বাস আর সংশয়ের উপত্যকা অতিক্রম করে। সত্য ও মিথ্যা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসীদের কিশতী সঠিক বন্দর খুঁজে নিয়েছে সব সময়। আর এখন এই চারজন যাত্রী আমরা নূহের কিশতীতে ভাসতে ভাসতে ছুটে চলেছি মাদায়েন সালেহর উপত্যকায়। সালেহ নবী ও তাঁর অলৌকিক উটের জন্য বিখ্যাত এই 'ওয়াদি উল কুরা'।

শহীদ ভাই আল কুরআনের সূরা রূম থেকে উদ্ধৃত করলেন :

"এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের আগে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম দেখতে পেত। ..." [সূরা রূম : ৯]

তাওরাতে নূহের নৌকা

ডা: আখতার বলছিলেন অতীত জাতিসমূহের কথা। আল কুরআনের পঁয়তাল্লিশ জায়গায় নূহের [আ] কথা এসেছে। নূহের [আ] পর আদ জাতির বিবরণ। আদ জাতির পর সামূদ জাতি।

www.pathagar.com

আদ জাতির সম্পর্ক ছিল হযরত হূদের [আ] সাথে। আর সামূদ জাতির সাথে সম্পর্ক ছিল সালেহের [আ]। আদ ও সামূদ জাতির পূর্ব পুরুষ ইরাম ছিলেন নূহের [আ] দৌহিত্র।

কথায় কথায় মানব বংশধারা সম্পর্কে আমরা তাওরাত-এর আলোচনায় ডুবে গেলাম।

তাওরাতের বর্ণনা মতে নূহ [আ] ছিলেন হযরত ইদরীসের নাতি। ইদরীস [আ] ৩৬৫ বছর পৃথিবীতে বাস করার পর আল্লাহ্ তাকে তুলে নেন। হযরত ইদরীসের ৬৫ বছর বয়সে তার এক ছেলে মুতাওয়াশ্‌শালাহ-র জন্ম হয়। মুতাওয়াশ্‌শালাহ বেঁচেছিলেন ৯৬৯ বছর। ১৮৭ বছর বয়সে তার ছেলে লামাক-এর জন্ম হয়। লামাক-এর ১৮২ বছর বয়সে জন্ম হয় তার ছেলে হযরত নূহের [আ]। [তাওরাত, জন্ম পুস্তক, ৫ম অধ্যায়, ২১-২৯ পংক্তি]।

ডা: শাহ্ আলম বললেন, কোন কোন বর্ণনায় হযরত ইদরীসকে হযরত আদমের সপ্তম সিড়ির লোক বলা হয়েছে। সে হিসাবে নূহ [আ] ছিলেন আদমের [আ] নবম অধস্তন পুরুষ। আবার কোন কোন বর্ণনামতে ইদরীস [আ] ছিলেন বনী ইসরাইলের নবী।

শহীদ ভাই বললেন, প্রত্যেক নবীর নির্দিষ্ট মিশন ছিল। আল কুরআনে নবীদের কাহিনী বলার উদ্দেশ্য মানব জাতিকে সেই মিশনের সাথে যুক্ত করা। নিছক ইতিহাসের ধারা বিবরণী দেয়া আল কুরআনের উদ্দেশ্য নয়। মানুষ যাতে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে ফারাক বুঝতে পারে সে জন্যই কুরআনে বিভিন্ন জাতির ঘটনা বলা হয়েছে।

আমি মুগ্ধ হয়ে দুই ডাক্তারের মুখে শুনছিলাম ইতিহাসের আলোচনা। ডা: শাহ্ আলম আমার চুপ থাকা দেখে জানতে চাইলেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কি-না। বললাম, আপনাদের কথা শুনতে শুনতে শিকড়ের অনেক ভিতরে ঢুকে গেছি। সেখান থেকে আমার আওয়াজ কি শুনা যাবে?

সবাই হেসে উঠলেন। আমি আমার প্রিয় কবিতার পংক্তি আওড়ালাম :

নানান বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগত ভরমিয়া দেখি
একই মায়ের পুত ॥

শহীদ ভাই বললেন : এই জগৎ সংসারে আমরা সবাই একই মায়ের পুত। তাওরাত আর কুরআনের আলোচনায় সে কথাটা গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে। বিপদের সময় আমাদের পূর্ব পুরুষগণ নূহের [আ] একই নৌকার চড়নদার ছিলেন। আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কটা তাই সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ডা: আখতার বললেন, নূহের [আ] নৌকা তৈরির ঘটনা কুরআনের তুলনায় তাওরাতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এসেছে। তাওরাতের 'জন্ম পুস্তক'-এর সাত ও আট অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

"তুমি কাঠ দিয়ে একটি নৌকা তৈরি কর। আর নৌকায় বিভিন্ন কোঠা তৈরি করবে। নৌকাটি তিনশ হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া আর তিরিশ হাত উঁচু হবে ...আর জীব-জন্তুর পুরুষ ও স্ত্রী প্রজাতির এক-এক জোড়া তোমার সাথে নৌকায় নেবে। পশু-পাখির এক-এক জোড়া এবং পৃথিবীতে যা আছে তা নৌকাতে নিতে হবে যাতে তারা বেঁচে থাকে। আর তুমি সব রকমের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করবে...। নূহ [আ] সব কাজই ঠিকমত করলেন।" [তাওরাত, জন্ম পুস্তক, সপ্তম অধ্যায়, পংক্তি ১২-১৩; অষ্টম অধ্যায় পংক্তি ৩-৫]

নূহের [আ] প্লাবন সম্পর্কে তাওরাতে বলা হয়েছে :

'এক নাগাড়ে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়। এক নাগাড়ে ১৫০ দিন পর্যন্ত যমীনের উপর পানি বাড়তে থাকে। এর পর পানি কমতে কমতে আরো ১৫০ দিন অতিবাহিত হয়। শেষে নৌকা আরারাত পর্বতে স্থির হয়।'

দিনক্ষণের এরূপ বিবরণ আল কুরআনে নেই।

জুদি পর্বত বা 'কোহে নূহ'

ডাঃ আখতার বললেন, তাওরাতের বিবরণ অনুযায়ী নূহের [আ] নৌকা ভিড়ার স্থান হলো আরারাত পর্বত। আর আল কুরআনের সূরা হূদে সে জায়গাটি হলো জুদি পর্বত। এই দুই বিবরণে মৌলিক তফাত নেই। আরারাত এক বিশাল বিস্তীর্ণ পর্বতমালা। এই পর্বতমালা বর্তমান ইরান ও তুর্কিস্তানের সীমান্ত জুড়ে অবস্থিত। তুর্কিস্তানের অংশটাই 'আরারাত' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই আরারাত পর্বতমালার একটি পর্বতে নূহের [আ] নৌকা ভিড়েছিল। তার নাম জুদি। ইরানীরা এই পর্বতের নাম দিয়েছেন 'কোহে নূহ' বা নূহের পাহাড়।

ডাঃ শাহ আলম প্রশ্ন তুললেন, নূহের [আ] মহাপ্লাবন কি কোন বিশেষ এলাকায় সীমিত ছিল? না-কি তা সারা দুনিয়াকে ডুবিয়েছিল?

এ সম্পর্কে একটি মত হলো : নূহের [আ] জাতির এলাকাই শুধু সে বন্যায় প্লাবিত হয়। সে সময় পৃথিবীর মানব বসতি শুধু নূহের [আ] জাতির মধ্যেই সীমিত ছিল। আর এ জাতির লোকেরাই আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল। তাই নূহের [আ] এলাকাতেই শাস্তি নেমে আসে। দুনিয়া জুড়ে এ ঘটনা ঘটলে এই মহা প্রলয়ের নিদর্শন সবখানে পাওয়া যেতো।

আরেকটি মত হলো : এই বন্যায় সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন উঁচু পাহাড়-পর্বতে নানা জলজ জীব-জন্তুর অস্থি বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাতে বুঝা যায় কোন না কোন সময় এইসব গিরি চূড়া পানিতে ডুবেছিল।

ডাঃ আখতার বললেন, এ নিয়ে তর্কের খুব বেশী গুরুত্ব নেই। নূহ নবীর প্লাবন ছিল খুবই ভয়াবহ। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আরারাত পর্বতমালার সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এই পানিতে নিমজ্জিত হয়। এই শৃঙ্গের উচ্চতা চৌদ্দ হাজার তিনশ ফুট। আর দ্বিতীয়

www.pathagar.com

গিরিচূড়ার উচ্চতা দশ হাজার তিনশ ফুট। বাণের পানি এতটা উঁচুতে পৌছেছিল। এর ফলে ইরাক ও তার আশ-পাশের বিশাল-বিস্তীর্ণ এলাকায় কী দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা আন্দায করতেও কষ্ট হয়। পৃথিবীর অন্যান্য এলাকাও এই প্রলয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার কথা নয়।

নূহের [আ] তিন উত্তরাধিকারী : সাম হাম ও ইয়াফেস

শহীদ ভাই এরপর নূহের [আ] বংশধারা সম্পর্কে কথা তুললেন।

ডা: শাহ্ আলম মানব বংশধারার একটি বিবরণ আমাদের শুনালেন। বললেন : এ বন্যার সময় নূহের [আ] এক ছেলে কেনা'ন তার বাবার কিশতীতে উঠেনি। বাণের পানিতে ডুবে সে মারা যায়। কেনা'ন ছাড়া নূহের [আ] আরো তিন ছেলের তথ্য পাওয়া যায়। তারা হলেন সাম, হাম ও ইয়াফেস। নূহের [আ] এই তিন উত্তরসুরীর নামে পৃথিবীতে তিনটি বংশধারা সৃষ্টি হয়। এই বংশধারা হলো বনু সাম, বনু হাম আর বনু ইয়াফেস।

তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী আরব উপদ্বীপ এলাকার বাসিন্দারা ছিলেন ইয়াফেস-এর বংশধর।

হামের চার ছেলে ছিলেন কুশ, মাসরাইম কেনআন ও ফুলু। ইরাকের বাবেল শহরের প্রথম বাদশাহ নমরুদ ছিলেন হামের ছেলে কুশ-এর বংশধর।

অন্যদিকে সামের ছেলেরা ছিলেন ইলাম, লুদ, আরফনহাশদ, আশুর ও ইরাম। হযরত ইবরাহীম [আ] হলেন আরফনহাশদ-এর বংশধর।

ইরাম বংশের আদ জাতি

নূহের [আ] মহাপ্লাবনের পর সামের বংশধারা আরব ও তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহের বংশধররা তৎকালীন পৃথিবীতে সভ্যতা নির্মাণে বিশেষ সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে। ইরামের বংশধারাই ইতিহাসে আদ জাতি নামে পরিচিত হয়। এই জাতির নবী হূদ [আ]। ইরামের বংশধারার আরেক শাখা পরে বিখ্যাত হয় সামূদ জাতি নামে। তাদের নবী ছিলেন সালেহ [আ]। হূদ [আ] ছিলেন নূহের [আ] পঞ্চম উত্তর পুরুষ। আদ জাতি ও হূদের [আ] বংশধারা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত এসে মিলিত হয়েছে।

ডা: শাহ্ আলম বলছিলেন আদ জাতির ইতিহাস। ইতিহাসের নানা সূত্র জোড়া দিয়ে তিনি তুলে ধরছিলেন মানব জাতির এগিয়ে চলার কাহিনী।

আল কুরআনের সূরা আ'রাফে আদে ইরাম বা আদ জাতিকে 'খুলাফাউ মিম বা'দে কাওমে নূহ' অর্থাৎ নূহের জাতির পরে প্রতিনিধিত্বশীল জাতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরাম-এর দুই ছেলে ছিলেন আউস ও জাসুর। আউসের বংশধররাই প্রথম আদ বা আদ-ই উলা নামে পরিচিত। জাসুরের ছেলে ছিলেন সামূদ। সামূদের বংশধারা কাওম-ই-সামূদ নামে পরিচিত হয়। আদ ও সামূদ ইরামের বংশধারার দুই শাখা। এই দুই কাওমের কথা আল কুরআনে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ডাঃ আখতার যোগ করলেন : আদ জাতিকে আল কুরআনে বলা হয়েছে 'ইরামাযাতেল ইমাদ'। 'যাতুল ইমাদ' অর্থ সুউচ্চ স্তম্ভ বা উঁচু দালানের অধিকারী। ইরাম-এর বংশধর এই আদ জাতির লোকেরা উঁচু খিলানওয়ালা বড় বড় দালান তৈরি করতো। এ জন্যই তাদেরকে 'ইরামাযাতেল ইমাদ' বা উঁচু স্তম্ভধারী ইরাম বংশ [Iram of Pillers] বলা হয়েছে।

আদ জাতির 'আহকাফ' এলাকা

ডাঃ শাহ্ আলমের বিবরণ আরো এগিয়ে যায় : সামের নামে আদ জাতির আদি নিবাস পরিচিত হয়েছে সাম বা সিরিয়া নামে। আদ জাতির তেরোটি শাখা-প্রশাখা ইয়ামান থেকে শুরু করে আরব সাগরের তীরে দক্ষিণ আরবের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পর এই সাগর উপকূল থেকে নিয়ে বর্তমান ইরাক পর্যন্ত তাদের বিস্তার ঘটে।

ডাঃ আখতার বললেন : ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক বিবরণীকার ও সীরাত প্রণেতা ইবনে ইসহাক আদ জাতির আবাসভূমি ওমান থেকে ইয়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ করেন। এ থেকে বুঝা যায়, বর্তমান ইয়ামান, হাদরামাউত, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি এলাকায় তাদের বাস ছিল। এই এলাকা থেকে আর কিছুদূর এগুলেই সাম বা সিরিয়া ও জর্দান। সেদিক থেকে এই জাতির অবস্থান ছিল বর্তমান সৌদি আরবের দক্ষিণ-পুব-উত্তর তিন দিক ঘিরে। অর্থাৎ পশ্চিমে লোহিত উপকূলবর্তী হিজায ছাড়া বাকী সবটা জনপদ জুড়ে আদ জাতির প্রভাব ছিল।

সৌদি আরবের চারপাশের ভূগোল সম্পর্কে এবং এ এলাকায় আদ জাতির বসতি সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা পেলাম।

ডাঃ আখতার বললেন : আল কুরআনের সূরা আহকাফের ২১ আয়াতে আদ জাতির কেন্দ্র বলা হয়েছে 'আহকাফ'। প্রাচীন ভূগোল অনুযায়ী আহকাফ ইয়ামান ও হাদরামাউতের উত্তরে ও ওমানের পশ্চিমে অবস্থিত। এ এলাকাটি হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রুব আল খালী'র দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

ডাঃ শাহ আলম বললেন : আধুনিক ম্যাপ-এ এসব জায়গার নাম-পরিচয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব জায়গার রাজনৈতিক মানচিত্রও পরিবর্তন হয়েছে।

ডাঃ আখতার যোগ করলেন : 'আহকাফ' থেকে বেরিয়ে আদ জাতির লোকেরা আশপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্বল জাতিসমূহকে তারা গ্রাস করে। আদ জাতির এই এলাকা সে সময় নানা বিচারে পৃথিবীর শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শক্তি আর প্রযুক্তিতে যারা ছিল তুলনাহীন

ডাঃ আখতার আল কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরেন আদ জাতির পরিচয় : আদ জাতির লোকেরা ছিল দৈহিকভাবে শক্তিশালী। আকৃতিতে তারা ছিল সুঠাম ও বিশাল

www.pathagar.com

দেহী। তাদের ক্ষেত-খামারগুলি ছিল সজীব আর শস্য-শ্যামল। তাদের ছিল সব রকম বাগান আর ছিল মিঠা পানির ঝরণা। আদ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শি ছিল। শক্তি-শৌর্য, গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ায় কোন জাতি তাদের সমান ছিল না। সম্পদ, শক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধিতে এগিয়ে থাকা আদ জাতি সমকালীন সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

আল কুরআনে সূরা শুয়ারায় আদ জাতির সমৃদ্ধির উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই জাতির সাথে তখনকার পৃথিবীতে অন্য কারো তুলনা ছিল না। সূরা ফজরেও আদকে বলা হয়েছে 'তুলনাবিহীন জাতি'। বলা হয়েছে : 'তাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি।' সূরা আরাফে বলা হয়েছে : "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তাদের অবয়ব ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।"

শহীদ ভাই গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই দুই ডাক্তারের সাথে কণ্ঠ মিলালেন। তিনি বললেন : কুরআন থেকে আমরা জেনেছি, আদ জাতির লোকেরা ছিল সমসাময়িক দুনিয়ার সবচে সমৃদ্ধ জাতি। কিন্তু এই সামর্থ্য আদ জাতির লোকদেরকে বিনয়ী হবার পরিবর্তে অহংকারী করে তোলে। আদ জাতি তাদের সম্পদ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করলো না। বরং তারা হয়ে উঠলো লুটেরা, জালেম ও স্বৈরাচারী। কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে তারা হলো বিদ্রোহী। দুর্বল জাতিসমূহকে তারা নিকৃষ্ট বা আতরাফ মনে করলো। দুর্বল জাতিসমূহের ওপর যুলুম করাকে তারা নিজেদের অধিকার মনে করলো। তারা দম্ভের সাথে বলে বেড়াতো : আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? সূরা হা-মীম সাজদাহতে বলা হয়েছে : "...তারা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ছাড়াই নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিল। আর তারা বলল, 'আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী কে আছে?"

'সত্যের শক্তিমান দুশমন'

ডাঃ আখতার বললেন : আল কুরআনের ভাষায় আদ জাতির নেতারা ছিল 'সত্যের শক্তিমান দুশমন'। এ জাতির লোকেরা ছিল 'রবের আয়াতের অস্বীকারকারী' এবং 'রাসূলদের অমান্যকারী'। আর তারা ছিল 'যালেমদের অনুগত'। সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে : "এরাই হলো আদ জাতি। তারা তাদের রবের আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং সত্যের প্রত্যেক শক্তিমান দুশমনকে মেনে চলেছে।"

ডাঃ শাহ আলম বললেন : গোটা আদ জাতিই যুলুমে জড়িয়ে পড়েছিল। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সাহস, শান-শওকত, বিদ্যা-বুদ্ধি মিলিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তারা ছিল অন্ধ। তারা পদানত রাজ্যসমূহে অহংকারের সাথে চলাফেরা করতো। দুর্বল জাতিগুলো তাদের অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তির জন্য চিৎকার করছিল।

শহীদ ভাই বললেন : নূহের [আ] জাতির পতনের পর আদ জাতির লোকেরাই ছিল পৃথিবীতে মূর্তি পূজার প্রবর্তক। তারা বহু শক্তির উপাসনায় লিপ্ত ছিল। তাদের প্রধান

www.pathagar.com

দেব-দেবীর নাম ছিল অদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়ায়ুক ও নসর। তারা তাদের কলাবিদ্যাকে সুন্দর সুন্দর মূর্তি বানানোর কাজে লাগায়। মূর্তি বানানো ছাড়াও আদ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাদের তৈরি উঁচু উঁচু দালান-কোঠা ছিল পৃথিবীতে অতুলনীয়। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তারা দম্ভের সাথে অযথা বিরাট বিরাট স্তম্ভের ওপর উঁচু উঁচু স্মারক-দালান নির্মাণ করতো।

ডাঃ আখতার বললেন : যুলুমের রাজত্বে কখনো স্থায়ী হয় না। আদ জাতির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য হয়। আদ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই আর তাদের যুলুম-নিপীড়নও সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের লুটতরাজ, খুন-খারাবী ও অন্যসব অপরাধমূলক তৎপরতা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আদ জাতিকে এ অবস্থা থেকে ফিরাতে ও সঠিক পথ দেখাতে হযরত হূদ আলাইহিস সালাম দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত হূদ ছিলেন আদ জাতির 'খুলুদ' শাখার লোক। তিনি তার জাতিকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। হযরত হূদ [আ] বললেন : তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করো। বিশ্বাসী ও অনুগত হও। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা সীমালংঘন ও বিদ্রোহের পথ না ছাড়লে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। তোমাদের জায়গায় তখন অন্য কোন জাতিকে নেতৃত্বের অধিকারী বানাবেন।

আদ জাতি হূদকে [আ] বোকা ও যাদুগ্রস্ত বললো। তাকে চ্যালেঞ্জ দিলো, তুমি সত্যবাদী হলে আনো তোমার শাস্তি।

হযরত হূদ বললেন : শাস্তি আনা তো আমার দায়িত্ব নয়। এটা আমার আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার। আমি তো শুধু তার পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছে দেয়ার কাজে নিযুক্ত। অথচ তোমরা না বুঝেই শাস্তি কামনা করছো। এটা তোমাদের চরম বোকামী।

'...আর আমি তাদের মূল কেটে দিলাম'

আদ জাতি তাদের কাজের ফল পেয়ে গেল। তাদের ওপর প্রথমে শাস্তি আসলো মেঘরূপে। আদের লোকেরা বললো : এই মেঘতো আমাদের জন্য বারিবর্ষণ করবে। তারপর তাদের বসতবাড়ী ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকলো না।

এর পর যা ঘটলো তা ছিল বড় মর্মান্তিক। তাদের চোখ-কান-হৃদয় তাদের কোন কাজেই আসলো না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে যুগের সবচে শক্তিশালী জাতি আর পৃথিবীর সবচে বড় সভ্যতা তার সব গৌরব নিয়ে মরুভূমির বালুর নীচে হারিয়ে গেল।

আদ জাতির পরিণতির কথা আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বার বার আলোচনা করা হয়েছে। আল কুরআনে আদ জাতির পরিণামকে মানুষের জন্য নিদর্শনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের অনুরোধে ডাক্তার আখতার 'আদ' জাতির কাহিনী তুলে ধরলেন আল কুরআন এর সূরা আ'রাফ থেকে :

"আমি আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। তিনি বললেন, 'হে আমার

www.pathagar.com

কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে চলবে না?'

"কাওমের সরদাররা, যারা একথা মানতে অস্বীকার করছিল, এর জবাবে বলল, 'আমরা তো দেখছি তুমি বোকামিতে পড়ে আছো। তাছাড়া আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদী।'

"[হূদ] বললেন : 'হে আমার কাওম! আমি বোকামিতে পড়ে নেই। বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতকামী, যার উপর ভরসা করা যায়।'

"তোমরা কি এ কারণে অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে তিনি তোমাদেরকে সাবধান করে দেন? একথা ভুলে যেও না যে, তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদেরকে খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ। হয়তো তোমরা সফল হবে।'

"তারা জবাব দিলো : 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ, যাতে আমরা শুধু এক আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বাদ দিই? আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের উপর ঐ আযাব নিয়ে এসো দেখি, যার ধমকি আমাদেরকে তুমি দিয়ে থাক।'

"[হূদ] বললেন : 'তোমাদের উপর তোমাদের রবের লা'নত ও গযব পড়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে ঐ নামগুলো নিয়ে ঝগড়া করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখছ? এসবের জন্য আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। ঠিক আছে, তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।'

"অবশেষে আমার মেহেরবানীতে হূদ ও তার সাথীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐসব লোকের মূল কেটে দিলাম, যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছিল ও যারা মুমিন ছিল না।' [সূরা আরাফ : ৬৫-৭২]

সূরা আ'রাফ হলো আল কুরআনের সপ্তম সূরা। এই সূরা থেকে তেলাওয়াতের পর ডা: আখতার বললেন : হযরত হূদের [আ] নামে আল কুরআনের এগারোতম সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এই সূরাতে বিভিন্ন অবাধ্য জাতির পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। যেন এসব অতীত নিদর্শন থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। সূরা হূদ-এ আদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"আমি আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রচনা করে রেখেছ।'

"হে আমার কাওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না।

www.pathagar.com

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার প্রতিদান তাঁরই জিম্মায় রয়েছে। তোমরা কি বিবেককে একটুও কাজে লাগাও না?'

"হে আমার কাওম! তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর দিকে ফিরে এস। তাহলে তিনি তোমাদের উপর আসমানের দরজা খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। অপরাধী হয়ে [আল্লাহর অনুগত হওয়া থেকে] মুখ ফিরিয়ে রেখ না।'

"তারা জবাব দিলো, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি। আর তোমার কথায় আমরা আমাদের মা'বুদদের বাদ দিতে পারি না। আমরা তোমার উপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নই। আমরা তো মনে করি, তোমার উপর আমাদের মা'বুদদের কারো গযব পড়ে গেছে।'

"হূদ বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী হয়ে থাক যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা [আল্লাহর সাথে] শরীক করে রেখেছ, এ থেকে আমি মুক্ত আছি। তোমরা সবাই এক সাথে মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার আছে কর এবং আমাকে একটুও ছাড় দিও না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। কোনো প্রাণী নেই যার মাথা তার হাতে নেই। নিশ্চয়ই আমার রব সঠিক পথে আছেন।'

"তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকলে থাক। তোমাদের কাছে আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের বদলে অন্য কাওমকে আনবেন। তখন তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমার রব সব কিছুরই হেফাযতকারী।"

"তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দ্বারা হূদকে ও যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দিয়ে দিলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম।"

"এরাই হলো আদ জাতি। তারা তাদের রবের আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং সত্যের প্রত্যেক শক্তিমান দুশমনকে মেনে চলেছে।'

"অবশেষে এ দুনিয়াতেও তাদের উপর লা'নত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও। শুনে রাখ, আদ জাতি তাদের রবের প্রতি কুফরী করেছে। জেনে রাখ, হূদের কাওম আদ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।" [সূরা হূদ : ৫০-৬০]

"এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন ..."

সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদের বক্তব্য প্রায় একই রকম। এভাবেই বিভিন্ন অবাধ্য জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আরো কয়েকটি সূরায়। আমাদের উৎসাহ আর আগ্রহে ডা: আখতার এরপর আল কুরআনের ছাব্বিশতম সূরা শুয়ারা থেকে আঠারোটি আয়াত

www.pathagar.com

পাঠ করে শুনালেন। এই সূরায় আদ জাতির দাম্ভিকতার কথা বলা হয়েছে। বাহাদুরী দেখানোর জন্য অযথা উঁচু উঁচু স্মারক অট্টালিকা নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। আর দুর্বলদের প্রতি তাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। হূদ [আ] তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি, বাগান ও ঝরনার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে আল্লাহর ভয় ও আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করে সংশোধন হবার আহ্বান জানান। তারা সঠিক পথ অনুসরণ না করলে মন্দ পরিণতি তাদের গ্রাস করবে বলেও তিনি সাবধান করেন। সূরা শুয়ারায় বলা হয়েছে :

"আদ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করলো।

"স্মরণ করো যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন : 'তোমরা ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমার প্রতিদান তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে।'

"তোমাদের একি অবস্থা যে, তোমরা প্রতিটি উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মারক হিসেবে দালান বানিয়ে ফেলছ এবং বড় বড় দালান-কোঠা বানাচ্ছো, যেনো তোমরা চিরকালই থাকবে?"

"যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও করো তখন তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাও। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।"

"তোমরা তাঁকে ভয় করো যিনি তোমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি, বাগান ও ঝরনাসমূহ। আমি তোমাদের ওপর একটি বড় দিনের আযাবের ভয় করছি।"

"জবাবে তারা বলল : 'তুমি নসীহত কর বা না কর, আমাদের জন্য সবই সমান। এসব কথা তো এমনিই চলে এসেছে। আমাদের উপর কোনো আযাব আসবে না।'

"শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা মনে করলো। আর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না। আসল সত্য এটাই যে, আপনার রব বড়ই শক্তিশালী ও দয়াবান।" [সূরা আশ্ শুয়ারা : ১২৩-১৪০]

"কোন কাজে লাগেনি তাদের চোখ-কান-হৃদয়-মন..."

ডাঃ আখতার এর পর তেলাওয়াত করলেন আল কুরআনের ৪৬তম সূরা আহকাফের ২১-২৬ আয়াত :

"এদেরকে আদের ভাইয়ের [হূদ] কাহিনী কিছুটা শুনাও যখন সে আহকাফে তার কওমকে সতর্ক করেছিলো। এ ধরনের সতর্ককারী পূর্বেও এসেছিল এবং তার পরেও এসেছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। তোমাদের ব্যাপারে আমার এক বড় ভয়ংকর দিনের আযাবের আশংকা আছে।

www.pathagar.com

"তারা বললো : 'তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদের প্রতারিত করে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দেবে? ঠিক আছে, তুমি প্রকৃত সত্যবাদী হলে আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাও তা নিয়ে এসো।'

"সে [হূদ] বললো : 'এ ব্যাপারে জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। যে পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি শুধু সেই পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তবে আমি দেখছি, তোমরা অজ্ঞতা প্রদর্শন করছো।'

"পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, বলতে শুরু করলো : 'এই তো মেঘ, আমাদের ওপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে।'

"না! এটা বরং সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

"অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের বদলা দিয়ে থাকি।

"আমি তাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলাম যা তোমাদের দেইনি। আমি তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয়-মন সব কিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু না সে কান তাদের কোন কাজে লেগেছে, না চোখ, না হৃদয়-মন। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে গেল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।" [সূরা আহকাফ : ২১-২৬]

"উপদেশ নেয়ার কেউ আছে কি ?"

আমরা কান পেতে শুনছিলাম আদ জাতির বৃত্তান্ত। আল উলা থেকে মাদায়েন সালেহ যাত্রার কথা ভুলে আমরা যেন বিচরণ করছি আদ জাতির আহকাফ এলাকায়। ডাঃ আখতার আর ডাঃ শাহ আলম চমৎকার দক্ষতার সাথে আমাদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আদ জাতির বাড়ির আঙিনায়। তাদের উদ্যানে, প্রান্তরে।

ডাঃ আখতার বলছিলেন : আদ জাতি যখন হূদের [আ] সতর্ক বাণী শুনলো না, তখন তাদের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি নেমে এলো। পর পর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ থাকলো। তাদের শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ, ফলের বাগান আর পানির ঝরনা শুকিয়ে বালুময় মরুভূমিতে পরিণত হলো। তার পরও আদ জাতির লোকেরা সংশোধন হলো না। এরপর আট দিন সাত রাত পর্যন্ত তাদের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগিচা ও দালান ধূলিসাত হলো। মানুষ ও জীবজন্তু কীট-পতঙ্গের মতো শূন্যে উড়তে থাকলো। এরপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়লো।

ডাঃ শাহ আলম বললেন : আদ জাতির ওপর নেমে আসা শাস্তি সম্পর্কে আল কুরআনের আরো বেশ কয়েকটি সূরায় বলা হয়েছে। আর কুরআনের ৬৯তম সূরা আল হাক্কাহতে আদ জাতির শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

"আর আদকে কঠিন ঝড়ো-বাতাস দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। যা তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। [সেখানে থাকলে তুমি] দেখতে পেতে তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। যেন খেজুরের পুরনো কাণ্ড। তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি?"

ডাঃ শাহ্ আলম সূরা কামার থেকে উদ্ধৃত করলেন। আল কুরআনের ৫৪তম এ সূরায় আদ জাতির ওপর নেমে আসা আযাব সম্পর্কে বলার ভঙ্গীতে রয়েছে ভিন্ন ছন্দ। সতর্ক করার ধরনও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে :

"আদ জাতি অস্বীকার করেছিল। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধান বাণী। আমি এক বিরামহীন অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পাঠালাম যা তাদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলছিলো যেন তারা সমূলে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধান বাণী। আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?'

ডাঃ আখতার বললেন : সূরা হাক্কাহ ও সূরা কামার-এ আদ জাতির পরিণতিকে খেজুরের পুরনো কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যান্য সূরায় ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন উপমা। এ ক্ষেত্রেও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী অনন্য। আল কুরআনের ৪৬তম সূরা হা-মীম-সাজদাহতে বলা হয়েছে :

"অবশেষে আমি কতক অশুভ দিনে তাদের [আদ জাতি] উপর কঠিন ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমানকর আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো এর চেয়েও বেশি লাঞ্ছনাময়। সেখানে তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।"

আল কুরআনের ৫০তম সূরা যারিয়াত-এ বলা হয়েছে :

"এছাড়া [তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে] আদ জাতির মধ্যে। যখন আমি তাদের ওপর এমন অশুভ বাতাস পাঠালাম যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলো তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেললো।"

৮৯তম সূরা ফজর-এ বলা হয়েছে :

"তুমি কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?"

আদ জাতির পরিণাম সম্পর্কে উপসংহার টানার ভঙ্গীতে ডাঃ শাহ্ আলম বললেন : দুর্বিনীত লোকেরা উষর মরুভূমির বালুর মধ্যে হারিয়ে গেল। প্রাথমিক পর্বের আদ জাতি বা 'আদ-ই-উলা' সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলো। তাদের যাবতীয় নিদর্শনও দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। আরববাসীদের ঐতিহাসিক কথামালা ও কিংবদন্তী থেকেও

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে জানা যায়। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহও এর সত্যতা প্রমাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ আদ-ই-উলা বা প্রথম আদকে বিলুপ্ত জাতি হিসাবেই গণ্য করে থাকেন।

আদ-ই-উখরা ও হূদ [আ]

ডাঃ আখতার বললেন : এরপর আদ জাতির মধ্যে হযরত হূদের [আ] অনুসারীরাই শুধু অবশিষ্ট থাকলো। এটাও আরব ইতিহাসের একটি স্বীকৃত সত্য। ইতিহাসে আদ জাতির এ অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় আদ বা 'আদ-ই-উখরা' নামে খ্যাত। আল্লাহর অনুগত হূদ [আ] ও তারা বিশ্বাসী সাথিরা আদ-ই-উলার ওপর নেমে আসা শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেন।

ডাঃ শাহ আলম বললেন : 'বাহরে মুহীত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী হূদ [আ] আহকাফ থেকে মক্কায় চলে যান। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনা মতে তিনি হাদরামাউতে হিজরত করেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। হাদরামাউতের 'মুকাল্লা' শহরের ১২৫ মাইল উত্তরে তারঈম নামক স্থানে একটি কবর হযরত হূদের [আ] মাযার হিসেবে পরিচিত। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সেখানে বহু লোক সমাগম হয়। প্রতি বছর ১৫ই শা'বান সেখানে 'উরস' হয়। মিসরীয় ইতিহাসবিদ শায়খ আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার তার গ্রন্থ 'কাসাসুল আম্বিয়াতে'ও হযরত হূদ আলাইহিস সালামের নামে পরিচিত এই কবরের কথা উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ আখতার বললেন : এ কবরটি হযরত হূদের কিনা তা ঐতিহাসিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত নয়। তবে দক্ষিণ আরবের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এটিকে হূদের [আ] কবর বলে বিশ্বাস করেন। হূদের [আ] কবর মনে করেই সেখানে মাযার নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক ঐতিহ্য এই এলাকাটিকে আদ জাতির এলাকারূপেই চিহ্নিত করেছে।

ডাঃ শাহ আলম যোগ করলেন : দক্ষিণ আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়। দক্ষিণ আরবের অধিবাসীরা মনে করেন এ এলাকাই ছিল আদ জাতির আবাস ভূমি। হাদারামাউতের কিছু ধ্বংসাবশেষকে এখনো স্থানীয় লোকেরা আদ জাতির বসতি মনে করে।

'ইয়ারাব' থেকে 'আরব'

ডাঃ আখতার বললেন : ১৮৩৭ সালে একজন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি Jaines R. Welles:ed 'হিসনে গুরাব' নামক জায়গায় একটি পুরাতন ফলকের সন্ধান পান। এতে হযরত হূদ আলাইহিস সালামের উল্লেখ রয়েছে। এ ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে বুঝা যায় যে হযরত হূদ-এর শরীয়তের অনুসারীরাই ছিলেন এই ফলকের লেখক। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, হিসনে গুরাবের স্মৃতি ফলকটি হযরত ঈসার জন্মের প্রায়

www.pathagar.com

১৮০০ বছর আগেকার। প্রায় পৌনে চার হাজারের পুরনো এই উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। তা হলো :

"আমরা দীর্ঘকাল এই দুর্গে বাস করেছি। আমাদের জীবন ছিল অভাব-অনটন থেকে মুক্ত। আমাদের খালগুলি নদীর পানিতে ভরে ছিল ...আর আমাদের শাসকগণ ছিলেন অসৎ চিন্তামুক্ত। তারা মন্দ লোক ও ফাসাদকারীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। তারা হূদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদেরকে শাসন করতেন এবং উত্তম ফায়সালাসমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা ছিলাম মু'জিযায় ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।"

ডাঃ শাহ্ আলম বললেন : ইতিহাসে আদ জাতির কয়েকটি উপশাখা প্রসিদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে কুরআনে বর্ণিত 'সামূদ' অন্যতম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আরমিয়ান [Aramean] জাতি। আরমিয়ানরা শুরুতে সিরিয়ার উত্তর এলাকায় বাস করতো। এদের ভাষা আরামী [Aramic] সিরিয়ার ভাষাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

ডাঃ আখতার বললেন : আরব বংশধারা বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেছেন, হূদের [আ] বংশধর ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান ইয়ামানে গিয়ে বাস করেন। ইয়ামানের সব গোত্র ইয়ারাবের বংশধর। ইয়ারাবের নামেই ভাষার নাম হয়েছে আরবী আর ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব। এছাড়া নূহের [আ] নৌকার একজন আরোহী জুরহাম ছিলেন আরবী ভাষী। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। সম্ভবত ইয়ামানে আরবী ভাষার সূচনা হয় ইয়ারাব থেকে আর মক্কায় আরবীর প্রচলন হয় জুরহাম থেকে।

ডাঃ শাহ্ আলম বললেন : আদ জাতির কাহিনী বহুকাল পর্যন্ত আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। হযরত মুহাম্মাদের [সা] সময়ও আদ জাতির ঘটনা ছিল ব্যাপকভাবে আলোচিত বিষয়। ছোট ছোট শিশুরাও আদ জাতির নেতাদের নাম জানতো। তাদের হারানো প্রতাপ ও গৌরব গাঁথা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। আদ জাতি ছিল আরবদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক।

ডাঃ আখতার এ কথায় সায় দিয়ে বললেন : এ কারণে আরবী ভাষায় প্রতিটি প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য 'আদি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে বলা হয় 'আদিয়াত'। অনাবাদী যে জমির মালিক বেঁচে নেই সে জমিকে 'আদিউল আরদ' বলা হয়।

ডাঃ শাহ্ আলম বললেন : প্রাচীন আরবী কবিতায়ও আদ জাতি সম্পর্কে বিস্তর উল্লেখ দেখা যায়। আরবের বংশধারা বিশেষজ্ঞগণও নিজেদের দেশের বিলুপ্ত জাতিদের মধ্যে আদ জাতির নাম প্রথমে উল্লেখ করেন। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার কাহিনীও কিংবদন্তী আর প্রবাদের রূপ নিয়েছিল।

ডাঃ আখতার বললেন : শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদের [সা] কাছে আল কুরআনের মাধ্যমে আদ জাতির যে বিবরণ এসেছে তা সংক্ষিপ্ত ও ইশারামূলক। তবে আল কুরআনের বার্তা

www.pathagar.com

তখনকার বুদ্ধিমান আর ঐতিহ্যগর্বী আরবদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল না। হযরত মুহাম্মদ [সা] নিজেও আদ জাতি সম্পর্কে লোক-প্রচলিত কাহিনী শুনেছেন, এমন নযীর পাওয়া যায়। একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বনু যহল ইবনে শাইবান গোত্রের এক ব্যক্তি আসেন। তিনি ছিলেন আদ জাতির এলাকার অধিবাসী। আদ জাতি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে তার এলাকায় যেসব কিংবদন্তী চালু ছিল তা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনান।

আহকাফ এখন 'রুব আল খালী'

ডাঃ শাহ আলম বললেন : আদ জাতির কেন্দ্রভূমি আহকাফ অঞ্চলই এখন 'রুব আল খালী' নামে পরিচিত। 'রুব আল খালী' মানে শূন্য চতুর্থাংশ। পশ্চিমা পর্যটক ও লেখকগণ 'রুব আল খালী'র তরজমা করেছেন : he Empy Quarer। এই বিস্তীর্ণ পতিত এলাকার বর্তমান অবস্থা দেখে কল্পনাও করা যায় না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো।

আমি চুপচাপ শুনছিলাম আলোচনা। 'রুব আল খালী'র প্রসঙ্গ আমাকে আবেগাপ্লুত করলো। বললাম : আমি রিয়াদ থেকে সৌদি আরবের দক্ষিণ অঞ্চলে আবহা যাওয়ার পথে রুব আল খালীর কিছু অংশ অতিক্রম করেছি।

ডাঃ আখতার উৎসাহিত হয়ে বললেন : প্রাচীন ইতিহাসের আহকাফ এলাকাই এখনকার রুব আল খালী। এটি সমগ্র আরব উপদ্বীপের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ধারাবাহিক মরু প্রান্তর [larges : coninuous sand area]। এই মরু প্রান্তরের বড় অংশ পড়েছে সৌদি আরবে। দক্ষিণ সৌদি আরব, উত্তর-পশ্চিম ইয়ামান, ওমানের পশ্চিমাংশ আর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দক্ষিণ ভাগ জুড়ে রয়েছে এই খা-খা-ঠা-ঠা শূন্য বে-বাহা প্রান্তর।

ডাঃ শাহ আলমও কম যান না। রুব আল খালীর ব্যাপারেও তিনি ডাঃ আখতারের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বললেন : রুব আল খালীর সবচে বেশী বিস্তার ঘটেছে উত্তর দিকটায়। আর সংকোচন ঘটেছে পুব প্রান্তে। উত্তর অঞ্চলে পুব-পশ্চিমে রুব আল খালীর দৈর্ঘ্য এক হাজার কিলোমিটার। পশ্চিম অঞ্চলে এ মরুভূমির বিস্তার উত্তর-দক্ষিণে আটশ কিলোমিটার। আর পুব দিকটায় উত্তর-দক্ষিণে এর পাড়ি তিনশ কিলোমিটার।

ডাঃ আখতার বললেন : আহকাফ এলাকা সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে আবুল আ'লা মওদূদী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৮৪৩ সালে ব্যাভেরিয়ার এক সৈনিক এ মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তসীমায় পৌঁছেন। হাদরামাউতের উত্তরাঞ্চলের উচ্চ ভূমি থেকে বিশাল এই মরুপ্রান্তর তিনি এক হাজার ফুট নীচুতে দেখতে পান। তিনি দেখেন, বিশাল এই মরুভূমিতে মাঝে-মধ্যে কিছু সাদা ভূমিখণ্ড আছে। সেখানে কোন বস্তু পড়লে

www.pathagar.com

তা দ্রুত বালুর নীচে তলিয়ে যায়। এই সৈনিক উল্লেখ করেন : আরব বেদুইনরা এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় করে। কোন কিছুর বিনিময়েই তারা মরু-অভ্যন্তরে যেতে রাজি হয় না। এই যেদী সৈনিক তখন একাই সেখানে চলে যান। তিনি দেখেন যে সেখানকার বালু একেবারে মিহিন পাউডারের মত। তিনি দূর থেকে তার মধ্যে একটি দোলক নিক্ষেপ করেন। ৫ মিনিটের মধ্যেই সেটি তলিয়ে যায়। যে রশির সাথে দোলকটি বাঁধা ছিল তার প্রান্ত গলে যায়।

ডা: শাহ্ আলম বললেন : মূলত তেল আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমাদের নযর পড়ে এই মরুভূমির প্রতি। রুব আল খালীকে ঘিরে বিদ্যমান ভয় ও রহস্যকে জয় করার জন্য চলে একের পর এক দু:সাহসিক অভিযান। বারট্রাম থমাস নামক এক ব্যক্তি ১৯৩১ সালে এ এলাকা সফর করেন। এর পর ১৯৩২ সালে সেন্ট জন ফিলবী এই শূন্য প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সৌদি আরব সম্পর্কে ফিলবীর বিবরণ এখন ইতিহাসের অংশ। ফিলবী সৌদি বাদশাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনেও সক্ষম হন। এর পর ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে উইলফ্রেড থেসাইগার দুই দুইবার রুব আল খালীর মধ্য দিয়ে তার দু:সাহসিক সফর অভিযান চালিয়ে সফল হন। উইলফ্রেড থেসাইগার [Wilfred : hesiger]-এর ১৯৪৫-১৯৫০ সালের বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'Arabian Sand's-এ এই মরুভূমিকে বিশ্বের নিষ্ঠুরতম মরুপ্রান্তরগুলোর অন্যতম [One of : he cruelles : deser : in : he world] বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডা: আখতার যোগ করলেন : রুব আল খালী নি:সন্দেহে পৃথিবীর সবচে চরম ভাবাপন্ন এলাকাগুলোর অন্যতম। গরমের সময় এর তাপমাত্রা ষাট ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ১৪২ ডিগ্রী ফারেন হাইট অতিক্রম করে যায়। কিন্তু এই একই সময়ে রাতের তাপমাত্রা কমতে কমতে হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়। আর এ মরুভূমি কোন সমতল এলাকাও নয়। মরুভূমির অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে বয়ে চলা মরু হাওয়া অনবরত পাল্টে দেয় এর সকল চিহ্ন আর নিশানা। আজ যেখানে বালুর বিশাল পাহাড় তা মরুঝড় উড়িয়ে নিয়ে জড়ো করে অন্য কোন খানে। মরুভূমিতে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে সাগরের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ। পরক্ষণেই তা মিশে নিচ্ছে নতুন রূপ। তবে রোদে পুড়ে শুকিয়ে যাওয়া কিছু শুকনো বালির শক্ত পাহাড়ও দেখা যায়। এসব বালিয়াড়ি কোথাও কোথাও হাজার ফুটের বেশি উঁচু হয়ে আইফেল টাওয়ারের উচ্চতাকে হার মানায়।

শহীদ ভাই বললেন : এই চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই কিন্তু এখানে তেল আবিষ্কারে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমারা। আপনারা যে থেসাইগারের কথা বললেন, তার অভিযানের সময়ই তো এই মরুভূমিতে ১৯৪৮ সালে বিশ্বের বৃহত্তম তেলক্ষেত্র 'গাওয়ার' আবিষ্কার করা হয়। এরপরে কিদান, শেবাহ আর রামালার মতো তেলক্ষেত্রগুলো একের পর এক আবিষ্কৃত হয়েছে। শেবাহ 'অয়েল ফিল্ড' রুব আল খালীর একেবারে মাঝখানে অবস্থিত।

১১—

www.pathagar.com

ডাঃ শাহ আলম তেল থেকে আলোচনাকে রুব আল খালীর আবহাওয়ায় ফিরিয়ে আনলেন। বললেন : এই বিজন শূন্য মরুভূমি এক সময় জনপদ ছিল। হাজার হাজার বছর আগে এই প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য কাফেলা এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় সফর করতো। সুগন্ধি কাঠের সওদা বয়ে নিত সওদাগররা। উঁচু উঁচু দালানের অধিপতি আদ-ই-ইরাম তাদের বাণিজ্য আর রাজত্বের পসরা বয়ে বেড়াতো এ দ্বীপদেশে। তাদের স্বাস্থ্যবান গৃহপালিত পশু এখানকার সবুজ চারণভূমিতে বিচরণ করতো। সেসব নগর-জনপদ আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন তেলকে কেন্দ্র করে এই মরুভূমিতে ধীরে ধীরে আবার আবাদ হচ্ছে নতুন সভ্যতার।

ডাঃ আখতার বললেন : রুব আল খালীর প্রান্ত ঘেঁষে কিছু কিছু উপজাতীয় জনবসতির সন্ধান পাওয়া যায়। নাজরান এলাকায় এই উপজাতীয়দের একটি বড় বসতি রয়েছে। রুব আল খালীতে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হওয়ার পর এসব উপজাতীয় জনপদের সাথে ধীরে ধীরে সড়ক সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। পানির উৎস আর তেল উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে স্থাপিত হয়েছে নানারূপ সংযোগ। এভাবে আদ জাতির আদি ভূমির সাথে বর্তমান নাগরিক সভ্যতার সংযোগ ক্রমেই বাড়ছে।

কথায় কথায় আমরা সামূদীয় সভ্যতার পাদপীঠ আমাদের গন্তব্য মাদায়েন সালেহের একেবারে কাছে চলে এলাম।

[রুব আল খালী সম্পর্কে সর্বশেষ খবর এখানে পাঠককে জানিয়ে রাখি। ২০০৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সৌদি আরবের ভূতত্ত্ব জরিপ বিভাগের উদ্যোগে রুব আল খালীতে এক অনুসন্ধানী অভিযাত্রা চালানো হয়। সৌদি আরবের ৮৯ জন পরিবেশবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানী এ অভিযানে শরীক হন। এছাড়া এই দলে ছিলেন বেশ ক'জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ। শূন্য প্রান্তরে তারা রোদে পোড়া শুকনো বালির পাহাড় বা Sand dune গুলোতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তারা সেখানে খুঁজে পান বিভিন্ন ধরনের প্রাণীজ ফসিল, যা জনপদ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বসবাসের নির্দেশ দেয়। প্রাণীজ ফসিল ছাড়া তারা এখানে খুঁজে পেয়েছেন বহু উল্কাপিণ্ডের নিদর্শন। এই অভিযানে তারা ৩১টি নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ২৪ প্রজাতির পাখিরও সন্ধান পান। রুব আল খালীর ভয়াবহ নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় এ প্রাণীকূল কীভাবে জীবন ধারণ করছে, তা এই বিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন বিস্ময়। সব মিলিয়ে এই ভূতত্ত্ববিদগণ তাদের অভিযানের ফলাফলকে খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। তারা রুব আল খালীর একটি নতুন নাম দিয়েছেন 'রুব আল ঘালী'। খালী মানে শূন্য আর ঘালী অর্থ মূল্যবান। সেই অর্থে এই ধুসর উষর মরুপ্রান্তর আরব উপদ্বীপের 'শূন্য চতুর্থাংশ' নয়। তাদের কাছে এটি এখন বিস্তীর্ণ আরব ভূমির 'মূল্যবান চতুর্থাংশ!']

আদ-ই-উখরা সম্পর্কে ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বীর বিবরণ

ডাঃ আখতার আর ডাঃ শাহ্ আলম বলছিলেন আদ জাতির ইতিকথা। কথার টানে কথা আসে। আদ জাতির কথাও যেন ফুরায় না। প্রাচীন এই জাতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের

www.pathagar.com

প্রচুর বিবরণ রয়েছে। আজো সে সম্পর্কে আলোচনা চলছে। সে কথাই বলছিলেন আমাদের সফর সঙ্গী দুই প্রবাসী ডাক্তার।

ডাঃ আখতার বললেন : প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস নির্ণয়ে আরব ঐতিহাসিকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে ইয়ামানের ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বি'র নাম সকলের আগে উল্লেখ করা যায়। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে হযরত মুহাম্মাদের [সা] নবুওয়ত পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসের একটি কাঠামো তিনি দাঁড় করেন। পরে আল-তাবারী থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

ওয়াহ্হাবের জন্ম হয় ৩৪ হিজরীতে [৬৫৪ খৃস্টাব্দে] হযরত উসমানের খিলাফতকালে। ১১৪ হিজরীর ১১ মুহাররম [৭৩২ খৃস্টাব্দে] ৮০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ঐতিহাসিক আল যাহাবী উল্লেখ করেন যে, ওয়াহ্হাব চল্লিশ বছর পর্যন্ত কোন প্রাণীকে তিরস্কার করেননি এবং এক নাগাড়ে বিশ বছর তিনি ইশা ও ফজরের মাঝখানে ওজু করেননি।

ওয়াহ্হাব তাওরাত ও ইনজিলসহ আহলি কিতাবের নানা গ্রন্থ ও কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে নবীগণের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-তীজান'-এ আদ জাতি ও ইরামের শহর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেসব প্রাচীন বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'আল-তীজান'-এ দক্ষিণ আরবের অতীত ঘটনাবলী এবং তাদের বিখ্যাত সম্রাটদের অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তর আরবের ওপর দক্ষিণ আরবের প্রাধান্য বিস্তারের বিবরণ এবং তাদের গর্বের কাহিনী এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। 'আল তীজান'-এ বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর বুকে হামীর জাতি ছিল আঁধার রাতে উজ্জ্বল প্রদীপতুল্য।'

'আল তীজান' থেকে জানা যায়, দক্ষিণ আরব বা ইয়ামান তাওহীদের অনুসারী ছিল। তারা কা'বার পবিত্রতা স্বীকার করতো। তাদের কোন কোন সম্রাট কা'বা ঘরে হজ্জ পালন করেন। ইয়ামানের সম্রাটগণ এবং তাদের অতীত নবীগণের বংশধরেরা পৃথিবীর নানা জায়গায় বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করেন। প্রযুক্তি, প্রশাসন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা পারদর্শি ছিলেন। তারা আরবী ভাষায় কাব্য রচনা করেন। তারাই উত্তর আরবকে আরবী হরফের ব্যবহার শিক্ষা দেন।

ওয়াহ্হাবের এই বর্ণনা ইবনে ইসহাকসহ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ অনুসরণ করেছেন।

ইবনে কুতায়বা তাঁর কাছ থেকেই ইবরাহীম ও নমরুদের কাহিনী, ইসমাইলের ইতিহাস, আসহাবে কাহাফ বা গুহার অধিবাসীদের বিবরণ এবং শুয়ায়েব নবী ও তাঁর মাদায়েন শহর সম্পর্কে তথ্য নিয়েছেন। ইবনে খাল্লিকান পৃথিবীর সৃষ্টি, নবীদের ইতিবৃত্ত এবং প্রাচীন যুগের শাসকদের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দেয়া বিবরণের প্রশংসা করেছেন। ওয়াহ্হাবের লেখা 'কিতাব আল মুল্ক' হামিরীয় শাসক ও তাঁদের সমাধি সৌধ এবং তাদের কবিতা সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ।

www.pathagar.com

আবদে শামসের দিগ্বিজয়

ডাঃ আখতার বলছিলেন আদ জাতি সম্পর্কে ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বীর বিবরণের কথা। একটু থেমে তিনি বললেন : হূদের [আ] বংশধর ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ইয়ারাব আহকাফ থেকে ইয়ামানে গিয়ে বাস করেন। ইয়ারাবের বংশধররাই ইতিহাসে 'আদ-ই-উখরা' বা দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত হয়। ইয়ারাবের নাতি আবদে শামস ইয়ামানের বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। তিনিই 'সাবা' নামে পরিচিত হন। 'সাবা' থেকেই কওম-ই-সাবা'র উদ্ভব হয়। হযরত সুলাইমানের সমসাময়িককালে সাবার রাণী বিলকিস ইতিহাসে খ্যাত হন। সাবা নামে আল কুরআনে একটি সূরা রয়েছে। আবদে শামস ওরফে 'সাবা' সম্পর্কেও ওয়াহ্হাব আলোচনা করেছেন।

আবদে শাম্স্ বিন ইয়াশ্জুব বিন ইয়ারাব বিন কাহতান ছিলেন শক্তিমান নৃপতি। সিংহাসনে বসেই তিনি তার দেশের জনগণকে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তিনি বললেন :

"হে কাহ্তানের বংশধর! তোমরা যুদ্ধ না করলে অন্য জাতি তোমাদেরকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করবে। তোমরা অভিযানে না বেরুলে বাইরের শত্রু তোমাদের ওপর হামলা করবে। তোমরা জেনে রাখ, স্পন্দনহীন কোন জাতি দুশমনের হামলার শিকার হলে তাদের পরিণতি হয় অসম্মান আর লাঞ্ছনা। অন্য কোন জাতির দ্বারা আক্রান্ত হবার আগে তোমরা তাই দেশ জয়ে বেরিয়ে পড়ো। অন্য কেউ তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার আগেই তোমরা যুদ্ধ শুরু করো।"

আমরা শুনছিলাম দ্বিতীয় আদ বা 'আদ-ই-উখরা'র কাহিনী। শুনছিলাম নব জাগ্রত ইয়ামানের এক প্রতাপশালী শাসকের বুলন্দ আওয়াজ। যেন মাত্র ক'দিন আগে ঘটে যাওয়া কাহিনী আমাদের পাশে বসে বর্ণনা করছেন সপ্তম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বী।

আব্দে শাম্সের ডাকে জনগণ বিপুলভাবে সাড়া দেয়। আবদে শামস তার বাহিনী নিয়ে বাবেল [ব্যাবিলোনিয়া] অধিকার করেন। এরপর তিনি আরমানিয়ায় অভিযান চালিয়ে ইয়াফেসের বংশধরদের আবাসভূমি দখল করেন। আবদে শামসের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল সিরিয়া। আর এ কাজে ফোরাত ছিল বাধা। তিনি ফোরাত নদীর ওপর সেতু তৈরি করে নদী পার হয়ে সিরিয়ায় পৌঁছেন।

সিরিয়ার প্রাচীন নাম 'সাম'। নূহের [আ] এক ছেলে সামের নামে সাম জাতি ও সাম দেশ। সাম থেকে উৎপত্তি হয় সেমিটিক সভ্যতার। 'সাম' হিমারিয় পরিভাষার শব্দ। আরবীতে 'সাম' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'তিবুন' শব্দ দ্বারা। 'তিবুন' মানে সুন্দর।

সিরিয়া অভিযানের পর আবদে শামস আরো পশ্চিমে নীল নদের কাছে পৌঁছেন। সেখানে মন্ত্রীদের বৈঠকে তিনি ঘোষণা করেন :

www.pathagar.com

'আমি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করতে চাই। এ উদ্দেশ্যে আমি এই সাগরের মাঝখানে একটি শহর নির্মাণ করবো। এই শহর হবে পুব ও পশ্চিমের জনগণের আশ্রয়স্থল।"

আবদে শামস এভাবেই পত্তন করেন একটি শহর। তার ছেলে ব্যাবিলিউন এই শহরের শাসক নিযুক্ত হন। তার নামে এই শহরের নাম হয় ব্যাবিলন। পশ্চিমের হামের বংশধররা এ মিসর শহরের উপকণ্ঠে বসতি গড়েন। আবদে শামস মিসর থেকে ইয়াফেস আর সামের এলাকা পার হয়ে পৌছেন কামুনিয়া'য়। ইয়াফেসের এক ছেলে 'কুত' বাস করতেন এই কামুনিয়ায়।

ব্যাবিলিউনের জন্য বার্তা

আবদে শামস এরপর মিসর থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সিরিয়ায় পৌছেন। সিরিয়ায় বসে তিনি তার ছেলে ব্যাবিলিউনের জন্য রচনা করেন একটি উপদেশমূলক কবিতা :

"ব্যাবিলিউনকে এ বার্তা পৌছে দাও, যাতে আছে জ্ঞান।

আমি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কর্তৃত্ব পেয়েছি

আর সে দায়িত্ব পালন করেছি সুষ্ঠুভাবে।

হামের বংশধরদের কর্তৃত্ব তুমি নিজ হাতে তুলে নাও

আর নিজ শক্তির দ্বারা সে কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করো

তারা বিপথগামী হলে যুদ্ধই হবে উত্তম জবাব।"

মক্কা থেকে সাবা ইয়ামানে ফিরে যান। সেখানে তিনি সত্তরটি নদীকে যুক্ত করে একটি বাঁধের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করেন। বাঁধের নির্মাণ শেষ হবার আগেই পাঁচশ সত্তর বছর বয়সে তিনি মারা যান। সাবা'র এই বাঁধের কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে।

আরবদের প্রথম শোকগাঁথা

দিগ্বিজয়ী আবদে শামস ইতিহাসে পরিচিত হয়েছেন 'সাবা' নামে। সাবা'র মৃত্যুর পর তার পুত্র হামীর বিশাল ইয়ামান সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি তার পিতার স্মরণে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। এটি আরবদের প্রথম 'মর্সিয়া' হিসেবে স্বীকৃত।

ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বী তাঁর বইতে 'তীজান ও ইয়ামানের শাসক' শীর্ষক অধ্যায়ে এ মর্সিয়া উদ্ধৃত করেছেন :

আপনার সময় সম্পর্কে যতই ভাবি, শুধুই অবাক হই

আপনার সময় কিভাবে সেসব কাজ সম্পাদন করলো!

আর আপনার প্রতিপত্তি আর পরাক্রমের দণ্ড কিভাবে হস্তান্তরিত হলো!

কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই আপনি নিশ্চিত করেছিলেন

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা;

www.pathagar.com

আর যখন কোন বিপদ আসে আপনি অতি সহজে করেন তার সমাধান।

হে আবদে শামস্! মর্যাদার চূড়ায় আপনি উপনীত।

এ মর্যাদা আপনার অর্জন, যার কোন নযীর কেউ দেখেনি।

চিরস্থায়ী বসতির জন্য আপনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন;

আর যখন আপনি সে স্থায়ী বাড়ীর দিকে ফিরে যান

সংগৃহীত সেসব সামান হয় আপনার দরকারী পাথেয়।

কসম আমার জীবনের!

আল্লাহর ভয় ছাড়া সে ঠিকানার জন্য আর কোন সম্বল নেই

হ্যা, আল্লাহর ভয় আর উত্তম আমলই সেখানকার স্থায়ী পাথেয়।

আপনার হুকুম আর শাসনের ভিত্তি ছিল হূদের ওপর নাযিল হওয়া ওহি;

আর তাঁর আগের নবীদের প্রতিও ছিল আপনার অকুণ্ঠ ঈমান।

ইরাদা পূরণের জন্য আপনি পরেন কা'বার ইহরাম

যেভাবে হূদ সমাপন করেছিলেন সে ঘরের ইহরাম।

হামীরের শোক গাঁথাটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। এতে আছে এক কুশলী নৃপতির শাসন দক্ষতা আর তাঁর বিপুল ক্ষমতা ও যশের কথা। হূদের [আ] ওপর নাযিল করা খোদায়ী বিধান অনুসারে তিনি দেশ শাসন করেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর থেকে মক্কায় সফর করেন। আর তার আগে হূদ নবী মক্কায় হজ্জ পালন করেন। এসব তথ্য খুবই মূল্যবান।

হামীর ও সামূদ জাতির কথা

আবদে শামস ওরফে সাবা'র পর তার পুত্র হামীরের যমানা। এই সময়েরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বী। হামীর বিন সাবা সিংহাসনে বসেই সৈন্য সংগ্রহ ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে একের পর এক দেশ জয় করেন। পুব দিকে অভিযান চালিয়ে তিনি 'ইয়াজুজ-মাজুজ' সম্প্রদায়কে সূর্যের উদয় রেখায় [দূর প্রাচ্যে] বিতাড়িত করেন। ইয়াফেসের বংশ থেকে ছড়িয়ে পড়া গোত্রসমূহকেও তিনি অধীন করে রাখেন। তুর্কী, যাত, কুর্দী, সাফ্দ, হাযর, কযর, দায়লাম ও ফারগানসহ বহু জাতি তার পদানত হয়।

প্রাচ্যে বিজয় কেতন উড়িয়ে হামীর ফিরেন পশ্চিমের দিকে। বিজয়ের উল্লাস নিয়ে তিনি মক্কায় পৌছেন। মক্কায় তার কাছে হাজির হন হূদের বংশধরের মধ্য থেকে ইয়ামানী কিছু সম্প্রদায়। তারা সামূদ বিন আবির বিন ইরামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হামীরের কাছে ফরিয়াদ জানান।

www.pathagar.com

এ সময় বনু হামের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে তার ভাই ব্যাবিলিউন হামীরের কাছে মিসর থেকে দূত পাঠান। কারণ তাদের পিতা আবদে শামসের মৃত্যুর খবর শুনার পর হামের বংশধরেরা ব্যাবিলিউনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মারী বিন কিনান বিন হামের বংশধারার কিছু গোত্র সিরিয়ায় বাস করতো। আর কুশ বিন কিনান আধিপত্য বিস্তার করেছিল আবিসিনিয়া থেকে নীল নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরে। মিসরকে ধ্বংস করার জন্য তারা সবাই জোট বেঁধে এগিয়ে আসে।

যাতুল আসাদ : সামূদ জাতির কাহিনীর যেখানে শুরু

ওয়াহ্হাবের এই বিবরণ থেকে সামূদ জাতির ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম আভাস পাওয়া যায়। ওয়াহ্হাব লিখেছেন : মক্কা থেকে হামীর ইয়ামানে ফিরে গিয়ে সামূদ জাতিকে সেখান থেকে বের করে দেন। হিজায ভূমির 'আয়লা' নামক স্থানে তিনি তাদের বসতি গড়ার নির্দেশ দেন। তারা 'আয়লায়' 'যাতুল আসাদ' বা নদীর তীর বেয়ে নয্দের পার্বত্য ভূমি পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। জনপদ গড়ে তোলে।

'যাতুল আসাদ' হলো হিজাযের একটি নদী বা 'ওয়াদি'। এ নদীর পানি স্ফটিক পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এর আগে কেউ এ নদীর স্বচ্ছতোয়া পানিতে তাদের পা ভিজায়নি। এই নদী থেকে উটকে পানি পান করানোর জন্য সামূদ জাতি পাথর কেটে রাস্তা বের করে। হিজাযের প্রখর রোদের প্রচণ্ড তাপ থেকে বাঁচার জন্য তারা পাহাড় কেটে ঘর বাড়ী বানায়।

'যাতুল আসাদে'র উর্বর ভূমির দখল নিয়ে কায়েস বিন যুহাইর আল-আবসী আর হুযায়ফা বিন বদর আল-ফাযারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। ইবনে যুহাইরের ঘোড়াকে দাহিস আটক করলে কায়েস কবিতা রচনা করেন :

"যাতুল আসাদের তীরে আমি বিপদে পড়ি

হামল বিন বদর আর তার গোত্রের হাতে

তাদের কোন বংশ মর্যাদা ছিল না, কিন্তু ছিল অহমিকা।

আমার দানশীলতার যে যশ চারদিকে প্রকাশিত

সে গৌরব তারা পেতে চেয়েছিল কোন বদান্যতা ছাড়াই।

কিন্তু যখন আমি কোন প্রতিপক্ষকে শাস্তি দিতে চাই

ভয়ঙ্কর হুঙ্কার তুলে এগিয়ে যাই তার দিকে..."

দিগ্বিজয়ী হামীর ও আরবী বর্ণমালা

হামীর ইবনে সাবা ইয়ামান থেকে সামূদ জাতিকে বিতাড়িত করার পর দামেশকের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। মারী'র বংশধরদের সাথে যুদ্ধ করে তিনি সিরিয়ায় কর্তৃত্ব কায়েম করেন। এর পর তিনি আবিসিনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে নীল নদের তীরে

www.pathagar.com

তাদেরকে পরাজিত করেন। তাদের পিছু ধাওয়া করে হামীর পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যান। শেষে আবিসিনীয়রাও বশ মেনে সিরিয়দের মতোই কর দিতে রাযী হয়। হামীর আরো পশ্চিমে আটলান্টিকের শেষ সীমানায় পৌঁছে কিবতীদের ওপর খারাজ চালু করেন।

ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বী লিখেছেন : হামীর পশ্চিম দেশে ছিলেন একশ বছর। সেখানে তিনি নগরীর পত্তন করেন আর শিল্প-কারখানা স্থাপন করেন।

পশ্চিম থেকে ফিরে হামীর তাঁর লোহার তৈরি অস্ত্র আর পথের ধারের পাহাড়ের গায়ে আরবী লিপি উৎকীর্ণ করেন। এ সব লেখমালা তার শাসনামলকে ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। হামীর স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাঁকে বলছেন : "আল্লাহ... আল্লাহ! হে হামীর!" সেই অলৌকিক পুরুষের কাছে হামীর জানতে চাইলেন, 'আমার জন্য কি কোন নির্দেশ আছে?' জবাবে বলা হলো :

'তুমি পাঠ দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর পবিত্র হরফমালাকে লোহা, পাথর আর কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ করছো। কিন্তু অপবিত্রকে তারও উপরে জায়গা দিচ্ছ। অথচ আল্লাহ্ এ হরফমালাকে মর্যাদা দিয়ে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদের [সা] উপর অবতীর্ণ কুরআনের লিপিরূপে মনোনীত করেছেন। তাই তুমিও একে মর্যাদার সাথে হেফাজত করো। কেননা মহান আল্লাহ্ এটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন আর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা আরবীর বর্ণমালারূপে মনোনীত করেছেন। তুমি আর তোমার সন্তানদের উচিৎ এ বর্ণমালার পরিচর্যা করা। তুমি তোমার সন্তানদেরকে এ লিপি হেফাজত করার জন্য আদেশ করবে।"

হামীরের একটি কবিতা : যৌবনে ভাটার টান শুরু হলে...

পিতা সাবার মতোই হামীর পৃথিবীর সকল আবিষ্কৃত যমিনের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। হামীরের রাজত্বকাল চারশ পঁয়তাল্লিশ বছর স্থায়ী হয়। এ রাজত্বকালের একশ বছর পার হবার পর হামীর একটি শ্লোক রচনা করেন :

"আমি রাজদণ্ডের অধিকারী হয়েছি আর

আস্বাদন করেছি জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ

আর এভাবে মহা গৌরবে রাজত্ব করেছি অনেক বছর

আমি বুঝেছি যৌবনকে আকর্ষণ করে মোহ, কাম আর চপলতা

কিন্তু এক সময় যৌবনে ভাটার টান শুরু হয়

আর তখন অবসান হতে থাকে সকল মোহের।"

আয়লা ও যাতুল আসাদের কথা

কথায় কথায় আমরা সামূদীয় সভ্যতার এককালের কেন্দ্রভূমি মাদায়েন সালেহ'র কাছাকাছি চলে এলাম।

www.pathagar.com

মাদায়েন সালেহর পুরনো নাম হিজর বা হাযর। আল কুরআনের একটি সূরার নামও 'হিজর'। এ কারণে 'হিজর' নামটি অনেকের কাছে পরিচিত।

'হিজর' নিয়ে কথা তুললেন ডাঃ শাহ আলম। ইয়ামানের কাহতান বংশীয় বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন আবদে শামস বা সাবা। তার পুত্র হামীরও পৃথিবীর নানা এলাকা জয় করেন। তার মধ্যে তুর্কিস্তান, কুর্দীস্তান ও ফারগানা এ যুগের পরিচিত নাম। ইবনে মুনাব্বীর ইতিহাসে হামীরের জয় করা এলাকার তালিকায় আরো পাঁচটি নাম পাওয়া যায়। সেগুলো হলো যাত, সাফ্দ, হাযর, কযর ও দায়লাম। হামীরের জয় করা 'হাযর' কুরআনে উল্লেখিত হিজর বা বর্তমান মাদায়েন সালেহ বলে মনে হয়।

আল উলা কি হামীরের সময় 'আয়লা' নামে পরিচিত ছিল? এ প্রশ্নটিও মাথা তুলল আমাদের আলোচনায়।

ইবনে মুনাব্বীর বিবরণ থেকে জানা যায় : সম্রাট হামীর সামূদ জাতিকে ইয়ামান থেকে বের করে দেন। সামূদ জাতির লোকেরা হামীরের নির্দেশে হিজাযের 'যাতুল আসাদ' নদী তীরের উর্বর ভূমি 'আয়লা'য় তাদের নতুন বসতি গড়ে তোলে। তারা নযদের পার্বত্যভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

উটকে পানি খাওয়ানোর জন্য তারা পাথর কেটে রাস্তা বানায়। হিজাযের প্রখর রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য পাহাড় কেটে তৈরি করে ঘরবাড়ী। আল কুরআনে সূরা ফজর ও সূরা হিজর-এ সামূদ জাতির পরিচয় বলা হয়েছে তারা উপত্যকায় পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ী বানিয়েছিল।

সামূদ জাতির 'যাতুল আসাদ' কোথায়? রাসূলের [সা] যুগের 'ওয়াদি আল কুরা'ই কি হামীরিয় 'যাতুল আসাদ'? এ প্রশ্নটি উঠে আসে আমাদের আলোচনায়।

'ওয়াদি' হলো প্রবাহিত নদীর শুকিয়ে যাওয়া নীচুভূমি। এই ঢালু জমিতে কূয়া থেকে সহজে পানি পাওয়া যায়। অধিকাংশ মরুদ্যান এমনি নীচু এলাকায়ই চোখে পড়ে। মরুভূমির ভিতর হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় মরু আরবদের একেকটি কাফেলা কোন না কোন ওয়াদির কাছে থমকে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের প্রাচীন নগর-জনপদ-বাজার-বন্দর যেমন নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, আরব দেশে তেমনি জনপদ গড়ে উঠেছে প্রধানত 'ওয়াদি'কে কেন্দ্র করে। আরবের বহু জনপদের নামের সাথে জীবন-সহায়ক 'ওয়াদি' শব্দটি এভাবেই মিশে গেছে।

হাইয়্যাল দিদানের প্রাচীন এ পথ বেয়ে...

আল উলা থেকে হিজরের পথে একটি নাম-ফলক চোখে পড়লো 'হাইয়্যাল দিদান'। দিদান সড়ক। সুপ্রাচীন দিদান সভ্যতার অন্যতম উৎসভূমি এ প্রাচীন জনপদ। এ সড়কটি দিদান সভ্যতার পরিচয়ের পতাকা বহন করছে।

হাইয়্যাল দিদান ইতিহাস-খ্যাত এক প্রাচীন উপত্যকার পথ। হাজার হাজার বছর আগে

www.pathagar.com

এ পথে হেঁটেছেন নবী সালেহ [আ]। হিজাযের কত শত বাণিজ্য কাফেলা এই পথ অতিক্রম করে গেছে। এই পথেই চাচার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য কাফেলার সাথি হয়েছেন কিশোর মুহাম্মাদ। এ পথই ছিল রাসূল মুহাম্মাদ [সা] ও তাঁর অনুগত সাথিদের তাবুক অভিযানের পথ। দিদানের প্রাচীন ঐতিহাসিক সড়কের এখনকার যাত্রী আমরা পাললিক বাংলাদেশের চার মুসাফির।

ভিতরে ভিতরে আবেগে কাঁপছি আমি।

আমরা কারা? ইরামের বংশধর সামূদের দেশে দ্রাবিড় বাংলার আমরা ক'জন তামাটে বর্ণের লোক। আমাদের উপমহাদেশ কোন মানব গোষ্ঠীর আদি বসতি ছিল না। তবে আর্যরা আসার অনেক অনেক আগে থেকে এ এলাকা ছিল দ্রাবিড়ভূমি। এই দ্রাবিড়দের উৎপত্তিস্থল ব্যাবিলন ও মেসোপটেমিয়া। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকাতেও এ সত্যের স্বীকৃতি রয়েছে। দ্রাবিড়রা হলো মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে বালুচিস্তানের পথ বেয়ে নেমে আসা একটি ঐতিহ্যবাহী মানব স্রোত। সিন্ধু অববাহিকার পথ বেয়ে এ স্রোত আছড়ে পড়েছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনায়।

নূহের [আ] পুত্র সাম। সামের বড় ছেলে আরফাখশাদ। আরফাখশাদের পুত্র কায়নাম। কায়নামের পুত্র শালিখ। শালিখের পুত্র আবির। এই আবির থেকেই কারো কারো মতে নাম হয়েছে 'দারে আবির'। আবিরের ঘর। 'দারে আবির' থেকে পরে জাতি নাম হয়েছে দ্রাবিড়।

সাম থেকে আবির। আবিরের নাতি আবুফীর। সেই থেকে আজকের শহিদুল ইসলাম, আবু আখতার আর শাহ্ আলম। নূহ নবীর পুত্র সামেরও বংশধারা থেকে বেরিয়ে আসা সেই সেমিটিক স্রোতেরই প্রতিনিধি আমরা। আমরা পথ চলছি আমাদের পূর্ব পুরুষদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে।

শহীদ ভাই বললেন : পৃথিবীর সব মানুষ আমরা একই আদমের বংশধর। কিন্তু সেই আদি পিতার সন্তানরা আজ বহু স্রোতে বিভক্ত। তাদের আলাদা পরিচয়কে আল কুরআনে মানব জাতির একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলাদা করার কারণ বলা হয়েছে : 'যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে'। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য থেকে তারা সরে গেছে। দেশের নামে জাতির নামে বর্ণের নামে একজন অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব আর কর্তৃত্ব করতে চাচ্ছে। জাত্যাভিমানের কারণেই সবখানে সব কিছুতে তারা বিভক্ত। ভাইয়ে ভাইয়ে চলছে হানাহানি। পৃথিবীর সকল ভাই-বোনকে বাবা আদমের দোহাই দিয়ে আবার এক মিলন-মোহনায় হাজির করা যায় না?

'...বেড়ানোর জায়গা নয়, কান্নার জায়গা'

আল উলা থেকে মাদায়েন সালেহ। পথ চলতে চলতে প্রাচীন সভ্যতার পুরান দিনের কাহিনীর ভিতরে পুরোপুরি ডুবেছিলাম আমরা। শহীদ ভাই ধাক্কা মেরে আমাদেরকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলেন।

www.pathagar.com

বাস্তবে ফিরে জানালা গলিয়ে বাইরের দিকে চোখ মেলে পথের ধারের বিধ্বস্ত পাহাড়গুলোর দিকে তাকালাম। ফেটে চৌচির হয়ে অদ্ভুত পোড় খাওয়া ভাস্কর্যের মতো হয়ে আছে এসব পাহাড়-পর্বত। প্রাচীন ক্ষত-বিক্ষত ছিন্নভিন্ন প্রায়শ মস্তকবিহীন এ পর্বতমালা এখানে এক ভয়াবহ আবহ সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা যতই সামনে এগুচ্ছি, এ বিদীর্ণ পার্বত্য এলাকার বিপর্যস্ত রূপ ততই প্রকট হয়ে উঠলো। এ জনপদের ওপর দিয়ে এক সময় যে ভয়াবহ দুর্যোগ বয়ে গেছে তা জানান দিচ্ছে এসব ধ্বংস-চিহ্ন। এ যেন মানুষের অহেতুক বাড়াবাড়ি আর অযৌক্তিক বাহাদুরির বিরুদ্ধে এক কঠিন ভ্রূকুটি।

'মাদায়েন সালেহ' নগরীর প্রবেশ দরজায় এসে পৌঁছলাম। মাদায়েন সালেহ আগে চারদিক থেকে উন্মুক্ত ছিল। এখন সেই প্রাচীন নগরীর চারদিক দেয়াল ঘেরা। বিশাল তোরণ পার হয়ে নগরীতে ঢুকতে হয়। এ তোরণের আশে পাশে আগন্তুকদের জন্য নানা নির্দেশনা। তার মধ্যে একটি নির্দেশ হলো : ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ নিষেধ।

কাগজ-পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তোরণ পাড় হয়ে আমরা প্রবেশ করলাম অলৌকিক সেই উটের রাজ্যে। ভয়-বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকালাম 'ওয়াদি আল কুরা'র প্রান্তরের দিকে।

ডাঃ আখতার একটা বিষয় আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে তাবুক অভিযানের সময় এ এলাকা অতিক্রম করেন। তিনি তাঁর সাথিদেরকে মাদায়েন সালেহর শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলো সম্পর্কে বলেন, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা।

রাসূলের [সা] কিছু সাহাবী মাদায়েন সালেহ'র ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরাফেরা করছিলেন। মহানবী [সা] সকলকে এক জায়গায় জমায়েত করে তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি সামূদ জাতি সম্পর্কে বলেন : 'এটি এমন এক জাতির এলাকা, যাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত পার হয়ে যাও। এটা তো বেড়ানোর জায়গা নয়, বরং এ হলো কান্নার জায়গা।'

ডাঃ আখতারের আবেগ-জাগানো আলোচনা যেন আমাদের হিজর সফরকে দেড় হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক তাবুক অভিযানের সাথে যুক্ত করে দিল।

শহীদ ভাইর আবেগের সাথে বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী হও! সুদূর মক্কা থেকে আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আমরা এসেছি কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন দেখে শিক্ষা নিতে। আমাদেরকে তুমি সঠিক জ্ঞান দাও। সঠিক জ্ঞান তো তোমারই কাছে।

শহীদ ভাইর সাথে 'আমীন' বলে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা মাদায়েন সালেহের অন্তর্দেশে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করলাম।

'বিনত বিবি'র প্রাসাদে

মাদায়েন সালেহতে ঢুকার সময় ডানে 'কস্‌র আল ফরিদ' [QASR FARID] ও 'কস্‌র

www.pathagar.com

আল বিন্ত' [QASR AL BIN:]। আর বাম দিকে 'কস্‌র আল সানেহ' [QASR AL SANEH]। দু'দিকে দু'টি সড়ক চলে গেছে। আমরা ডানের সড়ক ধরে সফর শুরু করলাম। একটি বড় ফলকে নির্দেশনা দেখলাম 'নাবাতিয়ান সমাধি সৌধ'। এরপর কস্‌র আল বিন্ত ও কস্‌র আল ফরিদের ফলক অনুসরণ করে আমরা এগুলাম।

'কস্‌র আল ফরিদ' বা ফরিদ প্রাসাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রমিক নম্বর হাজার একত্রিশ। একটি পর্বতের গায়ে আট-দশ ফুট উঁচুতে চার-পাঁচটি খোদাই করা কক্ষ। ডাঃ আখতার জানালেন : এগুলো সামূদ জাতির প্রাচীন ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কবর।

এ ধরনের কবর আমি আগে দেখেছি ইরানের 'নাক্‌শে রোস্তম' এলাকায়। ইরানের মহাকবি ফেরদৌস আর শেখ সাদীর স্মৃতি বিজড়িত শিরাজ নগরী। সেখান থেকে চল্লিশ কি.মি. উত্তরে চার হাজার বছরের পুরনো রাজধানী পারসেপোলিস। পারসেপোলিসের অদূরে 'নাক্‌শে রোস্তম' দেখতে যাই ১৯৯৩ সালে। সেখানে রাখ্‌শ নামক বিখ্যাত ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় মহাবীর রোস্তমের বিজয়ের চিত্র আঁকা রয়েছে একটি পর্বতের গায়ে। এ চিত্রই এখন 'নাক্‌শে রোস্তম' নামে প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটকদের আকর্ষণ। 'নাক্‌শে রোস্তম'-এর আশে পাশে কয়েকটি পর্বতের গায়ে বেশ উঁচুতে পারস্যের প্রাচীন ক'জন শাসকের কবর। মানুষ মরে গিয়েও এভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

কস্‌র আল ফরিদ পার হয়ে সামনে আর একটি সামূদী প্রাসাদ। পর্বত খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে এই আশ্চর্য প্রাসাদ। প্রাসাদটির নম্বর ফলক ছয়শ এক। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু দরজা দিয়ে আমরা পর্বতের ভিতর প্রাসাদের একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। প্রথমে দশ ফুট বাই দশ ফুট চতুর্ভুজ আকৃতির একটা কক্ষ। এরপর অন্যান্য কক্ষ। কক্ষগুলির দেয়ালে নানা ধরনের ছোট ছোট শেলফ। পর্বতের শক্ত পাথর কেটে নিপুণ দক্ষতায় হাজার হাজার বছর আগে এসব নিরাপদ ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছিল সামূদীরা। তাদের কাজের দক্ষতা দেখে এযুগেও বিস্মিত হতে হয়। এই প্রাসাদটি 'কস্‌র আল বিন্ত'-এর অংশ।

'কস্‌র আল বিন্ত' বা বিন্ত-এর প্রাসাদ। এর সাথে সামূদীদের কোন রাজার মেয়ের স্মৃতি জড়িত কি না কে জানে!

ঢাকার নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদের কথা আমার মনে পড়লো। সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌-এর আমলের কোন এক বিনত বিবির নামে তৈরি পুরান ঢাকার এ মসজিদ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে শত শত বছর টিকে আছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে বিনত বিবির পরিচয়। রয়ে গেছে শুধু তার নাম।

মাদায়েন সালেহর এই প্রাচীন ইতিহাসের উন্মুক্ত জাদুঘরে হাজার হাজার বছর আগের তৈরি 'কস্‌র আল বিন্ত'-এর এই 'বিন্ত'কেও এখন আর ইতিহাস ঘেটে উদ্ধার করা যাবে না। তবে ইতিহাসের সাক্ষী এই বিন্ত প্রাসাদ হারিয়ে যাওয়া সামূদ জাতির কথা

www.pathagar.com

বলে যাবে। বলে যাবে পাথর কেটে ঘরবাড়ি বানানোর সেই নিপুণ কারিগরদের বড়াই আর তাদের অসহায় ধ্বংসের কাহিনী।

বিন্‌ত প্রাসাদ-এর সাথে রয়েছে আরো অনেকগুলো পাহাড়ি দর-দালান। এর মধ্যে কোনটি প্রাসাদ। কোনটি সমাধি সৌধ। আবার কোন পাহাড়ে কিছুটা উঁচুতে খোপ-খোপ কবর। একটি অসমাপ্ত সমাধি সৌধের ফলকে লেখা পাঠ করলাম :

':he incomple:e :omb curved on :op of a hill, illus:ra:es :he me:hod of curving :he :ombs which s:ar:s from :op downward. I: also shows :he capabili:y of ancien: sculp:ure :o face :he challenge of na:ure and :o curve :omb on a place no ma::er how high :he rock was.'

পর্বতের সুউচ্চ স্থানে তৈরি করা এ এক অসমাপ্ত সমাধি সৌধ। উপর থেকে নীচে পাথুরে পর্বত খনন করে তৈরি করা হয়েছে এ সমাধি সৌধ। সেই প্রাচীন আমলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মুকাবিলা করে উঁচু স্থানে ভাস্কর্য নির্মাণের অসামান্য সৌকর্য আর পারঙ্গমতার প্রকাশ ঘটেছে এ স্থাপত্যে।

কস্‌র আল বিন্‌ত-এর আরেকটি সমাধি সৌধের গায়ের আরবী ও ইংরেজী ফলক থেকে কিছু লিপি আমি টুকে নিলাম। প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে সেটির ইংরেজী তরজমা করা হয়েছে এভাবে :

'INSCRIP:ION OF :OMB NO. 17, :his :omb is cons:ruc:ed by HANY, s/o :AFSY for himself, his children ... daugh:er and his discenden:s and however has a legal documen: from Hany for burial in :his :omb. No ou:sider shall be allowed :o be buried in :his :omb, :his :omb shall no: be sold or :ransferred while by volun:arily or obliga:ory dona:ion be given :o any ou:sider by a legal documen:a:ion. এরপর ফলকে তারিখ লেখা হয়েছে : ...ONE :HOUSAND HARI:HIA ON :HE MON:H OF NISAN. :he for:ie:h year of :he reign of ARE:AS, :he king of naba:aeans who adores his people [Mars, April 31, ADC curved by hoor, son of Ahy : :he sculp:urers'.

এই সৌধটিকে নাবাতিয়ান সভ্যতার কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্রাট আরিতাস-এর আমলে হারিসিয় সহস্রাব্দে এটি নির্মিত বলে তারিখ উল্লেখ করা একটি দলিল অবলম্বনে।

আমরা কস্‌র আল বিন্‌ত বা বিন্‌ত প্রাসাদের শিলালিপির নোট নেয়া ও ছবি তোলার সময় জীপ হাকিয়ে এসে হাজির হলেন সাধারণ আরবী পোশাকের এক লোক। সন্দেহের দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বুঝার চেষ্টা করলেন। তারপর চলে গেলেন। আমরাও এই সমাধি সৌধ থেকে বিদায় নিলাম।

www.pathagar.com

সামূদ জাতি : 'পাহাড়ে বাইন্ধাছি ঘর'

'কস্‌র আল বিন্‌ত' দেখে আমরা গেলাম আল মাহ্‌জার এলাকায়। সেখানে আমরা বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখলাম। পাহাড়-পর্বতের পাথর কেটে তৈরি করা একটির পর একটি প্রাসাদ আর সমাধি সৌধ।

আল-মাহ্‌জার দেখার পর আমরা গেলাম 'আল খুরাইমাহ্‌' এলাকায়। নির্দেশনা ফলকে ইংরেজীতে লেখা AL-KHURAIMA: AREA. আরবীতে লেখা 'মুনতাকাত আল খুরাইমাহ্‌'। খুরাইমাহ্‌ এলাকা বা প্রদেশ। উপত্যকা জুড়ে এখানে বিক্ষিপ্ত পাহাড় পর্বত। কোথাও দীর্ঘ সারিবদ্ধ পর্বতমালা। সেখানেও পাহাড়-পর্বতের গায়ে অনেক শিলালিপি চোখে পড়লো।

প্রাসাদ, সমাধি সৌধ আর 'বারিয়াল চ্যাম্বার' বা কবর। সামূদী গোত্রপতি বা সরদার ব্যক্তিদের জন্য পাহাড়-পর্বত কেটে বিশেষভাবে তৈরি করা হতো এসব সমাধি সৌধ বা কবর। একটি কবরের ফলকে লেখা পাঠ করলাম :

':he curving process of burial chambers was arranged by dividing :he :omb floor in squares or rec:angulars and dis:ribu:e i: among sculp:ures :o expedi:e comple:ion'.

মাদায়েন সালেহ্‌র বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একেকটি নিদর্শন দেখার জন্য বিস্তর সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ কই? শুধু ছুটে চলা। ছুটতে ছুটতে আমরা প্রাসাদ ও সমাধি সৌধের কিছু ছবি তুললাম।

যতই ঘুরি, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় চোখ। হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে শত শত পাহাড়-পর্বত খনন করে প্রাসাদ, ঘরবাড়ী, সমাধি ও কবর নির্মাণ করেছিল সামূদীরা। পর্বতের গায়ে চারদিকে খোদাই করে নির্মিত হয়েছে বাড়ীঘর। কোন কোন পর্বতকে একেকটি একক প্রাসাদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যার রয়েছে সুদৃশ্য তোরণ। সামনের দিকটায় রয়েছে সুদৃশ্য অলংকরণ। কোথাও পর্বতের ভিতর কক্ষগুলি ব্যবহার হয়েছে কবর হিসাবে। আবার কোথাও বাড়ীঘর। কোন কোন পর্বতের গায়ে প্রাসাদ আর সমাধি সৌধের উঁচু দরজা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এখন সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সামূদ জাতির ঘরবাড়ী দেখতে দেখতে আমার ভিতরটা মাঝে মধ্যেই হাহাকার করে উঠছিল। এসব ঘরবাড়ীর লোকজন এখন কই? ঘরবাড়ী মানুষের আশ্রয়। ঘরবাড়ী অনেকের স্ট্যাটাস সিম্বল। ঘরবাড়ী নিয়ে কত কথা। হাছন রাজার বিখ্যাত গানের চরণ মনে পড়লো :

লোকে বলে বলে রে
ঘর বাড়ি ভালা না আমার!
কি ঘর বানাইলাম আমি
শূন্যের মাঝার
লোকে বলে বলে রে...

www.pathagar.com

মাদায়েন সালেহর নিদর্শন দেখার ফাঁকে ফাঁকে ডাঃ আখতার আমাদেরকে বলছিলেন সামূদ জাতির কাহিনী।...

...আদ জাতির পরে ইরাম বংশের একটি শাখা ইয়ামানে প্রতাপশালী হয়ে ওঠে। তারা সামূদ নামে পরিচিত হয়। সম্রাট হামীর তাদেরকে ইয়ামান থেকে বের করে দেন।

ইয়ামান থেকে বেরিয়ে এসে সামূদীরা 'আয়লা' বা আল উলা এলাকায় বসতি স্থাপন করে। তারা পাহাড় খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ইতিহাসে তারাই প্রথম পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী নির্মাণের রীতি চালু করে। আল-কুরআনে সূরা ফজর-এ এই সামূদ জাতির পরিচয় বলা হয়েছে : "...যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘরবাড়ী বানিয়েছিল...।" সূরা আল হিজর-এ তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তারা পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ী নির্মাণ করতো এবং নিজেদের বাসস্থানে একেবারেই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল।"

আল কুরআনের তাফসীর গ্রন্থগুলোতে সামূদ জাতির পরিচয় বলা হয়েছে : তারা সমতল ভূমিতে বড় বড় অট্টালিকা বানাতো। এ ছাড়া তারা পর্বতের পাথর খোদাই করে নানা রকম ঘর বানাতো। সমতল এলাকায় ছিল তাদের সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদ-দালান। অজন্তা-ইলোরার পর্বত গুহার খোদাই শিল্পের হাজার হাজার বছর আগে সামূদ জাতির লোকেরা উত্তর-পশ্চিম আরবের হিজর এলাকায় পাহাড় কেটে সুরম্য প্রাসাদ গড়ে তোলে।

সামূদী বনাম নাবাতী : আবুল আ'লার প্রতিবাদ

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সামূদ জাতির সেসব বিস্ময়কর নিদর্শন। ডাঃ শাহ্ আলম বললেন : আগে মাদায়েন সালেহর এসব নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। কোন লিপি-ফলকও ছিল না। বর্তমানে প্রাচীন সামূদীয় লিপির কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করে তার ভিত্তিতে প্রাচীন নিদর্শনগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার জন্য আরবীর পাশাপাশি ইংরেজী ভাষায় সেসব নিদর্শনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে আরবী ও ইংরেজী দুই ভাষার ফলক। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা পুরনো লিপি যাতে সময়ের ছোঁয়াছুয়িতে মুছে না যায় সে জন্য শিলালিপিগুলো এক ধরনের স্বচ্ছ প্লাস্টিক আবরণে মুড়ে দেয়া হয়েছে।

ডাঃ আখতার বললেন : এসব প্রত্ন নিদর্শনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেছেন পাশ্চাত্যের লোকেরা। এই পশ্চিমা পণ্ডিতরা নিদর্শনগুলোকে নাবাতীয় যুগের বলে ঢালাওভাবে উল্লেখ করেছেন। সৌদি কর্তৃপক্ষ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতামত কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই কবুল করে নিয়েছেন।

ডাঃ শাহ্ আলম বললেন : এ মতের বিরুদ্ধে অন্তত একটি প্রতিবাদ আমি পাঠ করেছি। সে কণ্ঠটি আবুল আ'লার। আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৫৯ সালে মাদায়েন সালেহ সফর

www.pathagar.com

করেন। এর পর তিনি জর্দানের পেট্রায় নাবাতীয় যুগের স্থাপত্যকর্মও দেখেন। 'ওয়াদি আল কুরা'র পাহাড়-কাটা ঘরবাড়ী নাবাতীয় নয় বলে তিনি বেশ জোরের সাথে দাবি করেন।

আবুল আ'লা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে সূরা আশ শুয়ারার ১৪৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিবতী ও সামূদী স্থাপত্যের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরে লিখেছেন :

"আল হিজরে আমরা সামূদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম, ঠিক একই ধরনের কিছু ইমারত আমরা দেখেছি আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদিয়ানে এবং জর্দান রাজ্যের পেট্রা [PE:RA] নামক স্থানে। পেট্রায় সামূদী ধরনের ইমারত এবং নিবতীদের তৈরী দালান পাশাপাশি দেখেছি। এগুলোর আকৃতি, কারুকাজ ও নির্মাণ রীতির পার্থক্য স্পষ্ট। যে কেউ এক নযর দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো একই সময়ে নির্মিত নয়। একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ DAUGH:Y আল হিজরের ইমারত সম্পর্কে দাবি করেছেন এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতি আলাদা। একজন অন্ধ ছাড়া আর কেউ এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবি করতে পারে না। এটা নিশ্চিত, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে। এর হাজার হাজার বছর পরে নিবতীরা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এ নির্মাণ কৌশলকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। অবশেষে পেট্রার প্রায় সাতশ বছর পর ইলোরায় এ শিল্পের চরম উৎকর্ষ ঘটে।"

শহীদ ভাই বললেন : আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ নই। কিন্তু আমরা জানি এ যুগের পশ্চিমা প্রত্ন-পণ্ডিতদের প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই আল-কুরআনে পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী বানানোর কাজে সামূদ জাতির সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে। রাসূল [সা] এখানে সশরীরে হাজির হয়ে এ জায়গাটিকে সামূদীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে এই এলাকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বিশেষত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন। কুরআন ও হাদীসের এই দু'টি সূত্র ধরে মুসলিম প্রত্নতত্ত্ববিদদের এগিয়ে আসা উচিৎ।

ইবনে বতুতার দেখা মাদায়েন সালেহ

ডাঃ শাহ আলম বললেন : কুরআন নাযিলের আগেই সামূদ জাতির কাহিনী মানুষের মুখে মুখে চালু ছিল। জাহেলী যুগের কবিতা ও সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ রয়েছে। আসিরিয় শিলালিপিতে সামূদ জাতির উল্লেখ আছে। গ্রীস, স্পেন ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসবিদ আর ভূগোলবিদগণও সামূদ জাতির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আল উলা ছাড়াও আরবের আরো বেশ কিছু এলাকায় সামূদীয় নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

ডাঃ আখতার বললেন : ঈসার [আ] জন্মের কিছুকাল আগেও এ জাতির কিছু লোক

www.pathagar.com

জীবিত ছিলেন। এদের পূর্ব পুরুষগণ নিশ্চয়ই সালেহের [আ] অনুসারী ছিলেন। পরবর্তী এই সামূদীদের সাথে নিবতীদের শত্রুতার উল্লেখ পাওয়া যায় রোমীয় বিবরণে। রোমীয় ঐতিহাসিকদের মতে রোমের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে সামূদ জাতির লোকেরা তাদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই সামূদ জাতি আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বাস করতো। এ কথাও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। সামূদীদের প্রধান শহরের নাম ছিল হিজর বা হাজর। বর্তমানে এটিই মাদায়েন সালেহ নামে পরিচিত। সামূদ জাতি ধ্বংস হবার হাজার হাজার বছর পরে নিবতীদের একটি অংশ খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর দিকে হয়তো হিজর-এ বসতি স্থাপন করেও থাকতে পারে। নাবাতীরা এখানে কিছুকাল বাস করার কারণে তার অনেক আগের আমলের সামূদীদের ঘরবাড়ীকে ঢালাওভাবে নাবাতীয় বলে চালিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই।

শহীদ ভাই বললেন : পশ্চিমা পণ্ডিতরা সামূদ জাতির স্বীকৃত ইতিহাস বিকৃত করতে চাইছে। ইতিহাসকে তারা তাদের নিজেদের ধারায় প্রবাহিত করতে চায়। তথ্য প্রমাণ দ্বারাই তা খণ্ডাতে হবে।

ডাঃ শাহ আলম বললেন : ইতিহাসের সব সাক্ষ্য প্রমাণই সামূদ জাতির বিষয়ে কথা বলবে। হিজরী আট শতকে বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার দীর্ঘ সফরের এক পর্যায়ে আল উলায় এসে পৌছেন। তিনি মাদায়েন সালেহ বা ওয়াদি-উল-কুরা সম্পর্কে লিখেছেন :

'এখানে লাল রংয়ের পাহাড়গুলোতে রয়েছে সামূদ জাতির ইমারত। পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে তারা ইমারত নির্মাণ করেছিল। এ গৃহগুলোর কারুকাজ এখনো এমন উজ্জ্বল ও তরতাজা আছে যেন মনে হয় আজই এগুলো খোদাই করা হয়েছে। পচাগলা মানুষের হাড় এখনো এখানকার ঘরগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।'

ডাঃ আখতার বললেন : সাইয়েদ সুলাইমান নদভী তাঁর 'আরদুল কুরআন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন : 'তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজো বিদ্যমান। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদীয় বর্ণমালার শিলালিপি রয়েছে।' এসব কিছুই পশ্চিমা পণ্ডিতদের ধারণা অসার প্রমাণ করে। তারপরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাজ করা উচিৎ।

ডাঃ আখতারের এ বক্তব্যের প্রতি জোর সমর্থন জানালেন শহীদ ভাই।

খুরাইমার কূয়া

মাদায়েন সালেহর পরিত্যক্ত নগরীতে পাথুরে রাস্তাগুলো এবড়ো-খেবড়ো করে কাটা। এই অমসৃণ পথে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌছাতে বেশ সময় লাগে। তারপরও আমাদের পাইলট শহীদ ভাই দারুণ খুশী। ১৯৮৫-৮৬ সালে তাঁর প্রথম সফরকালে মাদায়েন সালেহ ছিল খোলা প্রান্তর। পথের ওপর ছিল বালুর পুরু স্তর।

১২—

www.pathagar.com

ফোর হুইলার জীপ ছাড়া ট্যাক্সি এই পথে চলাচল করতে পারতো না। বালুরাশির মধ্যে ট্যাক্সির চাকা দেবে যেতো। এখন মাদায়েন সালেহর চারপাশে উঁচু দেয়াল। এলাকার বালু সরিয়ে চলাচলের পথ করা হয়েছে। গ্রেটার দিয়ে এই পাথুরে পথ এবড়ো-থেবড়ো করা হয়েছে গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য। এলাকার আদি ভাবটা বজায় রাখাও হয়ত একটা বিবেচনা। এই অমসৃণ পথে কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা ওয়াদি আল কুরা বা হিজর এলাকায় ঘুরে বেড়ালাম।

মাথার উপর সূর্যের তাপ বাড়ছে। কিন্তু সামূদ জাতির বিভিন্ন নিদর্শন দেখার আবেগ আর উত্তেজনায় আমরা সব কষ্ট ভুলে গেলাম।

খুরাইমায় আমরা একটি প্রাচীন কূয়ার কাছে পৌছলাম। পশ্চিমা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ কূয়াটিকেও নাবাতীয় আমলের বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফলকে শিরোনাম লেখা হয়েছে : NABA:AEAN WELL. বিবরণীতে বলা হয়েছে : WELLS, as a major wa:er resources were commonly used by NABA:AEANS for irriga:ion. :he region con:ains more :han 60 wells, some of which were dug in :he rocky surfaces while :he o:her wells were lying from inside by rocks.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে নাবাতীরা সাধারণত সেচ কাজের জন্য এসব কূয়া ব্যবহার করতো। এ ধরনের ষাটটির বেশী কূয়ার খোঁজ তাঁরা এলাকায় এ পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। মাদায়েন সালেহর কূয়া নিবতীদের বলে পশ্চিমা প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করলেও আরেক দল বিশেষজ্ঞগণ দাবি করেন মাদায়েন সালেহের এসব কূয়া সামূদী আমলের। সামূদীগণ পাথর কিংবা পাথুরে মাটি কেটে এসব কূয়া খনন করেছেন। নাবতীরা সামূদীদের বহু বছর পর এসব এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বাস করেছে। এ কারণে এসব কূয়াকে নিবতীদের বলে দাবি করা যায় না বলে তারা মনে করেন।

প্রাচীন আরবে কূয়া ছিলো জীবনের উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। মরুভূমিতে বিভিন্ন কবিলার ইতিহাসের সাথে কোন না কোন কূয়ার কাহিনী যুক্ত। কূয়ার অধিকার মানে কবিলার মর্যাদা। কূয়ার অধিকার নিয়ে অনেক সময় গোত্রে-গোত্রে দ্বন্দ্ব হতো। একেকটি কূপের দখল নিয়ে একাধিক গোত্র অনেক সময় স্থায়ী বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়তো। মাদায়েন সালেহতে ৬০টি কূয়া দেখে তাই কেউ কেউ আন্দায করেছেন, এই এলাকা এক সময় একটি বড় নগরী ছিল। এ নগরীতে হয়তো কয়েক লাখ মানুষ বাস করতেন।

একটি কূয়া, অলৌকিক উট ও ফাজ্জুন নাকাহ্

অনেক পথ ঘুরে আমরা একটি ছায়াঘেরা এলাকায় পৌছলাম। দু'টি পাহাড় পাড়ি দিয়ে দুই প্রকাণ্ড পাথরের মাঝে আমরা এক বিরাট কূয়ার কাছে উপনীত হলাম। ডা: আখতার ও ডা: শাহ আলম উচ্ছ্বসিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন : এই তো সেই কূয়া যেখান থেকে সালেহর [আ] উটনী পানি পান করতো।

www.pathagar.com

রহস্যময় এই প্রাচীন কূয়ার পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। হযরত সালেহর [আ] যমানায় এক অলৌকিক উট এ কূয়া থেকে পানি পান করতো। এক চুমুকে নিঃশেষে টেনে নিত কূয়ার সবটুকু পানি। এই উটনীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তখনকার সামূদ জাতির ইতিহাস। সামূদীরা অতি গরজী হয়ে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িয়ে নিয়েছিল অলৌকিক এই উটনীর সাথে...।

...সামূদ জাতির লোকেরা সালেহর [আ] কাছে তাঁর নবুওয়তের প্রমাণ দেখতে চায়। আল্লাহর হুকুমে পাহাড়ের ভিতর থেকে আচমকা তাদের সামনে হাজির হলো এক অলৌকিক উট। সালেহ [আ] তার জাতিকে সাবধান করলেন। এই কুদরতী উটনী তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন আমার আল্লাহ। তোমাদের ভাগ্য এখন থেকে এই উটনীর সাথে জড়িত হয়ে গেল। তোমাদেরকে এই উটনীর ব্যাপারে বিশেষ আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে।

রহস্যময় এই উটনীর সাথে সামূদীদের জীবনযাত্রা আর তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী বাঁধা পড়ে গেল। শেষে সামূদ জাতি অধৈর্য হয়ে পড়লো। প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে তারা এই উটনীকে হত্যা করলো এবং আল্লাহর গযবে ধ্বংস হলো।...

লোহার মোটা তারের জাল দিয়ে কূয়াটি ঘিরে রাখা হয়েছে। জাল বেয়ে কিছুটা উপরে উঠে এবং যতদূর সম্ভব এই কূয়াটির ভিতরে দেখার চেষ্টা করলাম।

একজন আরব গাইড আমদের কাছে এগিয়ে এলেন। তার কাছ থেকে আরো নিশ্চিত হতে চাইলাম : এই কী সেই কূয়া যেখান থেকে সালেহর [আ] সেই অলৌকিক উটনী পানি পান করতো? গাইড আমাদের ডাক্তার বন্ধুদের তথ্যকে সত্য বলে প্রত্যয়ন করলেন। আগ্রহের সাথে তিনি আমাদেরকে এলাকাটি ঘুরে দেখালেন।

গাইড-এর নাম আবদুর রহমান। মাদায়েন সালেহর নিদর্শনসমূহের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য করলাম। আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে তিনি সামূদ জাতির ইতিহাসের কিছু ধূসর পৃষ্ঠা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করলেন।

শরীফ ও শিক্ষিত আরবগণ সাধারণত যেভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেন আবদুর রহমান সেভাবে দলিল হাজির করলেন তার বক্তব্যের পক্ষে। তিনি শুরুতেই বললেন :

এটি নিছক প্রমোদ ভ্রমণের জায়গা নয়। নয় কোন সাধারণ পর্যটন কেন্দ্র। হযরত মুহাম্মাদ [সা] মদীনা থেকে তাবুক অভিযানের সময় এ এলাকা অতিক্রম করেন। এ সময় মুসলমানদেরকে এখানটায় এই কূয়া দেখিয়ে মহানবী বলেন, এ কূয়াটি থেকে হযরত সালেহর উটনী পানি পান করতো। রাসূল [সা] মুসলমানদেরকে শুধু এই একটি কূয়া থেকে পানি পান করতে বলেন। আর অন্য সব কূয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে তিনি বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহর উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি 'ফাজ্জুন নাকাহ' বা উটনীর পথ নামে

www.pathagar.com

খ্যাত। মহানবীর জবান থেকেই আমরা এই এলাকার ইতিহাসের সত্যতা খুঁজে পাই।

আবদুর রহমান বলছিলেন সামূদ জাতির কথা :

সামূদ জাতির লোকেরা তাদের বৈষয়িক সামর্থ্যের কারণে অহংকারী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী বানাবার অপূর্ব স্থাপত্যের বাহাদুরি তাদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দেয়। সামূদ জাতির জীবনযাত্রার বস্তুগত মান বাড়ার সাথে সাথে মানবিক মান নিচে নেমে যায়। সমাজের উঁচুতলার লোকেরা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে অন্ধ হয়ে পড়ে। সবচে অহংকারী আর অবাধ্য লোকেরা হয় সামূদ জাতির নেতা। তাদের কারণে পৃথিবী জুলুম-নিপীড়নে ভরে ওঠে। সামূদ জাতির লোকেরা আল্লাহ ও পরকাল ভুলে শিরক ও মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়। ...অথচ নূহের কাহিনী তখনো লোকের মুখে মুখে চালু ছিল। আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী ছিল তাদের কাছে সাম্প্রতিক অতীতের ব্যাপার। তারপরও সামূদ জাতি গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।

সামূদ জাতিকে পথ দেখাতে আল্লাহ তাদের মাঝ থেকে তাদের এক ভাই সালেহকে [আ] নবুওয়তের দায়িত্ব দেন। হযরত সালেহ [আ] তার সম্পূর্ণ যৌবনকাল লোকদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে কাটালেন। তাদেরকে ভালো মানুষ হতে বললেন। তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিছুলোক তার কথা মানলো। বাকীরা অমান্য করলো। হযরত সালেহর ডাকে যারা সাড়া দিলেন তারা ছিলেন অভাবী, বঞ্চিত ও দুর্বল লোক। স্বার্থের উঁচু সিঁড়িতে যারা বসেছিল তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। সমাজের উঁচুতলার এই অবাধ্য লোকদের জবাব ছিল : 'যে বিষয়ে তোমরা ঈমান এনেছ তা আমরা মানতে পারি না।'

আবদুর রহমান সামূদ জাতি সম্পর্কে আল কুরআনের কয়েকটি সূরা থেকে কিছু আয়াত একে একে তুলে ধরলেন।

আল কুরআনের প্রাণস্পর্শী তিলাওয়াতের ব্যাপারে সম্প্রতি আরব উপদ্বীপে কয়েকটি শক্তিশালী ধারা চালু রয়েছে। কাবা শরীফের খতমে তারাবীর দুই সম্মানিত ইমাম শায়খ আবদুর রহমান সুদাইস ও শায়খ ইবরাহিম শুরাইম এবং মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম শায়খ আবদুর রহমান হুজাইফীর তিলাওয়াতের ধারা এখন বাংলাদেশসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ ক্বারী অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। এই সহজ স্বচ্ছন্দ আন্দোলিত ও আবেগঘন ধারা দুনিয়ার সর্বত্র দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আমাদের গাইড আবদুর রহমানের তিলাওয়াত তাদের থেকে কিছুটা ভিন্ন। তবে তিনি প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন এবং আমাদেরকে যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি আল কুরআনের সপ্তম সূরা আ'রাফের দশম রুকু থেকে তিলাওয়াত করলেন। তাতে বলা হয়েছে :

"আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বললেন : 'হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই।

www.pathagar.com

...ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তোমরা আজ সমতল জমিনে বিরাট দালান বানাচ্ছ এবং পাহাড় খোদাই করে বাড়ি তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।'

"তাঁর কাওমের ঐসব সরদার যারা বড়াই করত, তারা ঈমানদার ঐ সব দুর্বল লোকদেরকে বলল : 'তোমরা কি সত্যিই একথা জানো যে, সালেহ্ তার রবেরই রাসূল?'

তারা জবাবে বলল : 'নিশ্চয়ই, যে বাণীসহ তাকে পাঠানো হয়েছে এর উপর আমরা ঈমান এনেছি।'

"অহংকারী লোকেরা বলল : 'তোমরা যে জিনিসের উপর ঈমান এনেছ আমরা তা মানতে অস্বীকার করি।'

আবদুর রহ্মান তিলাওয়াত করলেন আল কুরআনের ১১তম সূরা হূদ থেকে :

"আর সামূদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বললেন : 'হে আমার কাওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর কাছে ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার রব কাছেই আছেন এবং তিনি দু'আ কবুল করেন।'

"তারা বলল : 'হে সালেহ্! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার উপর আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যেসব মা'বুদদের পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করা থেকে নিষেধ করতে চাও? তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ রয়েছে যা আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

"সালেহ্ বললেন : 'হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম হয়ে থাকি এবং তিনি তাঁর খাস রহমত দিয়ে যদি আমাকে ধন্য করে থাকেন, এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে কে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবে? আমাকে আরও বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে আসতে পার?"

আবদুর রহ্মান এবার পাঠ করলেন আল কুরআনের ছাব্বিশতম সূরা আশ্ শুয়ারার ৮ রুকু থেকে। সেখানে বলা হয়েছে :

"সামূদ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করলো, যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদেরকে বললেন : 'তোমরা কি ভয় করো না? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো।

www.pathagar.com

আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এখানে যে সব জিনিস আছে এর মধ্যে তোমাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে? এসব বাগান ও ঝরনাগুলো এবং ফসলের ক্ষেত ও রসভরা ছড়াসহ খেজুরের বাগানে [এভাবেই থাকতে দেয়া হবে]? তোমরা পাহাড় কেটে কেটে গর্বের সাথে তাতে ইমারত বানাচ্ছো। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। ঐসব লাগামহীন লোক, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ও কোন সংশোধনমূলক কাজ করে না তাদের আনুগত্য করো না।'

"তারা জবাবে বলল : 'তুমি একজন জাদুগ্রস্ত লোক। তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কী? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে কোন নিদর্শন আন দেখি।'

এরপর আবদুর রহমান পাঠ করলেন আল কুরআনের ২৭তম সূরা নাম্‌ল থেকে :

"আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে [এ বাণী দিয়ে] পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। এমন সময় তারা হঠাৎ দু'টো বিবাদমান দলে ভাগ হয়ে গেল।'

"সালেহ বললেন : 'হে আমার কাওম! ভালোর আগে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছ কেন? আল্লাহর কাছে মাফ চাও না কেন? হয়তো তোমাদের উপর রহম করা হবে।'

"তারা বলল : 'আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুলক্ষণ মনে করি।

জবাবে সালেহ বললেন : 'তোমাদের সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ তো আল্লাহর হাতে। আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।"

আল কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার পর আবদুর রহমান বললেন :

এভাবে অবিরাম দাওয়াত দিতে দিতে সালেহ [আ] বৃদ্ধ হলেন। শেষে সামূদ জাতির লোকেরা তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার বাহানা হিসেবে এমন কিছু দাবি করলো যা পূরণ করা সম্ভব নয়। তারা বললো : 'সত্যিই আপনি নবী হলে আমাদেরকে পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উটনী বের করে এনে দেখান।'

সালেহ [আ] তাতেই রাযী হলেন এবং তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন, এ দাবি পূরণ হলে তারা ইমান আনবে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে।

সালেহ [আ] আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তখন হিজরের প্রান্তরে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা দিল। পাথরের একটি বিরাট খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে সামূদ জাতির দাবি অনুযায়ী একটি উটনী বের হয়ে এল। এটি ছিল আল্লাহর তরফ থেকে মুজিযা। সামূদ জাতির লোকেরা অলৌকিক কিছু দেখার জন্য জেদ করেছিল। তারই জবাবে এই উটনীকে হাজির করা হয়েছিল। এটি যে কোন সাধারণ উট নয়, তা এর আবির্ভাবের ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছিল।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান বললেন : হযরত সালেহ এই উটনীটি হাজির করার সময় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাও এর অলৌকিকত্বের প্রমাণ। তিনি সামূদ জাতির অহংকারী লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন : এখন এ উটনীর প্রাণের সাথে তোমাদের জীবন জড়িত হয়ে গেছে। উটনীটি স্বাধীনভাবে তোমাদের ক্ষেতে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা পানি পান করবে আর অন্যদিন সমগ্র জাতির যত পশু আছে সবাই পানি পান করবে। আর তোমরা এর গায়ে হাত তুললে তোমাদের ওপর হঠাৎ আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।

এ প্রসঙ্গে সূরা আ'রাফের দশম রুকুতে বলা হয়েছে : "...তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে দেয়া হলো। একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও। কোনো বদ নিয়তে একে স্পর্শ করলে এক বেদনাদায়ক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।'

সূরা হূদে বলা হয়েছে : "হে আমার কাওম! এই দেখ, আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দাও। একে তোমরা বাধা দিও না। তা না হলে খুব শিগ্‌গিরই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে।'

সূরা আশ্‌ শুয়ারার ৮ রুকুতে বলা হয়েছে : "সালেহ বললেন : 'এ উটনীটি রইল। একদিন সে পানি পান করবে, আর একদিন তোমরা সবাই নিবে। তোমরা এর প্রতি খারাপ আচরণ করলে তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাব এসে পড়বে।"

এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। বাকীরা মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু সমাজপতিরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল।

হযরত সালেহ [আ] এই উটনীর জন্য একটি নিয়ম বেঁধে দিলেন। পালাক্রমে একদিন এ উটনী একাই সামূদদের কূয়া ও ঝরনা থেকে পানি পান করবে। আর একদিন জাতির সমস্ত লোক ও তাদের জন্তু-জানোয়ার পানি পান করবে। উটনীটি যখন পানি পান করবে তখন অন্য কেউ সেখানে যেতে পারবে না।

আরব ঐতিহ্যের দিক থেকে এ ছিল এক কঠিন আর বড় চ্যালেঞ্জ। আরব সমাজে পানিই ছিল জীবনের মুখ্য বিবেচনা। পানির অধিকার নিয়ে যখন-তখন খুনাখুনি হয়ে যেত। গোত্রগুলি পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। রক্তপাত ঘটিয়ে কেউ কোন ঝরণা বা কূয়া থেকে পানি নেবার অধিকার লাভ করতো। কূয়ার প্রশ্নে মরু আরবের এটাই ছিল যুগ পরম্পরায় চলে আসা রীতি প্রথা আর ঐতিহ্য। এই অবস্থায় জাতির এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, আমার উটনী একাই সমস্ত কূয়া ও ঝরনা থেকে একদিন পানি পান করবে, আর জাতির সব লোক ও জন্তু জানোয়ারদের জন্য পানি বরাদ্দ থাকবে দ্বিতীয় দিনে। একথার দ্বারা সালেহ [আ] তার জাতিকে যেন যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন।

এই চ্যালেঞ্জ শুধু এতটুকুই ছিল না যে, একদিন পর পর কেবল উটনীটি একাই

www.pathagar.com

জনপদের সকল পানির উৎসের মালিক হবে। বরং আরো বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছিল যে, এই অলৌকিক উট সারাদিন জনপদের সকল ক্ষেত-খামারে, ফলের বাগানে, খেজুর উদ্যানে ও চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবে। যেখানে ইচ্ছা যাবে, যা ইচ্ছা খাবে। কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

সেনাবাহিনীর সমর্থন ছাড়া আরবের কোন কওমকে কেউ এ ধরনের ধমক দেবে, এটা কিভাবে ভাবা যায়? অথচ হযরত সালেহ [আ] তাঁর জাতির সামনে একা দাঁড়িয়ে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। জাতি তার কথা কান পেতে শুনল। বহুদিন পর্যন্ত মাথা পেতে তা মেনে চললো। যেদিন উটনী পানি পান করতো সেদিন সামূদ জাতির লোকেরা উটনীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত।

আল্লাহ্ তাআলা এ উটনীটিকে সামুদ জাতির অহংকারী লোকদের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। উটনীটিকে তারা নিজেরাই সালেহর [আ] মাধ্যমে চেয়ে নিয়েছিল। এখন এ উটনীর কারণে এ জাতির বেশ অসুবিধা হতে থাকে। ফলে তারা উটনীটির ধ্বংস কামনা করতো। কিন্তু গযবের ভয়ে নিজেরা এ উটনীর দিকে হাত বাড়াতে সাহসী হতো না।

এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সালেহর [আ] উটনীটি ছিল সমগ্র জাতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অবিশ্বাসী দুর্বিনীত লোকেরা মনে মনে এর বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে। তারা নিজেদের ডেকে আনা এ আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে শরা-পরামর্শ করতে থাকে।

এরপরের ঘটনাও আবদুর রহমান আবেগের সাথে বর্ণনা করলেন :

সামূদ জাতির দুই যুবক মিছদা ও কাসার এ দু:সাহসী কাজে নিয়োজিত হলো। তারা উটনীটির যাতায়াতের পথে একটি বড় পাথর খণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। উটনীটি সামনে আসতেই মিছদা তীর নিক্ষেপ করলো। কাসার তার তরবারীর আঘাতে উটনীটির পা কেটে হত্যা করলো।

কুরআনে পাকে সূরা আশ শামসে কাসারকে সামূদ জাতির সবচেয়ে হতভাগ্য লোক বলে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : "যখন এ জাতির সবচে পাপিষ্ঠ লোকটি উদ্যোগী হলো'। সূরা আল কামারে বলা হয়েছে : "তারা নিজেদের সাথীকে আহ্বান জানালো, শেষ পর্যন্ত সে এ কাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং সে গিঁঠের রগ কেটে দিল।"

এ ঘটনার পর সালেহ [আ] তাঁর জাতিকে আল্লাহর ফয়সালা জানিয়ে দিলেন : "তিন দিন নিজেদের ঘরে আরাম করে নাও।" জবাবে সামূদ জাতির লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বললো : 'এ শাস্তি কোত্থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?'

সালেহ [আ] বললেন : 'তাহলে আযাবের লক্ষণ শুনে নাও। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ সকলের মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরদিন শুক্রবার

www.pathagar.com

সবার মুখ হয়ে যাবে গাঢ় লাল। সবশেষে শনিবারে সবার চেহারা ঘন কালো হয়ে যাবে। এ দিনটির পর তোমাদের জীবনে আর কোন সকাল অবশিষ্ট থাকবে না।'

সামূদ জাতির হতভাগা লোকেরা এ কথা শুনে আরো ক্ষেপে গেল। ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা সালেহকে [আ] হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সালেহ [আ] সত্যবাদী হন আর আযাব যদি আসেই তবে আমরা আগেই তাকে শেষ করে দেই না কেন? আর তিনি মিথ্যাবাদী হলে তিনি মিথ্যার সাজা ভোগ করুন।

এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক সালেহকে [আ] হত্যার জন্য রাতে তার ঘরের দিকে রওনা হলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পথেই তাদেরকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিলেন। কুরআনের ভাষায় : 'তারাও গোপনে ষড়যন্ত্র করলো এবং আমিও তার জবাবে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে তারা তা জানতেই পারল না।'

যেভাবে গযব এলো

বৃহস্পতিবার ভোরে সামূদ জাতির অবাধ্য লোকদের চেহারা ঘন হলুদ রঙ হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও এ বোকা লোকগুলো সতর্ক হলো না। বরং তারা সালেহর [আ] ওপর আরো ক্ষেপে গেল। সামূদ জাতির লোকেরা নবীকে হত্যা করার জন্য দল বেঁধে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

আল্লাহর আযাবের এটাও একটা লক্ষণ। জাতির জন্য যখন কঠিন দু:সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা কোন উপদেশ ও হুঁশিয়ারী শুনতে রাযী হয় না। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে গেলে তারা লাভকে ক্ষতি আর ক্ষতিকে লাভ মনে করতে থাকে। তারা তখন ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সবার চেহারা লাল হয়ে গেল। শেষে তৃতীয় দিন শনিবার তাদের চেহারা হয়ে গেল ঘোর কালো। সামূদ জাতির বেপরোয়া লোকেরা এখন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে নিশ্চিত হলো। এখন তারা আযাব কোনদিক থেকে কিভাবে আসে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

এরপর আযাব নেমে এলো। নির্ধারিত মেয়াদের শেষ রাতে ভোরের কাছাকাছি সময়ে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। সেই সাথে প্রচণ্ড ভূমিকম্প। বিভিন্ন আয়াত থেকে বুঝা যায় নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর থেকে বিকট নিনাদ বা গর্জন সামূদ জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ভোরে চারদিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যেন মনে হচ্ছিল, শুকনা লতাগুল্ম জন্তু-জানোয়ারের পায়ের নীচে দলিত-মথিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সামূদীদের সভ্যতার গৌরব, তাদের প্রাসাদ আর তাদের সুরক্ষিত পার্বত্য গুহাগুলো তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

আবদুর রহমান থামলেন। এরপর বললেন : সামূদ জাতি সম্পর্কে এসব বিবরণ কুরআন পাকের বিভিন্ন সূরা থেকে জানা যায়। কিছু কিছু জানা যায় হাদিস থেকে। এছাড়া

www.pathagar.com

তাফসীরবিদগণ ইহূদী ও খ্রীস্টানদের বর্ণনা থেকে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আবদুর রহমান উটনীর হত্যাকাণ্ড ও তারপর নেমে আসা আল্লাহর আযাব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন।

আল কুরআনের সূরা আ'রাফ-এ বলা হয়েছে : "তারপর তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল এবং গর্বের সাথে তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। তারা সালেহকে বলল : 'যদি তুমি সত্য রাসূলদের কেউ হয়ে থাক তাহলে ঐ আযাব নিয়ে এস, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ। শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

সালেহ তাদের বস্তি থেকে বের হয়ে গেলেন এ কথা বলে : 'হে আমার কাওম! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের [যথেষ্ট] কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু [আমি আর কী করব] তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকেই পছন্দ করো না।"

সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে : "...তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। তখন সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আর মাত্র তিন দিন তোমাদের বাড়িতে মজা করে নাও। এটা এমন এক মেয়াদ, যা মিথ্যা হবে না।' শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দিয়ে সালেহকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐ দিনের অপমান থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই আপনার রবই আসলে ক্ষমতাশালী ও মহাশক্তিমান। আর যারা যুলুম করেছিল, তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করলো এবং তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে এমন উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। শুনে রাখ, সামূদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, সামূদ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

সূরা হিজর-এ বলা হয়েছে : "তারা পাহাড় খোদাই করে বাড়ি বানাত এবং এতে তারা নিশ্চিন্ত ছিল। অবশেষে এক বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হতে হতেই পাকড়াও করল। তারা যা কামাই করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই এলো না।"

সূরা আশ্ শুয়ারায় বলা হয়েছে : "তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তারা আফসোস করতে থাকল। তারপর তাদের ওপর আযাব এসে পড়ল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।"

সূরা নাম্ল-এ বলা হয়েছে : "সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল। তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করত। কোনো গঠনমূলক কাজ করত না। তারা বলল : 'আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা রাতের বেলায়ই সালেহ ও তার পরিবারের উপর হামলা করব। তারপর তার

www.pathagar.com

অভিভাবককে বলে দেবো যে, আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় হাজির ছিলাম না এবং আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি। তারা তো এ চক্রান্ত করল। আমি এমন এক চাল চাললাম যা তারা টেরও পেল না। তারা যে যুলুম করত এর পরিণামে ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘরগুলো বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য এর মধ্যে এক শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম।"

সূরা যারিয়াত-এ বলা হয়েছে : "তাছাড়া [তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে] সামূদ জাতির মধ্যে। যখন তাদের বলা হয়েছিলো 'একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজা লুটে নাও। কিন্তু এ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা তাদের রবের হুকুম অমান্য করলো। অবশেষে দেখতে দেখতে হঠাৎ আগমনকারী আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো। এরপর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও তাদের থাকলো না এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও সক্ষম ছিল না।"

সূরা কামার-এ বলা হয়েছে : "শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোকটিকে ডাকলো, সে এ কাজের দায়িত্ব নিল এবং উটনীকে হত্যা করলো। দেখ, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণীসমূহ। আমি তাদের ওপর একটি মাত্র বিকট শব্দ পাঠালাম এবং তারা খোঁয়াড়ের মালিকের শুষ্ক ও পদদলিত শস্যের মত হয়ে গেল।"

সূরা শামস-এ বলা হয়েছে : "সামূদ জাতি নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো। যখন সেই জাতির সবচে হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গেলো, আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন : 'সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে [বাধা দিও না]। কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো। অবশেষে তাদের গুনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আর তিনি [তাঁর এই কাজের] পরিণতির কোন ভয়ই করেন না।"

সূরা হা-মীম-সাজদাহতে বলা হয়েছে : "সামূদদের সামনে আমি সঠিক পথ পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা রাস্তা দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকাই বেশি পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তারা যা কিছু করেছিল এরই কারণে তাদের উপর অপমানকর আযাব ভেঙে পড়ল। আমি তাদেরকে নাজাত দিলাম, যারা ঈমান এনেছিল এবং [গোমরাহী ও বদ আমল থেকে] দূরে ছিল।"

আল্লাহর আযাব ও গযবে সামূদ জাতির অবিশ্বাসী ও দুর্বিনীত লোকেরা ধ্বংস হলো। আর এই আযাব আসার আগেই সালেহ [আ] তার ইমানদার সাথিদের নিয়ে হিজর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সালেহ [আ] নিজ জনপদ ছেড়ে যাবার সময় তার জাতিকে সম্বোধন করে বলেন : হে আমার জাতি, আমি তোমাদেরকে আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।

www.pathagar.com

কোন কোন বর্ণনা মতে, হিজর থেকে চলে যাবার সময় সালেহর [আ] সাথে চার হাজার ঈমানদার সাথি ছিলেন। সালেহ [আ] তাঁর সাথিদের নিয়ে ইয়ামনের হাযরামাউতে চলে যান। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোন কোন বর্ণনায় তার মক্কায় চলে গিয়ে সেখানেই ওফাতের কথা জানা যায়। এ ব্যাপারে সিনাই উপদ্বীপে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে : সামূদ জাতির ওপর আযাব আসার সময় হলে হযরত সালেহ [আ] হিজরত করে সেখান থেকে চলে গিয়ে সিনাই-এ অবস্থান করেছিলেন। এ জন্যই "হযরত মূসার পাহাড়"-এর কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের নাম নবী সালেহ-এর পাহাড়।

একটি হাদীস থেকে জানা যায় : সামূদ জাতির ওপর আপতিত আযাব থেকে আবু রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া অবিশ্বাসীদের কেউ প্রাণে বাঁচেনি। আবু রেগাল তখন মক্কায় ছিল। মক্কার হারাম শরীফের মর্যাদার কারণে আল্লাহ তাআলা তার ওপর তখন গযব দেননি। কিন্তু সে হারাম থেকে বাইরে যাওয়ার পর সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূল [সা] মক্কার বাইরে আবু রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরো বলা হয় যে, তায়েফের অধিবাসী ছকীফ গোত্র আবু রেগালেরই বংশধর।

আব্বাসীয় আমলের সরাইখানা

এরপর আমরা একটি প্রাচীন সরাইখানা দেখতে গেলাম। সিরিয়া থেকে আসা হজ্জযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য আব্বাসীয় আমলে মাদায়েন সালেহতে এই সরাইখানা নির্মাণ করা হয়। নাম ফলকে লেখা : HE ISLAMIC CAS:LE. এরপর পরিচয় ভাগে লেখা : One of :he s:a:ions of :he Syrian Pilgrimage rou:e in :he abbaside era. I: was buil: as a res: house for :he PILGRIMAGE. :he cas: le is made by s:one blocks. A well is loca:ed in side i:. :o :he sou:h of :he cas:le :here was a wa:er :ank :o serve :he pilgrimage.

আমরা আব্বাসীয় আমলের এই প্রাচীন ভবনটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দুই-তিন ফুট লম্বা ও এক-দেড় ফুট প্রস্থ পাথর খণ্ড গেঁথে গেঁথে তৈরী করা হয়েছে এই সুদৃঢ় ভবন। হাজার বছরের কালের ক্ষয় থেকে আত্মরক্ষা করে এখনো এ সরাইখানা মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে আব্বাসীয় যুগের জনকল্যাণমূলক কাজের সাক্ষী হয়ে।

ভবনের পাশের ঘরে একটি বড় কূয়া। আগে হয়তো হাতে টেনে বা উটের সাহায্যে কপিকল ঘুরিয়ে পানি তোলা হতো। পরে কোন এক সময় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কূয়া থেকে পানি তোলার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সরাইখানার মূল ভবনের দক্ষিণ পাশে একটি চৌবাচ্চা বা পুকুর। চৌবাচ্চাটি আনুমানিক ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য ২০ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ১৫ ফুট গভীর। হজ্জযাত্রীগণ তাদের নানা কাজে চৌবাচ্চার পানি ব্যবহার করতেন।

আব্বাসীয় আমলের সূচনা হয় ৭৫০ খৃস্টাব্দে। সেই আমল থেকে কত শত হজ্জ কাফেলা

www.pathagar.com

এসে এখানে থেমেছে বিশ্রাম নেয়ার জন্য। কত বাণিজ্য কাফেলা এ পথ পার হয়ে গেছে। কত শত উটের ঘন্টাধ্বনি এ এলাকার ইথারে কাঁপন তুলেছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রাচীন এ সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলাম।

মাদায়েন সালেহ্ রেল স্টেশন

সরাইখানার কাছেই একটি রেল স্টেশন। নাম ফলকে লেখা : MADAIN SALEH S:A:ION. GB স্টেশনের পরিচয় ফলকে লেখা : One of :he main s:a:ions along :he Hijaj Railway which was cons:ruc:ed in :he year 1906 [1325 h] :o provide :ranspor:a:ion for :he pilgrimage be:ween :urkey and Al-Madina, i: is composed of 16 buildings.

সিরিয়া থেকে মক্কা-মদীনাগামী হজ্জযাত্রীদের জন্য ১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৬ সালে হিজায রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৮ সালে এ রেলপথে ট্রেন চলাচল চালু হয়।

তুরস্ক থেকে তাবুক হয়ে মদীনার পথে হিজায রেলওয়ের একশ বছরের পুরনো এ স্টেশনের নাম মাদায়েন সালেহ্। ওসমানীয় বা অটোমান তুর্কী শাসনামলে ষোলটি ভবন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই রেল স্টেশন ও তার আশপাশের এলাকাই ছিল হিজর বা মাদায়েন সালেহ্। সালেহ্ নবীর নগরী।

রেল লাইনটি হিজায রেলওয়ে নামে পরিচিত হলেও মদীনা পর্যন্ত গিয়ে এর গন্তব্য শেষ হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত আর এগুতে পারেনি। পরবর্তী নানা ঘটনা এ রেলপথের ইতিহাস আরো সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তুর্কীরা এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। রেলওয়ের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর। জর্দানের হাশেমীয় রাজারা তাদের এলাকার রেলপথ চালু রাখেন। কিন্তু সৌদি আরবে হিজায রেলওয়ে এরপর থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

এর আগে আমি হিজায রেলওয়ের মদীনা স্টেশনের কিছু নিদর্শন দেখেছি।

মাদায়েন সালেহ্র আব্বাসীয় আমলের সরাইখানার কাছেই এখনো একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ার্কশপে একটি রেল ইঞ্জিন দর্শকদের চাহিদা মিটাচ্ছে কালের সাক্ষী হয়ে। একজন গাইড আমাদেরকে দেখালেন পুরনো রেললাইনটি কিভাবে তুরস্ক ও সিরিয়া হয়ে তাবুকের পথ বেয়ে মদীনার দিকে চলে গিয়েছিল।

গাইড বললেন : 'মদীনা থেকে মাদায়েন সালেহ্ পর্যন্ত এক্সপ্রেস ওয়েতে আসার সময় তুমি ভালোভাবে খেয়াল করলে বেশ লাইন ও খুঁটির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাবে। কয়েক কি.মি. পর পর রেলওয়ের স্টেশন ছিল। সেসব বিলীয়মান রেল স্টেশন ভবনের আশপাশে রেলওয়ে বগীর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। কিছুদূর পর পর স্টেশন দেখে মনে হয় স্থানীয় লোকেরাও এই রেলপথ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।'

মাদায়েন সালেহ রেল স্টেশনের অদূরে রেলওয়ে বগী, চাকা এবং নানা ধরনের যন্ত্রপাতি

www.pathagar.com

এখনো পড়ে আছে। এসব দেখে এখন আর ট্রেনের অবয়ব সম্পর্কে ধারণা করার উপায় নেই। রেল ডিপোতে জার্মানীর তৈরী একটি বাষ্পীয় লোকোমোটিভ ইঞ্জিন সংরক্ষিত অবস্থায় দেখলাম। এটিকে পর্যটকদের দর্শনের উপযোগী করে রাখার কাজ চলছে।

সৌদি সরকার রিয়াদ থেকে হফুফ পর্যন্ত একটি নতুন রেল লাইন চালু করেছেন। মাত্র শ চারেক মাইল দীর্ঘ এ রেলপথে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেন চলাচল করে। এই পথে বার দু'য়েক আমি রিয়াদ থেকে হফুফ গিয়েছি। এ ভ্রমণে আমার মনে হয়েছে এটি সৌদিদের জন্য একটি প্রমোদ-ভ্রমণ মাত্র। যে হিজায রেলওয়ে এক সময় ভ্রমণের বাস্তব চাহিদা পূরণ করেছে, ইতিহাসের বিবর্তনে ওসমানীয় খিলাফতের পতনের পর সেটি এখন পরিত্যক্ত। তবে সৌদি সরকার রিয়াদের সাথে মক্কার ট্রেন সংযোগ চালুর চিন্তা করছেন বলেও শুনেছি।

আবার হাইয়্যাল দিদান

মাদায়েন সালেহ থেকে যখন বাইরে বেরুলাম সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আমরা বুক ভরে মুক্ত বাতাস টেনে নিলাম। সামূদ জাতির প্রাচীন ইতিহাস, উটনীর প্রতি তাদের অবাধ্য আচরণ, গোত্রপতিদের একগুয়ে অহংকার এবং তার পরিণামে ভয়াবহ আযাব ও গজব। এসব ঘটনা এখন জীবন্ত হয়ে তাড়া করছে আমাকে।

হাইয়্যাল দিদান সড়ক ধরে আল উলা শহরের দিকে ফিরে চললাম আমরা। আল উলা থেকে মাদায়েন সালেহ আসার সময় ছিল এক ধরনের উত্তেজনা। এখন মনের ভিতর কাজ করছে অন্য রকম আবেগ। সড়কের ধার ঘেঁষে ডান দিকে পর্বত সারি। বাম পাশে কিছুটা নীচু জমিতে প্রশস্ত বিস্তীর্ণ খেজুর বাগান। খেজুর বাগানের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে বিধ্বস্ত বা জরাজীর্ণ মাটির ঘরবাড়ীর কংকাল দাঁড়িয়ে আছে। যাওয়ার সময় এ দিকটা নযর দেয়ার সুযোগ পাইনি।

ডাক্তার আখতার বললেন : এই মাটির ঘরবাড়ী আর খেজুর বাগান নিয়ে যে এলাকা এটিই প্রাচীনকালের আল উলা বা 'আয়লা'। অর্থাৎ বর্তমানের আল উলা শহর প্রকৃত আল উলা নয়। আদি ও আসল আল উলা মাদায়েন সালেহর আরো কাছে। পুরনো আল উলা থেকে কিছুটা দূরে গড়ে উঠেছে এখনকার নতুন আল উলা শহর। আধুনিক হাসপাতাল, আমীরের অফিস, ব্যাংক, নানা প্রকার পুর-নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, হোটেল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে আল উলায়। অন্যদিকে প্রাচীন আল উলা এখনো তার পুরনো চেহারা নিয়ে অপরিচিত জনের মতো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের দেখছে।

আল উলা একটি শস্য-শ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে অনেক পানির নহর ও বাগিচা। আদিকালে এই অনুকূল পরিবেশই সামূদ জাতিকে এখানে এক নতুন সভ্যতার পত্তন করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। এই সামূদীরাই প্রথম পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী তৈরি করেছিল। পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল তাদের গর্বের কাহিনী। কিন্তু এখন হিজরের আশেপাশে বিরাজ করছে নির্জনতা আর ভীতির পরিবেশ।

www.pathagar.com

পথের দুই পাশে সারিবদ্ধ পাহাড়গুলোর একটির মস্তকও অক্ষত বা আস্ত নেই। বিধ্বস্ত, বিবর্ণ, ছিন্ন-ভিন্ন। নীচ থেকে ভূমিকম্প এবং উপর থেকে বিকট শব্দের প্রচণ্ডতায় ফেটে চৌচির আর ক্ষত বিক্ষত হয়ে কংকালগুলো আশ্চর্য ভাস্কর্যের রূপ নিয়েছে। আল উলার কাছাকাছি পৌঁছে আমরা সর্বত্র এমন পাহাড় দেখলাম যেগুলো একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ঝাকানি দিয়ে ফালি ফালি করে রেখে গেছে। এ ধরনের বিধ্বস্ত পাহাড়-পর্বতের সারি আমরা পরে আরো দেখেছি আল উলা থেকে ফিরার পথে পুব দিকে প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত। শুনেছি উত্তর দিকে জর্দান রাজ্যের সীমানার ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত এই ধ্বংসচিহ্ন বিস্তৃত। এর অর্থ দাঁড়ায় তিন চারশ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় একশ মাইল প্রশস্ত একটি এলাকা সালেহর [আ] সময় ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

গত বছর আমি শুয়াইব নবীর শহর মিদিয়ান বা 'মাগায়েরে শুয়াইব' সফর করি। তাবুক থেকে দু'শ মাইল দূরে এ এলাকা 'আইকাবাসীদের এলাকা' নামেও পরিচিত। শুয়াইবের [আ] সময় সে অঞ্চলের অবাধ্য লোকেরা আল্লাহর গযবে পড়েছিল। তাদের সবচে বড় অপরাধ ছিল মাপে কম দিয়ে লোক ঠকানো। শত শত মাইল জুড়ে মিদিয়ানে দেখেছি ক্ষত-বিক্ষত পাহাড়-পর্বত সারি। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব শেষে ফলের বাগান যেমনি দুমড়ানো মোচড়ানো অপমানিত অবস্থায় অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে, এখানকার পাহাড়গুলোর অবস্থাও তেমনি।

বিদায় আল উলা

আমরা আল উলার হোটেলে ফিরে এলাম। এবার ডা: শাহ আলম ও ডা: আখতারের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পালা। এই দুই সদ্য পরিচিত প্রাজ্ঞ মেজবানের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের মাদায়েন সালেহ সফর এত সহজ ও সফল হতো না। তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

মাদায়েন সালেহ থেকে ফিরে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শহীদ ভাইর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। এ অবস্থায় দু'জনই কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আমার চোখে ঘুম নেই। সারাদিনের ঘটনা সেলুলয়েডের ফিতার মতো আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। শহীদ ভাইর প্রতি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে। তিনি আগেও আল উলা সফর করেছেন। এবার শুধু আমারই জন্য তিনি মক্কা থেকে মাদায়েন সালেহ পর্যন্ত ১৭০০ কি.মি. কঠিন সফরের তকলিফ স্বীকার করেছেন।

সৌদি কর্তৃপক্ষকেও মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। প্রাচীন পরিত্যক্ত নগরীতে তারা চলাচলের সুযোগ উন্নত করেছেন। চারপাশে দেয়াল ঘিরে প্রধান ফটকে পুলিশের দফতর বসিয়েছেন। সামূদীদের প্রাসাদ-ঘরবাড়ী-সমাধি সৌধ ইত্যাদিতে পরিচিতিমূলক ফলক স্থাপন করে এবং কস্‌র আল ফরিদ, কস্‌র আল-বিন্‌ত, কস্‌র আল সানেহ,

www.pathagar.com

মুনতাকা আল খুরাইমাহ প্রভৃতির জন্য সড়কে নির্দেশনা এঁকে দর্শনার্থীদের দেখার ব্যবস্থা আগের চেয়ে সহজ করেছেন।

জাদুঘরে আমরা বহু মূল্যবান প্রত্ন নিদর্শন দেখেছি। প্রাচীন মৃতপাত্র, পাথরের তৈরী পাত্র ও হাতিয়ার এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের স্বর্ণমুদ্রা। পাখা থেকে শুরু করে নানা যুগের কিছু তৈজসপত্র বা তার ভগ্নাবশেষ। এসব কিছুই পেরিয়ে যাওয়া সময়ের সাক্ষী হিসাবে ঠাঁই পেয়েছে জাদুঘরে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের লক্ষ বছরের বিবর্তনের ধারা চিহ্নিত করে জাদুঘরে রয়েছে বেশকিছু মূল্যবান তথ্য সম্বলিত বোর্ড। সময়ের অভাবে সব কিছু তাড়াহুড়া করে দেখা ও নোট নেয়া পর্যটকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা জাদুঘরে বা মাদায়েন সালেহতে কোন নির্দেশনামূলক বই, ক্যাটালগ বা স্যুভেনির পাইনি। এখানকার একটি স্যুভেনির আমি ক'বছর আগে মক্কার রাবেতা আল আলম আল ইসলামী থেকে প্রকাশিত দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল এর বাংলাদেশী সাংবাদিক জনাব জাকির হোসেনের কাছে দেখেছিলাম। স্যুভেনীর ও বইপত্র ছাড়া এ ক্ষেত্রে পর্যটকদের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

আমীরের অফিসের চিত্রটাও আমার মনে দাগ কেটে আছে। সেখানেই ফেদাইন বা মুজাহিদীনদের বসে গাওয়া খেতে খেতে ও খোশ গল্প করতে দেখেছি। পরিবেশটা যেন কোন গল্প-কেচ্ছার রাজ দরবার। এখানে আরেক দফা আমাদের 'ইকামা' [রেসিডেন্ট পারমিট] চেক করার পর সেক্রেটারী নিজ হাতে চিঠি লিখলেন। ইকামা নাম্বারসহ আমাদের প্রত্যেকের নাম সে চিঠির অন্তর্ভুক্ত করে চিঠি সিলমোহর করে খামবন্দী করলেন। এর পর নিজ হাতেই তাতে গালা লাগিয়ে বন্ধ করে দিলেন। এই সেক্রেটারী সব কাজের কাজী। প্রত্ন নিদর্শন দেখার মতো বিষয় থেকে প্রদেশের সকল বড় বড় বিষয়, প্রজা হিতকর যে কোন সিদ্ধান্তের ফাইল, মামলা মোকদ্দমা এই সেক্রেটারীর হাত দিয়ে গড়ায়।

আমি এক সময় পুরনো পুঁথির দারুণ ভক্ত ছিলাম। উলায় এসে যেন সে পুঁথির এক রাজ চরিত্র দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি...।

মদীনার পথে

কিছুক্ষণ বিশ্রাম সেরে আমরা হোটেল ছেড়ে রওনা হলাম মদীনার উদ্দেশ্যে। কিছু খাবার সংগ্রহের জন্য আমরা আবার গেলাম 'জামিল বুখারিয়া'য়। আছরের আযানের আগ মুহূর্তে হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধে হোটেলের আফগান বেয়ারা দ্রুত হাতে কিছু রাইস আর ফাহাম দিজাজ [মুরগীর কাবাব] একটি প্যাকেটে ভর্তি করে দিলেন। তাতেই আমরা বেজায় খুশী। পথের ধারে একটি গাছের নীচে সোফরা বিছিয়ে খেতে বসে গেলাম। সৌদি জীবন-যাত্রায় এ ধরনের খাওয়া-দাওয়ার দৃশ্য অতি সাধারণ। আমীর-ফকীর যে কেউ পথ চলতে চলতে গাড়ী থামিয়ে মাদুর পেতে আয়েশী মজলিস জমিয়ে এভাবে খাওয়া সেরে নিতে পারেন। পথের ধারের

www.pathagar.com

এই সহজতা আরব জীবনে অনেক পরিবর্তনের পর আজো টিকে আছে। আমরাও পথের ধারে বসে খাওয়া পর্ব শেষ করে যাত্রা শুরু করলাম মদীনার পথে।

আল উলা এসেছিলাম রাতে। এখন দিনের আলোয় আল উলা ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম রাস্তার দুই ধারেই বিস্তীর্ণ ঘন পর্বত সারি। কিন্তু লক্ষণীয় হলো : বাম দিকের পর্বত সারির সাথে ডানের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। বাম দিকের পাহাড় পর্বতের কোনটির চূড়া আস্ত নেই। সবগুলোর মস্তক যেন এক অলৌকিক হাতুড়ির আঘাতে ফেটে চৌচির। দেহ ক্ষতবিক্ষত আর পোড়ামাটির রঙ ধারণ করেছে। অথচ অল্প ব্যবধানে ডানের পর্বত সারি স্বাভাবিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থা আমরা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম। মাদায়েন সালেহ-এর ভূমিকম্প, বজ্রপাত ও বিদীর্ণকারী শব্দের আঘাত যে এলাকার ওপর পড়েছিল তা স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করেছে এই দৃশ্যপট।

আল উলা থেকে দীর্ঘ পথ একটানা চলতে চলতে পথে একটি চায়ের দোকানও পেলাম না। মাঝপথে ডান দিকে শুধু একটি ফিলিং স্টেশন বা পেট্রোল পাম্প দেখলাম। গত রাতে অন্ধকারের মধ্যে এটি চোখে পড়েনি। রাতে খদ্দের না থাকায় হয়তো বন্ধ ছিল।

একশ সত্তর কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে আমরা মদীনা-তাবুক রোডে এসে পড়লাম। মদীনা-তাবুক নতুন সড়ক। আগে আল উলার মধ্য দিয়েই তাবুক হয়ে সিরিয়া-তুরস্ক পর্যন্ত পথ ছিল। এখন নতুন পথ আল উলার দিকে না গিয়ে পৌনে দু'শ কি.মি. বাকী থাকতেই সোজা তায়মার দিকে চলে গেছে। তারপর তায়মা থেকে তাবুক। তায়মা ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। সেখানে হযরত মূসার [আ] সময়কার নিদর্শন রয়েছে। আল্লামা আসাদের 'রোড টু মক্কা' বইতে 'তায়মা'র কথা পড়েছিলাম। গত বছর আমি তায়মা দেখার সুযোগ পেয়েছি।

মদীনা-তাবুক সড়ক ধরে মদীনার দিকে আরো বেশ কিছু দূর চলার পর আমরা ছোট মসজিদের পাশে একটি চায়ের দোকান পেলাম। মাগরিবের নামায শেষে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দু'পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা হলো।

চা-দোকানী পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের লোক। কথায় কথায় বেশ খাতির জমে উঠলো। আমার চায়ে তিনি 'মারমারি' নামে এক ধরনের পাতা দিলেন। বললেন, চেখে দেখুন। চায়ে 'মারমারি' পাতা আর কোথাও ব্যবহার হয় না! আমি নতুন স্বাদ থেকে মাহরুম হতে রাযী না।

সৌদি আরবের সর্বত্র 'শায়ে নানা' বা পুদিনা চা অত্যন্ত জনপ্রিয়। দুধ ছাড়া চা। একে আরবে বলা হয় 'শায়ে সুলেমানী'। শায়ে সুলেমানীতে 'নানা' বা পুদিনা পাতা ব্যবহার করার পর নাম হয় 'শায়ে নানা'। এই 'শায়ে না-না' বা 'পুদিনা চা' সর্বত্র জনপ্রিয়। সৌদি মুলুকে মদীনার নানা বা পুদিনা পাতার কদর সবচে বেশী। এছাড়া 'শায়ে ক্যাটক্যাটি' বা টক চাও খেয়েছি সৌদি আরবে। 'মারমারী'র সাথে এর আগে আমার

১৩—

www.pathagar.com

পরিচয় ঘটেনি। এক ধরনের ছোট ছোট ভারি পাতা। শুকিয়ে কুচকে গোল হয়ে কতকটা আমাদের দেশের হড়বড়ই-এর মতো আকার একেকটি পাতার। 'মারমারি' নামক সবজী মিশানো চা এ এলাকার সৌদিদের প্রিয়।

খায়বর ও কামুস দুর্গ

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আমরা এক লম্বা টানে খায়বর পৌছলাম। মদীনা-তাবুক মূল সড়ক থেকে ডানে টার্ন নিয়ে পথ চলে গেছে খায়বরের দিকে। কিছু পথ গিয়ে একটি ছোট বাজার। সেখানে কয়েকজন বাংলাদেশীকে পেলাম। তারা জানালেন, এখান থেকে আরো পনেরো কি.মি. দূরে কামুস দুর্গ। সেখানেই 'খায়বর জঙ্গ' হয়। এত রাতে অন্ধকারের কারণে এখন সে জায়গা দেখা যাবে না।

মনটা খারাপ হলো। অগত্যা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো। প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইরা তাদের চোখে দেখা কিছু বিবরণ শুনালেন দুর্গ সম্পর্কে। পনেরো কি.মি. যাবার পর রাস্তার কাছেই প্রাচীন কামুস দুর্গ। সেখানে পাহাড়ি উচ্চতায় প্রাচীর ঘেরা দুর্গ ছিল। প্রাচীর-এর ভিতর দুর্গের মধ্যে অনেক ঘর ছিল। এখন প্রাচীন এ দুর্গের প্রাচীর বিলুপ্ত হয়েছে। খোলা জায়গায় এখনো পুরনো আমলের কিছু ঘর রয়েছে।

বহুলোক এখনো রাসূলের [সা] খায়বর অভিযানের স্মৃতি বিজড়িত খায়বর দুর্গ দেখতে আসেন। মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহূদীরা খায়বরে জোটবদ্ধ হয়েছিল। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য খায়বর সৃষ্টি করেছিল নানা ধরনের হুমকি। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূল [সা] উত্তর আরবের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ পান। তখন তিনি বিদ্রোহী ইহূদীদের শক্তিশালী ঘাঁটি ও আশ্রয় কেন্দ্র এই খায়বরে অভিযান চালান এবং বিজয় অর্জন করেন। ইসলামের ইতিহাসে খায়বর বিজয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে হযরত আলীর বীরত্বের কাহিনী। সে কাহিনী কিংবদন্তীকে হারা মানায়।

কামুস দুর্গ ক'দিন অবরোধ করে রেখেছিলেন হযরত মুহাম্মাদের [সা] নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনী। এরপর এই দুর্গ মুসলমানগণ দখল করেন। কামুস দুর্গের প্রকাণ্ড লোহার দরওয়াজা একটানে খুলে ফেলে সেটিকেই হযরত আলী ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই ইতিহাস-খ্যাত দরজা এখন এখানে নেই। সামনে এখন একটি মসজিদ। তার পাশে পানির প্রস্রবন।

বাংলাদেশী বন্ধুরা বললেন : হযরত আলী যুদ্ধের সময় তার বিপক্ষ কাফের সেনাপতিকে জুলফিকার নামক তরবারী দিয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করলে দুশমনের দেহ দু'টুকরা করে তলোয়ার মাটিতে বিদ্ধ হয়। হযরত আলীর জুলফিকারের আঘাতে সৃষ্ট সেই গর্ত থেকে সেই যে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে, সে প্রস্রবন এখনো বন্ধ হয়নি...।

বাংলাদেশীরা স্বভাবত বীরভক্ত। হযরত আলী বাংলাদেশের লোকগাঁথায় অমিততেজ

www.pathagar.com

বীর হিসাবে বেশী পরিচিত। হযরত আলী একদিকে মহাবীর অন্যদিকে নবীজীর চাচাতো ভাই ও জামাতা। একেবারে প্রথম পর্যায়ের ঈমান গ্রহণকারী প্রথম কিশোর। হযরত আলীর বীরত্ব গাঁথা এঁকেছেন বাংলাদেশের পুঁথি লেখকগণ। তার মধ্যে 'খায়বর জঙ্গ' বিখ্যাত। পুঁথির মাধ্যমেই কিশোর বয়সে খায়বরের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। পরিচিত হয়েছিলাম হযরত আলীর হায়দরী হাঁক আর তাঁর দু'ধারী জুলফিকারের তেজের সাথে। আজ সে খায়বর-এ এসে বাল্যকালের আবেগ-উত্তাপ নতুন করে অনুভব করলাম।

আমরা গাড়ির গতি পরিবর্তন করে মোড় ঘুরে আল রাযী ব্যাংকের খায়বর শাখায় গেলাম। শহীদ ভাই গাড়ীতে অপেক্ষা করলেন। আল রাযী ব্যাংকের তরুণ ম্যানেজার ইংরেজী বুঝেন না। তার সাথে ভাংগা ভাংগা আরবীতে আর সুদানী ড্রাফট ক্লার্কের সাথে ইংরেজীতে কথা বলে কিছু পেশাগত কাজ সারলাম। এরপর একটানা মদীনার পথ।

মদীনায় 'সাইয়্যেদুনা শুহাদা' রোডের মেসে পৌঁছলাম। সেখানে চা খেয়ে মদীনার বাজারে গেলাম। কিছুক্ষণ ঘুরলাম। বাংলাদেশী বন্ধুদের দোকানে দোকানে অনেক কাপ শায়ে নানা পান করলাম এবং প্রয়োজনীয় কথা সারলাম। কিছু কেনাকাটাও হলো। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। খাওয়ার সময় ডা: সাইফুল ইসলাম ভাই বদর রোডের ইয়াতামা নামক পল্লী থেকে ডিউটি সেরে এসে আমাদের সাথি হলেন। শুতে শুতে রাত দু'টা।

ছয় বারো উনিশ'শ আটানব্বই, রবিবার।

পাশের মসজিদে ফজরের নামায আদায় করে এসে নাশতার সময় জমজমাট আড্ডায় মেতে উঠলাম। নাশতার সময় সাইফুল ভাই সৌদি আরব সম্পর্কে গল্প জমিয়ে তুললেন। আল উলা শহর আর তার আশপাশের নানা পল্লীতে কয়েক বছর চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সে সুবাদে এখানকার জনগণের সাথে ভিতর থেকে মিশেছেন। সে অভিজ্ঞতার ডালি মেলে ধরলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা মসজিদে নববীতে গেলাম। রিয়াদুল জান্নাতে জায়গা পেয়ে সেখানে কিছুক্ষণ কাটালাম। এরপর রাসূলের [সা] রওজা পাক যিয়ারত করলাম। সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মহিলাদের যিয়ারতের জন্য আসহাবে সুফফার এলাকাসহ রিয়াদুল জান্নাতের একটি অংশ এবং রওযা মুবারকের বাম দিকটা ঘিরে দেয়া হয়েছে। বাকী এলাকা পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত।

আমরা যিয়ারত সেরে বা'বে জিবরীলের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে বেরিয়ে এলাম। বহুদিন এই মদীনা ছিল আমার কাছে শুধুই স্বপ্নের ভুবন। পাখির কাছে হাওয়ার কাছে মিনতি জানিয়েছি কত। ও পুবাল হাওয়া আমার সালাম যাইও তুমি নবীজীর রওযায় লইয়া...।'

দুপুর বারোটায় মক্কার উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে থেমে একটি দোকান থেকে তামিয়া কিনে গাড়ীতে বসে খেতে খেতে পথ চললাম।

www.pathagar.com

ইহরাম না বেধে এই প্রথম আমরা বীরে আলী অতিক্রম করলাম। এ যাত্রায় আমাদের উমরার নিয়ত ছিল না। গত ক'দিন আগে প্রায় দু'সপ্তাহ এই এলাকায় সফরে ছিলাম। মক্কা, জেদ্দা, তায়েফ, রাবেগ, মাস্তুরা, বদর, ইয়ানবু, মদীনা। বিস্তীর্ণ এলাকা সফরের সুযোগ পেয়েছি সে সময়। তখনো চালক ছিলেন শহীদ ভাই। আমাদের একটানা সফরে আরেকজন যাত্রী ছিলেন মুজাহিদ ভাই। তখন একবার আমরা উমরা করি মদীনার বীরে আলী থেকে ইহরাম বেঁধে। আরেকবার রাবেগ থেকে। রাবেগের কাছের এই ইহরাম বাঁধার স্থানটির কাছেই রাসূলের [সা] মা হযরত আমেনার কবর। সেখানে ইহরাম বাঁধার সময় এক বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল আমার।

দু'টার দিকে এক ইশতারাহাতে দুপুরের খাওয়া সারলাম এবং যোহর ও আছরের নামায এক সাথে আদায় করলাম। বিকালে মক্কা শরীফে পৌঁছলাম এবং বেশ ক'দিন পর শহীদ ভাইর বাসায় বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রামের স্বস্তি অনুভব করলাম।

মাগরিবের পর জেদ্দা কনস্যুলেটের আইন কর্মকর্তা শহীদুল বারী ভাই এলেন। তার সাথে সারওয়ার। ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের ছোট ভাই। শহীদুল বারী ভাই একটি নতুন হোটেলে আজকের রাতের খাবার খাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। উন্মুক্ত আসমানের নীচে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। চন্দ্রালোকিত তারাখচিত খোলা আসমানের নীচে বসে কাবাব-রুটি খেয়ে দীর্ঘ আড্ডায় শরীরের ক্লান্তি অনেকটা কেটে গেল। শহীদুল বারী ভাই রাতটা আমাদের সাথেই কাটালেন।

সাত বারো আটানববই, সোমবার।

বা'ব আবদুল আযীযে গিয়ে সাপটকোর বাস চেপে তানঈম গেলাম। সেখানে আয়েশ করে এক গ্লাস 'শায়ে নানা'য় চুমুক দিলাম। চা-পান শেষ করার আগেই বাসে ওঠার ঘোষণা শুনলাম। সকাল দশটা শূন্য মিনিটে বাস মক্কা থেকে রিয়াদের উদ্দেশে রওনা হলো।

আমার হাতে কর্ণেল হামিদের লেখা একটি বই। ঢাকার তিনটি সামরিক অভ্যুত্থানের ওপর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট থেকে সাতই নভেম্বর পর্যন্ত এবং ১৯৮১ সালের ১লা মে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ওপর লেখা এ বই। লেখক ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তৎকালীন স্টেশন কমাণ্ডার কর্ণেল হামিদ এই বইটি মুজাহিদ ভাইর সাথে সফরের ফাঁকে ফাঁকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েছিলাম। এখন মক্কা থেকে রিয়াদের পথে চলতে চলতে আমাদের ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর চোখ রাখলাম। এই তিনটি ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি ছিলাম সাংবাদিক। নানাভাবে সাংবাদিক হিসেবে আমি এসব ঘটনার কিছু কিছু দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছি। আজ কর্ণেল হামিদের জবানী পাঠ করে এ সম্পর্কে আরো নতুন ধারণা লাভ করেছি বলে মনে হলো।

রাত দশটায় সৌদি এরাবিয়ান পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী SAP:CO-র বাস রিয়াদের

www.pathagar.com

কেন্দ্রস্থলে বাথা বাস স্ট্যান্ডে এসে থামলো। ঝাড়া সতেরো দিন পর রিয়াদ ফিরেছি। সেখানে কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হবার কথা ছিল না। কিন্তু কামরুল আমাকে সেখানে রিসিভ করলেন। তিনি চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ড. লোকমানকে আনতে বাস স্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন। তাকে না পেয়ে ফিরে চললেন আমাকে নিয়ে।

আমার কানে তখনো গুঞ্জরিত হচ্ছে ডাঃ আক্তার ডাঃ শাহ্ আলম আর আবদুর রহমানের কণ্ঠে আল কুরআনের তিলাওয়াত :

"তাদের কাছে কি তাদের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস পৌঁছেনি? নূহের জাতি, আদ, সামূদ ও ইবরাহীমের জাতির ইতিহাস? মাদইয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতিসমূহ উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলির ইতিহাস? তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিশানাসহ তাদের কাছে এসেছিল। এরপর তাদের ওপর যুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল।" [সূরা তাওবা : ৭০] ■

www.pathagar.com

জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় রাসূলের [সা] কয়েকটি হাদীস

মো: আব্দুর রহীম খান

আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালিন, ওয়ালা আলিহী ওয়াসহাবিহী আজমাঈন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ায় তার খলিফা প্রেরণ করেই শেষ করেননি বরং এ খলিফা কি করে এ দুনিয়ায় সুন্দরভাবে জীবন যাপন করে দুনিয়াকে আল্লাহ্র রঙ্গে আবাদ করে তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যমে আখেরাতে নাজাত পাবে– সে লক্ষ্যে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব দুনিয়াতে যথাযথভাবে পালন করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে বলে আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন।

এ ছাড়াও এ রাসূলকে অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ভালবাসার অর্থ আল্লাহ্ তাআলাকেই স্বয়ং ভালবাসা বলেও উল্লেখ করেছেন। রাসূলের [সা] বাস্তব জীবন আল-কুরআন এবং তাঁর মানবীয় জীবন চলার পথের দিশা আল-হাদীস। তাই আল-কুরআন ও হাদীস থেকে রাসূলের [সা]

www.pathagar.com

জীবনাচার জেনে সে মোতাবেক ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন গঠন করলেই তাকে ভালবাসার দাবী যথার্থ হবে। প্রসিদ্ধ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সহীহ আল-বুখারী যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনিভাবে চারখানি সুনান গ্রন্থের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ [রহ]-এর সুনান আবু দাউদ গ্রন্থখানি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ মানসেই সিহাহ্ সিত্তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত সুনান আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থ হতে জীবন চলার পথের প্রয়োজনীয় কয়েকটি হাদীস বিষয়ভিত্তিক পাঠকদের নিকট পেশ করা হলো। সাথে সাথে আরবী ইবারত দেখার সুবিধার্থে মূল কিতাবের হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হলো।

পবিত্রতা প্রসঙ্গ

১। হযরত আলী [রা] হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে ছবি, কুকুর ও অপবিত্র লোক থাকে– সেখানে রহমতের ফেরেশতাগণ [নতুন রহমতসহ] প্রবেশ করেন না। [হাদীস নং-২২৭]

নামায প্রসঙ্গ

২। আবু হুরায়রা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকআত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরা নামায [ওয়াক্তের মধ্যে] আদায় করল [এবং তা কাযা গণ্য হবে না]। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকআত আদায় করতে পারল সে যেন পুরা নামাযই [ওয়াক্ত থাকতেই] আদায় করল। [হাদীস নং-৪১২]

৩। আবু কাতাদা ইবন রিবঈ [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন– নিশ্চিত আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি : যে ব্যক্তি তা সঠিক ওয়াক্তসমূহে আদায় করবে– আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তার হেফাজত করে না– তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। [হাদীস নং-৪৩০]

৪। আবু হুরায়রা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতক্ষণ কোন বান্দা মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ সে নামাযী হিসেবে গণ্য হবে। ঐ ব্যক্তির উযু নষ্ট না হওয়া বা ঘরে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এইরূপ দু'আ করতে থাকে : "ইয়া আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও! ইয়া আল্লাহ! তার উপর তোমার রহমত নাযিল কর।" আবু হুরায়রাকে [রা] 'হাদাছুন'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে– তিনি বলেন, যদি পায়খানার রাস্তা দিয়ে আস্তে বায়ু নির্গত হয়। [হাদীস নং-৪৭১]

৫। উছমান ইবন আফফান [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায জামায়াতে আদায় করল সে যেন সারা রাতব্যাপী ইবাদতে মশগুল থাকল। [হাদীস নং-৫৫৫]

৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে [জামায়াতের পর] একাকী নামায আদায় করতে দেখে বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই কি– যে এই ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে তার সাথে একত্রে নামায পড়তে পারে? [হাদীস নং-৫৭৪]

৭। নুমান ইবন বশীর [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেন : তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দণ্ডায়মান হবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। রাবী বলেন, অত:পর আমি মুসল্লীদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। [হাদীস নং-৬৬২]

৮। আয়েশা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডানদিকের মুসল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন। [হাদীস নং-৬৭৬]

৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে দেরী করতে দেখে বলেন : তোমরা প্রথম কাতারে এসো এবং আমার অনুসরণ কর। অত:পর পরবর্তী লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করবে। এক শ্রেণীর লোক সবসময় সামনের কাতার থেকে পেছনে থাকবে। মহান আল্লাহও তাদেরকে পেছনে ফেলে রাখবেন। [হাদীস নং-৬৮০]

১০। আবু সাঈদ আল-খুদরী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযে রত অবস্থায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দিবে। যদি সে বাধা উপেক্ষা করে তবে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কারণ সে একটা শয়তান। [হাদীস নং-৬৯৭]

১১। ইবন আব্বাস [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়কালে একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেন। [হাদীস নং-৭০৯]

১২। আবু সাঈদ [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কোন কিছু নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযের

www.pathagar.com

কোন ক্ষতি হয় না, তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী এরূপ করতে বাধা দেবে। কেননা [নামাযীর সামনে দিয়ে] গমনকারী একটা শয়তান। [হাদীস নং-৭১৯]

১৩। আব্দুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতে অধিক লোকের শরীক হওয়ার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন। [হাদীস নং-৮০০]

১৪। আল-বারাআ [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা, রুকু ও দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে প্রায় একই পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন। [হাদীস নং-৮৫২]

১৫। আবু মাসউদ আল-বদরী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রুকু হতে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়াবে না এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বিরতির সময় সোজা হয়ে বসবে না তার নামায যথেষ্ট হবে না। [হাদীস নং-৮৫৫]

১৬। আবদুর রহমান ইবন শিবলী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকের ঠোকরের ন্যায় [অর্থাৎ তাড়াতাড়ি] সিজদা করতে, চতুষ্পদ জন্তুর মত বাহু বিছাতে এবং মসজিদের মধ্যে উটের মত নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে নিষেধ করেছেন। [হাদীস নং-৮৬২]

১৭। আবু যার [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : বান্দা নামাযের মধ্যে যতক্ষণ এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দৃষ্টি তার দিকে থাকবে। অপরপক্ষে যখন সে এদিক-ওদিক খেয়াল করবে, তখন আল্লাহও তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন। [হাদীস নং-৯০৯]

১৮। হযরত আবু হুরায়রা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযের মধ্যে ইমামের কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে পুরুষেরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা হাতের উপর হাত তালি মেরে শব্দ করবে। [হাদীস নং-৯৩৯]

১৯। যায়েদ বিন ছাবিত [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ফরয নামায ব্যতীত যে কোন ধরনের নফল নামায আমার এই মসজিদ [মসজিদে নববী] হতে ঘরে পড়াই শ্রেয়। [হাদীস নং-১০৪৪]

২০। হযরত আবুল জাদ আদ-দামিরী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বিনা কারণে অলসতা হেতু তিনটি জুমুআর নামায পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন [যাতে কোন মঙ্গল তাতে প্রবেশ করতে না পারে, ফলে তাতে কল্যাণ ও বরকত প্রবেশের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়]। [হাদীস নং-১০৫২]

www.pathagar.com

২১। আয়েশা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যখন নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো হাদাছ হয় [উযু নষ্ট হয়] তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায় [নাক ধরা উযু নষ্টের পরিচায়ক]। [হাদীস নং-১১১৪]

২২। ইবন উমার [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যদি মসজিদে কোন ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তবে সে যেন স্বীয় স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে বসে। [হাদীস নং-১১১৯]

২৩। ইবন উমার [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন। [হাদীস নং-১১৫৬]

২৪। ইবন আব্বাস [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়াই যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। ইবন আব্বাসকে [রা] এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর উম্মাত যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য তিনি এরূপ করেছিলেন। [হাদীস নং-১২১১]

২৫। হযরত উম্মে হাবীবা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকাত নফল/সুন্নাত নামায আদায় করবে– এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। [হাদীস নং-১২৫০]

২৬। হুযায়ফা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। [হাদীস নং-১৩১৯]

২৭। আবু হুরায়রা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ রাত্রিতে [তাহাজ্জুদ] নামাযের জন্য উঠে তখন সে যেন প্রথমে হালকাভাবে দুই রাকআত [নফল] নামায আদায় করে। [হাদীস নং-১৩২৩] [মুসলিম]। অন্য হাদীসে এসেছে– অত:পর তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত দ্বারা নামায আদায় করতে পার। [হাদীস নং-১৩২৪]

২৮। আবু হুরায়রা [রা] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন : কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী [অর্থাৎ সূরা আল-মুলক] তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ করে দেয়া হবে [অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুপারিশকারী হবে]। [হাদীস নং-১৪০০]

২৯। ইবন আব্বাস [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত করবেন এবং সব রকম দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করবেন এবং তার জন্য এমন স্থান হতে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। [হাদীস নং-১৫১৮]

৩০। আবু মূসা আশআরী [রা] হতে বর্ণিত । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : হে জনগণ! তোমরা নিম্নস্বর ব্যবহার করে তোমাদের নফসের প্রতি সুবিচার কর। [হাদীস নং-১৫২৮]

৩১। আবু হুরায়রা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করেন। [হাদীস নং-১৫৩০]

যাকাত প্রসঙ্গ

৩২। ইবন মাসউদ [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে– আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য দূর করেন না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তা আল্লাহর কাছে পেশ করে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন– হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে। [হাদীস নং-১৬৪৫]

৩৩। আনাস [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, [দুনিয়াতে তার] রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হোক এবং তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক– সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখে। [হাদীস নং-১৬৯৩]

৩৪। আসমা বিনতে আবু বাকর [রা] বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়ের [তাঁর স্বামী] তাঁর ঘরে যে মাল আনেন তা ব্যতীত আমার কোন সম্পদ নাই। আমি কি তা হতে দান-খয়রাত করতে পারি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তুমি তা হতে দান করবে এবং সম্পদ জমা করবে না। কেননা তুমি তা ধরে রাখলে তোমার রিযিকও স্থগিত করে রাখা হবে। [হাদীস নং-১৬৯৯]

হজ্জ প্রসঙ্গ

৩৫। ইবন আব্বাস [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী করীমকে [সা] [হজ্জের করণীয় বিষয় আগে-পরে করা সম্পর্কে] কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন জবাবে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করেছি? তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী [এখন] কর। এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলেন, [সূর্যাস্তের পূর্বে] আমি কংকর নিক্ষেপ করতে ভুলে গেছি এবং আমি [এখনও] কংকর নিক্ষেপ করিনি। এতদশ্রবণে

www.pathagar.com

তিনি বলেন, তুমি [এখন] কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। [হাদীস নং-১৯৭৯]

রোযা প্রসঙ্গ

৩৬। সালমান ইবন আমের [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা পানি পবিত্র। [হাদীস নং-২৩৪৭]

৩৭। নবী করীমের [সা] গৃহকর্তা আবূ আইউব আনসারী [রা] নবী [সা] হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি [সা] ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। [হাদীস নং-২৪২৫]

জিহাদ প্রসঙ্গ

৩৮। আবূ হুরায়রা [রা] নবী করীম [সা] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ যুদ্ধ করল না, এমনকি যুদ্ধ করার [বা গাযী হওয়ার] ইচ্ছাও প্রকাশ করল না, সে এক প্রকারের কপট [মুনাফিক] হিসাবে মারা গেল। [হাদীস নং-২৪৯৪]

৩৯। আনাস [রা] হতে বর্ণিত যে, নবী করীম [সা] বলেছেন : তোমরা তোমাদের জান-মাল দিয়ে এবং বাক্য প্রয়োগ তথা লেখনির মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। [হাদীস নং-২৪৯৬]

৪০। আনাস [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমরা রাতের বেলা ভ্রমণ কর। কারণ রাতে যমীন সংকুচিত হয়ে যায়। [হাদীস নং-২৫৬৩]

৪১। কা'ব ইবন মালিক [রা] হতে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম [সা] কোন দিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তা অপরের নিকট গোপন রাখতেন আর বলতেন, যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র। [হাদীস নং-২৬২৯]

৪২। আবূ হুরায়রা [রা] সূত্রে নবী [সা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈমানের দাবী এই যে, কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা যাবে না। কাজেই, কোন মু'মিন কাউকে ধোঁকা দিয়ে মারবে না। [হাদীস নং-২৭৬০]

কুরবানী প্রসঙ্গ

৪৩। উম্মু সালামা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন : যার কাছে কুরবানীর পশু থাকবে এবং সে তাকে কুরবানী করতে চায়, তার উচিত হবে যিলহাজ্জের চাঁদ দেখার পর হতে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটা। [হাদীস নং-২৭৮২]

অসিয়ত প্রসঙ্গ

৪৪। আবূ সাঈদ খুদরী [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : কোন ব্যক্তির

www.pathagar.com

জন্য তার জীবদ্দশায় এক দিরহাম পরিমাণ দান করা, তার মৃত্যুকালীন সময় একশত দিরহাম দান করার চাইতে শ্রেয়। [হাদীস নং-২৮৫৬]

৪৫। আলী ইবন আবী তালিব [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ [সা] থেকে শুনে এটা মুখস্থ করেছি যে, স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপ থাকা উচিত নয়। [হাদীস নং-২৮৬৩]

৪৬। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : তোমরা [ঈমান] ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে দূরে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা]! ঐ গুনাহগুলো কি কি ? তিনি [সা] বলেন : [১] আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, [২] জাদু করা, [৩] কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যার হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে হকভাবে হত্যা করা যাবে, [৪] সুদ খাওয়া, [৫] ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, [৬] যুদ্ধের দিন যুদ্ধের ময়দান হতে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং [৭] সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকদের উপর [যিনার] মিথ্যা অপবাদ দেয়া– যে সম্পর্কে তারা অনবহিত। [হাদীস নং-২৮৬৪] [সাতটি কবীরা গুনাহ]

জানাযা প্রসঙ্গ

৪৭। আবূ মূসা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবীকে [সা] বহুবার এরূপ বলতে শুনেছি : যখন কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে, কিন্তু অসুখ বা সফরের কারণে তা আদায়ে অক্ষম হয়, তখন তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী লেখা হয়, যে পরিমাণ নেকী তার সুস্থতার সময় বা বাড়ীতে থাকার সময় নেক কাজ করার পরিবর্তে লেখা হতো। [হাদীস নং-৩০৭৮]

৪৮। আবদুর রহমান ইবন 'আওফ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি যে, যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারীর খবর পাও, তখন সেখানে যাবে না। আর যখন তোমাদের বসতি এলাকায় মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়, তখন তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যত্র গমন করবে না। [হাদীস নং-৩০৮৯]

৫৯। আবূ সাঈদ খুদরী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালিমার তালকীন দিবে [অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করতে থাকবে]। [হাদীস নং-৩১০৩]

৫০। মা'কাল ইবন ইয়াসার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির নিকট 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করবে। [হাদীস নং-৩১০৭]

৫১। আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন : মৃত ব্যক্তির হাঁড় চূর্ণ করা, জীবিত ব্যক্তির হাঁড় চূর্ণ করার মত। [হাদীস নং-৩১৯৩]

৫২। উছমান ইবন 'আফফান [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী [সা] যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন :

www.pathagar.com

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর এবং সে যেন সুদৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য দু'আ কর। কেননা, এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [হাদীস নং-৩২০৭]

শপথ ও মানত প্রসঙ্গ

৫৩। সা'ঈদ ইবন আবী 'উবায়দা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইবন 'উমার [রা] জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার নামে কসম করতে শুনে তাকে বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খেল, সে যেন [আল্লাহর সংগে] শরীক করলো। [হাদীস নং-৩২৩৬]

৫৪। ইবন উমার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : যদি কেউ কসম করার পর ইনশাআল্লাহ্ বলে, সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ করতে পারে, আর চাইলে পরিত্যাগও করতে পারে। এমতাবস্থায় সে কসম ভংগকারী বলে বিবেচিত হবে না। [হাদীস নং-৩২৪৬]

ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গ

৫৫। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী এবং সুদের দলীল লেখক-সকলের উপর লা'নত করেছেন। [হাদীস নং-৩৩০০]

৫৬। আবূ উমামা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে, পরে সে ব্যক্তি সুপারিশের জন্য তাকে কোন হাদিয়া দেয় এবং সুপারিশকারীও তা গ্রহণ করে; এমতাবস্থায় হাদিয়া গ্রহণকারী যেন সুদের একটি বড় দরজার মধ্যে প্রবেশ করলো। [হাদীস নং-৩৫০৩]

বিচার প্রসঙ্গ

৫৭। আবদুল্লাহ্ ইবন আমর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] ঘুষদাতা এবং গ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন। [হাদীস নং-৩৫৪২]

ইল্ম প্রসঙ্গ

৫৮। আওফ ইবন মালিক আশজায়ী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি : নেতা, উপ-নেতা বা দাম্ভিক ধোঁকাবাজ লোক ছাড়া আর কেউ-ই কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে না। [হাদীস নং-৩৬২৪]

পানীয় প্রসঙ্গ

৫৯। আবদুল্লাহ ইবন আবী 'আওফা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী [সা] বলেছেন : লোকদের যে পানি পান করায়, তার উচিত সবার শেষে পানি পান করা। [হাদীস নং-৩৬৮৩]

www.pathagar.com

৬০। আনাস ইবন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী [সা] তিন দমে পানি পান করতেন এবং বলতেন : এভাবে পানি পান করলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হয়, খাদ্য অধিক হযম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। [হাদীস নং-৩৬৮৪]

৬১। আবদুল্লাহ ইবন [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। [হাদীস নং-৩৬৮৬]

খাদ্য-দ্রব্য প্রসঙ্গ

৬২। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] কোন সময় খাদ্যের কোনরূপ দুর্নাম করতেন না। যদি কোন কিছু তাঁর খাওয়ার ইচ্ছা হতো, তিনি তা খেতেন এবং খাওয়ার রুচি না হলে খেতেন না। [হাদীস নং-৩৭২১]

৬৩। ইবন 'উমার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে খায় এবং যখন পানি পান করে, তখন যেন ডান হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় এবং পানি পান করে। [হাদীস নং-৩৭৩৪]

৬৪। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : যখন তোমাদের কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তোমরা তাকে পাত্রের মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দেবে। কেননা, তার এক ডানায় রোগ এবং অপর ডানায় শিফা থাকে। আর মাছি খাবারে পতিত হওয়ার সময় ঐ ডানা নিক্ষেপ করে, যাতে রোগ-জীবাণু থাকে। কাজেই তোমরা তাকে পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। [হাদীস নং-৩৮০১]

ভাগ্য গণনা প্রসঙ্গ

৬৫। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : ভূত-প্রেত মানুষকে কষ্ট দিতে সক্ষম নয়। [হাদীস নং-৩৮৭৩]

পোশাক-পরিচ্ছদ প্রসঙ্গ

৬৬। আলী ইবন আবূ তালিব [রা] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [সা] [পুরুষদের জন্য] রেশমী বস্ত্র, কুসুম রংয়ের কাপড়, সোনার আংটি ও রুকুতে কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি [সা] রুকু ও সিজদার মধ্যে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন। [হাদীস নং-৪০০২ ও ৪০০৩]

৬৭। জাবির [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান না করে। [হাদীস নং-৪০৮৮]

৬৮। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা না করে। হয়তো দু'টি জুতাই পরবে, নয়তো দু'টিই খুলে রাখবে। [হাদীস নং-৪০৮৯]

www.pathagar.com

৬৯। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে, তখন সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে। আর যখন কেউ জুতা খুলবে, তখন সে যেন বাম পা থেকে শুরু করে। তাহলে ডান পা পরার সময় আগে থাকবে এবং খোলার সময় শেষে থাকবে। [হাদীস নং-৪০৯২]

৭০। আবদুল্লাহ ইবন উমার [রা] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [সা] গোঁফ ছাঁটতে এবং দাঁড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। [হাদীস নং-৪১৫১]

৭১। আনাস ইবন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা.] আমাদের জন্য চল্লিশ দিন পর-পর নাভীর নীচের চুল সাফ করার, নখ কাটার, গোঁফ ছাঁটার এবং বোগলের পশম উঠিয়ে ফেলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন। [হাদীস নং-৪১৫২]

ফিতনা-ফাসাদ প্রসঙ্গ

৭২। আবূ মূসা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : আমার এ উম্মতের উপর আল্লাহর রহমত আছে। আখিরাতে তারা [স্থায়ী] আযাব ভোগ করবে না। বরং তাদের কাফফারা এভাবে হবে যে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হবে-ফিতনা, ভূমিকম্প এবং হত্যা। [হাদীস নং-৪২২৯]

মাহ্‌দী [আ] প্রসঙ্গ

৭৩। উম্মু সালামা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি যে, “মাহ্‌দী আমার ঔরসজাত ফাতিমার বংশ থেকে হবে।” [হাদীস নং-৪২৩৫]

৭৪। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দীনের ‘তাজদীদ’ বা সংস্কার সাধন করবেন। [হাদীস নং-৪২৪১]

৭৫। আনাস ইবন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত যে, নবী [সা] বলেছেন : যত নবী এসেছেন, তারা সবাই তাদের উম্মতকে কানা ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। জেনে রাখ! সে হবে কানা। আর তোমাদের মহান রব কানা নন এবং দু'চোখের মাঝখানে ‘কাফির’ শব্দ লেখা থাকবে। [হাদীস নং-৪২৬৫]

৭৬। আবূ দারদা [রা] থেকে বর্ণিত যে, নবী [সা] বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। [হাদীস নং-৪২৭২]

শাস্তির বিধান প্রসঙ্গ

৭৭। আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : সম্রাট ব্যক্তিদের ব্যাপারে–শরীআত নির্ধারিত বিধান ব্যতীত– অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। [হাদীস নং-৪৩২৪]

www.pathagar.com

৭৮। আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন : তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, [অর্থাৎ যাদের ভাল-মন্দ আসল লেখা হয় না]। এরা হলো : [১] নিদ্রিত ব্যক্তি– যতক্ষণ না সে জাগরিত হয়; [২] পাগল ব্যক্তি– যতক্ষণ না সুস্থ্ হয় এবং [৩] নাবালক ছেলে মেয়ে-যতক্ষণ না তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়। [হাদীস নং-৪৩৪৬]

সুন্নাহ্ প্রসঙ্গ

৭৯। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম [সা] বলেছেন : কুরআনের মধ্যে নিজের মত ব্যক্ত করে ঝগড়ার সৃষ্টি করা কুফর। [হাদীস নং-৪৫৩২]

৮০। ইবন উমার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন : যদি কোন মুসলমান– অন্য কোন মুসলমানকে কাফির বলে– আর সে প্রকৃত কাফির হয়, তবে তো উত্তম। আর যদি সে কাফির না হয়, তবে যে কাফির বলবে, সে-ই কাফির হয়ে যাবে। [হাদীস নং-৪৬১৪]

৮১। ইমরান ইবন হুসায়ন [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহকে [সা] জিজ্ঞাসা করা হয় : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর জ্ঞানে কি জান্নাতী ও জাহান্নামীরা আগে থেকেই পরিচিত? তিনি বলেন হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বলে : তাহলে আমলকারীরা কোন আশায় আমল করবে ? নবী [সা] বলেন : আমল কর, যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়। [হাদীস নং-৪৬৩৬]

৮২। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : মানব দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ মাটিতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু মেরুদণ্ডের হাঁড় খেতে পারে না। তা দিয়েই মানুষকে তৈরী করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার তা দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হবে। [হাদীস নং-৪৬৬৫]

আদব প্রসঙ্গ

৮৩। আবূ যার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ [সা] আমাদের বলেন : যদি তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল; নয়তো সে শুয়ে পড়বে। [হাদীস নং-৪৭০৭]

৮৪। আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম [সা] তাকে বলেন হে আয়েশা। নিকৃষ্ট লোক তারা, যাদের মুখের ভয়ে অন্য লোকেরা তাদের সম্মান করে। [হাদীস নং-৪৭১৭]

৮৫। আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] এরূপ বলতে শুনেছি : মু'মিন ব্যক্তি তার সদাচারের জন্য রোযাদার ও সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে। [হাদীস নং-৪৭২৩]

১৪—

www.pathagar.com

৮৬। আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : আল্লাহ হলেন নরম ব্যবহারকারী, তিনি নরম ব্যবহার পছন্দ করেন। আর তিনি নরম ব্যবহারকারীকে যে ছাওয়াব দেন, কঠোর ব্যবহারকারীকে তা দেন না। [হাদীস নং-৪৭৩২]

৮৭। মুসআব ইবন সা'দ [রা] তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী করীম [সা] বলেছেন : আখিরাতের কাজ ব্যতীত, অন্যান্য কাজের জন্য তাড়াহুড়া না করাই উত্তম। [হাদীস নং-৪৭৩৫]

৮৮। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত যে কথাবার্তা শুরু করা হয়, তা অসম্পূর্ণ থাকে, [অর্থাৎ তাতে কোন বরকত হয় না]। [হাদীস নং-৪৭৬৫]

৮৯। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম [সা] বলেছেন : কোন মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। [হাদীস নং-৪৭৮৬]

৯০। উকবা ইবন আমির [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম [সা] বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো দোষ-ক্রুটি দেখার পর তা গোপন রাখে, সে যেন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জীবন দান করে, [অর্থাৎ মৃত্যুকে জীবন দান করা যেমন ছওয়াবের কাজ; কোন মুসলমানের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখা ঐরূপ ছওয়াবের কাজ]। [হাদীস নং-৪৮১১]

৯১। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম [সা] বলেছেন : তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেননা, হিংসা ভাল কাজকে সেরূপ খেয়ে ফেলে, যেরূপ আগুন কাঠকে খায় [অর্থাৎ জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়]। [হাদীস নং-৪৮২৩]

৯২। আবূ দারদা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] এরূপ বলতে শুনেছি : লা'নতকারীগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে না। [হাদীস নং-৪৮২৭]

৯৩। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ [সা] এক ব্যক্তিকে কবুতরের পেছনে দৌড়াতে দেখে বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের অনুসরণ করছে। [হাদীস নং-৪৮৫৬]

৯৪। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [সা] বলেছেন : মানুষের গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা-ই অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। [হাদীস নং-৪৯০৭]

৯৫। জাবির [রা] রাসূলুল্লাহ [সা] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহর কাছে তিনবার পানাহ চায়– শয়তানের ক্ষতি থেকে। এরপর সে যে পাশে শুয়ে থাকে, সে পাশ পরিবর্তন করে নেবে। [হাদীস নং-৪৯৩৮]

www.pathagar.com

৯৬। ইবন আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পানাহ চায়, তাকে পানাহ দেবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায়, তাকে দেবে। [হাদীস নং-৫০২০]

৯৭। সাআদ ইবন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার দু'কান শুনেছে এবং অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন : যে ব্যক্তি জেনে শুনে, যে ব্যক্তি তার পিতা নয়, এরূপ ব্যক্তির সাথে নিজের পিতার সম্পর্ক স্থাপন করে; তার জন্য জান্নাত হারাম। [হাদীস নং-৫০২৫]

৯৮। আনাস ইবন মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বানায় অথবা নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে মনিব বানায়, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে লা'নত বর্ষিত হবে। [হাদীস নং-৫০২৭]

সালাম প্রসঙ্গ

৯৯। আবূ হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন : ঐ যাতের কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে। আর তোমরা ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখবে। আর আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবো না, যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে? তা হলো : তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। [হাদীস নং-৫১০৩]

১০০। ইবন আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম [সা] চার শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তারা হলো : পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদ-হুদ পাখি এবং চড়ুই পাখি। [হাদীস নং-৫১৭৭]

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাহি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের যাবতীয় কাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করার তাওফিক দান করুন, আমীন। ■

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী বইসমূহ

০১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
০২. আলকুরআন কথা বলে
০৩. ইসলামের আলোকে স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
০৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
০৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
০৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
০৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দুআর ভাণ্ডার
০৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন
০৯. আত্মপরিচয়ে আলকুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. তাফসীরুল কুরআন [সূরা ফাতিহা ও বাকারা]
১২. তাফসীরুল কুরআন [আমপারা]
১৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে সহীহ মাকছুদুল মোমেনীন
১৪. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী (স)
১৫. মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬. কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭. শেষ মনযিলের পথে
১৮. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৯. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আলকুরআন)
২০. ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
২১. সুনির্বাচিত হাদিস সঞ্চয়ন
২২. যুক্তি প্রমাণের আলোকে পর্দার বিধান
২৩. আল কুরআনে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়
২৪. আসহাবুর রাসূল (স) [১ম খণ্ড] [বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী]
২৫. ছোটদের প্রিয়নবীর প্রিয়কথা
২৬. ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার
২৭. রোযা কি, কেন রাখবেন, কীভাবে রাখবেন
২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার
২৯. নারী ও ইসলাম
৩০. তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি
৩১. পরিবেশ ও ইসলাম
৩২. মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বাংলাদেশ
৩৩. মক্কা মদীনা ও হজ্বের বিধি-বিধান
৩৪. দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ
৩৫. হিজাব পর্দা ও ফ্যাশন
৩৬. মাওলানা মওদূদীর সাথে মরিয়ম জামিলার পত্রালাপ
৩৭. ঈদে মিলাদুন্নবী (স)
৩৮. জান্নাতের পথ ও পাথেয়

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন- ৭১২৪৩২৮, ফ্যাক্স-৭১৭০৪৯১,০১৭১১৩২৪৮৫৩

www.pathagar.com

সাংবাদিকতায় পয়গাম্বরি ঐতিহ্য

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

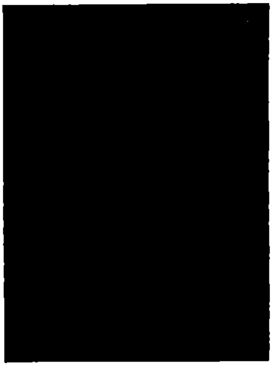

আমাদের সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য আলোচনা করতে গেলে যেমন ধর্মের প্রসঙ্গটি মুখ্য তেমনি সাংবাদিকতার বিষয়টিও ধর্মীয় ঐতিহ্যেরই অংশ। পয়গাম্বরগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দিতে, আল্লাহর পয়গাম বা বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে আবির্ভূত হয়েছেন। ফলে সাংবাদিকতার উৎস আলোচনায় আল্লাহপাকের বাণী এবং পয়গাম্বরগণ কর্তৃক তা বহন করে মানুষের কাছে পৌছে দেবার ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করি। এ কারণেই সাংবাদিকতার মূল আলোচনায় প্রথমে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে সংবাদ তৈরি, সংবাদ প্রেরণের কৌশল ও বিষয় এবং দ্বিতীয়ত: আবিষ্কার করতে হবে কী অবস্থার প্রেক্ষিতে পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে সে পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে এবং এর অনুসৃতিই বা কি।

আল্লাহপাক পয়গাম্বরি ধারার মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণের সূচনাকারী

আল্লাহ তাআলার প্রথম সৃষ্ট মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম যেমন প্রথম মানব তেমনি প্রথম নবীও। আল্লাহ মানুষকে তার সৃষ্টির সেরা জীব তথা 'আশরাফুল মাখলুকাত'রূপে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

এর ফলে সৃষ্টির সকল জীবের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্বও অর্পিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্ব হলো তার জ্ঞানের, সভ্যতার, মেধার, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ যাচাই করার যোগ্যতার কারণে। অন্যান্য জীবের সাথে মানুষের মিল-অমিল আবিষ্কার করতে হলে পার্থক্য রেখাটি আমাদের আগে জানতে হবে। আল্লাহপাক প্রত্যেক জীবকেই একটি জীবসুলভ প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন এটিকে বলে Animality জীব হিসেবে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। এটি মানুষসহ সকল জীবের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তু থেকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে অন্য একটি গুণ দিয়ে দেয়া হয়েছে যার নাম Rationality বা বুদ্ধিবৃত্তি। এ কারণেই আরবি ভাষায় মানুষকে বলা হয়েছে 'আল ইনসানু হাইওয়ানু নাতেকু' অর্থাৎ মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। মানুষের মধ্যে Animality এবং Rationality এ দু'টো গুণই সমভাবে থাকার কারণে সে অন্যান্য জীবের ন্যায় প্রাকৃতিক চাহিদাসমূহ যেমন পূরণ করে থাকে তেমনি 'বুদ্ধিবৃত্তি'র কারণে সে ভাল-মন্দ যাচাই করে চলতে পারে। এ ভাল-মন্দ যাচায়ের যোগ্যতার কারণেই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা রূপে নিজের অবস্থানকে সংহত করতে পেরেছে। স্বভাবজাতভাবে দেয়া জৈববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়াও মানুষের জ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে অহির জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। অহি হলো আল্লাহর নিজস্ব বিষয় আশয় যে সম্পর্কে তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের আনুগত্যের বিধান শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ অহি হলো একটি কর্ণগ্রাহ্য বিষয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ফেরেশেতাগণ এ জ্ঞান মানুষের নিকট নিয়ে আসেন। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ জ্ঞানকে ধারণ করা ও তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি একটি পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এ পন্থায় যাঁদের মাধ্যমে তিনি এ জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছান তাঁদেরকে বলা হয় নবী, রাসূল বা পয়গাম্বর। আল্লাহপাক এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন- "ইন্নি যায়িলুন ফিল আরদি খালিফা' অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই। আর এ প্রতিনিধি হলেন সে ধরনের ব্যক্তি যিনি আল্লাহর দেয়া বিধি বিধান ফেরেশতার মাধ্যমে অহির আকারে পেয়ে থাকেন এবং এটি তাঁর নিজ জীবনে বাস্তবায়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টির পাশাপাশি তা মানুষের কল্যাণে তাদের কাছেও পেশ করে থাকেন। এ বিধি বিধান পালনের ক্ষেত্রে আবার আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে আল্লাহ যে জাতির কাছে তাঁর বিধান পাঠাতে চান সে জাতির মধ্য থেকে সে জাতির ভাষাভাষি লোক দিয়েই তিনি তাঁর বিধিবিধান প্রেরণ করে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহপাক একটি জাতির মধ্যে বিদ্যমান তাদের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা ইব্রাহীমে বলা হয়েছে- "ওয়ামা আরসালনা মিররাসূলিন ইলা বিলিসানি কাওমিহি"। অর্থাৎ আমি আমার বাণী বাহককে [রাসূল] কোন কওমের কাছে পাঠাই সেই কওমের ভাষা দিয়ে। কুরআনের এ পবিত্র আয়াতাংশের কাব্যিক অনুবাদ করেছেন মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান। তাঁর ভাষায়-

www.pathagar.com

আল্লাএ বুলিছে মুঞি যে দেশে যে ভাষ
সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রসুল প্রকাশ।

ফলে দেখা যায় আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তাঁর সংবাদ বা বাণী পাঠানোর ক্ষেত্রে মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে দিকটিও খেয়াল রাখেন। এ সংবাদ পাঠানোর বেলায় তিনি কখন কি কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তার নির্দেশনা দেন। আবার মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কোন অতীত ঘটনার উদাহরণ টানেন। আর আল্লাহর প্রেরিত বাণীকে যারা হুবহু মানুষের কাছে না পৌঁছিয়ে এর মধ্যে পরিবর্তন আনেন তিনি তাদের তিরস্কার করেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেন। অর্থাৎ সংবাদ পাঠানোর আল্লাহপ্রদত্ত পদ্ধতি হলো যা বলা হবে বা যা ঘটবে তা অন্যত্র পেশ করার বেলায় হুবহু বলতে বা পেশ করতে হবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা নবী, রাসূল বা পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণের ধারার সূচনা করেন।

অন্যান্য ধর্মে প্রত্যাদেশ ও দৈববাণী অর্থে সংবাদ প্রেরণের ধারা

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মেও দেবতা, ঈশ্বর বা প্রভুর কাছ থেকে মুনী ঋষীগণ এ ধরনের বাণী পাবার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোকে বলা হয়েছে দৈববাণী, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি। আবার কোন কোন ধর্মে ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের বিষয়ও লক্ষ্য করা যায় যেমন বৌদ্ধ ধর্ম। অবশ্য সকল ধর্মেই ধ্যানের বিষয়টি রয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তাই যিনি সংবাদটির প্রত্যাশি তাঁকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে বা ধ্যান করতে হবে। তাহলেই সংবাদটি বহন করার মত যোগ্যতা তার সৃষ্টি হবে। আর কাঙ্ক্ষিত কোন সংবাদ যখন মানুষ পায় তখন তা সে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

আধুনিক সাংবাদিকতার সূচনা পয়গাম্বরি ধারা থেকেই

সাংবাদিকতা ধর্মীয় ঐতিহ্যেরই অংগ। খোদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিষয়টির সূচনা তা আজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশে সকল সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্র এখন শিল্পের মর্যাদায় বিশ্বব্যাপী নন্দিত এবং সভ্যতার ধারক বাহক। আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট প্রথম মানব হযরত আদম [আ] যেমন প্রথম মানব তেমনি প্রথম বাণীবাহক তথা নবীও। তার প্রজন্মের নকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল। আদম [আ] থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর সময় পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে যুগোপযোগী জ্ঞানের বাণী পৌঁছে দিয়ে সভ্যতার বিকাশে এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাংবাদিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনায় নবী রাসূলের প্রসঙ্গ উত্থাপনে কারও কারও মনে হয়ত প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে। বিষয়টি এজন্য আগেভাগেই খোলাসা করে নিয়েছি। পৃথিবীতে সাংবাদিকতার বিষয়টির সূচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ : আর নবী-রাসূলগণ হলেন সাংবাদিকতার মডেল। মানুষকে সত্যের পথে, একত্ববাদের পথে, আল্লাহর পথে,

www.pathagar.com

হকের পথে, ইনসাফের পথে আহ্বান করার জন্যই তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

পয়গাম্বরি ধারার সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আরবি 'নাবাউন' শব্দের অর্থ খবর, সংবাদ ইত্যাদি। 'নবী' হলেন সেই খবর বা সংবাদ বহনকারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পয়গাম বা বার্তা বহন করে আনার কারণে নবীকে ফার্সি ভাষায় বলা হয় পয়গাম্বর বা বার্তা বহনকারী। আবার সহিফা বা আসমানি কিতাব যেসব নবীগণের উপর নাযিল করা হয়েছে তাদেরকে বলা হয় রাসূল। রিসালত শব্দের অর্থও হলো বাণীপত্র, পয়গাম ইত্যাদি এবং যিনি বাণী বা পয়গাম বহন করেন তিনিই রাসূল। এভাবে নবী, রাসূল ও পয়গাম্বর শব্দগুলোর অর্থগত দিক দিয়েই আমরা সংবাদ বহনের এবং পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্বের প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করি। এই সংবাদ বহনের ক্ষেত্রে সততা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদির জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে একটি পর্যায়ে উন্নীত করে এরপর তার মাধ্যমে মানুষের কাছে সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এজন্যেই প্রায় প্রত্যেক নবী-রাসূলগণের জীবনে সত্যের পক্ষে জীবন দিয়ে হলেও অবিচল থাকার কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠা ছিল তাদের সংবাদ বহনের যোগ্যতা অর্জনের বড় মাপকাঠি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সততার প্রশিক্ষণ এবং সংবাদদাতার নাম জরুরি

ওপরের আলোচনায় এ কথাটি প্রতীয়মান হয়েছে যে সংবাদ বহন করার জন্য সংবাদ বাহক এর নাম জরুরি। কে শুনেছে, কার কাছে শুনেছে ইত্যাদি যেমন যাচাই-বাচাই এর বিষয় তেমনি সংবাদ বহনকারী কে, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রই বা কেমন, তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কী না ইত্যাদি বরাবরই যাচাইযোগ্য বিষয়। এজন্যই দেখা যায় সংবাদ বহনকারী হিসেবে নবীগণকে আগে সমাজে সবচেয়ে সৎ, যোগ্য, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার, পরোপকারী, ত্যাগী, দৃঢ়, সর্বোপরি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার যোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার পরই কেবল তাদের উপর এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে নবী বা রাসূলগণ আল্লাহর কাছ থেকে ওহী লাভের পর যখন এসে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন তখন লোকেরা নির্দ্বিধায় সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। অবশ্য যারা সত্যের অনুসারী, আলোর পথের যাত্রী তারাই সাড়া দিয়েছেন আগে। যারা মিথ্যার বেসাতি নিয়ে কারবার করেন, অন্যায়ের যারা ধারক তারাতো সত্যকে কখনোই সহজে গ্রহণ করেন না। নবী-রাসূলগণের ঐশি সংবাদ পেশ করার পর ঐ শ্রেণীটি বিরোধিতায় নেমেছে এবং আজো দেখা যায় তাদের অনুসারীরা সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না। সত্যপথের অনুসারীগণ নবী-রাসূলগণের ঐশি বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে যখন তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন তখন তারা সমকালীন নবীর নামকেও তাঁর কলেমার ঘোষণায় উল্লেখ করেছেন। নবীদের দাওয়াতের আহ্বানটি ছিল এরকম– 'ইয়া কাউমি বুদুল্লাহি

www.pathagar.com

মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু' হে লোক সকল তোমরা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করো তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এই 'ইলাহ' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর মাধ্যমে উলুহিয়্যাত তথা সার্বভৌমত্বের মালিক ও এর পরিচালনার সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহতেই সমর্পিত হয়। এ দাওয়াত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় যখন পেশ করা হলো তখন যারা ঈমান আনলেন তারা ঘোষণা দিলেন- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহীমু খলিলুল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং ইব্রাহীম [আ] আল্লাহর বন্ধু। আবার এ দাওয়াত যখন হযরত ঈসা [আ] দিলেন তখন যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করলো তারা ঘোষণা দিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ। একই ধারায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ [সা] যখন আরবের লোকদের নিকট এ দাওয়াত পেশ করলেন তখন যারা এ দাওয়াত কবুল করলেন তাঁরা ঘোষণা দিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ [সা] তাঁর প্রেরিত রাসূল। হযরত মুহাম্মাদ [সা] এর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা লাভের ঘোষণার পাশাপাশি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের মনোনয়নের মাধ্যমে নবুওয়তের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ আবহমানকালের মানুষের মুক্তির পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। এখন মানুষের কাজ হলো শুধু একে অনুসরণ করা। আগের পাঠানো কিতাবগুলোতে পরবর্তী নবীগণের আসমানি বার্তা যেমন রয়েছে তেমনি আল কুরআনেও পূর্ববর্তী কিতাব এবং নবী-রাসূলগণের উল্লেখ রয়েছে এবং ঐগুলোর সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। তবে সর্বশেষ কিতাব হিসাবে আল কুরআনই এখন সমগ্র মানব জাতির জন্য মুক্তির সনদ।

সত্য সংবাদ মানব জাতির কাছে পৌঁছানোর নবুওয়তি নির্দেশনা

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছ থেকে ঐশি বাণী আকারে যে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তারা তা মানবগণের কল্যাণের জন্য তাদের সামনে পেশ করেছেন। এভাবে সত্য সংবাদ পৌঁছে দেয়াটা নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অবশ্য কর্তব্য। তবে আল্লাহর বাণীই শুধু নয়; এ বাণীকে ধারণ করে নবী-রাসূলগণ জীবনে যে পূর্ণতা লাভ করেছেন সে পূর্ণতা থেকে বিশ্ববাসী যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তাঁরা নিজেরাও সত্যের বাণী বা সংবাদ অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেবার আহ্বান করেছেন। নবী মুহাম্মাদ [সা] এর বিদায় হজের ভাষণে আমরা সেই উদাহরণ লক্ষ্য করি। তিনি তাঁর এ ভাষণে উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন- "তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আমার বাণী অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছে দেবে।" মূলত এ নির্দেশনার মাধ্যমে সংবাদকে ছড়িয়ে দেবার পয়গাম্বরি ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এ ছাড়া নবুওয়তের আগমন ধারা বন্ধ হয়ে গেলে উলামাগণ সেই দায়িত্ব পালন করবেন এ ধারার একটি ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। যারা কুরআন এবং হাদিসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ আলেম

www.pathagar.com

হবেন তাঁদেরকে 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া বা আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকার বলা হয়েছে। এভাবে আল্লাহর পয়গাম বা বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর ধারাকে অব্যাহত রাখার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার 'আতিউল্লাহা, আতিউর রাসূল ওয়া ওলিল আমীর মিনকুম'– নির্দেশের দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য এবং উলিল আমর বা কর্তৃত্বশীলের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। নিখাদ আল্লাহর বাণীকে ক্যাসেটের মত মাথায় ধারণ করার অভিনব পদ্ধতিও আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ হাফেজের মাধ্যমে আল কুরআন মুখস্থ আকারেও হেফাজতের ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই যে অহি বা প্রত্যাদেশ নবীর কাছে পাঠানো হয়েছে সেগুলো কর্ণগ্রাহ্য বিষয়। সেই অহিকে যখন কলমের মাধ্যমে লেখা হয়েছে তখন অহি বহিতে বা বইতে রূপান্তরিত হয়েছে। কাতিব কর্তৃক লেখার কারণে হয়েছে কিতাব।

সাংবাদিকতার পয়গাম্বরি ঐতিহ্য আলোচনায় আমাদের একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, আল্লাহ পাক তাঁর শাশ্বত পয়গাম যাতে কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া হুবহু মানুষের কাছে পেশ করতে পারেন সে জন্য প্রত্যেক নবী-রাসূলকে উম্মি অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থায় রেখে নবুওয়তি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঐশি জ্ঞানের মহিমায় প্রাপ্ত ঐশী সংবাদ নিজে পড়েছেন বা আবৃত্তি করেছেন আর সঙ্গীর সাথিগণ তা মুখস্থ করে নিয়েছেন। সে অবস্থায় পরবর্তীতে তা কাতিবগণ কর্তৃক লিখিত রূপ লাভ করেছে। এই যে মুখস্থ করার বিষয় এটি কিন্তু প্রাচীন ধারায় এখনো জারি আছে। কেবলমাত্র ধর্ম গ্রন্থগুলো এবং মানবতার মুক্তি সনদ আল কুরআন মানুষ আজো সহজে মুখস্থ করতে পারে। এটিও সত্য সংবাদ সংরক্ষণের এক ধরনের ঐশি ধারা। সত্য সংবাদ বহন ও তা জনমণ্ডলীর কাছে পৌঁছানোর এ পয়গাম্বরি ধারার মাধ্যমে সংবাদ বহনের একটি অবকাঠামো গড়ে ওঠে। সে কারণেই দেখা যায়, সেই অনগ্রসর যুগেও নবী মুহাম্মাদ [সা] এর পূত পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি কথা, কাজ, নির্দেশনা খুঁটিনাটিসহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরিভাষাগতভাবে এগুলোকে বলা হয় হাদিস। এ হাদিস সংগ্রহের সময়ও সংগ্রাহকগণ অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং সমাজে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ বলে পরিচিত লোকদের কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করা হয়েছে। হাদিস সংগ্রহের ক্ষেত্রে একই বিষয়ে একাধিক বর্ণনাকারীগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ধারা থেকেই পরবর্তীতে ইলমুত তাওয়ারিখ বা ইতিহাস শাস্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছে। কোন ঘটনা ঘটে গেলে তাকে লিখিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মুসলমানদের হাতেই সবচেয়ে বেশী চর্চিত হয়েছে। এটিও সাংবাদিকতার পয়গাম্বরি ঐতিহ্যের একটি বিকাশ বলে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

সাংবাদিকতা একটি পবিত্র কাজ ও সৎ সাংবাদিকতা ইবাদততুল্য

পয়গাম্বরি ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত সাংবাদিকতার বিষয়টি এজন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গণ্য।

www.pathagar.com

নবী-রাসূলগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণে সত্য সংবাদ বহনের পবিত্র দায়িত্ব পালন শুধু সাংবাদিকতা নয় বরং একটি মৌলিক ইবাদত। সংবাদ আদান-প্রদানের এ আল্লাহ প্রদর্শিত ব্যবস্থা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। আল্লাহ্‌র বাণী, বহি কিতাব পড়ে জানার পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে এটি জনজীবনের খবরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কালপরিক্রমায় বর্তমানে এটি গণমাধ্যমের এক প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এর বিকাশ যাত্রায় আমরা এর ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বরাবরই লক্ষ্য করে থাকি।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার সূচনা পর্ব ও পয়গাম্বরি ধারার ঐতিহ্য

কেউ কেউ মনে করেন যে উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখেছি। লেখাপড়ার কমতি এবং জ্ঞানের স্থূলতার কারণেই আমাদের কোন কোন ব্যক্তির মন্তব্যে এমন কথা শোনা যায়। তবকাত-ই-নাসিরী [মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর লিখিত] গ্রন্থে সংবাদ বাহকের কথা উলেখ রয়েছে [দ্রঃ অনুবাদ ২০৭ পৃ:] আবার তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থেও ভূমিকায়ও লেখক বেশ কিছু মূল্যবান মতামত পেশ করেছেন যা সাংবাদিকতার পয়গাম্বরি ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়েছে। তাঁর এ বক্তব্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। লেখক জিয়া উদ্দিন বারানী বলেন, “জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইলমে তারিখ ইতিহাস শাস্ত্রের বহুগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমত: কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে পরবর্তী নবী রাসূলদের জীবন কাহিনী এবং রাজা-বাদশাদের সুকীর্তি ও কুকীর্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসেও সেই ধারা অনুসরণ করে অনুরূপ সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা হয়ে থাকে। এর ফলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বর্ণনার মধ্য তাদের চিন্তার আহার্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত: হাদিসে হযরতের জীবনীর উপকরণ ও অমূল্য বাণী রক্ষিত হয়েছে। মর্যাদার দিক হতে তাফসীরের পরই হাদীসের স্থান। হাদীসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর কথাবার্তা বিচার, বর্ণনাকারীর পরিচয়, উহার উৎসকাল, যুদ্ধাদির প্রকৃত সময়, বিবিধ বিধান প্রচলন ও রহিতকরণের পর্যায়ক্রম ইত্যাদির আলোচনা সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদিস শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন হাদিস ও ইতিহাস যমজস্বরূপ। কোন হাদিসবিদ যদি ঐতিহাসিক না হয়, তাহলে তার পক্ষে হযরত ও সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী প্রকৃত তথ্য বিচার সম্ভব নয়।”

জিয়া উদ্দিন বারানী তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায় এক জায়গায় হযরত ইব্রাহীম [আ] এর কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন– “ইতিহাসের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ও আধুনিক কালের সকল জ্ঞানী ব্যক্তিই এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রসঙ্গেই হযরত ইব্রাহীম আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন, পরবর্তী জনসমাজে আমার সত্যভাষণ প্রতিষ্ঠিত করিও। মিথ্যা লিপিবদ্ধকারীদের প্রতি ভর্ৎসনা করে আল্লাহ বলেছেন, যথাস্থান হতে বাক্যগুলো তাহারা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।”

www.pathagar.com

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]ও তাঁর বিদায় হজের ভাষণ অনুপস্থিত জনমণ্ডলীর কাছে পৌঁছানোর অনুরোধ করে সংবাদ বহনের যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে যান যুগ যুগব্যাপী অনাগত ভবিষ্যতের কাছে এ বাণী পৌঁছানোর কাজ চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতে থাকবে।

উপমহাদেশের ইতিহাসবেত্তাগণ বিশেষ করে মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর তবকাত-ই নাসিরীতে হযরত আদম [আ] থেকে শুরু করে তাঁর সময় অর্থাৎ ১২৬০ সন পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে নবুওয়তি দায়িত্বের ওয়ারিসী ধারাবাহিকতাই রক্ষা করেছেন।

বাংলাদেশে সুলতানী ও মোগল আমলের সাংবাদিক 'ওয়াকিয়ানবিশ

সুলতানী আমলে সংবাদ সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাস লেখার ধারাবাহিকতার পথ ধরেই সাংবাদিকতা বিকশিত হতে শুরু করে। প্রথম দিককার বিশ্বস্ত ইতিহাস লেখককে দিয়ে সত্য ঘটনার বিবরণ লেখানোর ঐতিহ্য থাকলেও পরবর্তীতে এ কাজের জন্য 'ওয়াকিয়ানবিশ' নামে সরাসরি সংবাদ লেখকের পদ সৃষ্টি করা হয। 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ হলো ঘটনা, ব্যাপার ইত্যাদি। ওয়াকিয়াত অর্থ ঘটনা সকল, সত্য ব্যাপারসমূহ। অতএব রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনা এবং সত্য ব্যাপারসমূহ যিনি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন তিনিই 'ওয়াকিয়ানবিশ'। সুলতানী আমলে শুরু হওয়া এ পদ্ধতি মোগল আমলে আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

উপমহাদেশে সাংবাদিকের জন্য প্রণীত প্রথম আইন

সম্রাট আকবরের সময়ে [১৫৫৬-১৬০৫] তাঁর নওরতন সভার সদস্য আল্লামা আবুল ফজল কর্তৃক প্রণীত 'আইন-ই-আকবরি' নামক গ্রন্থের ১০ নং আইনে 'Regulations Regarding the Waqia Nawis' শিরোনামে 'ওয়াকিয়ানবিশ' তথা সাংবাদিকের বিস্তৃত কর্ম পরিধির উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটির শুরুতে বলা হয়েছে- "Keeping record is an excellent thing for a government; it is even necessary for every rank of society. Though a trace of this office may have existed in ancient times, its higher objects were but recognized in the present reign." এর মাধ্যমে সাংবাদিকতার বিষয়টি যে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একটি বিষয় তাও স্বীকার করা হয়েছে। তবে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য যে সত্যের লালন এবং মিথ্যার অপসারণ সে কথাটিও আইনটির শেষাংশে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে– "His majesty's object is, that every duty be properly performed; that there be no undue increase, or decrease in any department; that dishonest people be removed, and trustworthy people be held in esteem; and that active servants may work without fear, and negligent and forgetful men be held in check." [Ain-E-Akbari, p.268-69]"

www.pathagar.com

ঢাকার ইতিহাসে প্রথম সাংবাদিক

মীর্জা নাথান রচিত বাহারিস্তান-ই গায়বী নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাংলায় ওয়াকিয়ানবিশ প্রেরণ করার কথা জানা যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিয়োজিত সুবে বাংলার সুবাহদার ইসলাম খান চিশতি যখন সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করছিলেন তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে ইয়াঘমা ইস্পাহানী নামক একজন সাংবাদিককে বাংলায় গিয়ে ওয়াকিয়ানবিশের [সংবাদ লেখক] কার্যভার গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিতে দেখা যায়। আমাদের জানা মতে ঢাকার ইতিহাসে তিনিই প্রথম সাংবাদিক।

সাংবাদিকের স্বাধীনতা

মোগল আমলে প্রতি সুবাহতে [প্রদেশে] একজন সংবাদ লেখক নিয়োগ করা ছিলো তখনকার সময়ের প্রচলিত প্রথা। ইয়াঘমা ইস্পাহানীকে ঢাকায় প্রেরণের সময় উপদেশ দেয়া হয় যে, প্রাদেশিক গভর্নরদের ঘটনা ও কার্যাবলীর ধারাবাহিক রিপোর্ট শাহী দরবারে প্রেরণের জন্য। সেসব রিপোর্ট সুবাহদারদের না দেখানোর জন্যও তাকে উপদেশ দেয়া হতো। এতে সরকারিভাবে নিয়োজিত সাংবাদিককেও সংবাদ লেখার বেলায় স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। ইয়াঘমা ইস্পাহানী তাঁর পদের উপযুক্ত সম্মানসূচক পোশাক প্রাপ্তির পর এক শুভ মুহূর্তে দ্রুত বাংলা অভিমুখে রওনা হন।

সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব সাংবাদিকগণের মর্যাদা কোনক্রমেই প্রাদেশিক গভর্নরের চেয়ে কম ছিল না; কারণ তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট দায়ী ছিলেন না বরং তার কার্যকলাপের খবরদারী করতেন। তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যেমন রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লেখা হতো তেমনি গভর্নরের পদোন্নতি, অপসারণ ইত্যাদির বেলায়ও সাংবাদিকের রিপোর্টকেই মূল্যায়ন করা হতো। ওয়াকিয়ানবিশগণ হতেন শিক্ষিত অথচ সৎ ও নিষ্ঠাবান। মোগল রাজত্বের শেষাবধিও আমরা এমনকি মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ও ওয়াকিয়ানবিশ নিয়োগের এ ধারা লক্ষ্য করি। ফলে উপমহাদেশে সাংবাদিকতার বিকাশে একটি মুসলিম ঐতিহ্য বরাবরই লক্ষ্য করা যায়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুগে সাংবাদিকতায় পয়গাম্বরি ঐতিহ্য

১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর ক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশের দখলকার হয়ে বসেন তখন তারা যে সাংবাদিকতার নবযাত্রা শুরু করেন তাও ছিল ধর্মীয় প্রচারণার পথ ধরেই। ইংরেজগণ হযরত ঈসার [আ] অনুসারী হওয়ায় তাঁর বাণী এদেশীয় লোকদের মাঝে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যেই সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু করে। ফলে ইংরেজ দু:শাসনে মুসলমানদের সাংবাদিকতার যে ঐতিহ্যিক ধারার বিকাশ ঘটেছিল সে ধারাবাহিকতায় খানিকটা বিঘ্ন ঘটে। তবে ইংরেজরাও এদেশে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু

www.pathagar.com

করে সাংবাদিকতার পয়গাম্বরি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই। ১৮১৮ সনে দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ নামে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে খ্রিস্টান মিশনারীরা প্রথম দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৮১৮-১৮৬৮ সময়কালে তারা গসপেল ম্যাগাজিন [মাসিক-১৮১৮], খ্রিস্টের রাজ্যবৃদ্ধি [মাসিক-১৮২২], মঙ্গলপাখ্যান পত্র [মাসিক-১৮৪৩], উপদেশক [মাসিক-১৮৪৭], সত্যপ্রদীপ [সাপ্তাহিক-১৮৫০], গত্যার্ণব [মাসিক-১৮৫০], সংবাদ সুধাংশু [সাপ্তাহিক-১৮৫০], অসনোদা [মাসিক-১৮৫৬], তত্ত্ববিকাশিনী [মাসিক-১৮৬৭] প্রভৃতি একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করে খৃস্টধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত হয়। অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিক সাংবাদিকতার সূচনা করতে গিয়েও এমনকি কোম্পানী আমলেও ইংরেজ খৃস্টানগণও সাংবাদিকতার পয়গাম্বরি ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে।

সাংবাদিকতায় দেশীয় হিন্দু-মুসলিম উদ্যোগ

১৮৩১ সনে ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ 'প্রভাকর' প্রকাশিত হওয়ার বছরই মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালে রংপুর থেকে সাপ্তাহিক রঙ্গপুর বার্তাবহ, ১৮৫৬ সালের সাপ্তাহিক ঢাকা নিউজ, ১৮৬১ সালে সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৫ সনে সাপ্তাহিক হিন্দু হিতৈষিণী রাজশাহী থেকে, ১৮৬৮ সনে সাপ্তাহিক হিন্দু রঞ্জিকা, ১৮৭০ সালে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু, ১৮৭৫ সনে ময়মনসিংহ থেকে ব্রাহ্মদের পত্রিকা সাপ্তাহিক ভারত মিহির ইত্যাদি পত্রিকাগুলোর কোনটি ব্রহ্মধর্ম, কোনটি হিন্দু ধর্ম কোনটি নীলকরদের সমর্থক ইত্যাদির নানা ভাব নিয়ে প্রকাশিত হয়। তবে প্রায় সবকটি সংবাদপত্রেই স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর ধর্মের বিধিবিধান ও ধর্ম প্রচারের বিষয়টি ছিল মুখ্য।

বাংলাদেশে মুসলিম সাংবাদিকতার পুনরুজ্জীবন

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক উপ-মহাদেশে দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের অবসানে এখানকার মুসলমানগণ প্রায় একশ বছরব্যাপী প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের লড়াই চালিয়ে যায়। এরই পাশাপাশি সমকালে অবহেলিত মজলুম মুসলিম জনসমাজ তাদের অসাম্প্রদায়িক উদার দিল মনোভাব নিয়ে সংবাদপত্র জগতেও টিম টিম করে তাদের আলোটি জ্বালিয়ে রাখে। ১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করা হলেও মুসলমানগণ তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ সময় সৈয়দ রেয়াজতুল্লাহর সম্পাদনায় ১৮৫৩ সালে ফারসী ভাষায় দূরবীন নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে মুসলিম সাংবাদিকতার ঐতিহ্য রক্ষা ও সাংবাদিকতার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চালানো হয়। সৎ সাংবাদিকতার লক্ষ্যে পরিচালিত এ সাপ্তাহিকীটি নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে চলে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকালেও পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়নি।

১৮৬৭ সালে ফরিদপুর থেকে আলাহেদাদ খাঁ সম্পাদিত পাক্ষিক ফরিদপুর দর্পণ, ১৮৭৩ সালে আবদুর রহিম সম্পাদিত বালা রঞ্জিকা, ১৮৮৩ তে ঢাকা থেকে শেখ

www.pathagar.com

আবদোস সোবহান সম্পাদিত এসলাম গার্জ্জিয়ান, ১৮৮৪ সালে করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকুল্যে মাসিক আখবারে এসলামীয়া, ১৮৮৪ সালে কলকাতা থেকে ইসলাম, ১৮৮৫ সালে টাঙ্গাইল থেকে আহমদী, ১৮৯০ সালে কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়া থেকে মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পাক্ষিক হিতকরী, ১৮৯২ সালে সাপ্তাহিক টাঙ্গাইল হিতকরী, শেখ আবদুর রহীম সম্পাদিত সুধাকর [১৮৯৪], মিহির [১৮৯২], মিহির ও সুধাকর [১৮৯৪], হাফেজ [১৮৯৬], ইত্যাদি; ১৮৯৮ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে এস.কে.এম মুহাম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত মাসিক কোহিনুর, ১৯০০ সনে মুসলেম ভারত, ১৯০১ সনে যশোর থেকে মাহতাব উদ্দিন সম্পাদিত মোসলমান পত্রিকা, ১৯০১ সনে পাবনা থেকে প্রকাশিত মাসিক সোলতান, ১৯০৩ সনে মোমেনশাহী থেকে এসএম নুরুল হোসেন কাশিমপুরী সম্পাদিত মাসিক হানিফি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত নবনূও [১৯০৩] ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম সাংবাদিকতার আধুনিক বিকাশ যাত্রা শুরু হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে এসব সংবাদপত্রের নামগুলো বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায় যে সাংবাদিকতার এ বিকাশ যাত্রায় ঐতিহ্যিক ধারাটি বহমান ছিল।

ইংরেজ ও হিন্দু সমর্থক শত শত পত্রিকার মোকাবিলায় কয়েকটি মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়ে ইসলামের আলো টিম টিম করে জ্বালিয়ে রাখলেও গোটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন পর্যন্তও মুসলমানদের কোন দৈনিক পত্রিকা ছিল না। ১৯০৬ সালে কলকাতা থেকে আবুল কাশেমের ও পরবর্তীতে মুজিবুর রহমানের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' [পরবর্তীতে দৈনিক], মুন্সী রেয়াজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত ইসলাম প্রচারক [১৮৯১] ও সাপ্তাহিক সোলতান [১৯০৬], মাওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় ১৯০৩ সনে কলকাতা থেকে মাসিক মোহাম্মদী [পরে সাপ্তাহিক ও দৈনিক] ১৯১৫ তে আল এসলাম, ১৯২০ সালে উর্দু দৈনিক জামানা ও ১৯২১ এ দৈনিক সেবক ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ বাবর আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় আহলে হাদীস [১৯১৫], মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সম্পাদনায় ১৯১৮ সালে সচিত্র মাসিক সাহিত্যপত্র সওগাত, ১৯২৬ বাংলা সাপ্তাহিক খাদেম, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় ১৯২০ সালে মোসলেম ভারত, ১৯৩৬ এ দৈনিক আজাদ সম্পাদনা, ১৯৪৭ সালে বেগম ইত্যাদি ধারায় সংবাদপত্র বিকাশ লাভ ঘটে।

এ ধারায় ১৯৩৬ সালে দৈনিক আজাদ প্রকাশের পর মুসলিম সাংবাদিকতা সারা বাংলায় ব্যাপকতা লাভ করে এবং সাংবাদিকতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ পত্রিকাটি মুসলিম তাহজীব, তমদ্দুনের সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতির নানা দুর্দিনে এবং মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গৌরবদৃপ্ত ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৯ সালে মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্পাদিত অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান, ১৯৫২ সালে দৈনিক যুগভেরী,

www.pathagar.com

দৈনিক আল ইসলাহ, চট্টগ্রাম থেকে দৈনিক আজাদী, ঢাকা থেকে দৈনিক পাকিস্তান পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা, ডেইলি অবজারভার, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক সংগ্রাম ইত্যাদি পত্রিকার পাশাপাশি পাকিস্তান আমলে বহু স্থানীয় দৈনিক প্রকাশিত হয়। তবে সাংবাদিকতার এ পর্যায়টিতে ঐতিহ্যিক ধারার রেশ থাকলেও সাংবাদিকতা ক্রমেই বস্তুতান্ত্রিকতার ও রাজনীতির দিকে ক্রমশ মোড় নিতে থাকে। বাংলাদেশ আমলে দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক খবর, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আজকের কাগজ, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, দৈনিক জনতা, দৈনিক শক্তি, দৈনিক সকালের খবর, দৈনিক প্রভাত, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক যুগান্তর, দি নিউ নেশন, দি বাংলাদেশ টাইমস, দি ডেইলী ইনডিপেন্ডেন্ট, দি ডেইলী স্টার, দি নিউজ টুডে, দি নিউ এজ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক দেশবাংলা, দৈনিক পূর্বকোন, দৈনিক আমাদের সময়, ডেইলি ফিনানশিয়াল টাইমস, দৈনিক অর্থনীতি, দৈনিক জাহান, দৈনিক কর্ণফুলী ইত্যাদি সহ শত শত দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকতাকে একটি শিল্পে উত্তীর্ণ করেছে। সাপ্তাহিক সোনারবাংলা, সাপ্তাহিক মাহে নও, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী, সাপ্তাহিক রোববার, সাপ্তাহিক ২০০০, সাপ্তাহিক প্রতিচিত্র, মাসিক মদীনা, মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট, মাসিক পৃথিবী, মাসিক নতুন কলম, ইংরেজী মাসিক আল ইসলাম, মাসিক সৌরভ, মাসিক কালি ও কলম, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ, মাসিক ছাত্রসংবাদ, মাসিক ন্যায়দণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সাংবাদিকতায় এসেছে বৈচিত্র্য। সংবাদপত্রের জগতে এ বৈচিত্র্য সাংবাদিকতার বিকাশে সাহায্য করলেও এর মধ্যে অনেক পরগাছাও ঢুকে গেছে। সাংবাদিকতার নামে নিজের স্বার্থ লাভের বিষয়টিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে একে কলুষিত করছে কেউ কেউ। তবে এর ভিতর দিয়ে সেসব পত্রিকাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে যেগুলো সাংবাদিকতার আদর্শকে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও ধারণ করে আছে। শত শত দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা আজ এক বিকাশমান শিল্পে রূপ নিয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইবাদতের মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য এখন অনেকটাই নিষ্প্রভ।

কমরেড ও হামদর্দ পত্রিকার মাধ্যমে খেলাফত আন্দোলনে সমর্থন, দৈনিক আজাদ পত্রিকার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলন, সাপ্তাহিক সৈনিক ও আল ইসলাহর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন, দৈনিক ইত্তেফাক এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং মাসিক মদীনা ও মাসিক পৃথিবী পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসা ও যুগ যন্ত্রণায় ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান ইত্যাদি আমাদের দেশীয় প্রেক্ষিতে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ অবদান। তবে সুলতানী ও মোগল আমলের সরকারী সাংবাদিকতায় 'ওয়াকিয়ানবিশের' ধারা জারি না থাকলেও

www.pathagar.com

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এখনও রিপোর্টার পদে লোক নেয়া হয়। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা নামে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে পত্রিকা প্রকাশ, পিআইবির মাধ্যমে সাংবাদিকতার বিকাশে নানামুখী ভূমিকা পালন ছাড়াও সংবাদ সংস্থা লালন ও রেডিও টিভি ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তবে সেখানেও অনেক সময় রাজনীতির সূতার টানে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন অবান্তর নয়।

আজও সমাজের দর্পণ হিসেবে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এ দেশে ও সমাজের অবকাঠামোকে ধরে রেখেছে। তবে সাংবাদিকতায় যখন থেকে পাশ্চাত্যের ধারায় মোড় ঘুরিয়েছে তখন থেকেই খানিকটা মূল রুট থেকে প্রচলিত ধারায় অবগাহনে লিপ্ত হয়েছে। ফলে আধুনিক সাংবাদিকতা ঐতিহ্যগত ধারার লালনে মৌলিকতা বজায় রাখতে পেরেছে কিনা তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে লাম্পট্য লালনে পিনআপ ম্যাগাজিন, পর্ণো পত্রিকা, পর্ণো বিজ্ঞাপন, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যৌনতার ছড়াছড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে তথাকথিত আধুনিক সাংবাদিকতা আমার মনন ও মানসের বিকাশের রুদ্ধ করে এক অন্ধকারের দিকে ধাবিত করছে যা সাংবাদিকতার আলো বিকিরণকারী, সত্যের লালন ও দুষ্টের দমনে সহায়ক ভূমিকার সাথে সাংঘর্ষিক। ব্রিটিশ প্রবর্তিত এবং ম্যাকিয়াভেলীয় মতবাদে পুষ্ট রাজনীতিতে হলুদ সাংবাদিকতা সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকতার কাঠামোতে ময়লার প্রলেপ লাগিয়ে করেছে কলুষিত এবং বিতর্কিত। সাংবাদিকতা তার মহান ঐতিহ্যকে হারিয়ে ক্ষেত্রবিশেষের যৌনতার সুড়সুড়ি উৎপাদনের হাতিয়ারেও পরিণত হয়েছে। মুসলিম সাংবাদিকতার ঐতিহ্যিক বিকাশ ধারাকে মৌল কাঠামো ধরে সকল শ্রেণীর সাংবাদিককে পবিত্র জ্ঞানে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সাংবাদিকতা পুনরায় হয়ে উঠবে মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রধান নিয়ামক আর সাংবাদিকের দায়িত্ব পালনও তখন হয়ে উঠবে ইবাদতের তুল্য।■

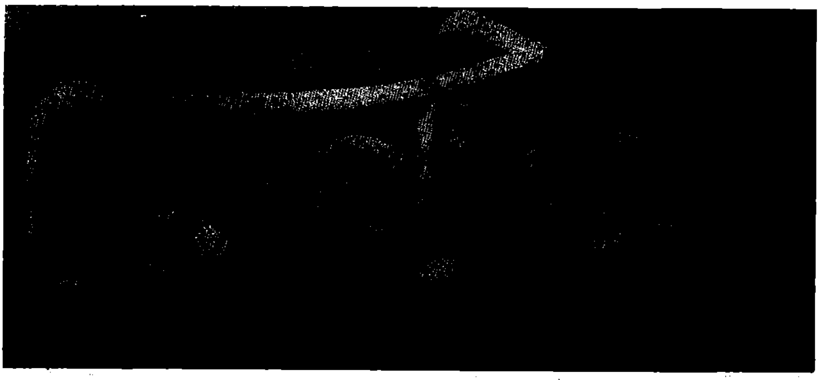

১৫—

www.pathagar.com

আধুনিক ও রুচিশীল মহিলাদের পছন্দ

ফাতেমা হিজাব এন্ড ফ্যাশন

ইরান, পাকিস্তান, সৌদী আরব, দুবাই সহ দেশী-বিদেশী
বৈচিত্রময় বোরকার পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান।

মশিউর রহমান
সত্ত্বাধিকারী- শিল্পী ও সুরকার

প্রধান শাখা
৪৩৫/এ-২ চাষী কল্যাণ ভবন (নীচতলা)
ওয়্যারলেস রেলগেইট (দৈনিক সংগ্রাম সংলগ্ন)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৬৪৬২, মোবাইল- ০১৯১৪-৮৭০৮৯২

সাতক্ষীরা শাখা
মুনশি পাড়া, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড
সাতক্ষীরা
মোবাইল ঃ ০১৭১০-৯৫৮২৪৮

www.pathagar.com

আজ খুব বেশী প্রয়োজন

মোঃ আবেদুর রহমান

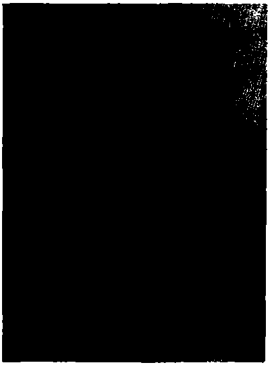

মানুষ সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বলেছিলেন "ইন্নি আ'লামু মা লা তা'লামুন" অর্থ নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জানো না"। মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন "কুনতুম খাইরা উম্মাতি উখরিজাত লিন্নাস, তা'মারুনা বিল মারূফী ওয়া তান হাওনা 'আনিল মুনকার"। অর্থাৎ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" আর সেই মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আমাদের প্রিয় নবী [সা] সর্বশেষ নবী [সা] মানবতার মহান শিক্ষক ও আদর্শ মানুষ হযরত মুহাম্মাদকে [সা]। যাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। যার সম্পর্কে তার প্রিয় সহধর্মিণী হযরত আয়েশা [রা] বলেছেন "মুহাম্মাদ [সা] এর চরিত্রই হচ্ছে আল কুরআন।"

৫৭০ খৃস্টাব্দে যখন হযরত মুহাম্মাদকে [সা] পৃথিবীতে পাঠানো হয় তখন সেই সমাজের মানুষের মধ্যে ছিল শুধু পশুত্ব ও বর্বরতা। আশরাফুল মাখলুকাতের কোন গুণাবলী মানুষের মধ্যে ছিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলী এক সমাজে মানুষ পশুর মতই জীবন যাপন করতো। রাসূল [সা] এর জন্মের পরই তিনি ব্যক্তিগত গুণাবলী দিয়ে

www.pathagar.com

সেই জাহিলী সমাজের পরিবর্তন আনা শুরু করেন। নবুওয়তের পূর্বেই তাকে আল-আমীন উপাধি দেওয়া হয়। তিনি হিলফুল ফুজুল গঠনের মাধ্যমে কিশোরদের সচেতন করার উদ্যোগ নেন। সমাজের পরিবর্তন আসতে থাকে। মানুষ মানবতার সাথে পরিচিত হতে থাকে সাথে সাথে খারাপ লোকেরা তার এই ভাল কাজের বিরোধিতা করতে থাকে। এভাবে তাআলা তার প্রিয় বন্ধুকে ৪০ বয়সে নবুওয়তী দেন এবং সর্বশেষ নবী [সা] হিসেবে ঘোষণা করেন। একদিন হযরত আলী [রা] প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদকে [সা] জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নীতি কি? তিনি এমন ভাষায় এর জবাব দিলেন যা মানুষের ভাষার ইতিহাসে এক অলৌকিক নিদর্শন। তিনি বললেন "আল্লাহর পরিচয় আমার পুঁজি, বুদ্ধি আমার দীনের মূল, ভালবাসা আমার ভিত্তি। আকাঙ্ক্ষা আমার বাহন, আল্লাহর স্মরণ আমার বন্ধু। আস্থা ও বিশ্বাস আমার সাথী, জ্ঞান আমার অঙ্গ, ধৈর্য আমার পোশাক, আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার জন্য অতিবড় নিয়ামত, বিনয় আমার সম্মান, যুহদ তথা পার্থিব সম্পদ নিস্পৃহতা আমার পেশা, প্রত্যয় আমার শক্তি, সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী। আনুগত্য আমার রক্ষাকবচ, জিহাদ আমার চরিত্র আর নামায আমার চক্ষু শীতলকারী।"

সত্যিই এ ভাষার তুলনা হয় না। আর এই যদি একজন মানুষের নীতি আদর্শ তাহলে কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হবেন না।

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই তিনি আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়ে নির্যাতিত মানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে এনেছিলেন। তখন ছিল না মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ। মানুষ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী সেই আশরাফুল মাখলুকাত। কেউ কেউ আবার দুনিয়া থেকে বেহেশতের সুসংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরও সেই যুগের ইতিহাস পড়লে লোভ লাগে। বর্তমানে আমরা কোন সমাজে বসবাস করছি। আবার আমরা সেই বর্বর যুগে চলে এসেছি। যেখানে মানুষ মানুষকে মারার জন্য মরণাস্ত্র তৈরি করছে। ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিদায় করার চেষ্টা চলছে। সেখানে নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। ইরাককে দখল করে একদিকে মুসলমান হত্যা করা হচ্ছে অন্য দিকে ইসলামের সকল ইতিহাস ঐতিহ্য নষ্ট করা হচ্ছে ও সাথে সাথে লুট করা হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয় বিশ্বের অনেক দেশই এই জঘন্য বর্বর কাজে তাদের সহযোগিতা করছে। এ এক অবাক পৃথিবী কারাগারে মানুষকে নির্যাতন করা হয়। বিনা বিচারে ধুকে ধুকে মারা হয়। মুসলমানরা আত্মরক্ষা করতে গেলেও সন্ত্রাসী বলা হয় আর আমেরিকা দেশ দখল ও হাজার হাজার মানুষ হত্যা নির্যাতন করলেও কিছু বলা হয় না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। আমরা যখন চাল আমদানী করতে যাই বিভিন্ন তালবাহানার মাধ্যমে চালের কেজি ধরে ৭০ টাকা। যে মূল্য পৃথিবীর কোথাও নেই। এটাই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ। কিন্তু রাসূল [সা]

www.pathagar.com

বলেছেন "যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন এতে একটু পানি বেশী দিও এবং তোমার প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নিও।"

আমেরিকা শুধু ইরাক থেকে তেল চুরি করে না। পৃথিবীর সকল দ্রব্যাদির বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী দাম বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে যা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের মানুষের উপর চরম নির্যাতন হচ্ছে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে মানুষ দিশেহারা। অথচ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন, "মুত্তাকী, সত্যাশ্রয়ী এবং সত্যবাদী ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য সব ব্যবসায়ীকে শেষ বিচারের দিন বদকার ব্যবসায়ীরূপে উঠানো হবে।" সেদিন খারাপ ব্যবসায়ীদের কঠিন আযাবের মুখোমুখি করা হবে।

আজ যদি আমরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখি বিশ্ব আজ সেই জাহিলী ও বর্বর যুগকেও ছেড়ে গেছে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে রাসূলের [সা] আদর্শ অনুসরণ খুব বেশী প্রয়োজন।■

www.pathagar.com

নিপীড়িত মানবতার নবী মুহাম্মাদ [সা]

জাফর আহমাদ

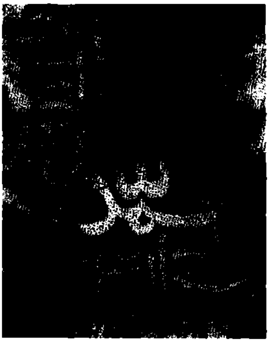

পৃথিবী সূচনালগ্ন থেকে এ যাবৎকাল তার বিশাল বুকে যত সংস্কারক-মহাসংস্কারক, রাজা-মহারাজা, সম্রাট-মহাসম্রাট, বিপ্লবী-মহাবিপ্লবী, নায়ক-মহানায়ক, বীর-মহাবীর, নেতা-মহানেতার ভার বহন করে এসেছে, তাদের অনেকেই সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গে ঝড়ও তুলেছেন এবং পৃথিবী তাদের কীর্তি অনেকদিন মনেও রেখে চলেছে। কিন্তু তাদের কীর্তি, অবদান ও সার্বিক চেষ্টা-সাধনার কোথাও পরিপূর্ণতা খোঁজে পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা নিতান্তই আংশিক, অপরিপূর্ণ বা খুবই ক্ষণস্থায়ী। একটি পরিপূর্ণ [Complete] অবদান বা কীর্তি পৃথিবী শুধুমাত্র রাসূল [সা] জীবনেই দেখেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বমানবের রহমত ব্যতীত প্রেরণ করিনি।" [সূরা আম্বিয়া-১০৭] তাই রাসূলে আকরাম [সা] সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করতেন। ইয়াতীম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অসহায় এক মানবতার নাম। রাসূল [সা] ছিলেন ইয়াতীমদের সরদার। কারণ জন্মের আগেই যার বাবা আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। যিনি জন্মের ছয় বছর বয়সের মধ্যে মায়ের অনন্ত ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের আদর ভালোবাসাও যার ভাগ্যে দুই বছরের বেশি স্থায়ী

www.pathagar.com

হলো না। আট বছর বয়সে আবু তালিবকে দায়িত্ব দিয়ে আবদুল মুত্তালিব পরপারের পথ ধরেন। 'ইয়াতীম নবী' এখানেও রাসূলের [সা] নবুওয়তের পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়েছে। যাতে করে পৃথিবীর কোন ইয়াতীম এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারে যে, আমরা বাবার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা তো পায়নি, সুতরাং পূর্ণাঙ্গ মহামানব, কামিল নবী আমাদের সম্পর্কে কী বলবেন? তাই হয়তো [আল্লাহই ভালো জানেন] মুহাম্মাদকে [সা] ইয়াতীম করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি ইয়াতীম পেয়েও কি তোমাকে আশ্রয় দেইনি? তোমাকে পথহারা পেয়েও কি তিনি পথ দেখাননি, তিনি তোমাকে নিঃস্ব পেয়ে, অতঃপর ধনী বানান। কাজেই ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হয়ো না। প্রার্থীকে তিরস্কার করো না।" [সূরা দোহা-৬-১০]

রাসূল [সা] দুর্বল, অসহায়, নির্যাতিত মানবতার অকৃত্রিম দরদি ছিলেন। নবুওয়তের আগে ও পরে তিনি এ শ্রেণীর লোকদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। নবুওয়তের আগে নির্যাতিত মানুষের করুণ দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য সমমনা যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' সংগঠন প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। দুর্বল, অসহায়, অধীনস্থ ও নির্যাতিতদের প্রতি তাঁর এমন একটি কোমল হৃদয় ছিল যে, চিরবঞ্চিত এ দাস-দাসীদের কথা বলে বলে তিনি এ পৃথিবীর অধ্যায় থেকে প্রস্থান করেছেন। জীবনের শেষ ঐতিহাসিক ভাষণটিকেও অসহায় মানবতার দরদি মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের গোলাম! তোমাদের ভৃত্য! তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে; নিজেরা যা পরবে, তাই তাদেরকে পরতে দেবে।" ভাষণটি মানবাধিকারের সর্বোচ্চ চূড়ায় আজো আসীন হয়ে আছে, যা চির অলঙ্ঘনীয়। যা যুগে যুগে, কালে কালে মানবতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীকে প্রেরণা জোগাবে।

আসুন না! অসহায় বঞ্চিত ও মজলুম মানবতার নবীর কিছু অবদান আলোচনা করে নিজেদের বিবেককে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করি। কারণ পৃথিবী আজ সবলদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মজলুম মানবতার আত্মচিৎকার পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। বিবেকের কান দিয়ে শুনুন কোথায় যেন আমার দুর্বল অসহায় মা-বোন আর শিশুরা মহান প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে : হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও। [সূরা আন নিসা : ৭৫]

নিম্নে এ ধরনের দুর্বল ও অসহায়দের নবীর [সা] একান্তই সামান্য কিছু অবদান বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি।

১. ইয়াতীম : ইয়াতীম নবী ইয়াতীমদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করতেন। ঈদের নামাযান্তে বাড়ি ফিরছেন, মাঠের এক কোণে বসে একটি অবুঝ শিশু কাঁদছে। রাসূল [সা] তার কাছে গিয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শিশুটি বলল, আমার আব্বা-আম্মা নেই।

www.pathagar.com

কেউ আমাকে আদর করে না। ইয়াতীম নবী রাহমাতুল আলামীনের মর্মবেদনা জেগে উঠলো। শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। হযরত আয়েশাকে [রা] ডেকে বললেন, 'আয়েশা হে! ঈদের দিনে তোমার একটি উপহার নিয়ে এসেছি। আয়েশা [রা] তাকে গোসল করিয়ে জামা পরালেন, পেট ভরে খেতে দিলেন। রাসূল [সা] বললেন, আজ থেকে আমরাই তোমার পিতা-মাতা। এ ছিল রাসূল [সা] ইয়াতীম প্রীতি। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু পাষণ্ড লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা ইয়াতীমের সাথে নির্মম ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয় না, সাথে সাথে তার সহায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা ইয়াতীমের মালকে আগুন বলেছেন। যারা এ আগুন নিয়ে খেলা করে তাদের বিবেকের কাছে একটি বিষয় এভাবে উপস্থাপন করতে চাই যে, আপনি যদি আপনার চক্ষুশীতলকারী আদরের শিশু সন্তানটিকে নিয়ে এভাবে চিন্তা করেন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে সে কি কি অভাবের সম্মুখীন হবে। তাহলে একজন ইয়াতীমের মর্মস্পর্শী হৃদয়ের অব্যক্ত কান্না আপনার বিবেককে অবশ্যই ব্যথিত করবে, আপনার উপলব্ধির করুণ মর্মবেদনা আপনার চোখকে অশ্রুসিক্ত করবে।

২. **অধীনস্থ :** অধীনস্থদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব রাসূলরই [সা]। যেহেতু রাসূলের [সা] প্রতিটি কথা ও কাজে সামঞ্জস্য ছিল। তিনি যা বলতেন, তা তাঁর নিজ চরিত্রে বাস্তবায়ন করতেন। সেহেতু অধীনস্থদের ব্যাপারে রাসূল [সা] শুধু ওয়াজই করেননি, বরং রাসূলের [সা] দুইজন চাকর বা খাদেম হযরত যায়েদ [রা] ও আনাস [রা] এর সাথে কি ব্যবহার করেছেন তা তাঁদের মুখ থেকেই শুনুন। হযরত যায়েদ [রা] ছোট্ট বেলায় মা-বাপ থেকে হারিয়ে যান। কুদরত তাকে রাসূলের [সা] ঘরে উঠিয়ে দেয়। তাঁর পিতা-মাতা খবর পেয়ে তাকে নেয়ার জন্য আসেন। যায়েদকে [রা] বলা হলো : তুমি কি তোমার পিতা-মাতার সাথে যাবে? যায়েদ [রা] বললেন, তামাম পৃথিবী যদি আমাকে দেয়া হয় এ ব্যক্তির কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি, তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। হযরত আনাস [রা] ৮ বছর বয়সে রাসূলের [সা] খেদমতে এসেছিলেন। দীর্ঘ ১০ বছর রাসূলের [সা] খেদমত করেছিলেন। হযরত আনাস [রা] বলেন, "দীর্ঘ ১০ বছর রাসূলের [সা] খেদমত করেছি, কিন্তু এ দশ বছরের কোন একটি দিন রাসূল [সা] আমাকে একটি কথাও ধমক দিয়ে বলেননি।"

কিন্তু আমাদের সমাজে অধীনস্থদের নির্যাতন ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যেন এদের পেটানোর মজাই আলাদা। সারা পৃথিবী আজ মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে হিংস্র পশুদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ হিংস্র প্রাণীরা কেবলমাত্র নিজের ক্ষুধার খাদ্য জোগাড় করার জন্য অন্য পশুদের শিকার করে। কোন পশু নিজের জিঘাংসা বা পাশবিকতা চরিতার্থ করার জন্য নৃশংস হয় না। অথচ মানুষ নিজেই নিজের সম্প্রদায়মুক্ত মানুষকে নির্যাতন করে। সবল শুকনিরা সভ্যতার সকল নিয়মকে দুপায়ে নিষ্পেষিত করে দুর্বল পৃথিবীর ওপর কালো থাবা দিনের পর দিন প্রসারিত করছে।

www.pathagar.com

রাসূলের শিক্ষা, রাসূলের সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে মানুষের প্রতি মানুষের ক্রোধ, জিঘাংসা এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, যা দেখে রীতিমতো শিহরিত হতে হয়। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে পেটানো, খানা-পিনা বন্ধ করে দেয়া, বিছানাপত্র না দেয়া– এগুলো তো মামুলি ব্যাপার, কিন্তু রান্নার কাজে ব্যবহৃত লোহার তৈরি সরঞ্জাম গরম করে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছেঁকা দেয়া, গরম তেল বা পানি শরীরে ঢেলে দেয়া– এ কেমন বর্বরতা ও নির্মমতা তা কি কল্পনা করা যায়? এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এরা পশুর ন্যায়; বরং পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।" কারণ পশু এ ধরনের কাজ কখনো করে না। অধীনস্থ দুর্বল ও অসহায়দের ব্যথায় ব্যথিত হন রাসূল [সা]। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করী-মের [সা] কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার খাদেমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? নবী [সা] চুপ থাকলেন। সে পুনরায় বলল, হে আল্লাহর রাসূল [সা] আমি খাদেমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করবো? তিনি বললেন, প্রতিদিন সত্তরবার। [তিরমিযী]

আবু সাঈদ আল খুদরী [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার খাদেমকে মারে এবং সে খাদেম আল্লাহর দোহাই দেয়, তখন তোমাদের হাত তুলে নাও। [তিরমিযী] হযরত আবু মাসউদ [রা] বলেন, আমি একজন ভৃত্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিলাম। এ সময় আমার পাশ্চাতে একটা শব্দ শুনলাম, জেনে রেখ, "হে আবু মাসউদ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এ ভৃত্যের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।" আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কখনো দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীকে প্রহার করবো না। আমি ওকে স্বাধীন করে দিলাম। রাসূল করীম [সা] বললেন, এ কাজটি না করলে আগুন তোমাকে কিয়ামতের দিন ভস্মীভূত করে দিত। [সহীহ্ মুসলিম] অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কাজের লোক যে খাদ্য নিজের হাতে তৈরি করল সেটির সামান্যও তার ভাগ্যে জোটে না। খাদ্যের উচ্ছিষ্টগুলো তাদের জন্য রেখে দেয়া হয়। ব্যবহারের পর পুরাতন কাপড় পরতে দেয়া হয়। রাতে ঘুমাবার জন্য ছোট্ট একটি পাকঘরের মেঝে গরম-শীতকে উপেক্ষা করে তাদেরকে বসবাস করতে হয়। মানবতার লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে? অথচ রাসূল [সা] বলেছেন, "তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সঙ্গে খেতে দাঁও, যে যদি বসতে না চায় তবুও দুই-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খেতে দেবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে। [তিরমিযী]

৩. নারী : পাশ্চাত্য নারীকে পণ্যের মতই ভোগের সামগ্রী মনে করে, আবার নারী অধিকারের নামে সারা পৃথিবী যিকির করে ফিরে। এরা নারীর মর্যাদাকে সর্বাঙ্গে ভূলুণ্ঠিতই করেছে। ইসলামই নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে। মহানবী [সা] ঘোষণা করেছেন, "নারীরা মায়ের জাত। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।" যে

www.pathagar.com

কন্যাসন্তানকে কুলুক্ষণে বা মর্যাদাহানিকর মনে করা হত এবং মেয়েদের জীবিত কবর দেয়া হতো। সে মেয়েদের লালন-পালনকে আল্লাহর রাসূল জান্নাত পাওয়ার কারণ বানিয়ে দিলেন। রাসূল [সা] বলেছেন, "যার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা বা দু'টি বোন থাকবে, আর সে তাদের প্রতি যত্নশীল হয়, তাদের হক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে তার জন্য বেহেশত অনিবার্য। [তিরমিযী, দাঊদ] নারীর অমর্যাদা মানে মায়ের অমর্যাদা। রাসূল [সা] সাহাবাদের নিয়ে বসে আছেন, একজন মহিলা এলেন, রাসূল [সা] তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন, শুধু কি তাই, নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতেও দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হলেন, কে এই মহান মহিলা? কেনই বা হতে যাবে তার এত মর্যাদা? আশ্চর্য! বিশ্ব নবী দাঁড়িয়ে! বিশ্ব নবীর চাদর! এ কি করে হয়? মহিলা চলে গেলেন। রাসূল [সা] অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে বললেন, ওনি আমার মা, ওনি আমার দুধ মা হালিমা। কি শ্রদ্ধা, কি সম্মান আর মর্যাদা। তা কি কল্পনা করা যায়? দুনিয়া জোড়া মানবতার ফেরিওয়ালা বা প্রগতির নামে যারা ফাঁকা বুলি মন্থর করে ফিরে, তারা কি নারীদের এ ধরনের মর্যাদা দিতে পেরেছে? রাসূলই [সা] শুধুমাত্র এ কৃতিত্বের একক হকদার।

রাসূল [সা] আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম। ইসলাম স্বামী থেকে মহরানা এবং পিতা ও স্বামীর সম্পদে মিরাস নির্ধারণ করে নারীদেরকে আরো সম্মানিত করেছে। নারীদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন রাসূল [সা] আপনাদের মায়ের মহান আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। সত্যিই আপনারা জাতির শ্রদ্ধার পাত্র। আপনাদের ওপর নির্ভর করে একটি সুস্থ জাতি ও সভ্যতা। কিন্তু বিশ্ব কুচক্রীদের বানোয়াট ও লোভনীয় টেবলেট গিলে এ মায়ের জাতিরা আজ বিভ্রান্ত। নারী স্বাধীনতার নাম করে লক্ষ লক্ষ জনতার মঞ্চে এনে নারীর মর্যাদার গোপন বাক্সকে উন্মোচন করা হয়। এ নারীরা জানে না যে, এ সকল লম্পটগুলো মূলতঃ তাদের বিকৃত মানসিকতাকে চরিতার্থ করার জন্যই এ ধরনের ফাঁদ তৈরি করেছে। নারীরা এ ফাঁদে পা দিয়ে তার অমূল্য সম্পদকে এভাবে বিকিয়ে দিচ্ছে। যার বাতাস রাসূলের [সা] ৯০% উম্মতের এ বাংলাদেশের গায়েও লেগেছে। প্রিয় রাসূল [সা] উম্মত মা-বোনেরা! আপনাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করার রাসূলের [সা] পথের কোন বিকল্প নেই। এ পথেই পাবেন দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি। দেশী বা বিদেশী কুচক্রীদের বিভিন্ন লোভনীয় ইস্যুর বিভ্রান্তিতে পড়ে আপনার অমূল্য সম্পদ মানুষের সামনে আর কখনো বিকিয়ে দেবেন না।

৪. **শিশু :** হাসান ও হুসাইনের সাথে রাসূলের [সা] ব্যবহারই শিশুদের প্রতি নবী করীম [সা]-এর ভালবাসার গভীরতা মাপা যায়। শিশুদের কান্না নামাযের একাগ্রতাকে ছেদ করে রাসূলের কলিজায় আঘাত হানতো। যার দরুন তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি শিশুদেরকে বেহেশতের ফুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে

www.pathagar.com

বের হলেও রাস্তায় কোন শিশু বা শিশুদের মজমা থাকলে তিনি সেখানে ক্ষণিকের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করতেন। তিনি তাদের সালাম দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন।

কিন্তু পৃথিবীর মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা আজ শিশুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পিতা-মাতা, ভাই-বোনহারা রক্তমাখা শিশুটির করুণ অসহায় চাহনি মানুষ নামের এ সকল হিংস্র জানোয়ারদের বিবেককে একটু আহত করে না। তার চেয়েও করুণ, যখন দেখা যায় রাসূলের [সা] মহব্বতে পাগলপারা মুসলিম দেশের শাসকরা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ ও কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান দান করার পরও সামান্য ক্ষমতার লোভে এবং দুর্বল ঈমান পোষণ করার কারণে এগুলোর প্রতিবাদের সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

৫. দুর্বল : রাসূলের [সা] মিশনের প্রথম যারা সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাদের অধিকাংশ সমাজের দুর্বল শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য যুগে যুগে সমাজের নির্যাতিত দুর্বলরাই সর্বপ্রথম আল্লাহর নবীদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছে। এর একটি যৌক্তিক কারণ ছিল এই যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ বা মত মানবতার মুক্তির গ্যারান্টি দিতে পারেনি। বরং বিভিন্ন মত ও পথের পদতলে এ শ্রেণীর দুর্বল, অসহায় ও অধীনস্থ অবহেলিতরা সবসময় বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিষ্পেষিত পদদলিত হয়েই এসেছে। তাই এ শ্রেণীর লোকেরাই সর্বপ্রথম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের অধিকার ফিরে পেতো। আল্লাহর রাসূল [সা] ছিলেন এদের একান্ত প্রিয় ও কাছের ব্যক্তিত্ব। একবার হযরত উমর [রা] বেলালকে [রা] ধমক দিয়ে কথা বললে রাসূল [সা] অসন্তুষ্ট হন এবং বললেন, হে উমর! তোমার কি এখনো বংশীয় গৌরব রয়েছে? উমর [রা] লজ্জা পেলেন এবং মাটিতে শুয়ে বেলাল পায়ে আঘাত না করা পর্যন্ত উঠবেন না। শেষ পর্যন্ত বেলালকে [রা] তা করতে হলো। এভাবে তিনি নিজের সকল আভিজাত্যের অহংবোধকে ধ্বংস করেন। কিন্তু পৃথিবী আজ সবলদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এমনটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দুর্বল ও অসহায় হয়ে জন্ম হওয়াই যেন মহাপাপ। দুর্বলকে লাঠি পেটার মজাই যেন আলাদা। দুর্বল মানবতার আত্মচিৎকার আজ পৃথিবীর আকাশকে ভারী করে তুলেছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র প্রধানরা প্রভূত সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাস ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে সবলদের পূজা দিতে রীতিমত প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মজলুম মানবতার চেয়ে তাদের গদি রক্ষার প্রয়াসই বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও। যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে।" [সূরা আন নিসা : ৭৫-৭৬]

মানবতার বন্ধু রাসূলের [সা] প্রিয় উম্মতগণ! উল্লিখিত আয়াতের আলোকে হৃদয়ের কান পেতে শুনুন বিশ্বব্যাপী অসহায় নারী, শিশু ও দুর্বল বনী আদমের বুক ফাটা আত্মচিৎকারে কিভাবে পৃথিবীর আকাশ ভারী করে তুলেছে। রাতের ইথারে কান দিয়ে শুনুন তো কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকের পাশবিক নির্যাতনের বলি আমার মা ও বোনের নীরব কান্না শুনতে পান কিনা? পিতা-মাতাহারা রক্তাক্ত অনাথ শিশুটির অসহায় চাহনি কি বিবেকের অন্তরকে একটু আহত করে না? তীক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করুন কিভাবে অনিশেষ এক ঘোর অমানিশা এ জাতিকে গ্রাস করার নিমিত্তে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সর্বগ্রাসী দানবের এ তাণ্ডব থেকে আপনারাও রেহাই পাবেন না। আপনাদের বিবেককে আর একটু অনুরোধ করব যেন পৃথিবীটা এক চক্কর দেখে আসে। কিভাবে সমঅধিকারের এ পৃথিবীটা মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ইতিহাস সাক্ষী রাসূল [সা] এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন, যে সমাজের দুর্বল, অসহায় ও অধীনস্থরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও সঠিক মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। আজো যদি রাসূলের [সা] আদর্শের আলোকে সমাজ-সভ্যতা ঢেলে সাজানো যায়, তবে শুধু বঞ্চিত, অসহায় মজলুম মানবতা নয় সকলেই তার অধিকার ফিরে পাবে।

সুতরাং আসুন বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে মানবতার মহান বন্ধু, মহান শিক্ষক রাসূলে করীমের [সা] জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং একটি কল্যাণমুখী সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুমতি দিন।■

www.pathagar.com

দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে ॥ নু রু ল ই স লা ম মা নি ক

নবীজী আসবেন
এ প্রতীক্ষায় অতন্দ্র জেগে আছে
কুবা পল্লীর মানুষ-আবাল বৃদ্ধ বণিতা,
জেগে আছে বৃক্ষলতা, প্রাণীকুল,
হীরের কুঁচির মতো চুমকি বিছানো
বালুময় প্রান্তর, বাগান-বাড়ি জেগে আছে সমস্ত প্রকৃতি।
তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় আকাশের বুকে নক্ষত্রপুঞ্জ
মুক্তোর মালার মতো ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে।
জেগে আছে মধ্য নিশিথের শুক্ল পক্ষের চাঁদ।
এভাবেই রাত্রির প্রহর যায়
কতো দিন চলে যায় দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

নবীজী আসবেন!
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে সহসাই এক চাঁদ
উদিত হলো 'সানিয়াতুল বিদা'র পাশে
মধ্য দিবসের সূর্যলোক ম্লান করে
এমন জ্যোৎস্নার প্রপাত কখনো দেখেনি কেউ,
জীবনে শোনেনি মানুষ এমন স্বপ্নের কাহিনী।
অথচ, কোবা পল্লির সবাই বিমুগ্ধ বিস্ময় চোখে
দেখছে আজ এক অপূর্ব দৃশ্যের খেলা
আকাশ ও মাটিতে চন্দ্র-সূর্যের তিথি।
মৃত্তিকার চাঁদের আলোয় দিবসে সূর্য যেন
একখণ্ড মলিন ধাতব পাত্রের মতো ঝুলে আছে
আকাশের বুকে।
বিদা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে আসা
আলো প্রপাত যেন অনন্ত সঙ্গীতের ঢেউ
আনন্দ ঝংকারে তার একে একে খুলে যাচ্ছে
মানুষের আত্মার গহীন দরজা।
আর সেই জ্যোৎস্নাময় আনন্দের ভিতর থেকে
ভেসে আসছে নবীজীর প্রশংসা গাঁথা :

তালা'আল বদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল বিদা'ঈ।

www.pathagar.com

ওজাবাশ্ শুক্‌রু 'আলাইনা
মা-দা'আ লিল্লাহি দা'ঈ।
আইয়ূহাল মাব'য়ূছু ফীনা
জি'তা বিল আমরিল মুতা'ঈ।
মারহাবা ইয়া খায়রু দা'!!'
'সানিয়াতুল বিদা'র পাশে উদিত হয়েছে চাঁদ
আমরা উদ্ভাসিত এই পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়।
তিনি এসেছেন আল্লাহর বিধান নিয়ে
আমাদের সম্মানিত আহ্বানকারী তিনি।
আমরা কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ থাকবো চিরকাল
যতদিন আমাদের অন্তর্লোক
উদ্ভাসিত থাকবে আল্লাহর পথে।
স্বাগতম! হে উত্তম আহ্বানকারী
আপনাকে স্বাগতম!!

হেরার জ্যোতি ॥ জ গ লু ল হা য় দা র

নূর নবীজী নূর ছিলো
বালির সমুদ্দুর ছিলো
আলোয় আলোয় ভরে।
জাহেলিয়াত দূর হলো
মানবতার সুর হলো
গীত ঘরে ঘরে ॥

হেরার জ্যোতি ধারণ করে বুকে
তৌহিদ মন্ত্র দিলেন নবী ফুঁকে
কেউ নিলো কেউ নিলো না সে
মন্ত্র আপন করে ॥

বুঝলো যারা খুঁজলো তারা মানে
কি সুর খেলে নবীর প্রাণে প্রাণে
সেই সুরে কেউ পাগল হয়ে
সঙ্গে কোরাস ধরে ॥

www.pathagar.com

সুখের ছবি ॥ আ বু ল হা সা ন তু হি ন

আরব সাগর পাড়ি দেব অল্লাহ্ রাসূল নামে
ইসলামের ঝাণ্ডা আমি কিনবো প্রাণের দামে ॥

মরুর বুকে ফুটালো ফুল রাব্বুল আলামিন
সেই ফুলেরই খোশবো মাখে বিশ্ব জমিন
শান্তির বার্তা এলো ইসলামেরই খামে ॥

আমেনার ঘর আলো করে এলো বিশ্বনবী
আঁধার ঘরে দোলে যেন শান্তি সুখের ছবি
কলেমা পড়, দরুদ পড়, সেই রাসূলের নামে ॥

তোমাকে সালাম ॥ মু হা ম্ম দ ই স মা ঈ ল

তোমাকে সালাম জানানোর আমার ভাষা নেই
অশান্ত পৃথিবীতে বসবাস, কর্দমাক্ত আমার শরীর
এখানে মানুষ হলি খেলে আর এক মানুষের রক্ত দিয়ে!
তবু আশা ছাড়িনি দরুদ
কেননা তুমি তো রাহমাতুল্লিল আলামিন!

এক টুকরো সাদা কাগজে আমি তোমাকে ভালোবাসি
এ কথাটি যেমন ঠিক নয়
মুখে মুখে রাসূলকে ভালবাসি সেটিও ঠিক নয়।
রাসূলকে ভালবাসো কোরান পড়ো
কোরান হলো রাসূলের চরিত্র।
রাসূলকে ভালবাসো হাদিস পড়ো
হাদিস হলো রাসূলের চরিত্র।
রাসূলকে ভালবাসো সাহাবীদের সংগ্রামী জীবন পড়ো।
রাসূলকে ভালবাসো ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কর
তবেই আসবে শান্তি এবং আমরা পাবো মুক্তি ॥

www.pathagar.com

বিশ্ব নবী ॥ মু হা ম্মা দ মা সু ম বি ল্লা হ

জেনে শুনে তোমরা যারা ধরেছো পাপের পথ
তাদের বলি নাও চিনে নাও নূর নবী হযরত।

আমার নবী বিশ্ব নবী যার তুলনা নাই
রোজ হাশরের কঠিন দিনে তার শাফায়াত চাই
তিনি হলেন বিশ্বভুবনে খোদার রহমত।

নূরের জ্যোতি হিরে মোতি যার ভিতরে আছে
আমরা কেন যাইনা তার অনেক কাছে কাছে
তিনি হলেন মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

তিনি হলেন পূত পুষ্প পূর্ণ গোলাপ ফুল
তারই পথে না গেলে ভাই হবে বিরাট ভুল
আর বসে নয় খুঁজতে চলো খোদার রহমত।

শ্রেষ্ঠ যিনি ॥ দু লা ল ন জ রু ল

সাইয়্যিদুল মুরসালিন
খাতামুন নাবিয়্যিন,
দীন-দুনিয়ার আলো তিনি
রাহমাতুল্লিল আলামীন।

আল্লার পেয়ারা হাবীব
নূর নবী মোস্তফা
যাঁর উপরে নাযিল হলো
শ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যিনি
তুলনা উপমাহীন।

যাঁর অছিলায় সৃষ্টি হলো
তামাম জাহান আসমান,
যিনি শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী
শ্রেষ্ঠ নেতা বীর শাসক

যাঁর স্মরণে ডাকে পাখি
ফোটে বনে ফুল রঙিন ॥

www.pathagar.com

ঈর্ষা মধুরেণু

হাসান আলীম

মেঘের নরম মাখন তাঁর কপোলে মেখে থাকত। কপোলে চুলগুলো জল ছলছল করে। খেজুর পাতারা চিরল শব্দে দুলছে যেন বাতাসের গায়ে। কিছু সুখ কিছু কষ্ট তাকে দোলায়। তিনি মাঝে মধ্যে উষ্ণ আরামে রক্তিম লাল আপেল বনে যান। কেন তার সাথে তার প্রিয়তম অমন করেন!

তিনি রূপসী কম! চাঁদ চকোরী তার রাঙা পায় চুমু খায়। তিনি কুমারী। কেবল তিনিই তাকে স্পর্শ করেছেন। আর সব স্ত্রী বয়স্কা, কেউবা বিধবা। তাকে তো বেশি বেশি আদর করা উচিৎ। আদর ঠিকই পান কিন্তু সেই বয়স্কা নারী থেকে নয় বেশি। সে নারী পৃথিবীতে নেই। অথচ সে তার প্রিয়তমের হৃদয় চাঁদে লুকোচুরি করেন। এটা তার জন্য ভীষণ কষ্টকর। তার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখান হয়ে যায়। হৃদয়ের চাতালে মরু সাইমুম ওঠে তার বারবার।

মাত্র ছ'বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের তিন বছর পর তার ঘরে গিয়েছেন। সে কী মধুর স্মৃতি। মদীনায় চলে এসেছেন তারা। আত্মীয় স্বজন, পরিচিত আঙিনা অনেক কিছুই ছেড়ে এসেছেন। মনে পড়ছে কত কত মধুর ঘটনা। খেলার বয়স গড়িয়ে যায়নি।

এখনও সখীদের নিয়ে খেলা করেন। দোলনায় দোল খান। ঘর-

১৬—

www.pathagar.com

সংসারের জটিলতা তাকে স্পর্শ করেনি। একদিন মাতা উম্মে রুমান তাকে জোরে ডাকছেন। মায়ের ডাক শুনে তিনি দ্রুত কাছে চলে যান। তখনও বুঝতে পারেননি কি ঘটতে চলছে। মায়ের সাথে দ্রুত হাটছেন। একটা ঘরের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন। বুকে দ্রুত শ্বাস ওঠানামা করছে। হাপাচ্ছেন খুব। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যান। তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেক মহিলা। মহিলারা তাদেরকে স্বাগত জানায়। পরম যত্নে তারা তাকে নতুন জামা কাপড়ে সাজিয়েছেন। খুশবু আতরে মাতোয়ারা করে তোলেন। শেষে তাকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার মাত্র ন'বছর বয়স। বাসরঘরে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে দেখে চমকে যান। অন্তরে আন্দর ঝর্ণা ঝর ঝর করে ওঠে। মহিলারা পাখা বিস্তার করে দেয়। সে কী আনন্দ, সে কী সুখ। বেহেশত সেদিন তার ঘরে নেমে এসেছিল যেন।

কি এক ভাষাহীন বোবা আনন্দে তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যায় এই তার শ্রেষ্ঠ উপহার। তার স্বামী। শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবতী তিনি। আল্লাহর হুকুমে তাঁর রাসূল তাকে বিয়ে করেছেন। তিনি রাসূল পত্নী-বিশ্ব মুসলিমের চিরকালীন মাতা– উম্মুল মু'মিনীন। এ সৌভাগ্য কার হয়? আল্লাহ্-ই তাকে এ শ্রেষ্ঠ দান দিয়েছেন। রাসূলের মুখেই তিনি শুনেছেন। রাসূল বলেছেন, বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের ভেতর দু'বার তোমাকে দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি, তুমি এক খণ্ড রেশমী বস্ত্রে ঢেকে আছো। আমাকে বলা হল, ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি, যে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।

সেই স্বপ্নে পাওয়া রত্ন তিনি। অথচ তিনি তাকে কতটুকু ভালবাসেন। তার প্রথম স্ত্রীকে তিনি কিছুতেই তুলতে পারছেন না। এখনও প্রথম স্ত্রীর বান্ধবীদের সম্মান করছেন। নানা উপহার সামগ্রী দিচ্ছেন। খাদীজার মৃত্যুর পর তিনি তিন বছর অপেক্ষা করেছেন। তারপর তাকে বিয়ে করেছেন। তাঁর আরও স্ত্রী জীবিত রয়েছে। তাদের ওপর আয়েশার ঈর্ষা নেই। মনে হয় খাদীজা জীবিত। তাকে তার মোটেও সহ্য হচ্ছে না। কেন মুহাম্মাদ [সা] তাকে এখনও ভুলতে পারেন না? কেন বার বার তার কথা আলাপ করে। এই তো সেদিন বকরী যবেহ্ করে তার রান ক'টা, গিলা-কলিজা সবই যেন খাদীজার বান্ধবীদের দিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদের [সা] এ আচরণ দেখে তিনি বলতেন মনে হয় দুনিয়াতে আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তিনি বলতেন, হ্যাঁ, সে এমনই ছিল। তাছাড়া তার থেকেই তো আমার ছেলে মেয়ে হয়েছে।

মুহাম্মাদ [সা] খাদীজাকে ভুলতে পারেন না। তাকে কি ভোলা যায়? এতে আয়েশার ঈর্ষা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু নবীর সাথে– তার স্বামীর সাথে কখনও খারাপ আচরণ করতেন না। কেবল মুখে মুখে দু:খ প্রকাশ করতেন।

একবারের ঘটনা মনে পড়ছে আয়েশার [রা]। খাদীজার [রা] বোন হালা মুহাম্মাদের [সা]

www.pathagar.com

ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। মুহাম্মাদ [সা] হালার কণ্ঠস্বরে খাদীজার কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলেন। তিনি হতচকিত হয়ে পড়েন। খাদীজার কণ্ঠস্বরের অনুরণন তাঁর হৃদয়কে তোলপাড় করে তোলে। তিনি মধুর দিনের সৌগন্ধে হত বিহ্বল হয়ে যান। সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে ওঠেন, হে আল্লাহ এতো দেখছি হালা! অপরদিকে আয়েশার বুকে ঈর্ষা আর কষ্টের বহ্নি শিখা জ্বলছে। বুড়িটা মরেও বেঁচে আছে। এখনও মুহাম্মাদ [সা] তার প্রেমে বিভোর- তাকে ভুলতে পারছে না। আয়েশার ভীষণ রাগ হয়। তিনি মুহাম্মাদকে [সা] বললেন। কুরাইশ বুড়িদের মধ্যে এমন এক বুড়ির কথা আপনি বলে যাচ্ছেন যার আর বলার কিছু বাকী নাই। কেবল দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটাই যেন বাকী রয়ে গেছে। সে তো শেষ হয়ে গেছে কত কাল আগে। তার চাইতে আল্লাহ তো আপনাকে আরও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।

আয়েশার মনের ভেতর যেন আরও কিছু গোপন রাগ ওৎ পেতে ছিল কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি। খাদীজাকে ভোলেন- আমাদের দেখুন, আমাদের প্রশংসা করুন। আমরা তো আপনার খেদমতে কুরবান হতে রাজী। আর খাদীজার কথা বলবেন না প্রিয়তম, ঈর্ষার বহ্নিতে আমার প্রেম শিখা জ্বলছে দ্বিগুন। আমাকে ভালবাসুন। চলুন না। জোস্না রাতে দু'জনে আনন্দ খেলায় মেতে উঠি। হারিয়ে যাই। রিলেরেস খেলি। দৌড় দেই- মাতামাতি করি। ঈর্ষার বহ্নি থেকে জ্বলে উঠুক প্রেমের পবিত্র আগুন।■

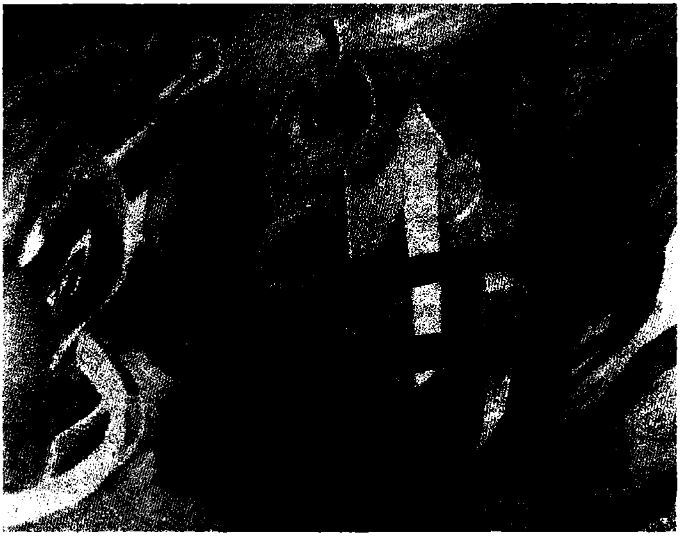

www.pathagar.com

ভিমরুলের গার্ড অব অনার

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

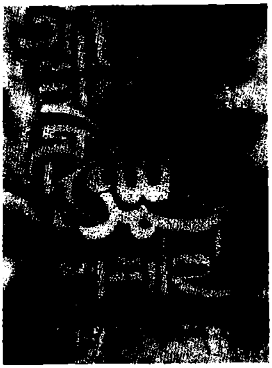

রাগে ক্ষোভে আগুনের মত জ্বলছে আসু সুফিয়ানের চোখ। পাংশু মুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাঘা বাঘা কুরাইশ সর্দাররা।

– মাত্র তিনশ তাল পাতার সিপাইয়ের মার খেয়ে পাতি শিয়ালের মত পালিয়ে এলি? তোদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিৎ।

– আমাদের কিছু করার ছিল না হুজুর! না পালালে আমাদেরও ওমর হিশামের দশা হত। একমুষ্ঠি কোমরের লিকলিকে মানুষগুলোর গায়ে অশুরের শক্তি এল কেমন করে? স্বচক্ষে দেখলে বুঝতেন, কারে কয় আল্লার মাইর, দুনিয়ার বাইর। আমাদের একজনের ঠাং ধরে কেমনে লাঠির মত ঘুরিয়েছে, আর আরেকজনের মাথায় মেরেছে।

– এসব ফালতু কথা বলে আমাদের লোকদের প্যালপিটিশন বাড়াইও না। বদরে জয়লাভ করে ওদের সাহস বেড়ে গেছে। এরা এখন মদীনায় বসে থাকবে না। যে কোন মুহূর্তে মক্কায় হানা দিতে পারে। বাপ-দাদার ভিটা সহজে ছেড়ে দেবে না।

– আপনি কোন চিন্তা করবেন না হুজুর! দশ তীরন্দাজের এক চৌকস বাহিনী মক্কার অলি গলি পাহারা দেবে। কোন কাক পক্ষিকেও ছেড়ে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

– তাই করো। তীরন্দাজের সংখ্যা বাড়াও। ভাল করে ট্রেনিং দাও। দূর থেকে হামলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কাছে গেলে আবার ঠ্যাং ধরে ফেলতে পারে।

হোযায়েলের নেতৃত্বে তীরন্দাজের একটি দল টহল দিচ্ছে আল হাদা এলাকায়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় হোযায়েল। একজন সঙ্গী জিজ্ঞেস করে।

– ওস্তাদ, সন্দেহজনক কিছু দেখলেন?

– ভাল করে সামনে তাকাও। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

– জ্বি হুজুর, কিছু উচ্ছিষ্ট খেজুর ও বীচি! বোধহয় রাখালেরা ভেড়া-বকরি চরাতে এসে এখানে আড্ডা দিয়েছিল।

– তোমার মাথায় সাইজের তুলনায় ঘিলু খুব কম। সারা জীবন জন্মের মত খেজুর খেয়েছ, কিন্তু কোন খেজুর কোথায় জন্মে তার খবর জান না!

একটি খেজুর ও দু'টি বীচি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে হোযায়েল। তারপর আবার বলে।

– এগুলো ইয়াসরিবের খেজুর। নিশ্চয় সেখানকার কোন কাফেলা মক্কায় ঢুকেছে। এরা বেশি দূর যায়নি। আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে।

– কি সাংঘাতিক! কোথায় যেতে পারে ব্যাটারা?

– নিশ্চয় ঐ উসফান পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, ঐ দিকেই। সবাইকে খবর দাও। উসফান পাহাড়ের চারদিক ঘেরাও দিতে। ওদের জ্যান্ত ধরতে হবে। তা না হলে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না।

উসফান পাহাড় চূড়ায় সালাতুল খউফ আদায় করে আছেম বিন ছাবেত গোল হয়ে বসে তার সঙ্গিদের নিয়ে।

– তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ঘোড়ার পদধ্বনি ও মানুষের ফিস্‌ফিসানী?

– জ্বি, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কারা যেন পাহাড়ে আরোহণ করছে। এখন কি করব আমরা?

– আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। আল্লাহর নবী আমাদের পাঠিয়েছেন, বদরে পরাজিত হয়ে কুরাইশরা কি ফন্দী আটছে প্রতিশোধের সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য। আমরা মাত্র দশ জন। আল্লাহ পাক যা নসীবে রেখেছেন তাই হবে।

হঠাৎ তারা শোনতে পায় উগ্র কণ্ঠের হুংকার।

– যদি জানে বাঁচতে চাও, আত্মসমর্পণ কর। আমরা কথা দিচ্ছি, আত্মসমর্পণ করলে কাউকে হত্যা করা হবে না।

– আল্লাহর দুশমনদের কথায় আস্তা রাখা যায় না। অতীতে বহুবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তোমরা। আমরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাব।

www.pathagar.com

উচ্চ কণ্ঠে জবাব দেয় আছেম বিন ছাবেত। জবাব শেষ না হতেই তীরের বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দল নেতা আছেমসহ সাতজন আনসার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আছেম আল্লাহর দরবারে হাত তুরে ফরিয়াদ জানায়।

– হে প্রতিপালক! আমাদের দুরবস্থার কথা নবী পাককে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু..... ।

আছেম ও তার ছয়জন সঙ্গি শাহাদত বরণ করে পাহাড় চূড়ায়। খোবায়েব, দাছনা ও সালিম কিছুক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। শাহাদত বরণ করবে, না বাঁচার জন্য চেষ্টা করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ খোবায়েব দাঁড়িয়ে যায়। চিৎকার দিয়ে বলে।

– তোমরা তীর থামাও। আমরা আত্মসমর্পণ করছি।

– হাত উঁচু করে নিচে নেমে আস। চালাকী করলে খবর আছে।

খোবায়েব, দাছনা ও সালিম নিচে নেমে আসতেই হোযায়েল ও তার সাথীরা ধনুকের রশি দিয়ে খোবায়েব ও দাছনার হাত পিঠমোরা করে বেধে ফেলে। তারপর এগিয়ে যায় সালিমের দিকে। সালিম চিৎকার করে বলে।

– ওরে শয়তানের দল। ওয়াদা ভঙ্গ করাই তোদের চরিত্র। এই সত্য কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম।

একদলা থুথু এসে পড়ে হোযায়েলের চোখে মুখে।

ক্ষিপ্ত হোযায়েল স্বজোরে আঘাত হানে সালিমের পেটে।

– কালেমা শাহাদাত পড়তে পড়তে লুটিয়ে পড়ে সে। বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে পাক কালেমা।

খোবায়েব ও দাছনাকে বন্দি করে মক্কায় নিয়ে আসে হোযায়েল ও তার বাহিনী। মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরিয়ে অপমান করে নিলামে বিক্রির ঘোষণা দেয়া হয়। দুই কুরাইশ উচ্চ মূল্যে কিনে নিয়ে যায় দুই বন্দিকে।

কুরাইশ সর্দার হারেছ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল খোবায়েবের হাতে। তার পুত্র মানাফ ক্রয় করে খোবায়েবকে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে তার বুকে।

বহু শলাপরার্শের পর কুরাইশ সর্দাররা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রকাশ্য ময়দানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে বন্দিদের। বদর যুদ্ধে নিহত দুই কুরাইশের উত্তরাধিকারীরা নিজ হাতে হত্যা করবে তাদের। দুই যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য নির্ধারণ করা হয় দিনক্ষণ।

মক্কাবাসীদের উত্তেজিত করতে ব্যস্ত হোযায়েল। বন্দি খোবায়েবকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বোন নাখালাকে। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিন দিন অন্ধকার কক্ষে আটকে রাখতে, কোন প্রকার খাদ্য-পানীয় ছাড়া। কান্নাকাটি, চেচামেচি করলেও যেন সামান্য দয়াও দেখানো না হয়।

www.pathagar.com

ভাই এর হুকুম পালনে কোন ত্রুটি করে না নাখালা। তবে খুব সখ হয় এক নজর দেখতে যুদ্ধাপরাধীর চেহারা। তাই একদিন দরজা ফাঁক করে উঁকি দেয় ভেতরে।

– একি? অন্ধকার ঘরে আলো আসছে কোত্থেকে? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এক সুদর্শন যুবক শূন্যে ঝুলানো ছড়া থেকে আঙ্গুর ফল ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে, এই শীতকালে আঙ্গুর এল কোত্থেকে?

বেখেয়াল নাখালার শিশুপুত্র জারাদা ঢুকে পড়ে বন্দিশালায়। হাটতে হাটতে চলে যায় একেবারে খোবায়েবের নিকটে। খোবায়েব কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে তাকে। আঁতকে উঠে নাখালা।

– মৃত্যুদণ্ডের আসামীর কোলে শত্রুর শিশুপুত্র! মরণকামর দিবে নাতো লোকটা?

হঠাৎ খোবায়েবের দৃষ্টি পড়ে নাখালার ভয়ার্তমুখের উপর। অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলে–

– ভয় নেই আপা, আপনাদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। আল্লাহর নবী আমাদের শিখিয়েছেন ছোটদের স্নেহ করতে, নারীদের সম্মান করতে।

কোল থেকে নামিয়ে রাখার পরও ছেলেটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। খোবায়েব আবার বলতে থাকে।

– আগামীকাল সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সাথে আমার মিলনের দিন ধার্য করেছেন আপনারা। ব্যস্ততার কারণে অনেকদিন খৌরকাজ করা হয়নি। এ অবস্থায় আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পাচ্ছি। যদি একটি খুর দিয়ে সাহায্য করতেন।

খোবায়েবের কথা শেষ না হতেই দৌড় দেয় জারাদা।

– আমি আব্বুর খুর নিয়ে আসছি।

কিছু বুঝে উঠার আগেই একট ধারালো খুর এনে জারাদা খোবায়েবের হাতে তুলে দেয়। লোকটার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে নাখালা, কিন্তু ভয় কাটে না। রক্ত মাংসে গড়া একজন মানুষ জানের দুশমনের সন্তানকে সামনে রেখে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো। যদি কিছু করে বসে।

– তুমি এবার তোমার আম্মুর কাছে যাও বাবা। আমি আল্লাহর কাছে যাবার জন্য তৈরী হব।

রাতে মানাফ বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই দাঁড়ায় বন্দিশালার দরজায়। দরজা খোলা দেখে চমকে উঠে।

– ব্যাটা পালিয়ে গেল নাকি? তাহলে তো সব আয়োজন মাঠে মারা যাবে।

ঘরে উঁকি মেরে দেখে লোকটা নিশ্চিন্ত মনে নামায পড়ছে। রুকু সিজদা করছে। বড় একটা তালা এনে দরজায় মেরে দেয় মানাফ। এক দফা বকাঝকা করে নাখালাকে।

– বলেছি কড়া নজর রাখতে আর তুই দরজা খোলা রেখেছিস। তোমাদের খুন করে পালালে কি করতি?

– আমি জানি সে পালাবে না। সে সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রিব হয়ে আছে। যাদের ব্যাপারে সারাক্ষণ চিৎকার কর, ক্ষমা নাই ক্ষমা নাই, বিচার চাই, বিচার চাই। কি বিচার করবে তাদের? শাস্তিতো কষ্ট দেয়ার জন্য। তারা আনন্দে নাচতে নাচতে জান্নাতে যাচ্ছে। ছেড়ে দেয়াটাই হবে তার জন্য বড় শাস্তি।

নাখালার বক্তৃতা শোনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মানাফ। তারপর বলে।

– ফুর্তিতে হাসুক, আনন্দে নাচুক, আর যাই করুক কাল তানিম প্রান্তরে দুই যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। তামাশা দেখবে মক্কার সকল লোক।

লোকে লোকারণ্য তানিম প্রান্তর। বন্দি খোবায়েব ও দাহনার চোখে মুখে কোন ভীতির ছাপ নেই। কিংভুতকিমাকার চেহারার জল্লাদ দাঁড়ালো তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের অপেক্ষায়। হঠাৎ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে খোবায়েবের কণ্ঠ–

– কোন রকম কান্নাকাটি আর মাতম করছি না বলে তোমরা খুব আশ্চর্য হচ্ছো? আমরা কোথায় যাচ্ছি, তোমরা কি জান? অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা জান্নাত আমাদের ডাকছে। যেখানে শুধু সুখ আর আনন্দ। তোমাদের কাছে আমাদের কোন অভিযোগও নেই, দাবীও নেই। শুধুমাত্র জীবনের শেষ দু'রাকাত নামায পড়ার জন্য অনুমতি চাই।

নিত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে অনুমতি দেয় কুরাইশ সরদার। মনে মনে ভাবে আয়াজের কথা। সে রকম কোন মতলব নেই তো বন্দিদের?

আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এক কুরাইশ সরদার নিহত হয়েছিল আয়াজের হাতে। গণআদালতে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। দণ্ড কার্যকরের আগে জীবনের শেষ খাবার খাওয়ার জন্য ইচ্ছে পূরণের সুযোগ পেয়ে বলেছিল, তার তরমুজ খেতে ইচ্ছে করছে। বিচারক রেগে মেগে বলেছিল।

– শালা দুনিয়ায় আর কিছু পেলি না? এই শীতকালে তরমুজ পাবি কই? তরমুজের সিজন আসতে আরো ছয় মাস, আয়াজ বলেছিল।

– তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই। আমি অপেক্ষা ছয় মাস করতে রাজী আছি।

কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করেছে খোবায়েব ও দাহনা। এক কুরাইশ সর্দার মন্তব্য করে–

– সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারে না বেকুবরা।

কিছুক্ষণ লম্বা নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ তো পেয়েছিলি। তাও কপালে সইল না? এবার মরার জন্য তৈরী হ।

খোবায়েবের জবাব শুনে সর্দার থ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

– খুবই ইচ্ছে করেছে, দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রাণভরে নামায পড়ি। মন খুলে আল্লাহর সাথে কথা বলি। তোমার মত বেকুবরা ভাববে, মৃত্যু বিলম্বিত করার কৌশল এই নামায। তাই তাড়াতাড়ি সেরে ফেললাম। আমরা জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। আমাদের শরীর নিয়ে তোমরা যা খুশী করতে পার। এই শরীর মাটির পুতুল ছাড়া এখন আর কিছু নয়।

দর্শক শ্রোতাদের মাঝে দেখা যায় ভাবান্তর। শোনা যায় গুঞ্জরন। কেউ কেউ মন্তব্য করে–

– নিশ্চয় এরা সত্য বলছে। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কেউ তামাশা করে না।

কিন্তু কুরাইশ নেতাদের পাষাণ হৃদয়ের কোন আলো প্রবেশের দরজা নেই। মানাফ নিজ হাতে হত্যা করে খোবায়েবকে। বদর যুদ্ধে নিহত আরেক কুরাইশ সর্দারের ছোট ভাই হত্যা করে দাছনাকে। উল্লাস করতে করতে তারা ফিরে যায় মক্কায়। নিস্প্রাণ দেহ দুটি পড়ে থাকে তানিম প্রান্তরে।

মক্কার গড ফাদার বলে পরিচিত কুখ্যাত শীর্ষ সন্ত্রাসী আতুজা তার বখাটে মাস্তানদের নিয়ে আমোদে লিপ্ত ছিল এক পানশালায়। মদের নেশায় ভুলে গিয়েছিল তানিমের আজকের ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠানের কথা। যখন নেশা কাটল তখন সব কার্যক্রম শেষ।

– আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা এখানে কি চুল ছিড়লাম? দুই আল বদরের মরণ চিৎকার আর ছটফটানি দেখার মজাডাই পেলাম না।

– তাতে অইজেডা কি? মজা মারনের কত রাস্তা আছে। চলেন ঐ ব্যক্তির শরীরের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাইটা লইয়া আই।

দারুণ বুদ্ধি আছে দেখছি তোর গোরব মাথায়। চল চল জলদি চল।

তানিমের মর্মান্তিক ঘটনার চিত্র জিবরীল [আ] মদীনায় নবী করীমকে [সা] জানিয়ে দেয় অহির মাধ্যমে। মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল নয়নে সমবেত মুসল্লীদের নবী পাক বলেন–

– শাহাদতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর দরবারে চলে গেছে আমার দশজন প্রিয় সাহাবা। সর্বশেষ খোবায়েব ও দাছনার পবিত্র লাশ দু'টি পড়ে আছে তানিমে। কয়টি নরপিশাচ শহীদি লাশের অপমান করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। কে আছ, জীবন বাজি রেখে তাদের লাশ দুটো মদীনায় নিয়ে অসতে পারবে?

একজন মুহাজির ও একজন আনসার দ্রুত অশ্ব চালায় মক্কা অভিমুখে। আতুজা তার বখাটে মাস্তানদের নিয়ে অনেক আগেই পৌছে গিয়েছিল তানিমে। কিন্তু লাশের নিকটে যেতে পারেনি কেউ। মেঘপুঞ্জের মত একঝাঁক ভিমরুল লাশের চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল। আতুজার বাহিনী কাছে যেতেই এমনভাবে তাড়া করল, পড়িমরি করে ছুটে পালাল সবাই।

www.pathagar.com

লাশ উদ্ধারকর্মী দুই মুহাজির ও আনসার তানিমে পৌঁছানোর পর ভিমরুলের ঝাঁক তাদের দু'পাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়। আতঙ্কিত আনসার জিজ্ঞেস করেন–

– এই ভিমরুলের ঝাঁক এখানে কি করছে?

– আমাদের প্রিয় ভাইদের লাশ পাহারা দিয়েছে এতক্ষণ।

– আমাদের ভাইদের যখন হত্যা করা হল তখন এরা কোথায় ছিল? তখন দাওয়া করলে তো বেঁচে যেত।

– আল্লাহর ফায়সালা আর তোমার চিন্তা সব সময় এক রকম হবে না। আল্লাহ্ পাক ফায়সালা করেছেন তার প্রিয় বান্দাদের উচ্চতর শহীদি মর্যাদা দেবেন কিন্তু লাশকে অপমান করতে দেবেন না।

– আহারে, মুহাজিরদের সাথে থেকেও আমি এত বোকা রয়ে গেলাম। আল্লাহর পাঠানো ভিমরুল বাহিনী, চোখে দেখেও একটা স্যালুট দিতে পারলাম না।

– তোমার স্যালুটের দরকার নেই। চল লাশ তুলে নিলে এবার মদীনায় রওয়ানা হই। ভিমরুলই আমাদের গার্ড অব অনার দেবে।■

www.pathagar.com

মহানবী [সা] নতুন এক সভ্যতার নির্মাতা

ইকবাল কবীর মোহন

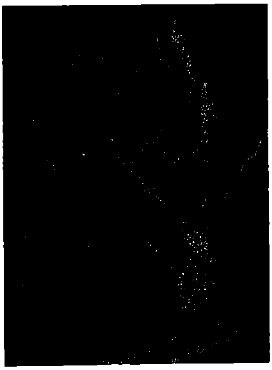

জাহিলিয়াতের চরম অন্ধকার যখন পৃথিবীকে গ্রাস করে বসেছিলো সেই দুর্দিনে নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে দুনিয়ায় এলেন। তখন মানুষ হয়ে পড়েছিলো সৃষ্টির দাসে, নারী জাতি ও দাস-দাসীরা ছিলো চরমভাবে নিপীড়িত, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার মতো জঘন্য অপরাধ করতেও হৃদয়হীন মা-বাবা কুণ্ঠিত হতো না। মানবতা ও মনুষ্যত্ব বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিলো না। সুদি কারবার ও মহাজনী শোষণে অর্থনীতি ছিলো পংগু। সামাজিক পরিস্থিতি এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো যে জীবন ধারণ করা ছিলো সত্যিই দুর্বিষহ। অনিয়ম, হানাহানি, সন্ত্রাস, কুসংস্কার ও শোষণ-নিপীড়নে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। মহানবী [সা] হিদায়াত ও সংস্কারের এক আলোকবর্তিকা নিয়ে মানবতার কাছে উপস্থিত হলেন। হেরার যে আলোকরশ্মি তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ধারণ করলেন তার মাধ্যমেই তিনি মহান এক সভ্যতা বিশ্বের মানুষের কাছে উপস্থাপন করলেন। মহানবী [সা] এ সুন্দর সভ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক J.H. Denison Zuvi Emotion as the basis of Civilization' গ্রন্থে অতি চমৎকারভাবে বলেছেন,

www.pathagar.com

'In the fifth and sixth centuries, the civilized world stood on the verge of chaos. It seemed then that the great civilization which it had taken four thousand years to construct was on the verge of disintegration, and that mankind was likely to return to that condition to barbarism where every tribe and sect was against the next, and law and order was unknown, The new sanctions created by Christianity were working for division and destruction instead of unity and order. It was these people [Arabs] that the man was born who was to unite the whole known world of East and South'-অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য জগত বিশৃঙ্খলার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। তখন এটাই মনে হচ্ছিল যে, চার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বিশাল সভ্যতা ভেঙে চুরমার হওয়ার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং মানব জাতি বর্বরতার এমন এক চরম অবস্থায় ফিরেছে যেখানে প্রতিটি জাতি, গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-বিবাদে লিপ্ত ছিলো, আইন শৃঙ্খলা ছিলো না, খ্রিস্ট ধর্মের দ্বারা সৃষ্ট নিত্যনতুন নিয়ম-অনুশাসন এবং শৃঙ্খলার বদলে বিভেদ ও ধ্বংসের কাজ করছিলো। এ জনগোষ্ঠীর [আরবদের] মধ্যে সেই মহামানব জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি পূর্ব ও দক্ষিণের জানা পৃথিবীটাকে ঐক্যবদ্ধ করতে আবির্ভূত হলেন।' মহানবী [সা] ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে নতুন যুগের সূচনা করলেন তার এ বিশাল অবদানকে Chambers Encyclopedia চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। সেখানে মহানবীর [সা] অবদানকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এভাবে- It was the prophet who laid the foundation of the vast edifice of enlighten and civilization which has adorned the world since his time. -অর্থাৎ মহানবী [সা] এমন এক জ্ঞানালোক ও সভ্যতার বিশাল প্রাসাদের বুনিয়াদ স্থাপন করলেন যা তাঁর সময় থেকে পৃথিবীটাকে অলঙ্কৃত করে আসছে।

মহানবী [সা] যে প্রকৃতই সেরা সমাজ সংস্কারক ও নতুন সভ্যতার নির্মাতা তা তাঁর কার্যক্রম সম্পন্ন করার গতি-প্রকৃতি অবলোকন করলেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ [সা] যখন এলেন তখন আরবের সমাজ ছিলো মারামারি, হানাহানি ও সীমাহীন বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। মানুষে-মানুষে, বংশ ও গোত্রে দ্বন্দ্ব-বিবাদ লেগেই থাকতো। সমাজের মানুষ চুরি, ডাকাতি ও ধোঁকাবাজি-প্রতারণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলো। মদ ও জুয়া অধিকাংশ মানুষের নেশায় পরিণত হয়েছিলো। মহানবী [সা] মানুষের মধ্যকার সকল ভেদাভেদ ও হানাহানি দূর করে সমাজে শান্তি ও স্থিতি স্থাপন করলেন। তিনি সমাজ থেকে সকল অসঙ্গতি ও অকল্যাণের বিষদাঁত তুলে ফেলে মানুষে মানুষে ভালবাসা ও সম্প্রীতির এক সুন্দর সমাজ কায়েম করলেন। প্রথমেই তিনি মানুষকে আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপন করার তাকিদ দিলেন। কেননা, মানুষ কেবল তখনই সব অন্যায়-অবিচার ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে যখন সে বুঝতে পারে

www.pathagar.com

তার কাজের জন্য তাকে আখেরাতে পাকড়াও করা হতে পারে। মহানবী [সা] বললেন, 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন'। [সূরা কাহাফ-৫] মানুষ যাতে হানাহানি ও বিভেদ ভুলে একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে তার জন্য তিনি মানুষের মর্যাদাকে তুলে ধরলেন। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমরা একে অপরের ভাই, একজনের নিকট অন্যের জান ও মাল আমানতস্বরূপ।' সমাজের মানুষের মধ্যে বংশ, গোত্র ও কৌলিন্য বিভেদকে বাতিল করার জন্য তিনি আরো ঘোষণা করলেন 'অনারবগণের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' ফলে তাঁর হাতে গড়া সভ্যতায় এমন এক মদিনা রাষ্ট্র জন্ম নিলো যার জনগণ সীমাহীন শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এমন একটি কল্যাণ রাষ্ট্র আজ অবধি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

তখনকার আরবে মানুষের মধ্যে সততা ও ন্যায়নীতির নামমাত্র ছিলো না। ফলে একে অপরের সম্পদ লুটে নিতো, মানুষ মানুষের ওপর যুলুম চালাতো এবং শক্তিশালীদের কাছে দুর্বলরা ছিলো চরম অসহায়। তাই একটি সভ্য সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে সত্যবাদিতা ও ন্যায়নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলো না। মহানবী [সা] মানুষকে সত্যের পথে আনয়নের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন, 'যারা ঈমান এনেছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।' [সূরা তওবা-১১৯] তিনি আরো বললেন, 'তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কেননা, মিথ্যাচার অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে এবং অন্যায় দোযখের পথে ধাবিত করে।' সুবিচার ও ন্যায়নীতি বিসর্জিত আরবের সমাজকে দেখে মহানবী [সা] বুঝতে পারলেন মানুষকে এর অভিশাপ থেকে বাঁচাতে হবে। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে ন্যায়নীতি বর্জন করতে। ন্যায়বিচার করবে। ন্যায়বিচার করাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।' [সূরা মায়িদা-৮] মহানবীর [সা] নিরলস প্রচেষ্টায় বিরাট সংখ্যক মানুষ সেদিন অবিচার, অসত্য ও ন্যায়হীনতা ছেড়ে সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে এলো। তারই সুফল ও প্রভাব পরিলক্ষিত হলো আরব সমাজে।

অন্ধকারময় আরবে মানবতা ছিলো বন্দী। সমাজে মানবাধিকারের নাম-গন্ধও ছিলো না। এই অবস্থা থেকে মানবতাকে বাঁচাতে মহানবী [সা] সমাজের সকল পর্যায়ে মানবাধিকারের এমন এক নমুনা পেশ করলেন যা আজও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের কাছে অনন্য হিসেবে স্বীকৃত। তিনি শ্রেণী ও বংশগত বৈষম্যের অবসান ঘটালেন। তাঁর প্রচেষ্টায় দাস প্রথা উচ্ছেদ হলো। চাকর-বাকর ও দাসরা এতদিন যে নীচ বলে পরিগণিত হতো তাদের সঠিক মানবিক মর্যাদা মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি আল্লাহর বাণী মানুষকে শুনিয়ে বললেন, 'আর সদ্ব্যবহার করো অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।' [সূরা আন নিসা-৩৬] মহানবী [সা] এসব নিরীহ মানুষের ওপর থেকে

www.pathagar.com

যুলুমের অবসান ঘটানোর জন্য ঘোষণা করলেন, 'যে চাকর-বাকরদের বা দাস-দাসীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সে বেহেশতে যেতে পারবে না।' তিনি আরো বললেন, 'যে চাকরদের প্রতি তুমি খুশি তাদের তাই খেতে দেবে, যা তুমি খাও।' মহানবী [সা] ৬২৪ সালে দুনিয়ার মানুষের জন্য যে অভূতপূর্ব সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রতিষ্ঠা করলেন তা এখনও মানবাধিকারের ইতিহাসে অসাধারণ ইশতেহার হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এতে ৫১টি ধারা সন্নিবেশিত ছিলো।

জাহিলিয়াতে ভরা আরব সমাজে তথা তখনকার বিশ্বে নারী জাতি ছিলো সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত। তারা সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো। তাদের না ছিলো সামাজিক মর্যাদা, না ছিলো কোন নিরাপত্তা। মহানবী [সা] এমন এক সমাজ কায়েম করলেন যেখানে নারী জাতির ওপর থেকে সকল বৈষম্য দূরীভূত হলো। নারীদের তিনি প্রকৃত মানবিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তখন নারীরা ছিলো চরমভাবে অবহেলিত। তাদেরকে ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই মনে করা হতো না। চরমভাবে অবহেলিত নারীদের উন্নতির জন্য মহানবী [সা] ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি দিলেন। নারী জাতির মুক্তির এই অধিকার এর আগে এবং পর আর কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আজকের আলো জ্বলমল সভ্যতায় নারীদের অধিকারের ব্যাপারে অনেক হৈ চৈ করা হলেও নারীরা ইসলামের দেয়া সার্বজনীন অধিকার এখনও ফিরে পায়নি, যা রাসূল [সা] নিজে কায়েম করে বিশ্বের সেরা মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। মহানবী [সা] বললেন, 'আর তোমরা যে মোহরানা স্ত্রীদের দিয়েছো, তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য মোটেও হালাল নয়। তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে জীবন যাপন করো।' [সূরা আন নিসা, ১৯] সে সময় মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়ার যে চরম অমানবিক ও পশু প্রবৃত্তি বিরাজমান ছিলো তাকে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহর নবী [সা] নারী জাতির মহামুক্তির পথ পরিষ্কার করে গেছেন।

মহানবী [সা] নতুন সভ্যতার যে ভিত্তি রচনা করলেন তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন এক ন্যায়ভিত্তিক ও সুষম বণ্টনের অর্থনৈতিক বিধান। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজ থেকে দূরীভূত হলো দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সব ধরনের যুলুম ও শোষণ। সুদের অভিশাপ ও মহাজনী কারবারের যুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তখন সুদি কারবারকে নির্মূল করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিলো না। তাই সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করা হলো। কুরআনের বাণী উল্লেখ করে রাসূল [সা] বললেন, 'আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে করেছেন বৈধ, আর সুদকে করেছেন হারাম।' এ বাণী প্রচারিত হবার সাথে সাথে মানুষ সুদি কারবার পরিহার করে তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এলো, দূরীভূত হলো সুদের মহামারি এবং প্রতিষ্ঠিত হলো সুষ্ঠু অর্থনীতি।

আজ এ কথা প্রমাণিত যে, সভ্যতার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। যে জাতি যতটা

www.pathagar.com

শিক্ষিত সে জাতিই ততটা উন্নত। সভ্যতার বিকাশের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অথচ এই শিক্ষা বিস্তারের প্রথম উৎসাহের বাণী আমরা শুনলাম মহানবীর [সা] কাছে। আরবের সমাজ তথা গোটা বিশ্ব যখন জ্ঞানের আলো থেকে একেবারে বঞ্চিত তখন নবী [সা] আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানের যে বাণী শুনালেন তা হলো– 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ করো আর তোমার প্রতিপালকের মহিমা যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।' –সূরা আলাক। আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ওহির এই শিক্ষা মানুষকে জানানোর সাথে সাথে মহানবী [সা] আরো ঘোষণা করলেন– 'বিদ্যা অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।' তিনি আরো বললেন, 'জন্ম থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।' এর ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়লো। মহানবীর [সা] ওফাতের পরও কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত এ জ্ঞানের আলোয় মুসলমানরা দুনিয়াকে উদ্ভাসিত রেখেছিলো। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশের সূচনা যে ইসলামী শিক্ষা ও মুসলিম মনীষীদের হাতে হয়েছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজকের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসের বিস্তাররোধ করতে গিয়ে দিশেহারা। সন্ত্রাস নির্মূলে অহর্নিশ চলছে এক মহাযুদ্ধ। অথচ এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামই নির্মূল করে দিয়েছিলো। মহানবী [সা] ইসলামের যে বাণী প্রচার করলেন তাতে হানাহানি ও সন্ত্রাসকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এ জন্য পবিত্র কুরআনে পাকে বলা হলো, 'ফিতনা বা সন্ত্রাস হত্যার চেয়েও গুরুতর।' [সূরা বাকারা-১৯১]

এভাবে জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী [সা] কায়েম করে গেলেন এমনসব নীতি, আদর্শ ও ব্যবস্থা যা গোটা মানব জাতিকে মর্যাদা, স্থিতি ও উন্নতির এক ঐতিহাসিক সোপানে নিয়ে দাঁড় করাতে সক্ষম হলো। মানবতা ফিরে পেলো নতুন গতি, পেলো নতুন চলার দিশা। আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মহানবী [সা] প্রচারিত অজেয় দীন ইসলাম সত্যিকার অর্থে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। মহানবী [সা] এমন এক ধর্ম মানুষের কাছে প্রচার করলেন এবং নিজেই তা প্রতিষ্ঠা করে দেখালেন যার ফলে সমাজ জীবনে নেমে এলো সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার অমিয় ফল্গুধারা। মহানবীর [সা] এই ঐতিহাসিক সংস্কারের জন্যই বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক Raimond চমৎকারভাবে বলেছেন, The founder of Islam is in fact, the promoter of the first social and international revolution of which history gives mention' আর তাই Encyclopedia Britannica মহানবীকে [সা] দুনিয়ার সবচেয়ে সফল ব্যক্তি বা সংস্কারক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। Britannica-তে বলা হয়েছে- 'Of all the religious personalities of the world Mohammad was the most successful'. পাশ্চাত্য লেখক Maikel Hart যথার্থই বলেছেন-He was the

www.pathagar.com

only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels. অর্থাৎ ইতিহাসে তিনিই মহানবী [সা] একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাঙ্গীন মহাসাফল্য লাভ করেছেন।

আজকের সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবে অস্থির। মানবাধিকারের বাণী এখন কেঁদে মরছে। দুর্বলরা সবলদের আগ্রাসনে পিষ্ট হচ্ছে। শক্তিশালী দেশ কম শক্তির দেশগুলোকে দখল করে নিচ্ছে। নারী মুক্তির নামে নারী জাতিকে বেলাল্লাপনা ও নোংরামির শেষ সীমায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে বাড়ছে বিরোধ, রক্তারক্তি। সন্ত্রাস মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। বাসযোগ্য দুনিয়া এখন অসভ্যতা ও অন্যায়-অবিচারের প্রচণ্ডতায় পশু সভ্যতার দিকে মোড় নিয়েছে। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, শুভকামনা ও শুভাশিস পালিয়ে বেড়াচ্ছে। চরম রাজনৈতিক পীড়নে মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও সুদি কারবারের ব্যাপকতা মানুষের হাড়-মজ্জা পর্যন্ত খেয়ে ফেলার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। এমন অবস্থায় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] প্রবর্তিত জীবন বিধানের প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে একটি সুন্দর ও শান্তিময় পরিবেশ। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তাই অনেকে আশা করছেন, আগামী শতক হয়তো বা মহানবী [সা] প্রবর্তিত সেই অনন্য সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। অবস্থা দেখে অন্তত এটাই আমরা আশা করতে পারি।■

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবীর [সা] আদর্শ

নাসির হেলাল

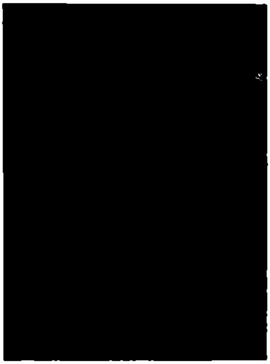

'তোমরা তো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে ছিলে, তিনি [রাসূল সা] তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।' [আলে ইমরান : ১০৩] অন্যত্র আল্লাহ বলছেন– 'হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বের শান্তি, কল্যাণ ও পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক হিসেবে।' [সূরা-আম্বিয়া]। রাসূল [সা] নিজেই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই, আমি আল্লাহ প্রদত্ত রহমত ও পথ প্রদর্শক।' [আল-হাকেম থেকে বর্ণিত]

উপরোক্ত উদ্বৃতি তিনটি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল মহানবীর [সা] আগমনের মূল উদ্দেশ্য। 'ইসলাম কখনোই সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ইসলামই সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে মানব সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া-মায়া এবং দরদ ভালবাসার শিক্ষা দেয়। সেই সাথে দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, যুলুম, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতাকে পদদলিত করে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বিশ্ব উপহার দেয়াই ইসলামের মূল শিক্ষা।' [সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম-নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত-পৃষ্ঠা-১০৭]

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির শাব্দিক অর্থ : আসুন আমরা আগে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি শব্দ দু'টির আভিধানিক অর্থ জানার চেষ্টা করি। সন্ত্রাস শব্দটি ত্রাস থেকে উদ্ভূত। ত্রাস হলো-ভয়, শঙ্কা, ভীতিকর। আর সন্ত্রাস হল- কোন উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি। অন্যদিকে দুর্নীতি শব্দটির অর্থ হলো-নীতি বিরুদ্ধ, কুনীতি, অসদাচরণ। অর্থাৎ যা কিছু অন্যায় ও বিবেকবর্জিত কাজ তার সব কিছুই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। সে অনুযায়ী সন্ত্রাস দুর্নীতিরই একটি রূপ। অবশ্য সন্ত্রাস আজ সর্বগ্রাসী, সর্বপ্লাবী।

সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- 'ইহরাব'। অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।

সন্ত্রাসের পারিভাষিক অর্থ : যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। অবশ্য সন্ত্রাসের সর্বসম্মত পারিভাষিক অর্থ এখনও নির্ণীত হয়নি। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়- 'সন্ত্রাস হলো ব্যক্তি বা সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষ্যেই তা হোক না কেন, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা প্রাইভেট বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোন রাষ্ট্রীয় উৎস ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়।' [সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, পৃ : ১৩৮]

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মূল উৎস

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মূল উৎস বিভিন্ন হতে পারে। তবে মৌলিক উৎসগুলো হলো-

১. নৈতিকতার অবক্ষয়, ২. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, ৩. দারিদ্র্য, ৪. বেকারত্ব, ৫. আল্লাহ ভীতির অভাব, ৬. প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি, ৭. অধিক লোভ এবং ৮. কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকা।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির শ্রেণী বিভাগ

সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়-

১. জীবনের নিরাপত্তা হরণ করা, ২. ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও ৩. সম্পদ আত্মসাৎ করা।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ইতিহাস :

মানুষ সৃষ্টির আগে এ পৃথিবীতে বসবাস করত জিন জাতি। তারা সীমাহীন অশান্তি, সংঘাত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন কঠোর হস্তে দমন করে পৃথিবীর দৃশ্যপট থেকেই তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছেন। আর

www.pathagar.com

সেখানেই পাঠিয়েছেন তার আদরের সৃষ্টি মানুষকে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির প্রথমেই ফেরেশতারা আশংকা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'হে আমাদের রব, আপনি পৃথিবীতে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তারক্তি করবে।' এর উত্তরে মহান রাব্বুল আলামীন বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'

'মানব সৃষ্টির পরপরই সংঘাত শুরু হয় শয়তানের সাথে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী ফরমান জারি করলেন, এই শয়তানই হবে তোমাদের চিরশত্রু। আর জেনে রেখো তোমাদের পথ দু'টি, একটি হল 'সিরাতাল মুস্তাকীম' এবং অপরটি হলো 'সাবিলি তাগুত' বা শয়তানের পথ।' মূলত এ দু'টি পথ ধরেই পৃথিবীতে সংঘাতের সৃষ্টি। যুগে যুগে শয়তান প্রদর্শিত পথের অনুসারীরা পৃথিবীতে সংঘাত সৃষ্টি করেছে।' [সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, পৃঃ ১৫৫] বেহেশতে অবস্থানকালে আদম [আ] ও হাওয়া [আ] আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে লোভের বশবর্তী হয়ে গন্ধম ফল ভক্ষণ করেন অর্থাৎ শয়তানের প্রলোভনের অনুসরণ করেন। ফল স্বরূপ তাদেরকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। আদম সন্তানের হাতে পৃথিবীতে প্রথম বিপর্যয় ঘটে কাবিল কর্তৃক সহোদর ভাই হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে। মর্তের দুনিয়ায় সেই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি শুরু হয়েছিল আজ তা নানা পত্র-পল্লব বিস্তার করে দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে।

আমরা জানি দ্বিতীয় আদম নামে খ্যাত হযরত নূহের [আ] পুত্র কেনান পিতার আদেশ অমান্য করে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছিল। হযরত ইব্রাহীম [আ] ও হযরত মূসা [আ] এর যুগে নমরূদ ও ফিরাউন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা দেশবাসীকে জিম্মি করে খোদায়ী দাবি পর্যন্ত করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী আদম [আ] থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ [সা] পর্যন্ত নানাভাবে, নানা অবয়বে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি চলে এসেছে এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

এবার আমরা রাসূলের [সা] আগমনের পূর্বেকার এবং সমসাময়িক সময়ের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির চিত্রটা কি ছিল তা একটু খতিয়ে দেখব।

প্রাক-ইসলামী যুগ

প্রাক-ইসলামী যুগে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে সারা পৃথিবী বিশেষ করে আরব বিশ্ব আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। মজলুমের ওপর জালিমের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি তারা লোক লজ্জার ভয়ে আপন কন্যা সন্তানকে পর্যন্ত জীবিত কবর দিত। মক্কার শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন শাখা গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় কোন শাসন না থাকায় গোত্রে গোত্রে লড়াই, মারামারি, হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। ফলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অবাধে চলছিল। ধন-সম্পত্তি ছাড়াও অনেক সময় স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত দুর্দান্ত দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হতো। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না' [সূরা বাকারা : আয়াত ১২]

www.pathagar.com

আধিপত্য বিস্তারের বাসনা

এক গোত্র অপর গোত্রের ওপর নিজেদের কায়েমি শক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতে তারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা সামান্য কারণে এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর চড়াও হতো। রক্তের বদলা নিতে কখনও বংশ পরম্পরায় এ যুদ্ধ চলতো। বংশের গৌরব বাড়িয়ে বলতে গিয়ে শুরু হয় 'হরবে ফোজ্জার' বা অন্যায় সমর। যা একাধিক্রমে পাঁচ বছর চলে। ইরশাদ হচ্ছে- 'যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ [সন্ত্রাস] বা অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' [সূরা বাকারা : আয়াত ২৭]

বেদুঈনদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

প্রাক-ইসলামী যুগে মরুচারী বেদুঈনরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা ভূমি কর্ষণকে মর্যাদাহানিকর কাজ বলে মনে করতো। ফলে হত্যা, লুটতরাজ, সন্ত্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বসাধারণের সর্বস্ব লুট করে জীবিকা নির্বাহ করত। কুরআন পাকে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্য ক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।' [সূরা বাকারা : আয়াত ২০৫]

প্রতিমা পূজার ব্যাপক বিস্তার

রাসূলের [সা] আগমনের সময়টা সত্যিই জাহিলিয়াতে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষ এক আল্লাহকে ভুলে বহু দেব-দেবীর অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কুরাইশ বংশের লোকজন আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও সাথে সাথে দেব-দেবীতেও প্রচণ্ড বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহর ঘর কাবাতে প্রতিষ্ঠা করেছিল ৩৬০টি মূর্তি। ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা আল্লাহর একক শক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। যে কারণে তারা নানা অন্যায়-পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাসূলের [সা] পদক্ষেপ

'হরবে ফোজ্জার' বা অন্যায় সমর-এ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বনু হাশিম গোত্র জড়িয়ে পড়ে। চাচাকে সহযোগিতা করার জন্য শেষ দিকে মুহাম্মাদও [সা] এ যুদ্ধে যোগদান করেন। তবে তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেননি। শুধু মাত্র তার কুড়িয়ে দিতেন। এ সময় রাসূল [সা] দেখেছিলেন সামান্য কারণে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নির্বিচারে কিভাবে একে অপরের গলা কাটতে পারে, কিভাবে লাশ মাড়িয়ে আরও লাশ ফেলার প্রতিযোগিতায় মানবতার মৃত্যু হয়। কিভাবে নিরপরাধ বনি আদমের পবিত্র রক্তে মরুভূমির বালু লালে লাল হয়। এ সমস্ত দেখে মানবতার মুক্তিদূত, উম্মতের কাণ্ডারি তরুণ নবীর হৃদয় হু হু করে কেঁদে উঠলো, তিনি আঁতকে উঠলেন মানবতার এ চরম অপমান দেখে।

www.pathagar.com

হিলফুল ফুজুল নামক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মাদের [সা] দিলটা ছিলো ফুলের মত নরম। কোন অন্যায় কোন নির্মমতা সেখানে কখনো ঠাঁই পায়নি। পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন দর্শকমাত্র। নিজের চোখেই তিনি দেখেছেন অসংখ্য মাথা গড়িয়ে পড়তে। যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে তাঁর দিল কেঁদে উঠলো। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? কিভাবে সমাজে আবার শান্তি স্থাপন করা যায়? কোন মানুষের সমাজ যে এভাবে চলতে পারে না, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন এ কথা ভেবে যে স্বগোত্রের বা দলের লোক যত অন্যায়-ই করুক না কেন তাকে গোত্রীয়ভাবে বা দলগতভাবে সমর্থন দেয়া হয়। তিনি মজলুম মানুষকে আর্তপীড়িত অসহায় মানুষকে কিভাবে সহায়তা দেয়া যায় তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। এক পর্যায়ে পিতৃব্য জুবায়েরকে ডেকে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। এরপর সমমনা কয়েকজন তরুণ মিলে আবদুল্লাহ বিন জুদানের গৃহে একটি বৈঠক ডাকলেন। এ বৈঠকে কুরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখার অনেকেই উপস্থিত হলেন। সর্বসম্মতিক্রমে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সেবা সংঘ গঠিত হলো। আরবি ভাষায় 'হিলফ' অর্থ প্রতিজ্ঞা এবং 'ফুজুল' অর্থ অত্যাচারীর নিকট অত্যাচারিতের প্রাপ্য অধিকারকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ আল্লাহর নামে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা করলেন :

১. আমরা নি:স্ব অসহায় ও দুর্গতদেরকে সেবা করবো।

২. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেবো।

৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করবো।

৪. দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করবো।

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবো।

সত্যিই সেই জাহিলিয়াতের যুগে এ ধরনের সেবা সংঘ গঠন ও এ ধরনের প্রতিজ্ঞা অকল্পনীয়। এই সংগঠনটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে প্রথম প্রয়াস বলে অভিহিত। এ সময়েই তরুণ নবী শান্তির পতাকাবাহী হিসেবে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত হন।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

কাবাঘর পুন:সংস্কারের সময় হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ পাথর যা মহা সম্মানিত পাথর হিসেবে খ্যাত তার প্রতিস্থাপন নিয়ে মক্কায় রক্তক্ষয়ী বিবাদের উপক্রম হয়-যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা। ঠিক এ সময় তৎকালীন কুরাইশদের প্রবীণতম ব্যক্তি আবু উমাইয়া সবাইকে শান্ত করে বললেন, 'আমি প্রস্তাব করছি আগামীদিনে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই পবিত্র মসজিদে 'বাবু বনী শায়বা'; [বর্তমানে এটি বাবুস সালাম' নামে পরিচিত] নামক ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে, এই ঝগড়া মীমাংসার ভার তার ওপর ন্যস্ত করা হোক। সে

www.pathagar.com

যে মীমাংসা করবে তাই সকলে মেনে নেবে।' সকলেই আবু উমাইয়ার এই প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলো। ঘটনাক্রমে পরদিন ঐ ফটক দিয়ে সর্বপ্রথম রাসূল [সা] প্রবেশ করেন এবং তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির অর্থাৎ 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপনের কাজ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করেন। ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবে অবিসংবাদিত শান্তিবাদী ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পান। অপরদিকে মক্কার কুরাইশগণ ভয়াবহ সংঘর্ষ ও রক্তপাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে।

ঐতিহাসিক মদিনা সনদ

মুসলমান ছাড়াও মদিনায় অন্য যে দু'টি সম্প্রদায় ছিল তারা হলো ইয়াহূদি ও পৌত্তলিক। অবশ্য আরও একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এরা হলো– মুনাফিক। মূলত মুনাফিকরা ছিল বক ধার্মিক বা কপট বিশ্বাসী। এরা প্রকাশ্যে মুসলমান হিসেবেই পরিচিত ছিল বা পরিচয় দিতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল পুতুল পূজারী। মুসলমান সেজে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়াই ছিল এদের কাজ। মুনাফিকদের নেতা ছিল খাজরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ্ বিন ওবাই বিন সলুল। আসলে উচ্চাভিলাষী আবদুল্লাহর আকাঙ্খা ছিল মদিনার নেতৃত্ব লাভের, কিন্তু রাসূলের [সা] মদিনায় আগমনের ফলে তার সে আশায় ছাই পড়ে। ফলে তার সব রাগ গিয়ে পড়ে রাসূলের [সা] ওপর। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, মক্কার কুরাইশ কাফেররা সরাসরি ইসলাম, মুসলমান এবং রাসূলের [সা] বিরোধিতা করতো তাদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে। অন্যদিকে তাদের এ অহংবোধ এ ক্ষেত্রে দায়ী। তবে যা প্রণিধানযোগ্য তা হলো তাদের বিরোধিতা ছিল বীরোচিত, তারা কোন রাখ-ঢাক না রেখেই বিরোধিতা করতো। কিন্তু অপরদিকে মদিনায় ইয়াহূদি, পৌত্তলিক ও মুনাফিকদের বিরোধিতা ছিল গোপনে। ষড়যন্ত্রমূলক এসব কিছু বিবেচনা করেই রাসূল [সা] সবাইকে নিয়ে শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বিশ্বপ্রেমিক, সর্বমানবতার বন্ধু, শান্তির দূত, রাহমাতুল্লিল আলামীন সকল সম্প্রদায়ের লোকদের ডেকে পরামর্শ সভায় বসলেন। কিভাবে সকলে মিলে-মিশে বসবাস করা যায়- সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। অন্যদের খোলামেলা সব কথা শুনলেন। তারপর সবাই মিলে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। যে চুক্তিটি মানব কল্যাণে মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত চুক্তি বা সনদ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই মদিনা সনদ হিসেবে পরিচিত।

এ চুক্তির প্রধান প্রধান ধারাগুলো হচ্ছে–

১. মদিনার ইয়াহূদি, পৌত্তলিক, খ্রিস্টান ও মুসলমান সকলে একই জনগোষ্ঠী বলে গণ্য হবে এবং তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠী হতে স্বতন্ত্র থাকবে। তারা সকলেই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

www.pathagar.com

২. হযরত মুহাম্মাদ [সা] হবেন নবগঠিত সাধারণ তন্ত্রের প্রধান এবং পদাধিকার বলে প্রধান বিচারপতি।

৩. সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সকলে বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে এবং কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৪. মদিনা নগরী পবিত্র বলে গণ্য হবে। এখানে রক্তপাত, হত্যা, ধর্ষণসহ অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকবে।

৫. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ মদিনা শহরের মর্যাদা রক্ষা করবে। মদিনা শহর আক্রান্ত হলে তারা সকলেই একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে।

৬. মদিনার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন ষড়যন্ত্রে কোন সম্প্রদায় বহি:শত্রুর সঙ্গে লিপ্ত হতে পারবে না।

৭. কেউ কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার সন্ধিস্থাপন বা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবে না।

৮. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৯. আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি কোন প্রকার নাশকতামূলক বা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে লিপ্ত না হলে আপনজন বলে বিবেচিত হবে।

১০. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হবে।

১১. অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি হবে, কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও।

১২. তারা পরস্পরের মধ্যে নাশকতামূলক বা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোন কাজে লিপ্ত হতে পারবে না।

১৩. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে তা মীমাংসার জন্য হযরত মুহাম্মাদের [সা] নিকট উপস্থিত হতে হবে; তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মীমাং-সা করবেন।

'এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা লিপিবদ্ধ ছিল। এই সনদ সম্পাদিত হয়েছিল মুসলিম-অমুসলিম সকলকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক কলহের অবসান ঘটানোর জন্য। মদিনা সনদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকতার সূচনা হয়। কারণ মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সৌহার্দ্র্যের ভিত্তিতে।' [সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, পৃঃ ৮৯-৯০]

হুদাইবিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূল [সা] প্রায় দেড় হাজার নারী-পুরুষ সাথে নিয়ে হজ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন। কিন্তু মক্কার কুরাইশদের কাছে খবর পৌঁছায় মুহাম্মাদ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। ফলে তারা সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মুসলিম

www.pathagar.com

বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর শুনে রাসূল [সা] বললেন, 'আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি হজ করতে, আমরা হজ করেই ফিরে যাব। তা ছাড়া এখন চলছে পবিত্র মাস, এ সময় তো কেউ যুদ্ধ করে না। আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই।'

কিন্তু তবু মুসলমানরা সে বছর হজ করতে পারলেন না। অনেক দেন দরবারের পর দু'পক্ষের মাঝে সন্ধি হলো- হুদাইবিয়া নামক কূপের পাশে এ সন্ধি সম্পন্ন হয় বলে একে হুদাইবিয়ার সন্ধি বল হয়। বাহ্যত এ সন্ধি মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল। যেমন–শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. মুসলমানগণ এবারকার মত হজ না করে মদিনায় ফিরে যাবে।

২. আগামী বছর তারা হজ পালন করতে পারবে, সে সময় কুরাইশগণ মক্কা ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করবে।

৩. আত্মরক্ষার উপকরণ তলোয়ার ছাড়া মুসলমানগণ অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবেন না। তলোয়ার খাপবদ্ধ থাকবে।

৪. মক্কায় অবস্থানরত কোন মুসলমানকে মদিনায় নেয়া যাবে না।

৫. কোন মুসলমান যদি মদিনা থেকে কুরাইশদের মাঝে ফিরে আসে তো কুরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না। কিন্তু মক্কার যে কেউ মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

৬. আরবের যে কোন গোত্র বা সম্প্রদায় মুহাম্মাদের [সা] সাথে অথবা কুরাইশদের সাথে স্বাধীনভাবে সন্ধি করতে পারবে।

৭. আগামী দশ বছরের জন্য কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

সন্ধির শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে মনে করে হযরত আবু বকর [রা] ছাড়া উপস্থিত সকল সাহাবা ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু দয়ার সাগর, মানবতার বন্ধু সার্বিক শান্তি, কল্যাণ ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা মাথায় রেখে এ সন্ধিতে রাজি হলেন। প্রকৃতপক্ষে সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশগণ এই প্রথম লিখিতভাবে মুসলমানদেরকে প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিলো।

কুরআন শরীফেও এ সন্ধিকে মহাবিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– 'হে মুহাম্মাদ [সা] আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম' [আল-ফাতহ : আয়াত ১]

মক্কা বিজয়

১০ রমযান রাসূল [সা] দশ হাজার মুসলিম বীরসহ মক্কার উদ্দেশে রওনা হলেন এবং বিনা বাধায় তাঁরা বীরদর্পে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু কী বিস্ময়কর ব্যাপার। কুরাইশদের ওপর তিনি কোন প্রতিশোধ নিলেন না বরং উচ্চ কণ্ঠে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

www.pathagar.com

করলেন। রাসূল [সা] ঘোষণা দিলেন– 'হে মক্কাবাসীগণ! শোন ! আমি প্রতিশোধ নিতে আসিনি। তোমাদের দুশমন হিসেবেও আসিনি। আর যুদ্ধ নয়। প্রতিশোধও নয়। আমি তোমাদের সাথে সেই রকম ব্যবহার করতে চাই, যে রকম ব্যবহার হযরত ইউসুফ [আ] মিসরে তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। তোমাদের প্রতি আমার কোন ক্ষোভ ও রাগ নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। যাও তোমরা সকলেই মুক্ত।'

জানের শত্রুকে, মুসলমানদের শত্রুকে, ইসলামের শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বাগে পেয়েও মাফ করে ছিলেন। এই তো মহানবীর [সা] আদর্শ।

বিদায় হজ্জ

লক্ষাধিক সাহাবীকে সামনে রেখে রাসূল [সা] বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন–

হে লোক সকল! আজকের দিনটি যেমন পবিত্র এই মাস এই শহর যেমন পবিত্র তোমাদের প্রতিপালকের কাছে না পৌছানো পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের জানমালও তেমনি পবিত্র জানবে। তোমরা জেনে নাও আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের সব রকম কুপ্রথা আজ আমার পায়ের নিচে পুঁতে ফেলা হলো। তোমাদের সকল রক্তপণ আজ থেকে মওকুফ করা হলো। অন্ধকার যুগের সুদ গ্রহণের নিয়মও রহিত করা হলো। আজ থেকে একজনের অপরাধের জন্য অন্যজনকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। এখন থেকে সব মুসলমান ভাই ভাই। আল্লাহর চোখে সবাই সমান। নারী জাতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার ঠিক তেমনি পুরুষের ওপর নারীরও অধিকার রয়েছে।

সাবধান! ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। অতীতে অনেক সমৃদ্ধ জাতি এই বাড়াবাড়ির কারণে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

হে মুসলমানগণ! কখনো নেতার আদেশ অমান্য করবে না। যদি কোন নাক কাটা কাফ্রি ক্রীতদাসও তোমাদের নেতা হয়, সে যদি আল্লাহর বিধানানুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তা নত মস্তকে মেনে চলবে। দাসদাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কোনরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাও তাই তাদেরকে খাওয়াবে, যা পরো তাই তাদেরকে পরতে দিবে। মনে রেখ তারাও তোমাদের মতই মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে। শিরক করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সব ধরনের পাপ কালিমা থেকে মুক্ত থাকবে এবং পবিত্র জীবন যাপন করবে। সত্যকেই পরম আশ্রয় জানবে।

হে মুসলমানগণ!

সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং যাবতীয় কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে।

www.pathagar.com

বংশ মর্যাদা নিয়ে অহঙ্কার করবে না। অপর দিকে নিজের বংশকে ছোট মনে করবে না। যে ব্যক্তি নিজের বংশকে ছোট বা নীচ মনে করে তার ওপর আল্লাহর লানত।

হে উপস্থিতি!

আজ আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। তাহলে তোমরা সঠিক পথে থাকবে। আর তা হলো আল্লাহর কুরআন এবং আমার সুন্নাহ। এ কথা নিশ্চিতরূপে জানবে, আমার পর আর কোন নবী আসবে না। আমি সর্বশেষ নবী। 'ইলম' উঠে যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে শিখে নাও।

সমবেত উম্মতগণ!

তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিত সকলের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও। হয়তো উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনুপস্থিত অনেকে এই বাণী মনে রাখবে ও উপকৃত হবে।

ভাষণ শেষে রাসূল [সা] আকাশের দিকে মুখ তুললেন। তার মুখমণ্ডল বেহেশতী নূরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহ! হে আমার রব! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পেরেছি ? আমি কি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পেরেছি? সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো- নিশ্চয়! নিশ্চয়! আবেগভরা কণ্ঠে রাসূল [সা] তখন বললেন, হে আমার রব; শুনে রাখ, সাক্ষী থাকো, এরা কি বলছে, এরা বলছে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

ঠিক এ সময় কুরআনের সূরা মায়েদার এ আয়াতটি নাযিল হলো−

'[হে মুহাম্মাদ] আজ আমি তোমার দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমার ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম' [সূরা মায়িদা-৩]

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবীর [সা] কর্মসূচি :

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে রাসূলের [সা] কর্মপদ্ধতি ছিল দু'টি।

১. সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অর্থাৎ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ না নেয়া− বরং তার মূল উৎসের প্রতিকার করা। যেমন- মদিনা সনদ প্রণয়ন, হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, বিদায় হজের ভাষণ প্রভৃতি যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। ক. মহানবী [সা] স্বয়ং হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ও

খ. কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে।

ক. মহানবীর [সা] স্বয়ং হস্তক্ষেপের মাধ্যমে : নবুওয়ত প্রাপ্তির আগেই রাসূল [সা] হিলফুল ফুজুল বা সেবা সংঘ গঠনের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এরপর বাহরাইন থেকে আগত 'উকল ও উরায়না' গোত্রের ঐ ৮ জন লোকের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। যারা ইসলাম কবুল করেছিল কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় সাদাকার উটের চারণভূমিতে পাঠানো হয়। পরে তারা উটের রাখাল রাসূলের [সা] আযাদকৃত দাস ইয়াসারকে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। সাথে সাথে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রাসূল [সা] লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলে। শাস্তিস্বরূপ হাত-পা কেটে ফেলে ও তাদের চোখ উপড়ে ফেলে মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর ফেলে রাখা হয়। এক পর্যায়ে তারা মৃত্যুবরণ করে। শাস্তির প্রচণ্ডতা এমন ছিল যে, তারা পানি পানি করে চিৎকার করছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। [বুখারী] এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়, 'যারা আল্লাহ– তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এই তাদের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।' [সূরা মায়িদা-৩৩]

অন্য আরেকটি ঘটনা হলো– ইহূদি গোত্র বনু নাযীর মহানবীকে [সা] সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে হত্যা করতে চেয়েছিল। ওহির মাধ্যমে রাসূল [সা] তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের খপ্পর থেকে বের হয়ে আসেন।

অত:পর সসৈন্যে গিয়ে বনু নাযীর গোত্রকে অবরোধ করেন। ৬ দিন অবরোধ করার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তাদের খেজুর গাছ কেটে ফেলার এবং বাগান জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এতে তারা বিচলিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি তাদেরকে বিশৃঙ্খল কাজ করা নিষেধ করতেন আর এখন আপনি নিজেই আমাদের খেজুর বাগানগুলো কেটে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। এটা কেমন কথা? [বুখারী]

এ সময় এ আয়াত নাযিল হলো– 'তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের ওপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; তা এই জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করেন।' [আল-হাশর : ৫]

শেষ পর্যন্ত বনু নাযির নিজেরাই দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে রাজি হয়। বিষয়টি এতটাই কঠোর ছিল যে, নিজেরাই নিজেদের গড়ে তোলা ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে বাধ্য হয়। উটের পিঠে করে যে সামান্য মালপত্র নেয়া সম্ভব সেটুকু নেয়ার শুধুমাত্র অনুমতি ছিল-বাকি সব ছেড়ে যেতে হয়।

খ. কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে

কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাসূল [সা] সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করেন। যেমন- চুরির শাস্তি হাত কাটা, হত্যার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড, যিনার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ডসহ নানা শাস্তির ব্যবস্থা। তিনি মদপান নিষিদ্ধ করেন, জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন, ধনীর শ্রেণী লোকেরা গরিবদের কাছ থেকে সুদ আদায় করতো- তিনি সমূলে এগুলো নির্মূল করেন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন, আইনের কর্তৃত্ব ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোন গোত্রের হাতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত করেন। যাতে আইন কারো ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহৃত হতে না পারে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সকল অপরাধ বিলুপ্ত করেন।

আসলে মহানবী [সা] ছিলেন কোমলে কঠিনে গড়া একজন মানুষ ও রাসূল। কোমল ও কঠিনের এমন সমন্বয় আল্লাহপাক আর কোন মানুষের মধ্যে দেননি। যে কারণে যখন যেখানে যে ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন তিনি সেখানে তা নিয়েছেন- আর এজন্যই খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর আদর্শ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

উপসংহার

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বর্তমান বিশ্বে শান্তি আনতে হলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হলে, খুন-ধর্ষণ, যুলুম-নিপীড়ন, সুদ-ঘুষ বন্ধ করতে হলে দরকার রাসূলের [সা] আদর্শ তথা তার আনীত জীবন ব্যবস্থার সার্বিক বাস্তবায়ন। আর এ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে যে সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি আসবে তার উদাহরণ খোলাফায়ে রাশেদীন। রাসূল [সা] যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তার প্রথম উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন হযরত আবু বকর [রা]। ইসলামের এই প্রথম খলিফার রাজত্বকালে এক বছর পার হয়ে গেলেও বিচারালয়ে কোন মামলা রুজু না হওয়ায় হযরত উমর [রা] আরজ করলেন, হে আমিরুল মুমিনীন, 'আমাদের বিচার বিভাগের তো কোন প্রয়োজন দেখছি না।' উত্তরে আবু বকর [রা] বললেন, রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে কোন অপরাধ সংঘটিত হয় না। তাই কোন মামলা বা অভিযোগও রুজু হয়নি।' এতেই কি প্রমাণিত হয় না- রাসূলের [সা] আদর্শই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট।■

www.pathagar.com

আলোকের সভাপতি

আইউব ওয়াজেদ

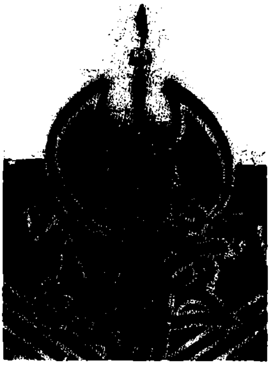

রাসূল মুহাম্মাদ [সা]! কি এক বিস্ময়কর এবং দ্যুতিময় আলোকের সভাপতি! সমগ্র পৃথিবী তো বটেই, গ্রহানুপুঞ্জ নক্ষত্ররাজি এবং নভোমণ্ডলও সেই আলোক ধারায় সমান উজ্জীবিত ও স্নাত।

রাসূলের [সা] মতো এমন সর্বগুণে গুণান্বিত এবং আলোকিত মহামানব তাঁর পূর্বে পৃথিবীতে আর কখনো আসেননি, অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের জন্যও আর কেউ আসবেন না। এটাই একমাত্র সত্য! এটাই একমাত্র আমাদের জন্য মহান রবের একান্ত মর্জি ও অনুগ্রহ।

মহান রাব্বুল আলামীন সর্বজ্ঞ সকল বিষয়ে তাঁর জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ এবং ত্রুটিমুক্ত। এ জন্য তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের কোনো জটিল বিষয়ের সমাধানের ক্ষমতা কেবলমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কারণ মানুষের পক্ষে সেসব জটিল সমস্যার সমাধান প্রদান করা সম্ভবপর নয়।

মানুষের দিক-নির্দেশনার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের মাধ্যমে প্রদান করেছেন হিদায়েতের সর্বোত্তম দিক-নির্দেশনাবাহী আসমানী কিতাব। তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের জীবনের একমাত্র অনুসরণযোগ্য

www.pathagar.com

হিসাবে সেই আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের আলোকে যাবতীয় সমাধান গ্রহণের। আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধান মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠার সুমহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানুষের ওপর। এই দায়িত্বের নাম খিলাফত। আর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব পালনের জন্যই আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

নবী মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তার ওপর নাযিল হয়েছে আল কুরআন। আর এই আল কুরআনের জীবন্ত রূপ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]। রাসূলুল্লাহর [সা] মাধ্যমেই রাব্বুল আলামীন পূর্ণতা দান করেছেন আল্লাহর দীন ইসলামকে। রাসূল [সা] তাঁর সমগ্র জীবন আল কুরআনের আলোকে আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূলের [সা] উম্মত হিসেবে আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে আল কুরআনের সমাজ বিনির্মাণের মহান দায়িত্ব। আমাদের দীন কায়েমের সর্বান্তকরণ প্রচেষ্টার একমাত্র গাইড বুক আল কুরআন এবং সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্।

শুধু ভাবাবেগ নয়, বরং ইস্পাত কঠিন ঈমান, প্রত্যয়, প্রজ্ঞা এবং সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে দাওয়াতে দীনের জন্য। ব্যক্তি চরিত্র ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ-নির্দেশিত ও রাসূল [সা] প্রদর্শিত সেই আল কুরআনের সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।

সমগ্র পৃথিবীটাই এখন উত্তপ্ত। কোথাও স্বস্তি এবং প্রশান্তি নেই। জবর দখল, হানাহানি, যুদ্ধ ক্ষয় এবং মানবতাহীনের সয়লাব বয়ে চলেছে। বস্তু, ব্যক্তি ও ক্ষমতাতান্ত্রিক স্বার্থ এখন মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে। এর একমাত্র কারণ মানুষ তার ওপর অর্পিত খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে দূরে সরে এসেছে। তারা ভুলে গেছে আল্লাহ, রাসূল এবং আল কুরআনের নির্দেশনার পথ। ভোগবাদী ও স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই আজ এই অধ:পতনের মূল কারণ।

সুতরাং আজ বড় বেশি প্রয়োজন আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। প্রয়োজন রাসূল [সা] নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা। সেই সাথে প্রয়োজন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। নিজেদের ভেতর স্বার্থ ও ক্ষমতার লিপ্সাকে ছুড়ে ফেলে একই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দাওয়াতে দীনের অভিন্ন প্রয়াসকে প্রাধান্য দেয়া। মূলত এটা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ।

ওফাতের পর রাসূলের [সা] তাঁর সাহাবীগণও [রা] আল কুরআনকে একমাত্র গাইড বুক হিসেবে তার আলোকেই তাঁদের সামগ্রিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। ফলে রাসূল [সা] নির্মিত সেই সোনার সমাজে কোনো প্রকার অসঙ্গতি ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চরিত্র-মাধুর্য যোগ্যতা, শিষ্টাচার, দক্ষতায়-সার্বিক দিকে রাসূলের [সা] হাতে গড়া সেই সকল সোনার মানুষ আল কুরআনের আলোকে এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, যা আজও সমগ্র বিশ্বে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

www.pathagar.com

ব্যক্তি গঠন ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাও করা যায় না। আল্লাহর রাসূল [সা] তাই সমাজ সংস্কারের পূর্বে ব্যক্তি গঠনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ব্যক্তি গঠন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে ক্রমোগ্রসর হয়েছিলেন। রাসূল [সা] প্রদর্শিত সেই আদর্শিক মডেলকে আমাদের সামনে রাখা জরুরি।

আজ বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সমগ্র বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থা যে ক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান, যে বিপন্ন মানবতা? এই দুর্গতি ও সমূহ পতন থেকে রক্ষা পেতে হলে অবশ্যই রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত কর্মকৌশল আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এটাই বর্তমান সময়ের দাবি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল কুরআন ও রাসূল [সা] প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার এবং কবুল করুন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সকল প্রয়াস।

দুই.

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] যখন জন্ম নিলেন, তখন শুধু মক্কা নয়, গোটা আরবের আকাশ ছিল আঁধারে নিমজ্জিত। তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনসহ জীবনের একটি বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়েছে এই দু:সহ পরিবেশে। কিন্তু রাব্বুল আলামীনের একমাত্র মঞ্জুরে নবী মুহাম্মাদ [সা] সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা এবং অনাচার থেকে নিজেকে সযতনে দূরত্বে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই জাহিলিয়াতের মধ্যেও তিনি নিজেকে এতটাই পরিচ্ছন্ন রেখেছিলেন যে, আপন পরিবার, গোত্র, সমাজ দূর-সুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিভা।

রাসূল [সা] নবুওয়তপ্রাপ্ত হলেন। ধারণ করলেন রাব্বুল আলামীনের বাণী। মহামহিম আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত করলেন রাসূলকে [সা]। বস্তুত বিশ্বজাহানের কল্যাণের জন্যই রাসূলকে [সা] প্রেরণ করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাত- উভয়ক্ষেত্রেই রাসূলের [সা] উম্মতদের মুক্তির একমাত্র পথ আল্লাহ এবং তাঁর হাবিবের বিশুদ্ধ অনুসরণ।

আজকের এই আধুনিকতার উৎকর্ষের মধ্যেও আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, আল্লাহর রাসূলের [সা] ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি যে বিপ্লবী কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই অনুসৃত দিকগুলো আজকের আধুনিকতার চেয়েও অত্যাধুনিক ছিল। সোনালি সুদিন উপহার দিয়েছিলেন তিনি। স্বল্প বলতে গেলে খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবীর বুকে এমন একটি কালজয়ী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত করলেন, এমন একটি বিশ্বায়নের রূপরেখা নির্মাণ করলেন যে সেই সময় পৃথিবীর অন্য আর কোথাও দ্বিতীয়টি তার নজির ছিল না। আজও নেই। রাসূল [সা] ছাড়া এমন আর কোনো দ্বিতীয় সফল রাষ্ট্রনায়কের নাম কারো জানা আছে বলে মনে হয় না, যিনি সার্বিক বিচারে সকল ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রে সমান সফলতার দাবি করতে পারেন।

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ এবং তাঁর মহান আদর্শ ও তত্ত্বাবধানে এমন একটি সাহাবী কাফেলা গড়ে উঠলো– যারা ঈমান, আমল, আখলাক এবং সার্বিক যোগ্যতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যে কারণে রাসূল-পরবর্তী সময়ের এই সত্যের মুজাহিদরা [রা] রাসূল নির্দেশিত আল কুরআনের সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। বাহুবলের চেয়েও তাঁদের ছিল আদর্শ ও সত্য ন্যায়ের তীব্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র। যার সম্মুখে অপরাপর কায়েমি শক্তিও মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

এ কথা ইতিহাস স্বীকৃত যে রাসূল প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র আজও পৃথিবীর বুকে মাইলফলক হয়ে আছে। তাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। হবেও না কখনো। রাসূলের [সা] যে মহান আদর্শিক বিপ্লবের কারণে তৎকালীন একটি বর্বর ও অসভ্য সমাজ সোনায় পরিণত হয়েছিল আজও যদি তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবেই আজকের দাবানলসম এই অশান্ত পৃথিবীর বুকে প্রশান্তির প্রবাহ বইয়ে দেয়া সম্ভব।

পৃথিবীকে আলোকময় ও অর্থবহ করে তোলার জন্য আজও প্রয়োজন রাসূলের [সা] অনুসরণ। প্রয়োজন আল কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার। আল্লাহ মনোনীত এবং রাসূল প্রতিষ্ঠিত সত্য, সুন্দর শাশ্বত দীনকে মানুষের সামনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুগোপযোগী করে তুলে ধরতে পারলে এবং মানুষের মন মগজ থেকে বস্তুতান্ত্রিক ও জাগতিক দুর্বার দূর করতে পারলে আজও সার্বিক সফলতা আসা সম্ভব এবং খুবই সম্ভব রাসূল-নির্দেশিত সেই আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

আজ এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনো সীমিত পরিসরে এবং নির্দিষ্ট কিছু দায় দায়িত্ব পালনের জন্য রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবকে [সা] প্রেরণ করেননি। রাসূলকে [সা] প্রেরণ করা হয়েছিল বিশ্বজাহানের যাবতীয় কল্যাণের জন্য। সুতরাং তাঁর কাজ ও কর্তব্যের পরিধিও ছিল ব্যাপক-বিশাল। সসীম জীবনে তিনি অসীম ভূমিকা রেখেছিলেন। রাসূলের [সা] উত্তরসূরি হিসেবে আমাদেরকে ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহকেই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহর [সা] কাঙ্ক্ষিত সেই আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ়। আল্লাহপাক আমাদেরকে কবুল করুন।

তিন.

কেমন ছিলেন রাসূল [সা]? রাসূল [সা] সকল সময় সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার হযরত আয়েশাকে [রা] জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহর [সা] বিছানা কেমন ছিল? তিনি বলেন, চামড়ার বিছানা ছিল, তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি। অনুরূপভাবে হযরত হাফসাকে [রা] জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহর [সা] বিছানা কেমন ছিল? তিনি বলেন, একখানা চট ছিল। আমি সেটিকে দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম এবং তার ওপর তিনি ঘুমাতেন। এক রাতে আমি বললাম, এ চটখানা যদি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দেই, তাহলে তা তাঁর জন্য আরেকটু আরামদায়ক

www.pathagar.com

হবে। তাই আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। সকাল বেলা তিনি বলেন, এ রাতে তুমি আমাকে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, আপনার বিছানাই। তবে সেটিকে আপনার জন্য কিছুটা নরম ও আরামদায়ক করার জন্য আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এটিকে পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। কারণ এর কোমলতা আমার রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

বিনয় এবং নম্রতাতেও রাসূল [সা] ছিলেন অনন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলতেন : তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালংঘন করো না, যেরূপ নাসারাগণ ঈসা ইবনে মরিয়ম [আ] এর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে। নি:সন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা। কাজেই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলো। রাসূলুল্লাহর [সা] চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন। বনু কুরাইযার [যুদ্ধের] দিন তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। তার লাগামের রশি ও গদি উভয়টিই ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরি। তিনি যবের রুটি ও পুরনো চর্বি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে তাও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। এক ইহূদির নিকট তাঁর একটি লৌহবর্ম বন্ধক ছিল। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সেটি ছাড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর হয়নি।

রাসূলুল্লাহ [সা] একটি পুরনো হাওদায় [বাহনের পিঠের গদি] বসে হজ করেছেন, তার ওপর একখানি চাদর বিছানো ছিল, যার মূল্য চার দিরহামও ছিল না। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! এ হজকে প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত ও খ্যাতিমুক্ত করে দাও"।

রাসূলের [সা] সাধারণ জীবন যাপন সম্পর্কিত একটি হাদিস আমাদেরকে সকল সময় অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আল হাসান ইবনে আলী [রা] বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালাকে [রা] রাসূলুল্লাহ [সা] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। বলাবাহুল্য, তিনি প্রায়ই নবীর দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি আমার নিকট তাঁর দেহাবয়ব সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। যাতে আমি তা স্মরণ রাখতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে পারি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] ব্যক্তি হিসেবেও মহান এবং মানুষের দৃষ্টিতেও মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিল।

হুসাইন [রা] বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ [সা] ঘরে ঘরে প্রবেশের বিবরণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি যখন তাঁর ঘরে আশ্রয় নিতেন, তখন তাঁর ঘরে অবস্থানকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন : এক ভাগ মহামহিম আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য, এক ভাগ তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য এবং এক ভাগ তাঁর নিজের জন্য। তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত অংশকে আবার তিনি নিজের ও জনগণের জন্য বিভক্ত করতেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাক্ষাৎ দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পৌছানোর ব্যবস্থা করতেন। কোন জিনিস তিনি তাদেরকে

১৮—

www.pathagar.com

না দিয়ে পুঞ্জীভূত করতেন না। উম্মাতের ক্ষেত্রে তাঁর একই নিয়ম ছিল যে, তিনি জ্ঞানী ও গুণীদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং নিজের সময়টুকু তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বণ্টন করতেন। তাদের কেউ একটি প্রয়োজন নিয়ে, কেউ দুটি প্রয়োজন নিয়ে, আবার কেউ অনেক প্রয়োজন নিয়ে হাজির হতেন। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করতেন যা তাদের ও এই উম্মাতের জন্য কল্যাণকর। তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি তাদের উপযোগী বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করতেন। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের কাছে এ বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়। এছাড়াও যারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আমার পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম, তোমরা যেন তাদের সেই প্রয়োজনগুলো আমার কাছে পৌঁছে দাও। যারা নিজেদের প্রয়োজন শাসকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, যা তাদের প্রয়োজনসমূহ তার কাছে পৌঁছে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের পদযুগল মজবুত ও স্থিতিশীল রাখবেন। তাঁর দরবারে এমন জরুরি বিষয়েরই আলোচনা হত। তিনি অপ্রয়োজনীয় আলোচনার সুযোগ দিতেন না। সাহাবীগণ তাঁর কাছে দীন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে আসতেন এবং তার স্বাদ গ্রহণ না করে বিচ্ছিন্ন হতেন না। এভাবে তারা হিদায়াত ও কল্যাণের দিশারি হয়ে [তাঁর দরবার থেকে] বেরিয়ে পড়তেন।

হুসাইন [রা] বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহর [সা] বাইরে অবস্থানকালের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি তখন কি করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ছাড়া মুখ খুলতেন না, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেন, বিতৃষ্ণাবোধক বা পীড়াদায়ক ব্যবহার করতেন না। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করতেন এবং তাকে তার গোত্রের প্রতিনিধি ও সর্দার নিযুক্ত করতেন। তিনি জনগণকে [আল্লাহর শাস্তি] সম্পর্কে সাবধান করতেন এবং নিজেও সাবধান থাকতেন, কিন্তু কারো সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন না। তিনি নিজ সাথীদের খবরটি রাখতেন এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তাদের কোন সমস্যা থাকলে তার সুষ্ঠু সমাধান করতেন, ভালো কাজের প্রশংসা করে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতেন এবং মন্দের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে তা প্রতিহত করতেন। তিনি সকলের বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতেন, তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল না। মানুষ যাতে দীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যায় বা কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ির দরুন বিরক্ত হয়ে না পড়ে সে সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। তাঁর দরবারে প্রতিটি কাজে একটা শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সত্য ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি কখনো শিথিলতাও প্রদর্শন করতেন না এবং সীমা অতিক্রমও করতেন না। শ্রেষ্ঠ লোকেরাই তাঁর দরবারে উপস্থিত হত। যার দ্বারা জনগণ উপকৃত হত তিনিই তাঁর বিবেচনায় সর্বোত্তম যে ব্যক্তি মানুষের দু:খ-কষ্টে সর্বাধিক ব্যথিত হত, তিনিই তাঁর কাছে সর্বোত্তম।

হুসাইন [রা] বলেন, এরপর আমি তার কাছে রাসূলুল্লাহর [সা] মজলিস বা বৈঠক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] উঠতে-বসতে আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি কোথাও কোন মজলিসে গেলে তার যে প্রান্তে খালি জায়গা পেতেন সেখানে

www.pathagar.com

বসতেন এবং অন্যদেরও সেইভাবে নির্দেশ দিতেন। সভাস্থ সকলের প্রতি তিনি তার প্রাপ্য দিতেন। ফলে তাদের প্রত্যেকই ভাবেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] কাছে অন্যদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। কেউ তাঁর কাছে কোন প্রয়োজনে এলে সে চলে যেতে উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতেন। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা দান করতেন, তা না থাকলে বিনয় প্রকাশ করে বিদায় দিতেন। তাঁর সদাহাসিমুখ, প্রশস্ত মন ও সদাচার সবার জন্য বিস্তারিত ছিল। তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য। অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তার মজলিস ছিল জ্ঞানচর্চা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্যশীলতা ও বিশ্বস্ততার কেন্দ্র, সেখানে ছিল না কোন শোরগোল, না কারো সম্মান সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ। তার মজলিসে কারো দোষ প্রকাশ পেলে তা যথাসময়ে গোপন রাখা হত। (বংশগত দিক থেকে) সকলেই সমান গণ্য হত, অবশ্য তাকওয়া ও সদাচারের দিক থেকে একের ওপর অপরের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। তারা পরস্পরের সাথে বিনয় নম্র ব্যবহার করতেন, বড়দের শ্রদ্ধা করতেন এবং ছোটদের স্নেহ করতেন, অভাবগ্রস্তকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং আগন্তুকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন।

হযরত আয়েশা [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] স্বভাবগতভাবেও অশ্লীল বা কর্কশভাষী ছিলেন না এবং স্বেচ্ছায়ও কর্কশভাষী বা অশ্লীলভাষী হতেন না। তিনি হাট বাজারেও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। তিনি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধের দুর্ব্যবহার করতেন না, বরং উপেক্ষা করতেন এবং ক্ষমা করে দিতেন।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত কখনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি এবং তিনি কখনো কোন খাদেম বা নারীকেও প্রহার করেননি।

হযরত আয়েশা [রা] আরো বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহকে [সা] ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি, যতক্ষণ না মহান আল্লাহর কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়। আল্লাহ তাআলার কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হলে তিনি সর্বাধিক অগ্র হতেন। তাঁকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হলে তিনি সর্বদা সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন, যাবৎ না কোন গুনাহের কাজ হত।

হযরত আনাস ইবনে মালেক [রা] বলেন, নবী [সা] আগামীকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

চার.

রাসূল [সা] অনুসৃত জীবন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথই আমাদের জন্য একান্ত এবং একমাত্র পথ। সেই পথেই রয়েছে আমাদের জন্য সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি। রাসূলের [সা] পথেই ঝরে কেবল বর্ণাঢ্য আলোর ঝরনা। তাঁর প্রদর্শিত পথেই রয়ে গেছে যাবতীয় আলোর উৎস। সীমাহীন প্রশান্তির ঢল।■

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] পরমতসহিষ্ণুতা

এস. এম. জহির উদ্দীন

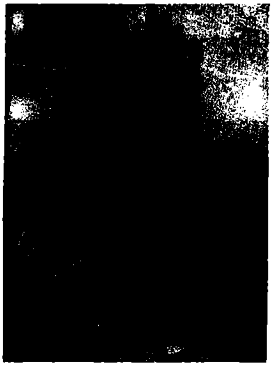

তোমাদের মধ্যে রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। সূরা আহ্যাবের ২১নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা যাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন, তাঁর সম্পর্কে দ্বিতীয় কিছু বলার ইখতিয়ার কোন মানুষ তথা সৃষ্টির সাধ্যের বাইরে। যার কথা বা কর্মকাণ্ড আল্লাহর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাঁর সকল সিদ্ধান্তই সঠিক ও নির্ভুল। তবুও তিনি একজন মানুষ। আল্লাহ্ বলেন, "হে নবী! আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ..... ।" [সূরা কাহ্ফ : ১১০]

সুতরাং নিজের দূরদর্শিতার পাশাপাশি সাহাবীদের [রা] মতামতকেও তিনি গুরুত্ব দিতেন আন্তরিকতার সাথে। সাহাবীদের [রা] পরামর্শ চাইতেন এবং তা যুক্তি যুক্ত হলে গ্রহণ করতেন সানন্দে।

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তা প্রতীয়মান হয়। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমণ করছিলো। কাফেলাটির যাত্রা পথ ছিলো মদীনার মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সীমানার মধ্য দিয়ে। কুরাইশদের আবদার ছিলো বেশ মজার। তাদের যতো ক্ষোভ, আক্রোশ, শ্যেনদৃষ্টি একমাত্র মদীনার মুসলিমদের প্রতি। কিন্তু সেই মুসলিমদের আওতাভুক্ত সীমানার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের মাধ্যমেই তারা ব্যবসা করবে। আরো মজার হলো

www.pathagar.com

সেই উপার্জনকৃত অর্থ মুসলিমদের বিরুদ্ধেই ব্যয় করা হবে। মক্কার প্রায় সকল নর-নারী এ কাফেলার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ, অলঙ্কার ইত্যাদি বিনিয়োগ করে।

এটি এমন এক সময় যখন 'ইসলাম' সদ্য প্রসূত প্রসূণের ন্যায়। অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার লক্ষ্যে আবু সুফিয়ানসহ কুরাইশদের এ বাণিজ্য কাফেলা যাত্রা করে।

মুসলিম বাহিনী কর্তৃক কুরাইশ কাফেলা আক্রান্ত হয়েছে এ মর্মে মক্কায় অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়ে। উতবা, শায়বা, আবু জাহলসহ বড় বড় কুরাইশ সরদাররা একত্রিত হয়ে যায়। গড়ে ওঠে বিশাল বাহিনী। সংঘবদ্ধ হয়ে তারা বিভিন্ন প্রকার সমরাস্ত্র, উট, অশ্ব, নর্তকী, গায়িকাসহ ইসলামকে চিরতরে বিলীন করতে সামনে এগুতে থাকে।

মুসলিমদের সামনে তখন দু'টি অবস্থা। একদিকে কুরাইশদের বিশাল বাহিনী অন্যদিকে বাণিজ্য কাফেলা। কুরাইশদের রুখতে না পারা যেমন নিজেদের জন্য চরম ক্ষতিকর তেমনি বাণিজ্য কাফেলা সমৃদ্ধ হওয়া অর্থও মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর।

মহানবী [সা] আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে বসে যান পরামর্শ সভায়। উভয় অবস্থাই তিনি মুসলিম বাহিনীর সামনে তুলে ধরেন। বিরাট সংখ্যক সাহাবী কাফেলার উপর আক্রমণের পক্ষে সম্মতি দেন। মহানবী পুনরায় প্রস্তাব তোলেন। এবার মুহাজিরদের অনেকেই [আবু বকর [রা], উমারসহ [রা] মহানবীর [সা] উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। মহানবী [সা] আবারও প্রস্তাব তুলে আনসারদের মতামত জেনে নেন। এভাবে বার বার প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি সকলের মত যাচাই করে নেন। সবার সম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্ত হয় কুরাইশদেরই প্রতিহত করা হবে। পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মুসলিম বাহিনী এর সুফলও পেয়ে যায়। মাত্র তিন শতাধিক সৈন্য তিনগুণ বেশি সৈন্যের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করে। যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন, "ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন তোমরা [সংখ্যায়] খুব কম ছিলে, তোমাদেরকে দুনিয়ায় দুর্বল মনে করা হতো, তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা না জানি তোমাদেরকে শেষ করে দেয়; তখন আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। তাঁর সাহায্য দ্বারা তোমাদের হাত মজবুত করলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করলেন, যাতে তোমরা শোকর গোযার হও। [সূরা আনফাল : ২৬]

উহুদ যুদ্ধের পর কুরাইশরা অনুধাবন করতে পারে মূলত তারা বিজয়ী বেশে ফিরতে পারেনি। তারা সিদ্ধান্ত নেয় কিছুদিন অপেক্ষার পর অধিক সমৃদ্ধ হয়ে পূর্ণ শক্তি নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করবে। কিন্তু সময় যতই অতিবাহিত হয় ততোই কুরাইশদের প্রাণশক্তি দুর্বল হতে থাকে। অপরদিকে সময়ের আবর্তে মুসলিম বাহিনীর প্রাণশক্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে। যার ফলে কুরাইশদের পরিকল্পনাও বিলম্ব হতে থাকে।

কিন্তু বাণিজ্য পথ বন্ধ হওয়ায় তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো পাশাপাশি মদীনা থেকে বিতাড়িত কিছু গোত্র কুরাইশদের উস্কানি দিতে থাকে। সব মিলিয়ে তারা পুনরায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

www.pathagar.com

এবার সমগ্র আরবের জাহিলী শক্তি একত্রিত হয়। সেনাপতি আবু সুফিয়ান। সৈন্য সংখ্যা চার হাজার। অশ্ব তিন হাজার, উট এক হাজার। পথিমধ্যে কুরাইশদের বিভিন্ন মিত্র গোষ্ঠী তাদের সাথে যোগ দিতে থাকে। পরিশেষে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার।

সংবাদ পৌঁছে যায় মহানবীর [সা] নিকট। সঙ্গে সঙ্গে ডাকেন পরামর্শ সভা।

কোন্ দিকে যাবেন? বাণিজ্য কাফেলার দিকে, নাকি কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করবেন? মদীনায় বসে প্রতিহত করবেন, নাকি মদীনার বাইরে গিয়ে প্রতিহত করবেন? নানা প্রশ্ন সকলের সম্মুখে। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয়– কুরাইশদেরই প্রতিহত করা হবে এবং তা মদীনায় বসেই।

শহরকে রক্ষার নানা পরামর্শের মধ্যে হযরত সালমান আল ফারসীর [রা] পরামর্শ গৃহীত হয়। তিনি অভিনব পরামর্শ দেন। পরিখা বা খন্দক খনন করেই মদীনা শহরকে রক্ষা করতে হবে। মদীনা শহরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তখন ঘরবাড়ী ও গাছ-গাছালীতে পূর্ণ। খোলা উত্তর দিকটাতে খন্দক খনন করা হয়। চওড়া দশ গজ, গভীরতা পাঁচ গজ এবং দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন মাইল। তিন হাজার সৈনিক বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে মাত্র তিন সপ্তাহে খননকার্য সমাপ্ত করেন।

খন্দক খননের পরপরই কুরাইশ বাহিনী মদীনা উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়। এখানে এমন অভিনব পদ্ধতি দেখে কুরাইশ বাহিনী ভড়কে যায়। এতদিনের পরিকল্পনা তখনই যেন বিলীন হয়ে যায়। কেউ কেউ অশ্ব নিয়ে খন্দক অতিক্রম করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায় কিন্তু তার পরিণতি মৃত্যুতে রূপ লাভ করে। দু'একজন পার হতে পারলেও মুসলিম বাহিনী শক্ত হাতে তা প্রতিহত করেন। কুরাইশদের অপেক্ষার দিন বাড়তে থাকে কিন্তু রসদ পত্র, শক্তি-সামর্থ্য, মনোবল সবই কমতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর পরিকল্পনায় [ঝড়ের কবলে পড়ে] আক্রান্ত হয়ে তারা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং মক্কায় ফিরতে বাধ্য হয়। সমগ্র মক্কার [জাহিলী] পূর্ণ শক্তির যাবতীয় পরিকল্পনা নিমিষেই শেষ হয়ে যায়।■

www.pathagar.com

হে প্রিয় হযরত ॥ জা কি র আ বু জা ফ র

প্রিয় হযরত
এই চির সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ থেকে তোমাকে সশ্রদ্ধ সালাম
একটি বাংলাদেশ একটি আকাঙ্ক্ষার মতো
একটি আনন্দময় উচ্চারণের মতো
একটি প্রাণময় সুন্দরের মতো
তোমার গুণগানে জেগে থাকে অবিরাম
ক্রমাগত তোমার নাম বেজে ওঠে বাতাসের প্রতিধ্বনির মতো

এদেশের পাখি ও বৃক্ষরা, নদী ও নক্ষত্ররা তোমাকে জানে
তোমার নামের সুস্বাদু শীতল গোগ্রাসে পান করে
এই জনপদ
ধানি জমির ভাঁজে, বাঁশঝাড়ে জড়িয়ে থাকা কুটিরগুলো
তোমার দরুদ সৌরভে অবাক মুগ্ধ

প্রিয় হযরত
এখানে আমাদের সব উচ্ছ্বাস সব স্বপ্ন তোমাকে ঘিরে
এখানে মাছেরা গাছেরা পাখিরা নিয়ত তোমার দেখানো পথে
ঘুরে আসে ফিরে ফিরে।
তুমি আমাদের নিত্যকর্ম নিত্যপ্রেমের বাণী
তোমার জন্য কত স্বপ্নরা হয়ে যায় কুরবানী
তুমি আমাদের দেখিয়েছ পথ এখনো দেখাও দিশা
তোমার প্রেমের রৌশনী কাটে ঘনঘোর অমানিশা
তুমি আমাদের সব
তোমার ঠিকানা জাগিয়ে দিয়েছে পবিত্র উৎসব

প্রিয় হযরত
মাঝে মাঝে আমরা অন্ধ হয়ে উঠি
লোভ লালসা প্রতিহিংসা বিদ্বেষ জিঘাংসায়
জর্জরিত হয়ে ওঠে আমাদের পাঁজর
বেদনার বিশাল বালিয়াড়ি বেড়ে ওঠে আমাদের বুকে
দম নিতে দারুণ কষ্ট হয় হযরত
মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয়ে ওঠে আমাদের আকাশ
শংকাগ্রস্ত হয়ে ওঠে আমাদের স্বপ্নের সীমানা
আর হঠাৎ দানবেরা

www.pathagar.com

আমাদের স্বাধীনতাকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে
আমাদের স্বপ্নকে নৃশংসভাবে খুন করতে উদ্যত
আমাদের নদীগুলো নিহত প্রায়
আগের মতো গান করে না পাখিরা
বৃক্ষগুলো কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে সবুজের অভাবে
আর এখনতো জনপদে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি
বাক স্বাধীনতা রুদ্ধ
আতঙ্কিত হয়ে উঠছে আমাদের সকালগুলো

প্রিয় হযরত
মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যের শেকল
ছিন্ন করতেই তুমি এসেছিলে
সুন্দরকে সুন্দরের সাথে জোড়া দিতে
তুমি এনেছিলে একক সত্তার সমৃদ্ধি
আমরা ভুলে গেছি তোমার সেই সুমহান বাণী-
তামাম বিশ্ববাসীরা ভাই বন্ধনে ঋদ্ধ হবে
অথচ আমরা আজ নানান অজুহাতের বারুদ নিয়ে
খাড়া হয়েছি
দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবার অহংকারে জেগে উঠি প্রতিদিন
নিজেরাই নিজেদের সংহার করি নিয়ত
এভাবে আর কতদিন হযরত
মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ এত হানাহানি দেখি আজ
মানুষের মাথা ভেঙে মানুষেরা হয়ে যায় মহারাজ
দম্ভ এবং অহংকারের তীব্র নিনাদ শুনি
তবুও তোমার দেখানো দিশায় জীবনের গান বুনি

হে প্রিয় রাসূল তোমার সুপথে জেগে ওঠে যদি ধরা
সারা দুনিয়ায় বাজবে আবার সুখের কলস্বরা।
প্রিয় হযরত বাংলাদেশের প্রতিটি গাঁয়ের বাঁকে
অজানা রোদেরা পাখিরা যেমন উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
তেমনি তোমার ভালোবাসা নিয়ে জেগে উঠেছে এ মাটি
সালাম সালাম লক্ষ সালাম মুখরিত পরিপাটি

ভুলিনি তোমার পাঠানো ঠিকানা ভুলিনি তোমার পথ
তুমিও ভুলো না আমাদের কথা হে প্রিয় হযরত

www.pathagar.com

বড় কষ্ট পাই ॥ ত ম সু র হো সে ন

আমার বড় কষ্ট হয়
যখন কাউকে সমাধিস্থ করার সময় বলা হয়
'সামিল করে দেয়া হলো মিল্লাতে রাসূলে'
অথচ সারাটা জীবন কর্মে ও বিশ্বাসে কখনোই সে
ছিলনা তার অনুসারী বরং প্রগতির নামে বাহবা গেয়েছে পথভ্রষ্ট নেতার,
মুক্তি খুঁজেছে ভুলে ভরা মানব রচিত মতাদর্শে।

আমার হৃদয় তখন বেদনায় ভারাক্রান্ত না হয়ে পারেনা
যখন আলখেল্লা পরা কাউকে
আরাম কেদারায় বসে দন্তখিলাল করতে দেখি
তিনি বহুত ব্যয় করে পশ্চিম থেকে এসেছেন বলে
সবাই তাকে গদ গদ ভক্তিতে মুগ্ধ করে রাখে
তার বংশধররা যখন উচ্চশিক্ষার বেয়াড়া অহংকারে
রাসূলের প্রতিটি সুন্নাতে হানে বিষাক্ত ছোবল
তখন তিনি না দেখার বাহানা করে কবর মোরাকাবায় থাকেন নিমগ্ন।

আমার অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় যখন দেখি
জনসভা, সেমিনারে রাসূলকে সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলা হয়না
যখন মুসলমান শান্তি খোঁজে বিধর্মীর অসভ্য কালচারে
তখন আমার মাথা নিচু হয়ে যায়
পার্থিব সমৃদ্ধির মোহে বিদ্বান মূর্খ নির্বিশেষে
পা চাটে বিধর্মীর
আমার তখন থাকেনা হিতাহিত জ্ঞান
যখন ধর্মান্ধ মৌলবাদী বলে সংগ্রামী মুমিনকে
দেয়া হয় গালি।

আমার মন বেদনার কালো মেঘে ছেয়ে যায়
যখন দেখি অন্যায়কে কেউ আর অন্যায় বলেনা
আপন পিঠ বাঁচানোর জন্য যখন কেউ শঙ্কিত জানোয়ারের মতো
সমাজ থেকে পালিয়ে বেড়ায়

www.pathagar.com

সব রাজত্ব বাতিলকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে খানকায় বাঁধে ঘর
যখন দেখি দুশ্চরিত্রদের তোয়াজ করে কেউ
কিংবা আনন্দচিত্তে ছেড়ে দেয় ইবাদতখানার কর্তৃত্ব,
তখন বুক ফেটে চিৎকার দিতে ইচ্ছে হয় আমার–
এসব কী হচ্ছে, কী হচ্ছে এসব! রাসূল কী এমন করতে বলেছেন?
আমাকে সবাই ঘাড় ধরে সমাজ থেকে বের করে দিতে চায়
যে সমাজে রাসূল নেই– সেখানে আমার তো থাকা যায়না!

মুক্তির দিশারী ॥ মা হ মু দু ল হা সা ন নি জা মী

একটি মানুষ পৃথিবীর মজলুমানের জন্য
এনেছেন মুক্তির দীন
মমতায় ভরে সম্মানে তাঁরে ডাকিতো
সবে আল আমিন ॥
সেই মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে
মুক্তির পথ যারা পেয়েছে
পৃথিবীতে আলোকিত তাঁরা আজ
স্রষ্টার রহমত পেয়েছে
মুক্তির দিশারী তাঁরা সবে
সত্যের কাণ্ডারী চিরদিন ॥
মানুষে আজি মানুষের জন্য
মানুষ নহে গো পণ্য
সৃষ্টির সেরা মানুষই ভাই
করেছেন যিনি গণ্য
আঁধার মুছে তিনি আলো এনেছেন
এই পৃথিবীতে অসীম ॥

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদ [সা] ॥ শা হ না জ পা র ভী ন

কলুষিত কলঙ্কিত ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি সকাল–
নীরব নিখিলের অন্তর্বেদনায় বাজে অপূর্ণ স্বাদ।
পুঞ্জীভূত নিরাশার বেদনা–পাথরের গভীরে জমাট।
চাঁদ ডোবে, সুব্‌হে সাদিক হয় উজ্জ্বল–
সোমবার, বার তারিখ, ৫৭০-এর রবিউল আউয়াল।
আরবের মরু দিগন্তে মক্কা নগরীর নিভৃত কুটির–
মহিমান্বিত নারী সেই সাজালো স্বপ্ন তাঁর সুনিবিড়।
অপূর্ব নূরের ছটায় আসমান জমীন আজ আলোকে আলোক!
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবীর-বৃক্ষরাজি মারিছে ঝলক।
অনন্ত অসীম দিনের প্রতিক্ষিত আগমনী সুর বাজে আজ–
অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হল আনন্দ-আয়োজন কুল মাখলুকাত।

মা আমিনার গৃহে আজ অপূর্ব চিত্র হল দৃশ্যমান
বিবি হাওয়া, বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়ম–
উচ্ছল, ঝলমল আমিনার পাশে বাজে গান।
বেহেশতী নূরে ভাসে তামাম পৃথিবী হয় আলোকিত
জান্নাতি খোশবুতে উন্মাতাল ধরণী হলো সুরোভিত।
স্নিগ্ধ, পবিত্র-চেতনায় ঝংকৃত মহাআনন্দ ধ্বনি!
খোশ আমদেদ ইয়া রাসূলাল্লাহ, মারহাবা ইয়া হাবীবাল্লাহ
আহলান সাহলান!
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

প্রিয় তুমি ॥ মা মু ন সা র ও য়া র

আলোর নবী রাসূল আমার
তোমায় পেয়ে ধন্য,
প্রাণে জাগাও সুখের দোলা
পাগল তোমার জন্য।

পাহাড় ঘেরা আরব ভূমি
সবার কাছে প্রিয় তুমি
সকল নবীর মাঝে তোমার
করে সবাই গণ্য।

নূরে নূরে ছড়াও তুমি
নতুন দিনের আলো,
একেক করে দূর হয়ে যাক
অতীত দিনের কালো।

তোমায় রাখি মনের মাঝে
সকল সময় সকল কাজে
বিচার দিনে একটুখানি
শাফায়াতের জন্য।

হৃদয় পটে ॥ শা হ মু হা ম্ম দ মো শা হি দ

রাত শেষে কেটে যাবে আঁধার যখন
কাঁচা রঙে লাল হবে সূর্য তখন
পৃথিবীতে কেঁপে এলো থির থির থির
আলোর ফোয়ারা শিশুর শরীর।

সেদিন সকাল ছিলো ঝলোমলো ঝল
গানে উদাসী হলো পাখিদের দল।
বাতাসের ফিস ফিস কানাকানি রটে
কান থেকে বলে দিলো হৃদয় পটে
যার লাগি এতো সব তিনি শেষ নবী
দেহ মন মগজে রেখো তাঁর ছবি।

www.pathagar.com

কবি ও কবিতার পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী [সা]

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ

ইসলামের চিরায়ত সাহিত্যে আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগ [৫০০-৬০০ খ্রি.] 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বলে অভিহিত। এ সময়ে আরবের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যকর। সাহিত্য বলতে কাব্যকেই মনে করা হতো কবিতায় আরবদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবন চমৎকারভাবে উৎকীর্ণ হতো। এ যুগে গদ্য সাহিত্যের ব্যবহার ছিল অপ্রতুল। শৈল্পিক মানসমৃদ্ধ গদ্যের অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাসে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও ছন্দমিলের অভাবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তখন ছন্দোবদ্ধ গদ্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যকোন ধারা বিশেষভাবে মূল্যায়িত হতো না। কেননা এ সময়ে কাব্যই ছিল সাহিত্যের শক্তিশালী মাধ্যম। কবি কাব্যের যেমন কোন বংশকে বংশানুক্রমে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতেন, তেমনি সেই কাব্যের মাধ্যমে পরিচয়বিহীন কোন বংশকে খ্যাতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিতেন। কোন পরিবারে কবির জন্ম হলে গোত্রের লোকেরা তাকে অভিনন্দিত করত এবং আমন্ত্রণের মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে গীত গেতে আনন্দ-উল্লাস করত। এ সম্পর্কে ইবন রশিকের বক্তব্য রেনল অ্যানেল নিকলসনের ভাষায় উল্লেখযোগ্য :

www.pathagar.com

When there appeared a poet in Family of the Arabs, the other Aribes round about would gather togather to that Family and wish them joy of their good luck, Feasts would be got ready. The women of the tribe would join together in bands, playing upon lutes, as they were wont to do at bridals, and the men and boys would congratulate one another; for a poat was a defence to the hounur of them all, a weapon to ward off insult from their good name, and a means of perpetuating their glorious deeds and of establishing to their fame forever.

জীবন-জীবিকার জন্য আরবদের যুদ্ধ ছিল অপরিহার্য। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের মনোবল, সাহস ও শৌর্যের ভীত শক্তিশালী করার জন্য কবিগণ কাব্যের দ্বারা তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। গোত্র গৌরব, বিক্রম, বীরত্ব, যশ ও খ্যাতি নিয়ে কাব্য রচনা করা কবিদের প্রাত্যহিক রুটিনে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ লোকজন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দু:খে, আপদে-বিপদে কবিদের আদেশ-উপদেশ নির্দ্বিধায় মেনে চলতো। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কবির শরণাপন্ন হতো, কবি হিজা কাব্যের [নিন্দামূলক কবিতা] মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ছোট করতেন। কেননা সে সময়ে আরবে হিজা কবিতার দুর্দান্ত প্রভাব ছিলো। হিজা কবিতা তাদের কাছে মন্ত্রপূত মৃত্যুবাণ বলে গণ্য হতো। কবি ছিল পরামর্শদাতা, সবজান্তা, উপদেষ্টা ও ভাগ্যোন্নয়নের প্রতীক। জাহিলী যুগের [৫০০-৬০০ খ্রি.] কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেলে। আঁধার আরবের মাঝে কাব্যকে মনে করা হতো আলোকবর্তিকা। কাব্যের আলো ছাড়া আরবদের বৃত্তান্ত জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ কারণে প্রচলিত আছে : 'কাব্যের শ্যামল বনভূমির পথরেখা অনুসরণ করে পৌছান যায় ইতিহাসের রাজপথে।' কথাটি প্রাচীন আরবি কাব্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য।

আরবি কাব্যচর্চা ও কাব্যপ্রীতি আরবদের একটি গৌরবের বিষয় ছিল। এতদসত্ত্বেও সাহিত্যের এ ধারাটি কিভাবে সমৃদ্ধ হলো, কখন বিকশিত হলো এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত খুব কমই পাওয়া যায়। অনেক কবিতা ইতিহাসের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে আবার অনেক কবিতা সুদীর্ঘকাল পরেও স্বকীয়তায় ভাস্বর রয়েছে। কেননা ইসলাম-পূর্ব যুগের খ্যাতিমান কবি ইমরাউল কায়েস [মৃ. ৫৪০ খ্রি.], আনতারাহ [মৃ. ৬১৫] ও যুহাইর বিন আবি সুলমার [মৃ. ৬০৯ খ্রি.] উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাদের পূর্বেও অনেক কবি কাব্যচর্চার মনোনিবেশ করেছিলেন। কবি আনতারাহ দু:খ করে বলেছেন : 'প্রাচীন কবিগণ কি কোন শূন্যতা রেখে গিয়েছে যে, আমরা তা দূর করবো?' কবি যুহাইর বিন আবি সুলমা [মৃ. ৬০৯ খ্রি.] বলেছেন : 'আমরা হয়তোবা ধার করা ভাবধারা কিংবা পূর্বে কথিত অথবা পুন:পুন: উক্ত বাক্য প্রকাশ করে থাকি'।

আরবদের জীবনে কাব্যপ্রীতি এত গভীর হওয়া সত্ত্বেও কাব্য সংরক্ষণের তেমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ কারণে যা সকলের নিকট সমাদৃত ছিল শুধু তাই

www.pathagar.com

সংরক্ষতি হয়েছে। আর এর মূল কারণ ছিল আরবে লিপি শিল্পের ব্যবহার তখনও ব্যাপক হয়নি। শিক্ষা দীক্ষায় কোন বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকায় যে যার মত শিক্ষায় ব্রতী হতো। ঐতিহাসিক ওয়াকেদার [মৃ. ২০৭ হি.] মতে, মক্কার ন্যায় শহর জীবনেও তখনও মাত্র সতের জন ব্যক্তি লিখন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কবি যুর রুম্মা [মৃ. ৭১৯-৭৩৫ খ্রি.-এর মাঝামাঝি] লিখতে জেনেও প্রকাশ করতেন না, কারণ লিখতে জানা তখনকার সময়ে এক ধরনের অপমান [স্মৃতি শক্তি কম] মনে করা হতো। লিখন শিল্পের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে ইসলাম-পূর্ব যুগের কাব্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আরবীয় নির্ভেজাল রূপ প্রাচীন আরবি কবিতায় সংরক্ষিত থাকায় কাব্য সংরক্ষণের গুরুত্ব পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের গ্রহণীয় পদ্ধতি হিসেবে প্রথমত রাভী প্রথার প্রচলন করা হয়। এ প্রথার মাধ্যমে কাব্যকে বিস্মৃতি ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু কালের ধারাবাহিকতায় এসব রাভীর মৃত্যু ঘটলে কাব্য বিনষ্ট হওয়ার আংশকা নতুনদের মাঝে প্রবল হয়ে উঠে। আবু আমর ইবন আলআলা তাই বলেছেন : 'প্রাচীন কবিতার খুব অল্পই আমরা পেয়েছি, সবগুলো সংগ্রহ করা গেলে সাহিত্য ও কবিতার বিরাট অংশ আমরা লাভ করতাম।' ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতার সংখ্যার প্রাচুর্যের কারণে অনেক সমালোচকের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকবে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ ছাড়াও রাভীদের [কবিতা আবৃত্তিকারী] দ্বারা কাব্য সংযোজন ও বিয়োজনের ব্যাপারটিও ইতিহাস প্রচলিত আছে। এতকিছুর পরেও সকল ভাষা-বিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও মনীষী মনে করেন প্রাচীন কাব্যের এ বিরাট সাহিত্য-সম্পদের অধিকাংশই অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল আছে। প্রাচীন কবিতায় সাহিত্য-সম্পদকে রক্ষার ক্ষেত্রে বসরা ও কুফার ব্যাকরণবিদগণের অবদান প্রাত:স্মরণীয়। তাদের উৎসাহে পরবর্তীকালে কিছু মূলনীতির আলোকে কাব্য-সাহিত্যকে সংগ্রহ ও বিন্যাস করা হয়।

প্রাচীন আরবি কবিতা অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীলতা, চিত্তের ব্যাকুলতা, হৃদয়ের অস্থিরতা ও বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন থাকলেও কৃত্রিমতা ও মিথ্যা-প্রতারণার ছোঁয়া তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যাশ্রয়ী নান্দনিক কবিতাকে তারা সুন্দরতম অভিপ্রায় হিসেবে আখ্যায়িত করতো। কবি যুহাইর বিন আবি সুলমা [মৃ. ৬০৯ খ্রি.] বলতেন : 'তোমার রচিত সর্বোত্তম কবিতা সেটিই যা শুনে শ্রোতা বলবে, তুমি সত্য বলেছ।' আরবি সাহিত্যে সাবআ মুআল্লাকা [গীতিকা সপ্তক] ইসলাম-পূর্ব যুগের সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সম্পদ। যা ভাষা, রচনাশৈলী ও নান্দনিক সাহিত্য হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্ব সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। সাহিত্যাঙ্গনে যাদের ব্যবহৃত উপমা-উৎপেক্ষা অধুনাকালেও সাহিত্য সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে কবি ইমরাউল কায়েস [মৃ. ৫৪০ খ্রি.] যেসব উপমা বৈচিত্র দ্বারা আরবি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তার কাছে বিশ্ব সাহিত্য আজও ঋণী। সৃষ্টির উলাসে তিনি জীবনবোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চাননি। তাইতো দেখা যায়, কবির শৈশব কেটেছে অতি আদর সোহাগে আর যৌবন কেটেছে কবিতা, গান আর মদের নেশায়।

www.pathagar.com

নারীর প্রতি অনুরাগ, উনায়যার সাথে তার প্রেম উপাখ্যান আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। ঘর ছাড়া ভবঘুরে যুবরাজ কায়েস যার জীবন ছিল সদা প্রেম-বিরহ আর প্রকৃতির টানে বিভোর। মরুদ্যানের তরু-পলবের শ্যামল-শোভা ও মরুভূমির বালুময় প্রান্তরে পাখির কলতানে তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে বেড়াতেন। আর এভাবেই তিনি তার সৃষ্টিশীল কাব্যে জীবনের প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলেন। অনেক কবিতায় অশ্লীল শব্দ ব্যবহার হলেও বিশুদ্ধ ভাষা, চিত্র ও ভাবের সঙ্গতি থাকায় তার কাব্যের প্রতিটি চরণ যেন সুরের মূর্ছনায় উদ্দীপিত, অপূর্ব শিল্প দ্যোতলায় পরিপাট্য। মুআল্লাকা রচনায় তার প্রবর্তিত নব নব ধারা পরবর্তী কবিদের জন্য শিল্পরূপের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মহানবীর [সা] উপর কুরআন নাযিল হলে মক্কার কাফির-মুশরিকগণ মহানবীকে [সা] কবি এবং কুরআনকে কাব্য বলার ধৃষ্টতা দেখায়। সাথে সাথে আল্লাহ ঘোষণা করে জানিয়ে দেন যে, 'আমি মহানবীকে কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং কাব্যচর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়'। মহানবী [সা] কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি কবি ও কাব্যকে পছন্দ করতেন না এমনটা নয়। কেননা তার জীবনকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি কবি ও কাব্যকে ভালবাসতেন, মননশীল মার্জিত কাব্য পছন্দ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কাব্যিক ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেছেন, কাব্যচর্চায় সাহাবিদের উদ্বুদ্ধ করে কাব্য রচনার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার কখনো কবি ও কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে দু'আ করতেন এবং ইসলামী চেতনা সমৃদ্ধ কবিতা শ্রবণ করে কবিদেরকে পুরস্কৃত করতেন। এসব কিছুই রাসূলের [সা] কাব্য প্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি বলতেন : 'কবিতা সাধারণ কথার মতই। ভাল কথার ন্যায় ভাল কবিতা সুন্দর এবং খারাপ কথার ন্যায় খারাপ কবিতা অসুন্দর'। কুরআনের বাণী : 'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুড়ে বেড়ায়? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না'। কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলের [সা] বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কাব বিন মালেক [মৃ. ৬৭০-৬৭৩ খ্রি.] ও হাসসান বিন সাবিত [মৃ. ৬৭৪ খ্রি.] কেঁদে কেঁদে রাসূলের [সা] কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন : "হে আল্লাহর মহানবী [সা]! কবিদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ আমরাও কবি'। তিনি উত্তরে বললেন : 'সম্পূর্ণ আয়াত পড়, ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়নি'। এভাবে মহানবী [সা] বললেন : 'তোমাদের কারো পেটে কাব্য থাকার চেয়ে পচা পুঁজ থাকা অনেক উত্তম'। মহানবীর [সা] এ বাণী শুনে আয়েশা [রা] বললেন : 'মহানবী [সা] কবিতা দ্বারা খারাপ বা কুৎসামূলক কবিতাকে বুঝিয়েছেন'। তাই বলা যায় ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী, ঈমান ও ইসলামে আঘাত লাগে এমন অশালীন কাব্যচর্চাকেই মহানবী [সা] নিরুৎসাহিত করেছেন। ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ কাব্যচর্চায় তার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না। তিনি একটি সুন্দর কবিতার চরণ আবৃত্তি

www.pathagar.com

শুনে বলেছিলেন : 'কোন কোন বক্তৃতায় যাদু আছে। আর কোন কোন কবিতায় আছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা'। কাব বিন যুহাইর [মৃ. ৬৭০/৬৭৩ খ্রি.] একজন মুখাদরাম কবি। ইসলামের বিরুদ্ধে কাব্য রচনা করে রাসূলের বিরাগভাজন হলে, মহানবী [সা] তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের ফরমান জারি করেন। এরপর তিনি ইসলাম কবুল করে [সা] মহানবীর প্রশংসামূলক কাব্য রচনা করেন :

রাসূল তো নূরের জ্যোতি
দিকে ছড়ায় আলোক দ্যুতি
তিনি যেন দীপ্ত পথের মুক্ত ছবি।

মহানবী [সা] এ কবিতা শুনে তার বিরুদ্ধে জারিকৃত মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নেন এবং ক্ষমতার মহিমার আনন্দের আতিশয্যে নিজের চাদরটি সৃষ্টির প্রতিদানস্বরূপ উপহার দেন। এভাবে আব্বাস বিন মিরসাদ মহানবীর [সা] প্রশাংসা কাব্য রচনা করলে তিনি তাকে একটি কাপড় উপহার দেন। মহানবীর [সা] নির্দেশে নযর বিন হারিসকে হত্যা করা হলে তার কন্যা রাসূলের [সা] সামনে মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করেন, কবিতা শুনে মহানবী [সা] বললেন : 'আমি যদি এ কবিতা তাকে হত্যার পূর্বে শুনতাম, তাহলে তাকে হত্যা করতাম না'। ইসলাম-পূর্ব যুগের কিছু কবি যখন ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, মহানবী আনসার ও মুহাজিরদের ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে যখন কুৎসামূলক কাব্য রচনায় ব্রতী হয়, তখন মহানবী [সা] অতিষ্ঠ হয়ে আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন : যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তদীয় মহানবীকে [সা] সাহায্য করেছে, তাদেরকে জিহ্বা দিয়ে সাহায্য করতে কিসে বাধা দিয়েছে ! এ কথা শুনে কবি হাসসান বিন সাবিত [মৃ. ৫৪ হি.] কবিতার দ্বারা কুরাইশদেরকে নিন্দা করার প্রস্তুতি নেন। মহানবী [সা] কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে কুরাইশদের নিন্দা করবে, আমিও তো কুরাইশ বংশের লোক? উত্তরে কবি বললেন : 'মথিত আটা থেকে যেভাবে চুল বের করে আনা হয় ঠিক সেভাবেই আপনাকে আমি নিন্দা করা থেকে বের করে আনবো'। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'যাও আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ্! রুহুল কুদুসকে [জিবরীল] দিয়ে তাঁকে সাহায্য কর।' এরপর কবি হাসসান বিন সাবিত রাসূলের [সা] পক্ষ থেকে কুরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে, যোগ্যতার প্রমাণ করেন। তার কবিতা শুনে মহানবী [সা] বলেছিলেন : তোমার কবিতা কুরাইশদের বর্শার আঘাতের চেয়েও বেশি আহত করে। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নিন্দায় কবিতা রচনা করলে মহানবী [সা] তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দু'আ প্রসঙ্গে বললেন :'হে হাসসান! আলাহর কাছে তোমার পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত'। এরপর হাসসান বিন সাবিত [রা] যতদিন বেঁচে ছিলেন রাসূলের [সা] শানে, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আত্মনিবেদিত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যের দ্বারা তাদেরকে সমুচিত জবাব দিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ছিলেন। এ কারণে তিনি 'শায়িরুর রাসূল' বা

www.pathagar.com

রাসূলের কবি অভিধায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। মহানবী [সা] তাঁর কাব্য-প্রতিভা শাণিত হওয়ার জন্য দু'আ করতেন। তোফায়েল বিন আমর আদদাওসী মহানবীর [সা] সামনে এসে একবার ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন। তিনি নিজেকে একজন কবি পরিচয় দিয়ে মহানবীকে [সা] কবিতা শ্রবণ করার অনুরোধ জানান। মহানবী [সা] শ্রবণে সম্মত হলে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন এবং মহানবী [সা] তা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। ইসলাম-পূর্ব যুগের কবি তারাফা রাসূলের [সা] সামনে আবৃত্তি করলেন :

অনাগত কাল জানাবে তোমায় তুমি যা জানতে না,
কি নিয়ে আসবে খবর যা তুমি শোন না।

মহানবী [সা] তারাফার মুখে এ কবিতা শুনে বললেন : 'এতো নবীদের কথা'। একবার শারিদ সাকাফী মহানবীর [সা] যাত্রাপথের সাথী হওয়ায় মহানবী [সা] তাঁর কাছে উমিয়্যার কবিতা শুনতে চাইলেন। তিনি আবৃত্তি করলেন, মহানবী [সা] শুনলেন এবং আরো আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি সেদিন একশ'টি কবিতার চরণ শুনলেন। এভাবে মহানবীর [সা] আগমন উপলক্ষে মদিনার নারী ও শিশু কাব্যের সুরে সুরে গেয়েছিলেন :

তালাআল বাদরু আলাইনা, মিন সানি ইয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা মাদাআ লিলাহি দায়ী।
'উদিছে গগনে পূর্ণিমার চাঁদ
ছানিয়া বিদা ভেদ করি
ডাকেনি কেউ আর খোদার রাহে
শোকর হলো ওয়াজিব করা তাঁর তরি।

মহানবী [সা] ছিলেন সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। কবিতা ও সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী। নিম্নের কিছু হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবীকে [সা] বলতে শুনেছেন যে বাণীর বিন্যাস হয়েছে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা ছাড়াই, সে বাণী তাকে নিয়ে যাবে পূর্ব পশ্চিমের ব্যবধানের চেয়েও আরো দূরে নরক গহবরে। [বুখারী, মুসলিম] মহানবী [সা] আরো বলেছেন, [আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা না করে] শুধু মানুষের হৃদয় কেড়ে নেয়ার জন্য যে মনোহর কথা বানানো শেখে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তার কোন বিনিময় গ্রহণ করবেন না। [আবু দাউদ] উবাই ইবনে কা'ব [রা] হতে বর্ণিত, মহানবী [সা] বলেছেন, কিছু কিছু কবিতা তো হিকমাহ্ বা দর্শনস্বরূপ। [আদাবুল মুফরাদ]। মহানবী [সা] অন্য হাদীসে বলেন, উট থামাতে পারে তার সকরুণ ক্রন্দন কিন্তু আরবরা তাদের কবিতার সুর থামাতে পারেনা। [এহইয়া উলূমুদদীন] মহানবী [সা] ইরশাদ করেন, আমি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে নির্দেশ দিলাম কবিতা রচনার। ভালোই করেছে সে, কা'ব বিন মালিক

www.pathagar.com

সেও সুন্দর রচনা উপহার দিয়েছে। নির্দেশ দিলাম হাসসান বিন সাবিতকে, সে আমাদের তৃপ্তি করেছে এবং নিজেও হয়েছে। [কিতাবুল আগানী] হযরত আয়েশা [রা] বলেন, মহানবী [সা] মসজিদে হাসসানের জন্য উঁচু মিম্বার তৈরি করেন। তার ওপরে ওঠে হাসসান মহানবীর গৌরব গাঁথা এবং মুশরিকদের নিন্দাকাব্য আবৃত্তি করতো। কখনো মহানবী [সা] বলতেন, হাসসানের জিহ্বা যতদিন রাসূলের [স] পক্ষ হয়ে কবিতার বাণী শুনিয়ে যাবে, ততোদিন তার সাথে জিবরীল থাকবেন। [তিরমিযী] কা'ব বিন মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী [সা] আমাদের নির্দেশ দিলেন– যাও, তোমরা মুশরিকদের প্রতিপক্ষে লড়াই কর। কারণ মুমিন জিহাদ করে জান দিয়ে মাল দিয়ে। মুহাম্মাদের [সা] আত্মা যাঁর হাতের মুঠোয় তার শপথ তোমাদের কাব্য তীরের ফলা হয়ে যেন তাদের কলিজা ঝাঁজরা করে দেয়। [আওনুল বারী] ইবনুল রাওয়হার কবিতা শুনে মহানবী [সা] বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের কবিতা দেখ কত অনাবিল ও পরিচ্ছন্ন। [বুখারী] হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে [রা] প্রশ্ন করা হলো আচ্ছা মহানবী [সা] কি তার বক্তৃতায় কখনো কবিতার উপমা নিয়ে আসতেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। কখনো বা উপমা দিতেন তারাফ বিন আবদ–এর এই কবিতা দিয়ে। 'অনাগত কাল শেখাবে তোমরা যা তুমি জানতে না, এবং নিয়ে আসবে খবর কভু যা শোননি। [তিরমিযী] জাবির বিন সামুরাহ [রা] বলেন, মহানবীর [সা] শতাধিক বৈঠকে আমি অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছি অমি দেখতাম, তাঁর সাহাবীগণ একে অপরের কাব্য সমালোচনা করতেন। ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতাও আলোচিত হতো সেখানে। মহানবী [সা] প্রায়শ: চুপ থাকতেন। কখনো বা আবার মুচকি হাসতেন। [তিরমিযী] মহানবী [সা] বলেছেন, কবিদের আর্থিক সহযোগিতা করা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য। [মুহাদারাত আল-উদাবা] হযরত আসওয়াদ বিন সারি বলেন, আমি কবি ছিলাম। একবার মহানবী [সা]-এর কাছে বললাম, আমার রবের স্তুতি গেয়ে আমি কিছু কবিতা লিখেছি। হে নবী! তা থেকে কিছু শোনাব? তিনি বললেন, তোমার রব এ ধরনের স্তুতি নিশ্চয়ই পছন্দ করেন। [আল-আদাবুল মুফরাদ]

আরব দেশ কবির দেশ আরবদের কথামালার একটি বিনোদনমূলক বিষয়। কাব্যচর্চা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়করূপে বিবেচিত হতো। কাব্য কোন শখের বিষয় ছিল না। কাব্য ছিল চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের গৌরবময় বহি:প্রকাশ। মহানবী [সা] শালীন কবিতাকে সমর্থন করতেন, সত্যভাষী কবিদেরকে উৎসাহ দিতেন। মহানবী [সা] নিজে কবি না হয়েও তিনি ছিলেন কাব্যামোদী, একজন সমঝদার কাব্যযোদ্ধা। কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা, কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন কাব্য-চেতনার ইঙ্গিত বহন করে। তবে এ কাব্য হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিশীল। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এমন কাব্যচর্চাকে তিনি উদ্বুদ্ধ তো করেনইনি বরং নিরুৎসাহিত করেছেন সব সময়ে।■

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

ইবন রশিক, উমদা ফি মাহাসিন আশশির ওয়া আদাবিহি ওয়া নাকদিহি, ১ম খ, পৃ. ১৪

জুরজী যায়দান, তারিখ আলআদাব আললুগাহ আলআরাবিয়া, ১ম খ, পৃ. ৫১

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ঢাকা: বিআইসি, ১৯৮৭, ১ম খ, পৃ. ভূমিকাংশ।

ইবন আবদি রাব্বিহি, আলইকদুক ফারিদ, পৃ. ৩৯৮

আহমদ ইসকান্দারী, আলওয়াসিত ফিল আদাবিল আরবি ওয়া তারিখিহী, পৃ. ৩১১

ড. শাওকী দায়েফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খ, পৃ. ৪৫

ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৭ম খ, পৃ. ৫৬৪-৫৬৬

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান, ইসলাম-পূর্ব যুগে গদ্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৪-৫০

আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৯০

আর.এ নিকলসন, A literary History of the Arabs, পৃ. ২৪৩-২৪৮

আহমাদ হাসান যাইয়াত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২১২-২১৪

জালালউদ্দিন সুয়ুতী, আলমুযহির, ১ম খ, পৃ. ৬৬

ওয়ালি উদ্দিন আলখতিব, মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খ, পৃ. ৪১১

ড. ওমর ফাররুখ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, ১ম খ, পৃ. ৩২৩-৩২৫

আবু ঈসা তিরমিযী, জামে আততিরমিযী, ২য় খ, পৃ. ১৮৮

ইবন কুতাইবা, আশশির ওয়াস শুআরা, পৃ. ৫৩

শিবলী নুমানী, সিরাতুন নবী, পৃ. ২০৫-২১০

কুদামা ইবন জাফর, মুকাদ্দিমাহ নাকদুশ শির, পৃ. ২৩

ইবন কাসির, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খ, পৃ. ৩৪৯

ইউসুফ কান্ধলবী, হায়াতুস সাহাবা, পৃ. ৪৭৫

ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, ২য় খ, পৃ. ১৯৮৭

জাবী জাযাহ আলি ফাহমী, হুসনুস সাহাবা, পৃ. ৫১

ইবন কুতাইবা, আশশির ওয়াশ শুআরা, পৃ. ৫১

আলজাহিয, আলবয়ান ওয়াত তাবয়িন, ১ম খ, পৃ. ৪৫৩

ইবনুল আছির, আলকামিল ফি আততারিখ, ২য় খ, পৃ. ৪৪২

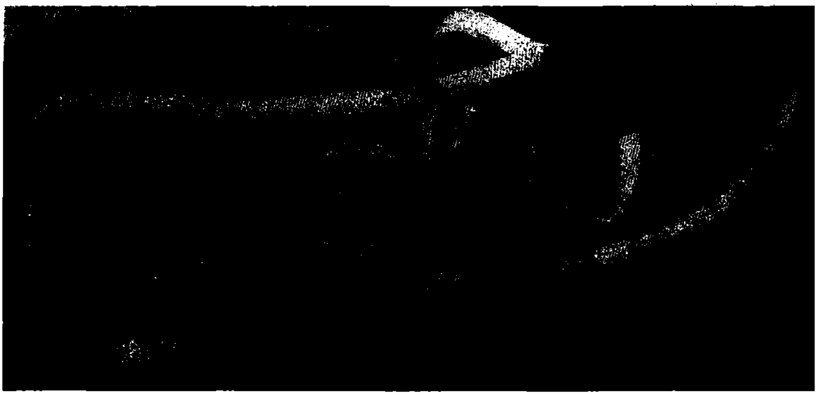

www.pathagar.com

পনের শতকের বাংলা সাহিত্যে রাসূল বিজয় প্রসঙ্গ

নিজাম সিদ্দিকী

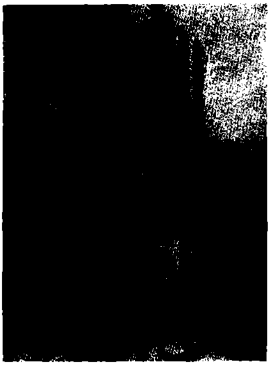

এক.

মানব প্রণেতা সম্পর্কে অধিক কৌতূহলের কারণে সাহিত্য সমালোচকগণ জীবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রাচীন জীবনীকারগণের এ শিল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কৌতূহল ছিল না, তাঁদের বিবেচনা ছিল সন্তচরিত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করা– যেখানে ইতিহাস বা মৌখিক ঐতিহ্য তথ্য দিতে অসমর্থ সেখানে প্রত্যাদেশ তা মিটাতে পারতো। মানবিক দুর্বলতা মুক্তিই মহাপুরুষ চরিত্রের মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হতো।

জেমস এল. ক্লিফোর্ড তাঁর Biography As An Art [1962] গ্রন্থে বলেছেন : The value of praising great men was an accepted fact. Criticism, at last, had found problem in biography not easy to solve. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রাসূল বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হয় যে, মহাপুরুষ জীবনের সমালোচনা একান্তই দুরূহ ব্যাপার। একজন মুসলমানের পক্ষে রাসূল জীবনের বা রাসূল চরিত্রের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। বাংলা রাসূল চরিতসমূহ আলোচনার ক্ষেত্রে ক্লিফোর্ডের তত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের গদ্য জীবনীগুলোতে কোথাও আছে যুক্তি ও ভক্তির সমন্বয়, কোথাও আছে অনবচ্ছিন্ন প্রশংসা। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও বস্তুগত দৃষ্টিতে একান্ত যুক্তির নিরিখের রাসূলচরিত রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার ঊনিশ শতকের মিশনারী রচিত রাসূল চরিতসমূহ বিজাতীয় বিদ্বেষে পূর্ণ। ঐ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে হিন্দু এবং ব্রাহ্ম লেখকদের রচিত মুহাম্মাদ জীবনীসমূহ সমন্বয়বাদী চেতনার ফসল।

মুসলমান কবিরা হিন্দুর পুরাণ পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামী পদ্ধতির লেখকরা বেশিদিন এড়িয়ে চলতে পারলেন না। ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের জীবন চরিত ও ধর্ম প্রচারের কাহিনী ঢালাই করলেন শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, হরিবংশ পাণ্ডব বিজয়ের ছাঁচে। এ শ্রেণীর রচনাগুলোকে প্রধানত: দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে পয়গম্বরদের কাহিনী। সাধারণত: এগুলো হচ্ছে 'নবীবংশ', 'রসূলনামা' বা 'মোহাম্মদ বিজয়', উনবিংশ শতাব্দীতে 'কাছাছুল আম্বিয়া'।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে রাসূলের পরবর্তী খলিফা ও মুসলিম বীরগণের বিজয় অভিযান এবং অনেক কলহ ও গৃহবিবাদের বর্ণাঢ্য কাহিনী। এগুলোর সাধারণ নাম 'জঙ্গনামা' বা 'যুদ্ধকথা'। এগুলোর বিষয়বস্তু কারবালার করুণ কাহিনী। এগুলো বাংলা ভাষাভাষী সকলের কাছেই সমধিক সমাদৃত। প্রাচীন বাংলা কাব্যধারায় 'বিজয় কাব্য' বা মহাকাব্য এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য। যেমন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি।

এসব কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লৌকিক-অলৌকিক দিগ্বিজয়ের কাহিনীর মাধ্যমে দেব-দেবী বা নায়ক-নায়িকার মাহাত্ম্য প্রচার। এ ধারার কাব্যের বিষয়বস্তুতে হিন্দু-মুসলমান লেখকদের পরিকল্পনায়ও বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অমুসলিম কবিদের রচিত বিজয় মঙ্গল কাব্যগুলোতে কেবল দেব-দেবীর কলহ-ঝগড়া ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দম্ভ ও বিজয়ের একঘেঁয়ে প্রাণহীন এক ধরনের মানবতার লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের কাহিনী।

মুসলিমদের রচিত কাব্যে এ ধরনের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ কম ছিল বলে স্বভাবত: নবী-রাসূলদের মাহাত্ম্য ও মানবতার জয় ঘোষণাই প্রধান ও প্রকট হয়ে উঠেছে। মুসলিম কাব্যধারার এ বৈশিষ্ট্যটির প্রতি লক্ষ্য না রাখলে তাদের কাব্য তথা ভাবধারার ও আদর্শের প্রতি অবিচার করার সুযোগ রয়েছে। এ সঙ্গে আরো মনে রাখতে হবে যে, কবিদের রোমান্টিক ভাবধারার বীজও এখান থেকেই সূত্রপাত।

দুই.

মুসলমান কবিদের বিজয় কাব্যে আক্ষরিক অর্থেই বিজয় শব্দ যুক্ত হয়েছে। যুদ্ধে রাসূলের [সা] 'জয়' প্রকাশ করতেই তাঁরা কাব্যের নাম 'রাসূল বিজয়' রেখেছেন। জৈনুদ্দীন[১], শা' বারিদ[২] খান, শেখ চাঁদ প্রভৃতির কাব্য এ বক্তব্যেরই সমর্থক। এসব কাব্যে যুদ্ধের যে বিবরণ তা বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ। কোন কোন ক্ষেত্রে কবিগণ ইতিহাসের প্রতি কোন তোয়াক্কাই করেননি। এসব কাব্য আরবি 'মাগাজি'-র অনুসরণে রচিত। রাসূলের [সা] যুদ্ধ ঘটনা বর্ণনায় মাগাজি লেখকরা অনৈতিহাসিক তথ্য বা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১. জৈনুদ্দীন ছাড়াও জয়নুদ্দীন, জয়েন উদ্দীন, জইনউদ্দীন প্রভৃতি বানান পাওয়া যায়।
২. শা'বারিদ এবং শা'বিরিদ দু'রকম বানান আছে।

www.pathagar.com

বাঙালি কবিরাও অনুসরণ করেছিলেন সেদিনের কোন কোন পারসি বা আরবি কিতাব। 'জঙ্গে ওহুদ', 'জঙ্গে খয়বর' ইত্যাদি কাব্যও একই জাতীয়। আরবি-পারসি মাগাজি বা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থরাজিতে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে মুসলিম পণ্ডিতগণ মনে করেন। জৈনুদ্দীনের 'রসূল বিজয়' কাব্যই এ ক্ষেত্রে অগ্রদূত। চরিত সাহিত্য রচনা অথবা চোখে দেখা মানুষের কাহিনী রচনা বাংলা কাব্যে এই প্রথম।

মধ্যযুগের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু কবির কাব্যবস্তু একই কাহিনী। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৩২০ বঙ্গাব্দে জৈনুদ্দীনের 'রসূল বিজয়' কাব্য সম্পর্কে প্রথম পরিচয় দান করেন। এরপর ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ড. আহমদ শরীফ শীত সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় টীকা-টিপ্পনীসহ কাব্যখানি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। এ থেকে কাব্য সম্পর্কে নানা প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে।

এ কাব্যের কাহিনী ছদ্ম-ঐতিহাসিক। কাব্যের বিষয়বস্তু ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদের [সা] যুদ্ধ বিবরণ। জয়কুম সম্ভবত ঐতিহাসিক পুরুষ। ব্লু মহার্ডের মতে তিনি ছিলেন আর্মেনিয়ার রাজা। তবে কবি বর্ণিত কাহিনী কাল্পনিক। হযরত মুহাম্মাদ [সা] বদর, ওহুদ, খন্দক, খয়বর ইত্যাদি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সূত্রে কবিরা এ যুদ্ধ কাহিনী তৈরি করেছেন। জয়কুমের রাজ্যে রাসূলের প্রবেশ চিত্রাংকন করতে গিয়ে কবি যা বলেছেন তা ঐতিহাসিক না হলেও কবির গর্ব-লালিত।

'রসূল বিজয়' হযরত মুহাম্মাদের [সা] দিগ্বিজয় কালের ঘটনা। তিনি জয়কুম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করেছেন। মদীনা থেকে জয়কুম রাজার রাজ্য ছয় মাসের পথ। তবু মঙ্গল কামনা করে নারা-ই-তাকবীর বলে নবী যুদ্ধে যাত্রা করলেন। নদ-নদী, ঝাড়-জঙ্গল পার হয়ে তিনি পথ চলেছেন। পথে জয়কুম রাজার চর এক জালিয়ার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এ চরের মারফতে নবী জয়কুম রাজাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। জয়কুম-রাজ বাহরাম খবর পেল; ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। রাজা ইসলাম গ্রহণ করলেন না। রাসূলও [সা] যথাসময়ে জয়কুম রাজ্যে প্রবেশ করলেন। উভয়পক্ষে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

জয়কুমের কাসেদর অশোভন কথা বলায় নবী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন—

অন্দরেতে যাই আলি জব করিব গরু।
সেই শের থোন দিমু তোমার রাজার জরু ॥
কলিমা পড়াইমু সব ভজাইমু জিগির।
বলিহীন শাস্ত্র পূর্জ না রাখিমু ফিকির ॥
এমত শুনিয়া কাসিদ করিল গমন।
নৃপতির আগে গিয়া দিল দরশন ॥

www.pathagar.com

কাসেদ নৃপতি এ সংবাদ জেনে চিন্তিত হলেন। তবে আচমিরি নামক বীর তাকে আশ্বাস দিল যে, 'মারিয়া খাবাম গিয়া জথ মুসলমান'।

যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হল। সে এক ভীষণ যুদ্ধ! নবীর দু'আয় আলী জয়কুমের আট হাজার প্রহরীর দরজা ভেঙে দিলেন। অত:পর আরম্ভ হলো আরো এক ভয়াবহ যুদ্ধের সাজ। রাজার পক্ষে–

সাজিলেক ষাট লক্ষ দশ অশ্বাবর।
নব সহস্র গজ ধরে পটোয়ার ॥
সহস্র বিংশতি জঙ্গী দেখি ভয়ঙ্কর।
মুঘল মুদগর শর হস্তের উপর ॥

কবির কল্পনার অশ্ব চলছে আরো দ্রুত। তিনি বলেছেন–

কোটি কোটি পদাতি করি কোলাহল।
রহিলেন্ত সর্ব সৈন্য গিয়া রণস্থল।
এথা দেখি কহে সব নবীর গোচর।
লক্ষ লক্ষ বিঘ্ন পথ আইল নিয়ড় ॥

ষাট লক্ষ অশ্বারোহী, নয় সহস্র, গজ, সহস্র বিংশতি জঙ্গী এবং কোটি কোটি পদাতিক পৃথিবীর কোনো যুদ্ধে কখনো গিয়েছে এ কথা কেউ শোনেনি। এমন কল্পনার কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই।

নবীর মনে অসীম ঈশ-নির্ভরতা। শত্রু সৈন্যের সংখ্যা তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। তিনি বললেন, 'বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার'।

যদি বলবন্ত শত্রু আছ এ তোক্ষার।
ততোধিক বলবন্ত আছে করতার ॥

আল্লাহর প্রতি এই নির্ভরতা নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনুসারী এবং সৈন্যগণ এ থেকে লাভ করে অশেষ উদ্দীপনা এবং উৎসর্গের ঐকান্তিক আবেগ। নবীর উৎসাহে–

নির্ভয় হইয়া সব হরিষ হইল।
সবের মনেতে বহু বিক্রম বাড়িল ॥
নবীকে প্রণামি সবে সুসজ্জ হইয়া।
ধরিয়া নানান অস্ত্র রহিলা রুষিয়া ॥
তবে নবী মন ভাবি নিজ সৈন্যগণ।
বিচক্রিয়া দিলা নবী নিজ সৈন্যগণ ॥

www.pathagar.com

অত:পর 'নবীকে প্রণমি সবে সুসজ্জ' হয়ে সংগ্রামে অগ্রসর হলো। আবু বকর [রা], ওমর [রা], ওসমান [রা] প্রমুখ বায়ুগতিসম্পন্ন সহস্র সহস্র বীর যুদ্ধে গমন করলেন। নবী নিজেও 'সুসজ্জ' হলেন। প্রসঙ্গত জৈনুদ্দীন বলেছেন–

তার পাছে সুসজ্জ হইলা নবীবর।
[আকাশে উদিত যেন হইল শশধর ॥]
ধবল আর্শ্বেত নবী আরোহিলা যবে।
আকাশের মেঘ ছায়া ধরিয়াছে তবে ॥
নি:সরিল নবীবরে সঙ্গে অশ্ববার।
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার ॥

যুদ্ধে নবীর এই মূর্তি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধায় তিনি তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক ভাবমূর্তি চিত্রিত করেছেন। নবীর এই বীর মানবিক চিত্র দেব-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের অতিলৌকিক পরিবেশের ব্যতিক্রম। এ চিত্র আরবি-পারসি ঐতিহ্য নির্ভর। সাধারণ বা চোখে দেখা মানুষের মত নবী জীবনকে উপজীব্য করে আখ্যান কাব্য রচনার ধারা আরবি-পারসি সাহিত্যে ছিল।

কবি যুদ্ধ বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন, জয়কুম পক্ষের মহাবীর জোনাবিল পরাজিত হয়ে নবীর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে এবং আশীর্বাদ লাভ করে। ইসলাম গ্রহণের পর সে নবীপক্ষ হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। যুদ্ধে জয়কুমের পুত্র, আত্মীয় কেউ নিহত হলো, কেউবা কলেমা পড়লো।

অত:পর রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়কুম রাজের আদেশে একশত কূপ খনন করে তার মুখে 'ঢাকনি' দিয়ে গোপনে আবরণ দেওয়া হল। প্রভাতে যুদ্ধ করতে এসে আলী [রা] এই কূপে পড়ে গেলেন। চারদিক থেকে শূল ও বাণ বর্ষিত হতে লাগল। এ খবর শুনে নবী চিন্তিত হলেন এবং আলীকেই উদ্ধারের জন্য সম্মুখ সমরে অগ্রসর হলেন। কবি বলেন–

যেই দিকে চলে আসি প্রভুর সখার।
সেই দিকে বহ এ নদী অতি স্রোতধারা ॥
লক্ষ লক্ষ মৃত অঙ্গ পড় এ চতুর্ভিত।
শত শত মত্তকরী পড় এ ভূমিত ॥
নানা ছত্র নানা অস্ত শেল শূল শর।
দিগ দিগন্তের ভরি রহে ভূমি 'পর ॥

বহু কষ্টে আলী [রা] কূপ থেকে উদ্ধার পেলেন। তখন তাঁর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। আলী [রা] সমস্ত কথা নবীকে বললেন,

www.pathagar.com

এতেক শুনিয়া নবী করুণা অন্তর।
আলীর অঙ্গেতে বুলাইয়া নিজ কর ॥
যত সব ঘাত তার শরীর মাঝার।
ক্ষত নাহি হৈল হেন পূর্বের আকার ॥

আরোগ্যান্তে আলী [রা] আবার যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এবার প্রতিশোধ বাসনায় তাঁর বল-বীর্য চতুর্গুণ হয়ে দেখা দিল। আর–

শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়া হায়দার।
মারেন্ত আছাড়ি সব ভূমির উপর ॥
অতি কোপে ধরি শত কবিবর দন্ত।
ভ্রমাই ক্ষেপন্ত সৈন্য মারন্ত অনন্ত ॥
যদি কভু সম্মুখে দেখেন্ত গিরিবর।
উপাড়ি ক্ষেপন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য পর ॥

জয়কুম যত বড় বীরকেই তাঁর সামনে পাঠায় সে নিহত হয়। 'অকালেতে হৈল যেন প্রলয়ের কাল।' জয়কুমের সৈন্যগণ যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল তখন স্বয়ং রাজা নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বহু মুসলমান সৈন্যকে বন্দী করে সে নবীর মুখোমুখী হয়। তার উদ্ধত আচরণে নবী কুপিত হয়ে তাকে ধরে কুমোরের চাকের মত ঘুরিয়ে শূন্যে নিক্ষেপ করলেন। সে যখন পড়লো তখন পুনরায় তাকে ধরে নবী বললেন–

মুসলমান হইবা কিংবা যাইব যমপুর।

জয়কুম তখন নবীর কাছে প্রার্থনা করলো–

নবীর বচন শুনি নিজ মনে গুনি।
ভ্রুকুটি করিয়া সবে কহে পুনি পুনি ॥
কাতর বচন কহে কর পরিত্রাণ।
ন মারহ মহাশয় আনিমু ঈমান ॥

নবী তাকে কালেমা পড়ালেন, শোনালে দীনের বৃত্তান্ত। জৈনুদ্দীনের কাব্যে এ পর্যায়ের অবাস্তবতা, গ্রাম্যতা এবং অনৈতিহাসিকতা লক্ষ্য করা যায়। কোন বৈষয়িক ধনরত্ন লাভ, সাম্রাজ্য বিস্তার কিংবা শত্রু-নিধন নবীর উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য কাফেরকে কালেমা পড়ানো এবং সে কারণে তিনি জয়কুম রাজ্য আক্রমণ করেছেন– তাত্ত্বিকভাবে একথাও সত্য নয়। নবীর আদর্শ এমনটি ছিল না।

বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনায় কাব্যের সর্বত্রই নৈপুণ্য এবং উপমা প্রয়োগের চমৎকারিত্ব ছড়িয়ে আছে। কবি জৈনুদ্দীনকে সমগ্রভাবে বিচার করলে, একজন শক্তিমান কবি বলে নি:সন্দেহে অভিহিত করা চলে। এমনকি রামায়ণ–মহাভরতাকারদের সম-আসন পাবার

www.pathagar.com

যোগ্যতা তাঁর আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে আমরা কেবলমাত্র আরব দেশের পারিপার্শ্বিক ও প্রতিবেশ বর্ণনা পাই না, বরং সর্বত্রই বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিকথাই প্রতিভাত লক্ষ্য করি।

তাঁর কাব্যে অনেক অতিকথন আছে, অলৌকিকতা আছে, অবাস্তবতা আছে তবু- 'এই রসূল বিজয়' দিয়েই বাংলা ভাষায় চোখে দেখা রক্ত মাংসের মানুষের জীবন কথা বা চরিত কথা লেখার শুরু। এ ধরনের রচনাকে বলা চলে ঐতিহাসিক ব্যক্তির 'কাল্পনিক রূপায়ণ বা অনৈতিহাসিক জীবন চরিত।'

শুধু 'রসূল বিজয়' নয়, মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ নবী, পীর, বুজুর্গ, অলী-দরবেশ, বীরপুরুষদের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করতে বাস্তব-অবাস্তব সম্পর্কে তাদের কোন দ্বিধা থাকতো না। তাই গৌবর প্রচার অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে অগৌবরতুল্য।

ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, ইসলামে উন্মেষকালের বিজয় কাহিনী বর্ণনার সময় কবিদের মনে জেগে উঠেছে পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম বিজয় অভিযানের ছবি। তাই কাফের হলো হিন্দু, রাজা মাত্রই ব্রাহ্মণ। এসব অভিযানের মূলে ধন বা রাজ্য লোভ নেই, আল্লাহর মহিমা প্রচার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল এদের লক্ষ্য। কবিদের বর্ণনার মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য-গর্বী স্বাপ্নিক মনের পরিচয় আছে। জৈনুদ্দীনের কাব্যে এসব বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান।

পাণ্ডুলিপির প্রথমের যে আট পৃষ্ঠা যা আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে- অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে তাতে বন্দনা, প্রশস্তি এবং কবি, কবির পীর ও পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় আত্মবিবরণী আছে বলে মনে হয়। পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলে নাম পৃষ্ঠা বা পুষ্পিকা সূত্রে পুঁথিখানির নাম জানা যায় না। তবে ভণিতাদৃষ্টে মনে হয় পুঁথিখানির নাম 'রসূল বিজয়।'

কবি 'রাজরত্ন শ্রীযুক্ত ইউসুফ খানের আরতির জন্য পীর শাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করে' রাসূল বিজয় রচনা করেছেন। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আদেশেই কবি রসূল বিজয় কাব্যখানা রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জৈনুদ্দীনকে ১৫ শতকের শেষার্ধের কবি বলে মনে করেন। সাহিত্যবিশারদ সাহেব এ গ্রন্থটিকে ১৩২০ খ্রীস্টাব্দের কবি বলে অনুমান করেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে, যদি ইউসুফ খানকে গৌড়ের সুলতানের পুত্র বলে স্বীকার করা যায়, তবে জৈনুদ্দীনের কাব্যের রচনাকাল ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে বলে ধরে নেওয়া যায়।

তিন.

শা' বারিদ খান [আনুমানিক ১৪৪০-১৫৫০] মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর 'রসূল বিজয়' কাব্যে হযরত মুহাম্মাদ [সা] এবং জয়কুম রাজার মধ্যে

www.pathagar.com

সংঘটিত কাল্পনিক যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জয়কুম রাজার লড়াই কাহিনী কয়েকজন কবির কাব্য বিষয় হলেও শা' রাবিদের বর্ণনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁর কাব্যে এ যুদ্ধ বর্ণনার মূল আবেগ হলো বিপুল সমর কৃতিত্বের জন্য হযরত আলীর প্রতি রাসূলের সংবর্ধনা।

জয়কুম পুত্র সালারকে আলী [রা] পরাজিত ও বন্দী করেন। রাজা এতে শোকার্ত হন। তারপর বর্ণিত হয়েছে আলী ও জয়কুমের দ্বিতীয় পুত্র মুলুক শাহের যুদ্ধ। সে যুদ্ধেও আলী [রা] বিজয়ী হন এবং মুলুক শাহ বন্দী হয়। অত:পর জয়কুমের তৃতীয় পুত্র খাকান যুদ্ধে আগমন করে। খাখানের সঙ্গে আলী [রা], হানিফা প্রমুখের কয়েক দফা যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত আলীর [রা] হাতে বন্দী হয়।

এ কাব্যের বেশ কয়েক দফা যুদ্ধ হলেও রাসূল প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছেন একবার– সে হলো কাওয়াসের যুদ্ধ [পঞ্চম যুদ্ধ]। ইরাকরাজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, এ সময় হযরত আলী [রা] কূপে পতিত হন। এবারে স্বয়ং রাসূল [সা] যুদ্ধে গমন করলেন। আল্লাহকে স্মরণ করে নবী সমরে চলেন। নবীর সমুদয় সৈন্য 'আল্লাহো বুলিয়া'। কবি বলেন–

কওয়াস সহিত হইল নবীর সংগ্রাম।
মহাবলবন্ত সেহ রণে অনুপম ॥
রসূলকে ধরিতে কওয়াস আইল ধাই।
পয়গাম্বরে তার কটি ধরিলেন্ত যাই ॥

কওয়াসকে নবী সমুচিত শিক্ষা দিলেন। রাসূলের [সা] পক্ষে হযরত আলী [রা], মোহাম্মদ হানিফা [রা], আবু বকর [রা], আবু হুরায়রা [রা] প্রমুখ অসম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়কুম ও তৎপক্ষীয়দের পরাস্ত ও বন্দী করেন।

যুদ্ধের ময়দানে বিপক্ষীয় যোদ্ধাকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানান, ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের প্রাণ রক্ষা হবে। ইসলাম প্রচার ছাড়া এ যুদ্ধের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এই যুদ্ধ-কাহিনীর মত কাল্পনিক যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণনায় মুসলমান পক্ষের জয়, সকল বাধা তাদের কাছে তুচ্ছ। হিন্দুদের পরাজয় এবং ইসলাম গ্রহণের পরিচয় আছে।

রাসূলের [সা] প্রতি অনুসারীদের চরম আনুগত্যের বহু ঐতিহাসিক নজির আছে, অন্যদিকে তাঁদের প্রতি নবীর ভালবাসারও বিস্তর পরিচয় আছে। যুদ্ধের মাঠে চরম বিপদের সময়ও এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না কবি বলেছেন, আলীকে দেখে রাসূল [সা] আনন্দিত হলেন এবং 'চুম্বন করিয়া পুনি কৈলা আলিঙ্গন'।

জৈনুদ্দীন ও শা' বারিদ খান উভয়ের 'রসূল বিজয়' কাব্যেরই বিষয়বস্তু প্রায় এক, তবে সমালোচকের মতে, পাণ্ডিত্যে ও কাব্যকলায় শা' বারিদ খান জৈনুদ্দীন হতে শ্রেষ্ঠ।

চার.

সৈয়দ সুলতান [১৫৫০-১৬৪৮] সাধক ও কবি ছিলেন। ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি হযরত মুহাম্মাদের [সা] জীবনী বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। তাঁর

www.pathagar.com

'নবীবংশ' বিশাল গ্রন্থ। এ গ্রন্থ নবীবংশ, শবে মেরাজ, রসূল বিজয় [জয়কুম রাজার লড়াই], ওফাতে রসূল, রসূল চরিত এই কটি পর্বে বিভক্ত।

সৈয়দ সুলতান রচিত 'জয়কুম রাজার লড়াই' হযরত মুহাম্মাদের [সা] জীবন নিয়ে লেখা কাল্পনিক কাব্য। কবি জৈনুদ্দীনের 'রসূল বিজয়' এবং শা' বারিদ খানের 'রসূল বিজয়' থেকে এ কাব্যের তেমন কোন স্বাতন্ত্র্য বা মৌলিকতা নেই। মূলত রাসূল ও জয়কুমের মধ্যে সংঘটিত কাল্পনিক যুদ্ধ কাহিনীই এর বিষয়বস্তু। তাই এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। আর্মেনিয়ায় জয়কুম নামে কোন রাজা ছিলেন একথা সত্য হলেও রাসূলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের একজন শক্তিমান কবি। তাঁর 'নবীবংশ' বিশাল কাব্য এবং বাংলায় হযরতের জীবনীমূলক এত বিস্তারিত কাব্য তাঁর আগে এবং পরে আর কেউ রচনা করেননি। ইতিহাস, কিংবদন্তী এবং কল্পনা এ কাব্যের অবয়ব নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। তাঁর রসূল বিজয় বা রাসূল সংক্রান্ত কাব্যগুলোরও স্বভাব এই। বাংলা এবং ভারতীয় জীবন সংস্কার, বিশ্বাস ও প্রতিবেশ এ কাব্যে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঁচ.

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করছি যে, অলৌকিক বীরত্বে নবী কাফেরদের পরাজিত করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি অচিন্তিতপূর্ণ কৌশল ও শৌর্য প্রদর্শন করেছেন। এ বিষয়বস্তু সংবলিত কাব্যকে কবিরা সাধারণত 'রসূল বিজয়' রূপে নামাঙ্কিত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূলের যুদ্ধ বৃত্তান্তকে 'জঙ্গনামা' বলা হয়েছে এবং তার আসল বক্তব্য 'রসূল বিজয়' সদৃশ।

জৈনুদ্দীনের রাসূল বিজয়ের মত প্রায় সকল বিজয় কাব্যেই কাল্পনিকতার প্রাধান্য খুব বেশি। স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে কবিরা ছিলেন অনেকটা উদাসীন। কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে শিল্প সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছিলেন তারা। তাই সকল ক্ষেত্রেই কল্পনার মিশ্রণ রয়েছে প্রচুর। তবে রাসূলের বীরত্ব গাঁথা প্রচার ছিল কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য।■

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, ড. বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত– বাংলা একাডেমী : ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৩।

২. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [দ্বিতীয় খণ্ড] স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৮।

৩. আহমদ শরীফ সম্পাদিত জয়েন উদ্দীন বিরচিত 'রসূল বিজয়' : সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রকাশকাল : ১৩৭০ বাংলা, শীত সংখ্যা।

www.pathagar.com

সুশীল সমাজ গঠনে বিশ্বনবীর [সা] সুষম অর্থনীতি

ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম

সুশীল সমাজ

বর্তমান যুগে 'সুশীল' শব্দটির প্রয়োগ অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী লক্ষণীয়। বিশেষ করে 'সুশীল' শব্দটি 'সমাজ' শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে ইদানিং বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। সুশীল সমাজ গড়ার প্রত্যয় আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ এমনকি আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের মুখেও অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে। 'সুশীল' শব্দটিকে ইংরেজীতে "Good Natured, Gentle, well behaved, having a good charracter" বলা হয়। বাংলাতে 'সুশীল সমাজ' পরিভাষাটি আজকাল অপরাধমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত' সমাজ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে হলে, যে সমাজে কোন অপরাধপ্রবণতা চর্চা হয় না, যে সমাজে বসবাস পূর্ণ নিরাপদ, প্রতিটি মানুষ তার নিজের মৌলিক অধিকার কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায় তাকে সুশীল সমাজ বলে। সুশীল সমাজ গঠনের জন্য কিছু অনিবার্য শর্তাবলী রয়েছে। সেই শর্তাবলী পূরণ হওয়া ব্যতীত কোন সমাজ সুশীল সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে না। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো হচ্ছে–

www.pathagar.com

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

সমাজের সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সুশীল সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরী। যে সমাজের রাঘব বোয়ালরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে, আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করবে, সে সমাজ কখনো সুশীল সমাজ হতে পারে না। দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল থেকে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত যে কেউ, যে কোন অপরাধ অন্যায় করলে প্রচলিত আইনের আওতায় তার বিচার কার্য সম্পাদিত হবে, এটিই সুশীল সমাজের অনিবার্য দাবী। এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূলের [সা] ঐতিহাসিক বাণী হচ্ছে- "যদি ফাতিমাহ বিনতি মুহাম্মাদ [সা] চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।" [সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৬২]

উল্লেখ্য যে, মানুষের কোন না কোন সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে যে কোন মানুষ কর্তৃক, পরিপূর্ণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব না হলেও বেশ দুরূহ। তবে হ্যাঁ, সে আইন যদি বিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত হয়, আর তার প্রয়োগ যদি সৎ লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাহলেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিশ্বনবী [সা] মূলত সেই আইনের শাসনই প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।

সৎ লোকের শাসন

সৎ লোকের কাছে ছাড়া যে কোন আইন নিরাপদ হয় না। সেজন্য সুশীল সমাজের জন্য যেমন প্রয়োজন আইনের শাসন, তেমনি প্রয়োজন সৎ শাসকের। সেই জন্য মহান আল্লাহ অমোঘ নীতিই হচ্ছে সৎ ব্যক্তিদেরকেই তিনি এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন–

নিশ্চয় পৃথিবীর উত্তরাধিকার হয় আমারই সৎবান্দাগণ। [সূরা আম্বিয়া-১০৫] তবে পৃথিবীর এই সৌভাগ্য লাভের জন্য মানুষদেরও সৎ শাসক লাভের ভূমিকায় সক্রিয় থাকা আবশ্যক। আল্লাহর ভাষায়– "আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য না পরিবর্তন না করে। [সূরা আর-রা'আদ-১১]

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

একটি পশুর সমাজ আর মানুষের সমাজের মধ্যে মূল পার্থক্য যে বিষয়টি নির্ধারণ করে তা হচ্ছে জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতার এই গুরুত্বের কারণেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "নিশ্চয় চুল, কান ও অন্ত:করণ সবকিছুর জন্য জবাবদিহি করা হবে।" [সূরা বনূ ইসরাঈল-৩৬] বিশুদ্ধ হাদীসেও জবাবদিহিতার বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। যে যা ইচ্ছা তাই করবে, এমন সমাজ কনো সুশীল সমাজ হতে পারে না। সমাজের যে কোন প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর ব্যক্তিও জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য। কোন সমাজে এই রীতির প্রচলন সুশীল সমাজের পরিচয়ই বহন করে। বিশ্বনবী [সা] মূলত সেই জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সমাজই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

www.pathagar.com

সুষম অর্থনীতি

যে অর্থনীতি কাউকে বঞ্চিত করে না। যার অধিকার তাকে পাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, যে অর্থনীতি উন্নয়নের পথে কোন বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করে না, যা মানব কল্যাণে অবদান রাখে তাকেই সুষম অর্থনীতি বলা হয়। আসলে সুষম অর্থনীতির বিকাশ ছাড়া কোন সমাজকে সুশীল সমাজ বলা যায় না। মূলত: মানুষের রচিত কোন অর্থনীতি কোন সমাজে অর্থনৈতিক দাবী পূরণ করতে সম নয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রী অর্থব্যবস্থা, মিশ্র অর্থব্যবস্থার অসারতাই এর উজ্জ্বল সাক্ষী। এই সব অর্থনীতি মূলত: মানবতাকে সমস্যামুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে বিশ্বনবীর [সা] শাশ্বত অর্থব্যবস্থাই মূলত: সমস্যায় নিমজ্জিত এই মানবতাকে অগ্রগতির রাজতোরণ উপহার দিতে সক্ষম। খোলাফায়ে রাশিদার যুগই তার বাস্তব প্রমাণ।

উল্লেখ্য যে, সুশীল সমাজ গঠনের জন্য উল্লেখিত এই অনিবার্য বিষয়গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে বমান প্রবন্ধটি শুধু মাত্র সুষম অর্থনীতি তথা বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির সাথে জড়িত বিধায় আমরা এখানে সুশীল সমাজ গঠনে শুধুমাত্র বিশ্বনবীর [সা] শাশ্বত অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ভূমিকাই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুশীল সমাজ গঠনে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি

দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক দুর্নীতি দমন, অর্থের সুষম বণ্টন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুষম শ্রমনীতি, সুন্দর বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূলত: একটি সুশীল সমাজ গঠনের জন্য অর্থনৈতিক যে পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত জরুরী, উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো তন্মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি একটি সুষম সুন্দর ও সুশীল সমাজ গঠনে উল্লেখিত এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানে আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে তাইই।

অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি

মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু অর্থনৈতিক অপকর্মসংস্থান করে নিয়েছে, যা মূলত: সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে কুরে কুরে খেয়ে ধ্বংস করে ফেলছে; যার অনিবার্য পরিণতিতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। সুষম অর্থনীতি বিকাশ লাভ করতে পারছে না বিধায় এখানে সুশীল সমাজ গঠন সম্ভব হচ্ছে না। সে জন্য সুশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বনবী [সা] সমাজ থেকে এই অর্থনৈতিক ব্যাধিগুলো উৎপাটনের চূড়ান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আজ যদি বাংলাদেশে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির সেই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হত, তাহলে বাংলাদেশই হত বিশ্বের দরবারে সুশীল সমাজের স্পষ্ট নমুনা। সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে যেসব অন্তরায় পরিলক্ষিত হয়, বিশ্বনবীর [সা] শাশ্বত ইসলামী অর্থনীতি সেগুলোর মূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর। সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এসব অন্তরায় সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

সুদ

মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত, যা কোন সম্পদের বিনিময় ছাড়াই গ্রহণ করা হয় তাকেই সুদ বলে। এই সুদ ঝুঁকি ছাড়াই সুদ দাতাকে সুদ গ্রহিতার নিকট থেকে যুলুম করে মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পথ উন্মুক্ত করে, যা দিন দিন সুদ গ্রহিতাকে দরিদ্র হতে বাধ্য করে। এই সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক শ্রেণীর লোককে দরিদ্র হওয়ার পথ সুগম করে, যা সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। তাই সুশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সুদকে বিশ্বনবী [সা] অভিসম্পাত দানের মাধ্যমে হারাম ঘোষণা করেছে। সুদী অর্থ ব্যবস্থ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে, এর সাথে জড়িত সকলকে বিশ্বনবী [সা] অত্যন্ত শক্ত ভাষায় তিরস্কার করেছে। বলা হয়েছে :

"রাসূল [সা] সুদদাতা, গ্রহিতা, এর লেখক ও এর দুই সাক্ষীর উপর অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, এরা সকলেই সমান।" [মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮৮] এ বিষয়ে বিশ্বনবী [সা] আরো বলেন–

"কোন মানুষের জানা অবস্থায় এক দিরহাম সুদ ভক্ষণ করা, ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।" [মুসনাদি আহমাদ, খ. ৫, পৃষ্ঠা-২২৫] অন্যত্র এসেছে–

"মি'রাজের রাত্রিতে যখন আমরা সপ্তম আসমানে উপনীত হলাম, তখন উপরে দেখলাম বজ্র,বিদ্যুৎ ও প্রচণ্ড শব্দ; এরপর আমরা একটি সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম, যাদের পেটগুলো হচ্ছে ঘরের মত, যার মধ্যে অবস্থান করছে সর্পসমূহ, যা বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম হে জিবরীল, এরা কারা? তিনি বললেন : এরা সুদখোর।" এমনিভাবে বিশ্বনবী [সা] সুদভিত্তিক অর্থনীতির মূল উৎপাটন করে সুশীল অর্থনীতির প্রচলন করেছেন।

সুদী অর্থব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচন করে না বরং ধনীকে আরো ধনী হতে সাহায্য করে। আর দরিদ্রকে করে আরো দরিদ্র। সুদী অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রিক আবর্তিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাই এই সত্যের বাস্তব প্রমাণ। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা দারিদ্র্যকেই লালন করে, সেজন্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সুশীল সমাজ উপহার দিতে পারেনি। পক্ষান্তরে বিশ্বনবী [সা] সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। সুদের সাথে ইসলামের এই বিপরীতমুখী অবস্থান মূলত: ইসলাম যে দারিদ্র্যকে লালন করে না, বরং দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় উৎসের মূলোৎপাটন ও অর্থনৈতিক যুলুমকে নিরসন করে একটি সুশীল সমাজ গড়তে চায়, এটা তারই জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যাংক, এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান এমনকি গ্রাম গঞ্জের ধনীরা এই সুদী কারবারের সাথে জড়িত। সরকারের পরো মদদে এখানে চলছে সুদ গ্রহণের প্রতিযোগিতা। যা মূলত: এ দেশের সুদ গ্রহীতাকে দিনদিন আরো দারিদ্র্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

২০—

www.pathagar.com

শুধুমাত্র ধনী কেন্দ্রিক সম্পদ আবর্তন

সম্পদ যদি শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়, আর তা ব্যবহার করার সুযোগ যদি দরিদ্রদের মোটেও না থাকে, তাহলে দরিদ্ররা দিন দিন দরিদ্র হতে বাধ্য যা সুশীল সমাজের পরিপন্থী। সেজন্য সম্পদ ধনী কেন্দ্রিক আবর্তিত হওয়াকে বিশ্বনবী [সা] করে দারিদ্র্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়েছে। যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই। রাসূল [সা] যাকাত প্রসংগে বলেছেন– "তোমাদের ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বিতরণ করবে।" [সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৫] এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়েই বিশ্বনবীর [সা] শাশ্বত অর্থনীতির অন্যতম মূলমন্ত্র ঘোষিত হয়েছে।

সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হওয়ার উদ্দেশ্যেই বিশ্বনবী [সা] সম্পদ খরচ না করে জমিয়ে রাখাকে অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। এই একই কারণে কার্পণ্য বিশ্বনবী [সা] দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণিত কাজ। রাসূল [সা] বলেন :

"কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষের থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। মূর্খ দাতাও আল্লাহ সুবহানাহুর কাছে কৃপণ আবেদের চেয়ে বেশি প্রিয়।" [তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪২]

সুতরাং দারিদ্র্য সৃষ্টি হতে পারে এই উদ্দেশ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা ও কৃপণ হওয়াকে বিশ্বনবীর [সা] অপরাধ বলে চিহ্নিত করা, বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি যে দারিদ্র্য বিমোচন করে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই আপোষহীন, তারই স্পষ্ট প্রমাণ। তবে দু:খজনক হলেও সত্য যে, অন্য অন্য ধনীদের মতই বাংলাদেশের ধনীরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখায় অভ্যস্ত। কার্পণ্য তাদের ভূষণ, সেজন্য এখানে লাখ লাখ বনি আদম সন্তান অনাহারে অর্ধাহারে কাটাতে বাধ্য হয়, যা সুশীল সমাজ গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

অপব্যয়

অপব্যয় দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সম্পদ যত বেশীই হোকনা কেন, তা যদি অপব্যয় করা হয়, তা হলে অল্পদিনেই তা শেষ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। যার অনিবার্য পরিণতিতে দেখা দেয় দারিদ্র্য, যা সুশীল সমাজের কাম্য নয়। সে জন্য অপব্যয় রোধের মাধ্যমে বিশ্বনবী [সা] দারিদ্র্যের পথ রুদ্ধ করেছে। বিশ্বনবী [সা] অপব্যয়কে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন : "অপব্যয় না করে তোমরা খাও, দান কর এবং পরিধান কর।" [আন-নাসাঈ ২য় খণ্ড, ৪৮ পষ্ঠা] তিনি কোন কিছু অপব্যয় করতেন না। বাংলাদেশে অপচয় রোধের কোন ব্যবস্থা নেই। একশ্রেণীর ধনীরা এখানে অপচয়ের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, যা দেশীয় সুষম অর্থনীতি গঠনে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানে যদি আমরা বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির অংশ অপব্যয় না করার শিক্ষাকে অনুশীলন করতে পারতাম, তাহলে কতই না ভাল হত।

www.pathagar.com

অলস জীবন

কর্মবিমুখ অলস জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না, সে সমাজ যত অলস সে সমাজ তত অনুন্নত। যে সমাজ যত কর্মঠ, তত বেশী সুশীল। যে জাতি যত বেশি কর্মঠ, সে জাতি ততবেশী উন্নত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান আজ উন্নতির কাঞ্চন জংঘায় উন্নীত হয়েছে। কেননা অর্থনৈতিক অবস্থান মজবুতির জন্য তারা সব কিছু ছেড়ে কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। সারাটি জাতিই শুরু করল নিরলস পরিশ্রম। যার ফলশ্রুতিতে আজ তারা সমাসীন হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি জাতিতে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ তারা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছে। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় আজ পরাশক্তি আমেরিকা হেরে যাচ্ছে তাদের কাছে। অলসতা বর্জনের এই বাস্তব সত্যকে কিন্তু রাসূল [সা] ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য সেই ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণকে অলসতা বর্জন করে কর্মতৎপর, কর্মোদ্যম ও কর্মোচ্ছল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাসূল [সা] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে কর্মঠ, পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর হওয়ার জন্য উৎসাহ দিলেন, অনুপ্রেরণা দিলেন।

"রাসূলুল্লাহকে [সা] জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, নিজ হাতে কাজ করে মানুষ যা উপার্জন করে...।"

বিশ্বনবীর [সা] এই ঘোষণা যে কোন মানুষকে কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিটি মুসলিম হয়ে উঠেছে কর্মতৎপর। নিরলস পরিশ্রমী, যা সুষম অর্থনৈতিক বিকাশে রেখেছে অনন্য অবদান, দারিদ্র্য বিমোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা। সুষম সমাজ গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি এ প্রসংগে আরো বলেছেন :

"নিজের হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে কেউ কোন উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে না। আল্লাহর নবী দাঊদ [আ] নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই গ্রহণ করতেন।" [বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০] আলোচ্য হাদীসে স্বউপার্জিত খাদ্য গ্রহণকে সবচেয়ে উত্তম ঘোষণা দিয়ে মূলত: তিনি সকলকে কর্মতৎপর হওয়ার স্পষ্ট উপদেশ দিয়েছেন, যা সকলকে নিজে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়া ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম করে তুলেছে। বিশ্বনবী [সা] মুখের কথার দ্বারাই এক্ষেত্রে শুধু ভূমিকা রাখেননি, তিনি নিজে ব্যবসাও করতেন। নিজ হাতে নিজের সকল কাজ সম্পন্ন করে কথায় ও কাজে অর্থনৈতিক ও সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সকলের মাঝে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য নমুনা হয়ে বিরাজ করছেন। রাসূলের [সা] কর্মঠ ও পরিশ্রমী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করলে আমরা অবশ্যই দিন দিন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারব। ইসলাম তালাক প্রাপ্তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিধি নিষেধ অর্পণ করেছে। এর পরেও রাসূল [সা] যাবির বিন আবদুল্লাহর তালাকপ্রাপ্তা খালাকে নিজের বাগানে খেজুর সংগ্রহের জন্য স্বত:স্ফূর্ত অনুমতি দিয়েছিলেন। [মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯০৬]

www.pathagar.com

অকর্মণ্য ও অলসতা দারিদ্র্যকে অনিবার্য করে, যা সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে সেজন্য বিশ্বনবী [সা] কাউকে যে অকর্মণ্য বসে থাকা পছন্দ করতেন না, এ হাদীসটি তারই প্রমাণ। আমাদের দেশে অসংখ্য লোক বেকার। জনশক্তি উন্নতির একটি উত্তম মাধ্যম। অথচ এদেশ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে এ দেশের চিত্র পরিবর্তন হয়ে যেত।

উৎপাদনযোগ্য সম্পদের অপব্যবহার

উৎপাদনযোগ্য সকল সম্পদ যথাযথ ব্যবহার হলে দরিদ্রতা অনেক অংশে লোপ পায়। সেই প্রেক্ষাপটে উৎপাদনযোগ্য ভূখণ্ড অলস পড়ে থাকাটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। সেজন্য আধুনিক যুগে সকল ভূখণ্ড যাতে চাষাবাদ, খামার বাড়ি, মাছের ঘের প্রভৃতি কাজে যথাযথ ব্যবহার হয়, রাষ্ট্র সেদিক কড়া দৃষ্টি রাখে যা একটি সুশীল সমাজের জন্য খুবই জরুরী। বিশ্বনবী [সা] এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেননি। তিনি সাধারণভাবে ঘোষণা দিলেন :

"যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করবে সে-ই সে জমির মালিক বলে গণ্য হবে। [তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৩] তখন জমির মালিক হওয়ার ইচ্ছায় অনেকেই উৎসাহিত হল। মদীনার উপকণ্ঠে কোন জমি আর অনাবাদী পড়ে রইল না। একইভাবে বিশ্বনবী [সা] বৃক্ষ রোপণ ও কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করলেন সকলকে। তিনি ঘোষণা করলেন :

"কোন মুসলিম কোন গাছ রোপণ করলে অথবা কৃষি শস্য বপন করলে তা থেকে উৎপাদিত ফল বা শস্য পাখী অথবা মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী ভণ করলে তা সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।" [মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬২-৯৬৩]

বর্তমানে পরিবেশ রক্ষার জন্য যে বৃক্ষ রোপণ অভিযান হয়ে থাকে বিশ্বনবীও [সা] সেই সময় এই বৃক্ষ রোপণ ও কৃষি কর্মের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধনের জন্য যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন, এই হাদীসটি তার স্পষ্ট প্রমাণ। কৃষি উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত মানের হওয়াটাও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম, সুশীল সমাজের পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেই তিনি খাইবারের বিজিত এলাকার শস্য ক্ষেত্র কৃষি ক্ষেত্রে পারদর্শী [যা দারিদ্র্য বিমোচনে বেশ সহায়ক হয়েছিল] ইয়াহূদীদের কাছে বর্গা দেন। [যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৪] এ ক্ষেত্রে তিনি বিধর্মীদের সহযোগিতা নিতেও কুণ্ঠিত হননি। বরং কৃষি নির্ভর খাইবরকে আরো উৎপাদনমুখী করার জন্য তিনি এ ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের মত ইসলামের চিরশত্রুকেও কাজে লাগিয়েছেন। এভাবে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বনবী [সা] রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করার জন্য জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। এমনিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীভূত করে তিনি সুষম অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কালজয়ী ভূমিকা রেখে সুশীল সমাজ গঠনে এক বিরল অবদান রাখেন। বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ। ভূখণ্ডের আয়তন তেমন বিস্তৃত নয়, তার পরেও এখানের বহু ভূমি অনাবাদী হয়ে রয়েছে। উদ্যোগের অভাবে এ থেকে ফায়দা লাভ সম্ভব হয় না। সেজন্য এ দেশের সরকার ও সচেতন মানুষের বিষয়টির দিকে আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সুষম শ্রমনীতি

ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ একটি শ্রমনীতি। প্রতিটি সমাজের শ্রমিকরা হচ্ছে, একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠি তাদের স্বার্থ যে সমাজে ভূলুণ্ঠিত হয়, যেখানে তারা মজলুম হয়ে বেঁচে থাকে, সে সমাজকে সুশীল সমাজ বলা যায় না। ঠিক একইভাবে মালিক পক্ষ পূর্ণ অধিকার বুঝে না পেলে সেখানেও অর্থনৈতিক সমস্যা জোরদার হয়ে উঠে। সেজন্য শ্রমিককে বলা হয়েছে, সে যেন মালককে ফাঁকি না দেয় আর মালিককে বলা হয়েছে, তাকে সাধ্যাতিরিক্ত কাজ না করাতে। নিজের সমমানের পোশাক ও খাদ্য সরবরাহ করতে। চুক্তি সম্পাদনে স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে। আমাদের এখানে শ্রম আদালতের প্রচলন থাকলেও তা যেমন ইসলামী নয় তেমন কাঙ্ক্ষিত মানেরও নয়। সুশীল সমাজ গড়তে হলে এ বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বিশ্বনবী [সা] কত সুন্দরই না বলেছেন– "শ্রমিকের ঘাম শুকানের পূর্বেই তার পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দাও।" [ইবনে মাজাহ, ৭ খ. পৃষ্ঠা-২৯৮]

সুন্দর বাণিজ্য নীতি

ব্যবসা বাণিজ্যের অংগন আজ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, ভেজাল, মিথ্যা, চুক্তিভংগ, প্রভৃতি অসৎ গুণাবলী চর্চার আখড়ায় পরিণত হয়েছে ব্যবসা জগত। ঠকছে ক্রেতা। ঠকাচ্ছে বিক্রেতা। এগুলো কোন সুশীল সমাজের লক্ষণ নয়। বিশ্বনবী [সা] অর্থনীতি তাই এমনি অনিন্দ্য সুন্দর একটি ব্যবসা নীতি প্রণয়ন করেছে, যা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। বিশেষ বিশেষ হাদীস গ্রন্থের একটি বিরাট অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে এই ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে। সুশীল সমাজ গড়তে হলে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অভিনব এমন কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রয়োজন, যা মূলতঃ দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে সক্ষম। সেজন্য বিশ্বনবী [সা] এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সুশীল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামী ক্রয় বিক্রয় নীতি একেবারেই উপেক্ষিত। যার অনিবার্য পরিণতিতে এ সমাজে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না।

দারিদ্র্য বিমোচনের বিশ্বনবীর [সা] পদ্ধতি

তিনি এ বিষয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন–

দান ব্যবস্থার প্রচলন

বিশ্বনবী [সা] কৃপণ না হয়ে হাত খুলে দান করাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অসংখ্য হাদীসেও এ বিষয়ে বিশ্বনবীর [সা] নির্দেশ এসেছে। বিশ্বনবীর [সা] পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর, বিভিন্ন ধরনের কাফ্‌ফারা, মানত, প্রভৃতির মাধ্যমেও ধনীদের সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা, মূলতঃ বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি যে দারিদ্র্য বিমোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে সুশীল সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। বাংলাদেশের অনেক

www.pathagar.com

ইসলামী এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান ইয়াতীম, গরীব, অসহায়, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য সহযোগিতা, গৃহহীনকে বাসস্থান নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, নবমুসলিমদের পুনর্বাসন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড যে সুশীল সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে তা মূলত: বিশ্বনবী [সা] দান দাক্ষিণ্যের প্রতি যে উদ্বুদ্ধ করেছে তারই ফল।

আয়ের উৎস উদ্ভাবন

বিশ্বনবী [সা] দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয়ের বেশ কিছু উৎসকে অনুমোদন দিয়েছেন। এ সকল উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ ও সুষম অর্থনীতি বিকাশ তথা সুশীল সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক. খারাজ : [ভূমি-রাজস্ব] মুসলমানদের দ্বারা বিজিত অমুসলিমদের সকল জমি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত হারে প্রতি বছরে যে খাজনা এসব জমি হতে আদায় করার নিয়ম রয়েছে তাকেই আরবীতে খারাজ বলে।

খ. জিযিয়া : এটি মূলত: ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অমুসলিমদের উপর আরোপিত কর। বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকারের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

গ. গাণীমাহ্ : যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে গাণীমাহ বলে। যার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্র আর বাকী অংশ যোদ্ধাগণই প্রাপ্ত হন। এই সম্পদের বণ্টননীতি আল কুরআনে উল্লেখ হয়েছে।

ঘ. ফাই : যুদ্ধ না করেই শত্রুদের পরিত্যক্ত যে সম্পদ লাভ করা হয় তাকে ফাই বলে। এভাবে প্রাপ্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। এর বণ্টন সম্পর্কেও কুরআনে আলোচনা এসেছে।

কোন ভূখণ্ডে বিশ্বনবীর [সা] হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে উপরোল্লিখিত উৎসগুলোর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের সম্পদ অর্জন করা সম্ভব, যা মূলত: দারিদ্র্য মুক্ত সুশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উত্তরাধিকার আইন

বৃটিশদের উত্তরাধিকার আইনে পিতার বড় পুত্রই পিতার সকল সম্পদের মালিক হয়। বৃটিশদের এই নিয়ম একজন ব্যতিত সকল পুত্রকন্যাকে দরিদ্র করে রাখার অপকৌশল। পক্ষান্তরে বিশ্বনবীর [সা] উত্তরাধিকার নিয়মে সকল সন্তানকেই সম্পদের ভাগ দেয়া হয়। যা মূলত: অন্যদেরকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার পথ উন্মুক্ত করে। বিশ্বনবীর [সা] এই সুন্দর উত্তরাধিকার নিয়ম, দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বনবীর [সা] দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখিত এই উৎসগুলোর চেয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা, সুশীল সমাজ গঠনে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। এখানে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

www.pathagar.com

যাকাত

যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধিকরণ, বেড়ে যাওয়া, বরকতময় হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, বিশুদ্ধ হওয়া। পরিভাষায় প্রত্যেক সাহেবে নেসাব মুসলমান তার মাল ও সম্পদ থেকে ইসলামী শরীয়াতে নির্ধারিত অংশটুকু নির্ধারিত হকদারদেরকে দিয়ে দেয়াকে যাকাত বলে। ফসলের 'উশরও যাকাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন– "কিয়ামতের দিন যারা যাকাত দেয় না তারা জাহান্নামী হবে।" [আল-মু'জামুল কাবীর ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪] বিশ্বনবী [সা] বলেন– "কোন সম্প্রদায় যাকাত না দিলে মহান আল্লাহ তাদের উপর দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করেন।" [আল-মু'জামুল আওসাত ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৭] এমনি অসংখ্য হাদীসে বিশ্বনবীর পক্ষ থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে যাকাত থেকে বিরত থাকার ভয়ংকর পরিণতি ও জঘন্য পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ফসলের যাকাত দেয়ার বিধানও চালু করেন। ফকীহদের দৃষ্টিতেও যাকাতের অপরিসীম গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। তাদের মতে, কেউ যাকাত আদায় না করে মৃত্যু বরণ করলে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত আদায় করা ছাড়া তার সম্পত্তি বণ্টন করা যাবে না। সুতরাং যাকাত একটি অপরিহার্য বিষয়। এমনিভাবে কুরআন, হাদীস ও ইসলামের মনীষীদের দৃষ্টিতে যাকাত যে, দারিদ্র্য বিমোচনে তথা সুশীল সমাজ গঠনে আপোষহীন ভূমিকা রাখে সেই বাস্তব সত্যই ফুটে উঠেছে। দু:খজনক হলেও সত্য যে, এ দেশে প্রায় দুই লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে যা মূলত: সালাতের ফরযিয়াতের ক্ষেত্রে সচেনতারই প্রতীক। তবে যাকাতের মত ফরযিয়াতের ক্ষেত্রে নামে মাত্র একটা যাকাত বোর্ড ব্যতীত কিছুই নেই। এ বিষয়ে আমাদের সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা অত্যাবশ্যক। এ দেশে যাকাত এখনো ঐচ্ছিক দান বলে বিবেচিত। আর যারা যাকাত দেন তারাও এর দাবী যথাযথভাবে পূরণ করেন না। সেজন্য যাকাতের সুফল থেকে এ দেশ বঞ্চিত। আসলে এখানে সুষম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাকে সুশীল সমাজ গঠনের অনিবার্য শর্ত বলে যা কিছু তুলে ধরা হল তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমেও সম্ভব নয়। সরকারকেই এর মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। আর ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই প্রত্যাশা অবান্তর।

উপসংহার

বাংলাদেশ আজ দুর্নীতির শীর্ষ তালিকার একটি দেশ। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, হত্যা, সন্ত্রাস, প্রভৃতি এমন কোন অপরাধ নেই যা বাংলাদেশে সংঘটিত হয় না। এগুলোর সিংহভাগ কিন্তু কোন না কোন পর্যায়ে অর্থনীতির সাথে জড়িত। ইসলাম আল্লাহ প্রণীত এক সুষমা সুন্দর শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। আর বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতিও সেই জীবন ব্যবস্থারই অংশ। ইসলামী বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি তাই আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি। পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে, সুশীল পৃথিবী হিসাবে রূপান্তর করতে হলে এই অর্থনীতির কোন বিকল্প নেই। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ এমনকি মিশ্র অর্থনীতিও যে সুশীল

www.pathagar.com

সমাজ গঠনে ব্যর্থ হয়েছে, এসব মতবাদের সুতিকাগারগুলোর আত্মহত্যা তারই প্রমাণ। সুতরাং সুশীল সমাজ গঠন করে এই পৃথিবীর মানবতাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির বাস্তবায়ন আজ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বাস্ত বতাকে মেনে নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ যদি আজ ইসলামী বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতিকে অনুসরণ করত তাহলে এই বাংলাদেশ অবশ্য অবশ্য একটি সুশীল সমাজে রূপ নিত।

সুপারিশসমূহ

১. সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ক্ষেত্রে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির বাস্তবায়নের আন্দোলনকে জোরদার করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক।

২. বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতিতে যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সকল সাহিবে নিসাব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কেউ যাতে যাকাত ফাঁকি না দিতে পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।

৩. অবৈধ অর্থ চর্চা, যেমন সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকার পরে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা অপরিহার্য।

৪. বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতির সুফলকে সমাজের সকল লোকের কাছে যথাযথ ব্যবহার ও সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা জরুরী।

৫. সুশীল সমাজের ধারণা ও মানব কল্যাণে এর অবদান সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. বিশ্বনবীর [সা] ব্যবসা নীতি ও শ্রমনীতির উপকারিতা জনগণকে বুঝাতে হবে।

৭. পূর্ণ বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ইসলামী সরকার ব্যতীত অসম্ভব, সেজন্য ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

৮. যে নামেই হোক না কেন বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি আন্দোলনের জন্য একটি সংগঠন অতীব জরুরী। দেশের সকল শিক্ষিত নাগরিক সে আন্দোলনে শরীক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. অনৈসলামী অর্থনীতির কুফল ও তার নেতিবাচক প্রভাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে।

১০. দেশের আলেম সমাজকে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি বুঝানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে বিশ্বনবীর [সা] অর্থনীতি পাঠ্যভুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইসলামী অর্থনীতি অনুষদ/বিভাগ চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে।■

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের [সা] ব্যক্তিজীবন

ফখরুদ্দীন আহমাদ

আল্লাহর রাসূলের [সা] ব্যক্তিজীবন ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। তাঁর স্বভাব-চরিত্র এত উন্নত, পবিত্র ও বরফ শুভ্র ছিল যে আইয়ামে জাহিলিয়াতের অসভ্য ও বর্বর মানুষেরা নবুওয়ত লাভের আগেই তাঁকে 'আল-আমীন' বা একমাত্র বিশ্বস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

> "হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা আল-কলম : ৪]

একজন মানুষকে তখনই চরিত্রবান বলা যায় যখন তার কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, চলা-ফেরা, লেন-দেন, কাজ-কারবারসহ সকল বিষয় সুন্দর, সঠিক ও সাবলীল হয়। উপরের আয়াত থেকে বুঝা যায়, এসব ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন অনন্য সাধারণ। যেহেতু তাঁর চরিত্রই সঠিক চরিত্র তাই পৃথিবীর সকল মানুষকে তাঁকেই অনুসরণ করে চলতে বলা হয়েছে।

> "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাব : ২১]

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ কিন্তু আল্লাহর এই কথার কোনই মূল্য দিচ্ছে না, অর্থাৎ তারা রাসূলকে [সা] মডেল বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করছে না; কিন্তু ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন কোন ক্ষেত্রেই না! বরং তারা মডেল হিসেবে এমন সব লোকদের বেছে নেয় যাদের চরিত্র বলে কিছু নেই।

যারা সত্যিকার মুসলিম হয়ে জীবন যাপন করতে চান তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের [সা] চরিত্র অনুসরণ করতে হবে। তিনি কেমন ছিলেন, কী পছন্দ করতেন, কী পছন্দ করতেন না তা জানা খুবই দরকার।

আল্লাহর রাসূল [সা] দেখতে কেমন ছিলেন

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল [সা] বেশি লম্বা ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না বরং মধ্যম আকৃতির ছিলেন, দেহ কাঠামো ছিল দারুণ সুন্দর, চুল বাঁকা ছিল না একেবারে সোজাও ছিল না, গায়ের রঙ গৌর বর্ণের, হাঁটার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। [শামাইলুন নাবিয়্যী, হাদীস নং-২]

❖ জাবির ইবনে সামুরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জোসনা রাতে আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] দেখেছি। তাঁর গায়ে লাল চাদর ছিল। আমি একবার তাঁর দিকে একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম; আমার কাছে মনে হয়েছে আল্লাহর রাসূল [সা] চাঁদের চেয়ে অনেক সুন্দর। [ঐ, হাদীস নং-৯]

❖ আবু রিমসা আততাইমী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পুত্রসহ নবীর [সা] কাছে এলাম। লোকেরা নবীকে [সা] দেখিয়ে দিলো, আমি তাঁকে দেখে বলে ফেললাম, ইনি সত্যিই আল্লাহর নবী। তাঁর গায়ে ও পরনে দু'টি সবুজ কাপড় ছিল এবং তাঁর কয়েকটি চুলে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, যা ছিল লাল বর্ণের। [ঐ, হাদীস নং-৪২]

আল্লাহর রাসূলের [সা] জীবন যাপন

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলের [সা] পছন্দের পোশাক ছিল ইয়ামানী বুটিদার চাদর। [শামাইলুন নাবিয়্যী, হাদীস নং-৬০]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীর [সা] একটি রূপার আংটি ছিল, তাতে লাল রঙের আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। [ঐ, হাদীস নং-৮৪]

❖ আসমা বিনতে ইয়াযীদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর [সা] জামার হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত। [ঐ, হাদীস নং-৫৬]

❖ মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] একটি রুমী পোশাক পরেন, সেটির হাতা ছিল ছোট। [ঐ, হাদীস নং-৬৮]

❖ আবু সাঈদ আল-খুদরী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] নতুন কাপড় পরার সময় সেটির নাম বলতেন– পাগড়ী, জামা, চাদর। তারপর বলতেন, "হে আল্লাহ! প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্য। এ কাপড় তুমিই আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার নিকট এ কাপড়ের কল্যাণ এবং যে জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে সে কল্যাণ প্রত্যাশা করি। এ

www.pathagar.com

কাপড়ের মধ্যে যদি কোন অকল্যাণ থাকে এবং এটি যদি খারাপ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে তবে সে অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। [ঐ, হাদীস নং-৫৯]

❖ আলী ইবনে আবু তালিব [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। [ঐ, হাদীস নং-৯২]

❖ আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] যখন অযূ করতেন, মাথা আঁচড়াতেন বা জুতা পরতেন তখন ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। [ঐ, হাদীস নং-৩৩]

❖ উবাইদ ইবনে জুরাইহ্ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে [রা] বলেন, আমি দেখেছি আপনি পশমবিহীন চামড়ার জুড়া পরেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহকে [সা] পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরতে এবং পরা অবস্থায় অযূ করতে দেখেছি, তাই আমি অনুরূপ জুতা পরতে পছন্দ করি। [ঐ, হাদীস নং-৭৬]

❖ যুবাইর ইবনুল আওয়াম [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবীর [সা] গায়ে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। তিনি একটি পাথরের উপর উঠার চেষ্টা করেন, উঠতে পারেননি। তখন তালহা [রা] নিচে বসলে তিনি তাঁর কাঁধে চড়ে পাথরের উপর উঠেন।* যুবাইর বলেন, আমি তখন নবীকে [সা] বলতে শুনলাম, তালহা তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিলো। [ঐ, হাদীস নং-১০৫]

❖ জাবির [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী [সা] কালো পাগড়ী পরে মক্কায় প্রবেশ করেন। [ঐ, হাদীস নং-১০৯]

❖ হুদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ [রা] থেকে তার দাদা বা নানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন, তাঁর তরবারিটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত। রাবী তালিব [রা] বলেন, আমি তাঁকে (হুদকে) রূপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,তরবারির হাতলে রূপার কারুকাজ ছিল। [ঐ, হাদীস নং-১০৩]

❖ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] আমার জংঘা বা তাঁর নিজের জংঘা ধরে বললেন, এটা হচ্ছে পাজামা [বা প্যান্ট] ঝুলাবার সীমা, এতে যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও তাহলে জেনে রাখ, পায়ের টাখনু স্পর্শ করার অধিকার পাজামার নেই।" [ঐ, হাদীস নং-১১৭]

❖ আবু জুহাইফা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল [সা] বলেছেন, আমি কখনোই কিছুর সাথে ঠেস দেয়া অবস্থায় আহার করি না। [ঐ, হাদীস নং-১২৭]

❖ আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদের [সা] ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁর

* আল্লাহর রাসূল [সা] তখন মারাত্মক আহত। কাফিরদের আক্রমণে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। গুজব রটে যে, রাসূলুল্লাহ [সা] নিহত হয়েছেন। তাই তিনি পাথরের উপর উঠে গুজব মিথ্যা প্রমাণ করে মুসলিমদের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন।

www.pathagar.com

পরিবারের লোকেরা কখনো যবের রুটি দ্বারা তৃপ্তির সাথে পরপর দু'দিন আহার করেননি।* [ঐ, হাদীস নং-১৩৭]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] লাউ খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর জন্য খাবার আনা হলো কিংবা তাঁকে খাওয়ার জন্য ডাকা হলো। আমি খুঁজে খুঁজে তাঁর সামনে লাউয়ের টুকরা রেখে দিচ্ছিলাম, কারণ আমি জানতাম তিনি লাউ পছন্দ করেন। [ঐ, হাদীস নং-১৫৩]

❖ আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীর [সা] জন্য গোশত আনা হলো এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হলো, তিনি বাহুর গোশতই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেলেন। [ঐ, হাদীস নং-১৬০]

❖ উমার ইবনে আবু সালামা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট গেলেন। তাঁর সামনে খাবার ছিল। তিনি বললেন, হে বৎস! কাছে এসো, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাওয়া শুরু কর। [ঐ, হাদীস নং-১৮৩]

❖ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] খেজুরের সাথে শশা খেতেন।" [ঐ, হাদীস নং-১৯০]

❖ আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর [সা] প্রিয় পানীয় ছিল শীতল মিষ্টি পানি। [ঐ, হাদীস নং-১৯৭]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] পানি পান করার সময় তিনবার নি:শ্বাস নিতেন এবং বলতেন, এভাবে পান করা অধিক আরামদায়ক ও তৃপ্তিকর। [ঐ, হাদীস নং-২০৩]

❖ আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, পুরুষরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার ঘ্রাণ প্রকাশ পায় এবং রং দেখা যায় না আর মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু ঘ্রাণ হালকা। [ঐ, হাদীস নং-২১২]

❖ আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] তোমাদের ন্যায় অবিরাম ও দ্রুত কথা বলতেন না বরং প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথা বলতেন, তাঁর নিকট উপস্থিত ব্যক্তি তা বুঝতে ও মনে রাখতে পারতো। [ঐ, হাদীস নং-২১৫]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] কোন কথা তিনবারও বলতেন, যাতে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। [ঐ, হাদীস নং-২১৬]

❖ আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্ই [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] মুচকি হাসিই দিতেন। [ঐ, হাদীস নং-২২০]

---

* রাসূল [সা] গরীব ছিলেন না, মদীনার প্রেসিডেন্টের খাদ্যেরও অভাব ছিল না। তাঁর দরিদ্রাবস্থার পেছনে দু'টি কারণ ছিল, এক. তিনি খুব বেশি দানশীল ছিলেন। দুই. দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত থাকতে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করেন।

www.pathagar.com

❖ জারীর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুসলিম হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ [সা] আমাকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দেননি এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসতেন। [ঐ, হাদীস নং-২২৩]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী [সা] আমাদের ছোটদের সাথে অবাধে মিশতেন, এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে কৌতুক করে বলতেন, হে আবু উমাইর! কি করেছে নুগাইর [ছোট পোষা পাখি]? [ঐ, হাদীস নং-২২৮]

❖ আল বারাআ ইবনে আযিব [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] শয্যা গ্রহণের সময় তাঁর ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে বলতেন, আমার প্রভু! যেদিন তোমার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবে, সেদিন তোমার আযাব থেকে আমায় রক্ষা করো। [ঐ, হাদীস নং-২২৪]

❖ আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল [সা] [এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নফল] নামায পড়তেন যে, তাঁর দু'পা ফুলে যেত। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হল, আপনি এভাবে নামায পড়ছেন! অথচ আপনার আগের ও পরের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? [ঐ, হাদীস নং-২৫১]

❖ আবদুল্লাহ ইবনে সাদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] জিজ্ঞেস করলাম, নফল নামায ঘরে পড়া ভালো নাকি মসজিদে? তিনি বললেন, তুমি তো দেখেছো আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে, তবু আমি ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায ঘরে পড়তেই ভালোবাসি। [ঐ, হাদীস নং-২৮২]

❖ আবদুল্লাহ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] প্রত্যেক মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন এবং জুমুআর দিনের রোযা খুব কমই ভাংতেন। [ঐ, হাদীস নং-২৮৮]

❖ আবু সালিহ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা [রা] ও উম্মু সালামার [রা] নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট অধিক প্রিয় আমল কোনটি ছিল? তাঁরা উভয়ে বললেন, পরিমাণে কম হলেও যে আমল নিয়মিত করা হয়। [ঐ, হাদীস নং-২৯৭]

❖ কাতাদা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই সুন্দর চেহারা, মধুর কণ্ঠস্বর দিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমাদের নবীরও [সা] চেহারা ছিল সুন্দর এবং কণ্ঠ ছিল মধুর। তবে তিনি স্বর কাঁপিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। [ঐ, হাদীস নং-৩০৫]

❖ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন থেকে পড়ে শোনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শুনাবো! অথচ আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। তখন আমি সূরা আন-নিসা

www.pathagar.com

পড়তে শুরু করলাম, পড়তে পড়তে "এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে দাঁড় করাবো।" [আয়াত : ৪১] পর্যন্ত পৌঁছে নবীর [সা] দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। [ঐ, হাদীস নং-৩০৮

❖ উমার ইবনুল খাত্তাব [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, যেমন নাসারাগণ ঈসা ইবনে মরিয়মের [আ] ব্যাপারে করেছে। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর গোলাম। সুতরাং আমাকে আল্লাহর বান্দাও তাঁর রাসূল বলবে। [ঐ, হাদীস নং-৩১৫]

❖ আনাস [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহর [রা] চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না, তবু তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে [সা] দেখলে কখনো দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতেন তিনি তা পছন্দ করেন না। [ঐ, হাদীস নং-৩২০]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহর [সা] খেদমত করেছি। তিনি কখনো বিরক্ত হয়ে উফ্ পর্যন্ত বলেননি। কোন কাজে ভুল হয়ে গেলে তিনি [ধমকের সুরে] বলেননি, এটা কেন করলে? অথবা কোন কাজ না করলেও তিনি বলেননি, এটা কেন করলে না? আল্লাহর রাসূল ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ।... [ঐ, হাদীস নং-৩৩০]

❖ আনাস ইবনে মালিক [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট এক লোক উপস্থিত ছিল, তার গায়ে ছিল গলুদ রঙের কাপড়। রাসূলুল্লাহ [সা] কারো কোন কিছু পছন্দ না হলে সরাসরি বলতেন না। লোকটি চলে গেলে তিনি সাহাবীদের বললেন, যদি তোমরা তাকে এ রঙের পোশাক ত্যাগ করার কথা বলে দিতে! [ঐ, হাদীস নং-৩৩১]

❖ আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] স্বভাবগতভাবে অশ্লীল বা কর্কশভাষী ছিলেন না এবং স্বেচ্ছায়ও অশ্লীলভাষী হতেন না। তিনি হাট-বাজারেও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে দুর্ব্যবহার করতেন না বরং উপেক্ষা করতেন এবং ক্ষমা করে দিতেন। [ঐ, হাদীস নং-৩৩২]

❖ আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] ব্যক্তিগত কারণে কখনো কারো উপর থেকে যুলমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর এবং যারপর নাই অসন্তুষ্ট হতেন। দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলে তিনি সব সময় সহজ বিষয়টি গ্রহণ করতেন, যদি না তা গুনাহর কাজ হতো। [ঐ, হাদীস নং-৩৩৪]

❖ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি। [ঐ, হাদীস নং-৩৩৭]

www.pathagar.com

❖ আবু সাঈদ আল-খুদরী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] পর্দার ভেতরে থাকা কুমারীর চেয়ে বেশি লাজুক ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারা থেকেই আমরা বুঝতে পারতাম। [ঐ, হাদীস নং-৩৪৩]

❖ আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। [ঐ, হাদীস নং-৩৬৩]

❖ নাওফাল ইবনে আইয়াস আল হুযানী [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ [রা] ছিলেন আমাদের সহচর, তিনি উত্তম সহচর। একদিন তিনি আমাদের সাথে ফেরার সময় আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি ভেতরে গিয়ে গোসল করে আসেন। আমাদের জন্য একটি বড় পাত্রে রুটি ও গোশত পরিবেশন করা হল। খাওয়া শুরু হলে আবদুর রহমান [রা] কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] এই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা সাধারণত যবের রুটি দ্বারাও পেট ভরে আহার করতে পারেননি! এখন যে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয় তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। [ঐ, হাদীস নং-৩৬০]

উপরের হাদীসগুলো প্রমাণ করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের [সা] চরিত্র ছিল আদর্শ চরিত্র। তাই তাঁকে অনুসরণ করে চললেই আমাদের দুনিয়ার জীবন হবে সুন্দর ও আখিরাতে পাবো আল্লাহর জান্নাত, আর তাঁকে অনুসরণ করে না চললে হাজারো প্রাচুর্যের মধ্যেও অশান্তির সীমা থাকবে না এবং আখিরাতে চিরকালীন দু:খ-কষ্টের জায়গা জাহান্নামে প্রবেশ করা লাগবে।■

** **টীকা :** এ লেখাটি ইমাম তিরমিযীর [র] 'শামাইলুন নাবিয়্যী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।*

www.pathagar.com

সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে মহানবীর [সা] ভূমিকা

হেলাল আনওয়ার

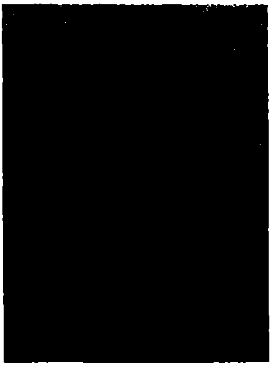

বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলের [সা] সামগ্রিক জীবনের উদ্দেশ্যই ছিলো মানব জাতির কল্যাণ সাধন। কেননা তাঁর আগমনের আগে আরব জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ গোটা সমাজকে করেছিলো কলুষিত ও বিপর্যস্ত। অশান্তি আর অস্থিরতা সমাজ কাঠামোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলো। চারিত্রিক গুণের অভাবে মানুষ মানুষকে পদানত করার হীন কাজে লিপ্ত ছিলো। এমন বিভীষিকাময় প্রেক্ষাপটে নবী মুহাম্মাদের [সা] আবির্ভাব হয়েছিলো। তিনি জাহিলী সমাজকে সভ্য সমাজে পরিণত করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত দিক-দর্শন পেশ করেন এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করেন। যার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করে প্রমাণ করেন যে, একমাত্র ইসলামই সামাজিক সভ্যতা বিকাশের জন্য মূল চালিকা শক্তি।

ইসলাম পরবর্তী সামাজিক অবস্থা জানার আগে ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিলো তা জানা প্রয়োজন। জাহিলী যুগে মানবতা ও মনুষত্ব ছিলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নারীকে ভোগ্য পণ্য মনে করা হতো। শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। নারীর

www.pathagar.com

কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিলো না। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে করে চলতো বছরের পর বছর, এমনকি যুগের পর যুগ যুদ্ধ। 'জোর যার মুলুক তার'– এই দর্শনে তারা বিশ্বাসী ছিলো। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ আকণ্ঠ জড়িয়ে ছিলো জাহিলী সমাজের অস্থি মজ্জায়। দ্বন্দ্ব-কলহকে তারা নিত্য করে জীবনী উপাদান মনে করতো। পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা বলতে কিছুই ছিলো না। সামান্য কারণে হত্যার মতো জঘন্য পাপকেও তারা স্বাভাবিক বলে ভাবতো। এককথায় যে যুগ ছিলো পাপ পঙ্কিলতায় কানায় কানায় ভরপুর।

সৈয়দ আমীর আলী এভাবে তুলে ধরেছেন তখনকার অবস্থা– "তিনি [রাসূল মুহাম্মাদ সা.] তাদেরকে অবমাননাকর ও রক্তক্ষয়ী কুসংস্কারে নিমজ্জিত দেখতে পেয়েছিলেন; তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেয়েছিলেন।"[১]

রাসূল [সা] আহতচিত্তে এই অসভ্য সমাজকে সভ্যতার দিকে ফিরিয়ে আনতে নানামুখী কার্যক্রম শুরু করেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে মাত্র সতের বছরের যুবক মুহাম্মাদ [সা] হিলফুল ফুজুল নামক সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একক প্রচেষ্টার বাইরে সংঘবদ্ধ তৎপরতার মাধ্যমে সমাজের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। শান্তির অমিয় বাণী আরবীয়দের জানিয়ে দিলেন একত্ববাদের দাসত্ব ব্যতীত সমাজকে সুসভ্য করা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা মহান আল্লাহর দেখানো নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমে জঞ্জালমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। এ জন্যে মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন– "তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[২]

এভাবে মহানবী [সা] আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে জাহিলী যুগের অসভ্য সমাজকে এক আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে প্রগতিশীল একটি আধুনিক সভ্য সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন, সমাজের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য দর্শন উপস্থাপন করেছিলেন। সেই বর্বর যুগেও তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল আরবের লোকেরা।

আধুনিক যুগে 'সমাজ ও সভ্যতা এ দুইয়ের মাঝে বিভাজন করে দেখানো হয়েছে। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে যে কথা বলেছেন তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এখান থেকে পনের শো বছর আগেই মহানবী [সা] সমাজ সম্পর্কে যে দর্শন পেশ করেছিলেন তার সাথে সংগতিপূর্ণ। সমাজ বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো– মানুষ একাকী বাস করতে পারে না। তার বসবাসের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। আর এই পরিবেশকে সমাজ বলা হয়।

"মানুষের জন্যে সমাজ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সভ্যতার। এজন্য প্রয়োজন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা।" যে সমাজ সভ্যতাকে উপেক্ষা করে সে সমাজ অন্তঃসার শূন্য। কারণ সভ্যতা সৃষ্টি করে ব্যক্তি।[৩] আর ব্যক্তির জন্য দরকার

২১—

www.pathagar.com

। সুন্দর, চিত্তবান ও চিন্তাশীল মানুষের প্রভাবেই সভ্যতার সৃষ্টি হয় এখানে সুন্দর ৷৮-' বলতে সুন্দর, পূত:পবিত্র মনকে বোঝানো হয়েছে। আর পবিত্র মন তখনই সৃষ্টি হবে যখন তারমাঝে আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় থাকবে। রাসূল [সা] সেই সুন্দর মানুষ তৈরির জন্য প্রথমত তাঁর দাওয়াতী মিশন শুরু করেন। যাতে করে মানুষ চরিত্রের মাধ্যমে আদর্শবান হয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে পারে।

ব্যক্তি সংকীর্ণতাকে যে পদদলিত করতে না পারে তার দ্বারা সভ্যতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। নবী মুহাম্মাদ [সা] তাঁর দাওয়াতী মিশন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য হাজারো প্রলোভন দেখানো হয়েছিলো। যেগুলো ছিলো তাঁর জন্য ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি তাদের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন– যদি আমার এক হাতে চাঁদ ও অন্য হাতে সূর্যও এনে দাও তাহলেও আমি আমার মিশন থেকে বিচ্যুত হবো না।" আধুনিক অন্য ধর্মের বহু পণ্ডিত যারা নবীকে [সা] অনুসরণ করেন না তারাও রাসূলের [সা] বাণীকে অনুকরণ করে বলেন– "ত্যাগ করে ভোগ করো।"

মহানবী [সা] মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। আর মুসলিমদের জন্য তাঁর কথা হলো– "একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।" একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দর্পণ।" এর অর্থ– দাঁড়ায় এমন যে, মুসলমান তথা আল্লাহপ্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তিই সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে সমর্পণ করবে। একজনের ব্যথা-বেদনায় অন্যজন ব্যথিত হবে এবং তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। সামাজিক সভ্যতার জন্য মহানবীর [সা] দেয়া কিছু বিধিমালা তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করছি। যেমন :

১. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করার জন্য মহানবী [সা] তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন– "যে ছোটদের স্নেহ-ভালোবাসা আর বড়দের সম্মান করে না তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"

২. প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন– "জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অব্যাহত নসীহত করতে থাকায় আমি ধারণা করলাম যে, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানানো হতে পারে।"[৪]

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল [সা] বলেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে যে যেন মেহমানের প্রতি সম্মান করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে সে যেন কথা বললে ভালো কথা বলে নচেত চুপ থাকে।"[৫]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত রাসূল [সা] বলেন– "আল্লাহর নিকট সেই সাথী সর্বোত্তম যে নিজ সাথীর কাছে উত্তম আর সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম যে প্রতিবেশী নিজ প্রতিবেশীর নিকট সর্বোত্তম।"[৬]

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ [সা] প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর উম্মত আরো যাতে মনোযোগী হয় সে জন্য তিনি জোরালোভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলেন– "আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর

www.pathagar.com

শপথ সে মুমিন যে, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। প্রশ্ন করা হলো– কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি উত্তরে বললেন– যার প্রতিবেশী তার মন্দ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়।"[৭]

সুতরাং সমাজকে সুসভ্য করতে হলে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যেমনটি আল্লাহর রাসূল [সা] করেছিলেন।

৩. ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে প্রত্যেক মানুষকে আপন করার জন্য মহানবী [সা] তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন– "সকল মুমিন একটি দেহের অংশ।" অপর এক হাদীসে তিনি বলেন– "একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য ভাইস্বরূপ।" অপর একটি হাদীসে তিনি বলেন– "একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ।"

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অপরিহার্য দাবি। নবী মুহাম্মাদ [সা] আত্মীয়তার সম্পর্ককে সুদৃঢ় রাখার ওপর গুরুত্ব দান করে বলেন– "সেই ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না যে তার আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে।"

৫. দান-সাদাকার মাধ্যমে ইয়াতীম, দু:স্থ; অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো– "যারা দু:স্থ, ভিক্ষুক তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।"

৬. গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন– [যারা গীবত করো] "তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করো? নিশ্চয় সেটা তোমরা অপছন্দ করো।"[৮]

৭. সুদ ঘুষ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যকেও এ আইন মেনে চলার প্রতি আহ্বান করা। কেননা শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের বদ দোয়া আল্লাহর নিক বিদ্যুতের চেয়ে ত্বরিৎ গতিতে কবুল হয়।

৮. জুলুম-অত্যাচার থেকে বিমুক্ত হওয়া সমাজ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাল কিয়ামাতে "জালিমদের জন্য কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী যাবে না।" রাসূল [সা] যাকাত আদায়ের জন্য মায়াজকে [রা] ইয়ামন দেশে পাঠালেন তখন তাঁকে সাবধান করে বললেন– অত্যাচারিত মানুষ থেকে সাবধান হবে। কারণ আল্লাহ্ আর তার মাঝে বদ দোয়ার সময় কোনো পর্দা থাকে না।

৯. প্রতিবেশীর হক নষ্ট না করা। সর্বোপরি তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। কখনো তাদের হক যে কাজে নষ্ট হয় সে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ হক দু'রকম– আল্লাহর হক এবং বান্দার হক। যদি কেউ বান্দার হক নষ্ট করে তাহলে আল্লাহ সে গুনাহ্ মাফ করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করে।"

নবী মুহাম্মাদ [সা] এসব বিষয় বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন বলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশৃঙ্খল ও বর্বর আরব সমাজকে সভ্য করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সেই জন্য শুধু আরব নয় গোটা দুনিয়ার কাছে তিনি হয়েছিলেন নন্দিত সমাদৃত এবং সম্মানীত।

www.pathagar.com

এভাবে সামাজিক সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম যে ভূমিকা বা অবদান রেখেছে তার জন্য আজকের আধুনিক যুগের সকল বহু জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করেন যে মহানবীর সমাজ সংস্কার ছিলো ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। তিনি তাঁর সমাজ ও সভ্যতার দর্শনকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে ইসলামের বাইরে যারা তারাও স্বীকার করে নিয়েছে যে মুহাম্মাদের [সা] যুগই ছিলো প্রকৃত অর্থে স্বর্ণ যুগ। হিংসা-বিদ্বেষ হানা-হানি ও কলহমুক্ত এক নতুন সমাজ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। মাইকল এইচ. হার্ট প্রসঙ্গে বলেন– "সেই সময় [মুহাম্মাদের সা. সময়] আরব দুনিয়ায় খৃস্ট ধর্ম আর ইহুদী ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিলো। এই দুই ধর্মের লোকেরা একে অন্যকে ঘৃণা করতো। প্রত্যেকেই প্রচার করতো তাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। বাহ্যিক আচার-আচরণ আর আড়ম্বরকে মনে করতো ধর্মের প্রধান রূপ। বিভিন্ন ধর্মের সামগ্রিক রূপ দেখে হযরতের মনে হলো মানুষের এই পারস্পরিক বিদ্বেষ-সংশয়, কুসংস্কার, অন্ধ মূর্তি পূজা বিশ্ব স্রষ্টার পরম সত্য করুণা থেকে মানুষের অন্তরালোককে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।"[৯]

তিনি এর বিপরীতে মহান রবের শান্তি বাণী প্রচার করে সমাজকে দ্বন্দ্ব কলহমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ আরব জাতির রক্ত পিপাসু মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো মোটেও সহজ সাধ্য ছিলো না। এ জন্যে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর মঝে চিত্তাকর্ষক সামাজিক ও নৈতিক গুণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেই জন্য বিশৃঙ্খল ও বাঁধনহীন আরব জাতি তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁর দেয়া বিধান মনে প্রাণে মেনে নেন।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে নবী মুহাম্মাদের [সা] দর্শন ছিলো অত্যন্ত বিজ্ঞচিত এবং বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত সমাজ দর্শন কলুষমুক্ত সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের ভেতর সাম্প্রদায়িক সংঘাত কিংবা ব্যক্তি আক্রোশের কারণে সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বিনষ্ট হয় সমাজের স্থিতিশীলতা ও সুখ। এ জন্যে মহানবী [সা] পরস্পর নিরাপত্তা বিধানের জন্য দর্শন পেশ করে বলেন– "হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত। সেই ব্যক্তি মুমিন, যার নিকট লোকেরা নিরাপদ। সেই ব্যক্তি মুসলিম, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।"[১০]

তিনি সমাজের প্রতি দরদের হাত প্রসার করার জন্য তার উম্মতদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। সাহাবাগণ তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজকে সভ্যতার আদলে তাদের জীবন গড়তে পেরেছিলেন। এমনই একটা হাদীস হলো– রাসূল [সা] বললেন : "হে আবু যার! যখন শুরবা রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি করে দেবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে দান করবে।"[১১]

প্রতিবেশী কারা তার সংজ্ঞা দিয়ে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী চমৎকারভাবে বলেছেন যে– "প্রতিবেশী বলতে মুসলিম-কাফের, আবেদন-ফাসেক, শত্রু-বন্ধু, পরিচিত-অপরিচিত, উপকারী-অপকারী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, নিকটবর্তী-দূরবর্তী ঘরের বাসিন্দাদের বুঝায়।"[১২]

www.pathagar.com

মোটকথা সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে মহানবীর [সা] চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারা পৃথিবীতে নতুন মাত্রা যোগ করে। যা আজো প্রবাহমান এবং এর আবেদন আজো অম্লান। মূলত নবীর [সা] আগমনের প্রভাব আজো পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজমান। স্বীয় আকীদা, ভাবধারা, কৃষ্টি-কালচার, চরিত্র ও সমাজ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এটা যে কার্যকর করে নিয়েছে শুধু তাই নয় বরং এমন সুদৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরেছে কোনক্রমেই তা এখন পৃথক করা সম্ভব নয়।"[১৩]

মহানবীর [সা] সমাজ সভ্যতার দার্শনিক ভাবধারা পৃথিবীকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিলো। যে জন্য মানুষের মাঝে পরস্পর ভালোবাসা, গভীর মমত্ববোধ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিলো। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে মানুষ তাই গড়তে পেরেছিলো একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সভ্য সমাজ।

এর জন্য মহানবী [সা] আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন। আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদের মূলোৎপাটন করে সাম্য ও শৃঙ্খলা সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে সক্ষম হন। তিনি সভ্য সমাজ গঠনের প্রধান অন্তরায়গুলোয় চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন- সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং সমাজকে সভ্যতার চাদরে আবৃত করতে হলে অবশ্যই স্রষ্টাকে অনুসরণ করতে হবে। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে। তাই মহানবী [সা] মানুষের জান, মাল, ইজ্জত রক্ষায় বিধান প্রণয়ন করেন। সে জন্য জাহিলী যুগের সকল সামাজিক অনাচার দূর করে সামাজিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আর মানুষ সুখ, স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে মহা আনন্দে দিন যাপন করে।[১৪]

আরবের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে যে হিলফুল ফুজুল নামক সংঘটি রাসূল [সা] গঠন করলেন তার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো সমাজের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। এ জন্য তিনি পাঁচ দফা কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যান। তা হলো-

১. দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা।

২. মযলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

৩. জালেম বা অত্যাচারীকে বাঁধা দান।

৪. বিভিন্ন গোত্রের দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন করা।

৫. বিদেশীদের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা।"[১৫]

বর্তমান বিশ্বে সমাজ সভ্যতা নিয়ে বহু পণ্ডিত ও সমাজ বিজ্ঞানী বহু কথা বলেছেন। তারা সমাজ ভেদে সভ্যতার দর্শন পেশ করেছেন। যুক্তির কাঠগড়ায় সভ্যতাকে সমাজ থেকে আলাদা করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু যত কথাই তারা বলুন না কেন সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে রাসূলের [সা] দর্শনই হলো একমাত্র বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত। তিনি সেই বর্বর আরব সমাজকে তাঁর দশনে একীভূত করে প্রমাণ করে গেছেন যে একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করলে সমাজে সভ্যতার সূর্য

www.pathagar.com

উঁকি দেবে। ঐতিহাসিকগণও দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন সমাজ সভ্যতায় বিনির্মাণে মহানবীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা।■

টীকা

১. অমৃত ভাষণ ॥ সৈয়দ আমীর আলী। অনু- ড. রশীদুল আলম।
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১০৩
৩. সভ্যতা ॥ ক্লাইভ বেল ॥ পৃ. ৬.
৪. বুখারী, মুসলিম।
৫. বুখারী, মুসলিম।
৬. তিরমিযী।
৭. আহমদ, বুখারী ও মুসলিম।
৮. সূরা হুজরাত।
৯. Ranking of the most influential persons in history II Michal H. Hart-II pa-10
১০. আহমদ, আবু ইয়ালী, বাজ্জার।
১১. মুসলিম শরীফ।
১২. ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃ.-৩৭০
১৩. নবুওয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, পৃ-১৪৮
১৪. মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর [সা] সমাজ বিপ্লব ॥ এ কে এম নাজির আহমদ ॥ সীরাত সংকলন ॥ সম্পাদনায় : মোশাররফ হোসেন খান-২০০৫
১৫. কুরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল [সা] ॥ অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

গ্রন্থ পঞ্জি

১. বিশ্ব সভ্যতা ॥ এ কে এম শাহ নাওয়াজ
২. সভ্যতা ॥ ক্লাইভ বেল ॥ অনুবাদ- মোতাহের হোসেন চৌধুরী
৩. ইসলামের সামাজিক আচরণ ॥ হাসান আইউব
৪. অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা ॥ আবু জাফর
৫. কুরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল [সা] ॥ অধ্যাপক মফিজুর রহমান
৬. নবুওয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম ॥ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী [রহ], অনু- মাওলানা রুহুল আমীন খান উজানবী।
৭. Ranking of the most influential persons in history II Michal H. Hart.
৮. মহানবীর মহাজীবন ॥ আবু জাফর
৯. আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ॥ হাফেজ মাওলানা শহীদুল
১০. আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া ॥ আবুর ফিকা হাফিজ ইবন কাছীর
১১. সীরাতুন্নবী [সা] সংকলন ॥ সম্পাদনায় : মোশাররফ হোসেন খান ॥ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র- ২০০১, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭
১২. মেশকাতুল মাসাবিহ।
১৩. তাযকিরাতুল আম্বিয়া।
১৪. কাসাসুল আম্বিয়া।
১৫. সীরাতে সারওয়ারে আলম।

www.pathagar.com

আকুতির তিনপর্ব ॥ ম হি উ দ্দি ন আ ক ব র

সূচনা পর্ব

সবুজ গম্বুজের দিকে দৃষ্টি যেতেই বুকটা আমার দুরুদুরু কেঁপে ওঠে
বিশ্বাসের ভিতটা নড়বড়ে হয়ে যেতে চায়, আমি কি কখনো-
অই সবুজ গম্বুজের নিচে দাঁড়িয়ে আপনাকে পারবো জানাতে সালাম
প্রাণের আকুতি পারবো কি খুলে বলতে
সেই সে নসিব, সেই সে বাদশাহী দীপ্ত বরাত-
হয়েছে বরাদ্দ কি এই অধম পাপী নাখান্দা আদমের!
কই, মনে তো পড়ে না এমন কোনদিন, কোন একটিবার
আপনার দর্শন স্বপ্নের মাঝে পেয়েছি কি না,
কিংবা পাবো কি পাবো না- এই দোলাচালে চলে গেলো
পুরো শতকের অর্ধেক সাল, পেরিয়ে গিয়েছে কৈশোর-তারুণ্য-যৌবনকাল
মধ্য বয়সী এক ক্লান্ত পথিক এই গুনাহ্গার...

আপনার অই রওজাকে যদি করতে না পারি জিয়ারত-
তাঁর কাছে খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না;
চাই না মুনকার-নকীরের সাক্ষাৎকার, চাই না জান্নাত-জাহান্নাম...
ওগো সবুজ গম্বুজ তলে শায়িত শাফায়াতের একচ্ছত্র অধিপতি!
ওগো আবে কায়সারের পানপাত্রের কর্ণধার!
ওগো প্রেমের ছবি- আপনার জন্য লুটিয়ে পড়ুক
আমার প্রাণের মাতা, জন্মদাতা বাপ, প্রিয়তমা বেগম এবং
পুত্র-কন্যাদের তাবৎ প্রেম। আর লুটিয়ে পড়ুক আমার এই তুচ্ছ আমল,
তবু- তবুও আপনার জিয়ারত ছাড়া আমার প্রাণ-পাখি
তাঁর ডাকে যেন উড়াল না দেয়...

আবেদন পর্ব

সম্মানিত কিরামান কাতেবিন!
আপনারা লিখে নিন এই অধমের অবনত আকুল করা আকুতিটুকু
আর দয়া করে পৌঁছে দিন সেই সবুজের স্নেহ ছায়া তলে;
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম পবিত্র স্থানে। যেখানে ঘুমান তাঁর প্রিয় হাবিব,
যেখানে বিশ্রামরত এই জাহানের শাহেন শাহে আযম,
যেখানে অপেক্ষমান পরজগতেরও সরদার।

www.pathagar.com

পরিশেষ

ওগো আমার জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক; সর্বশক্তিমান!
সারা জীবনের লালিত স্বপ্নটুকু তুমি বাস্তব করে দাও,
আমাকে তোমার ইয়ারের দরবারে উপনীত করে দাও,
তোমার দয়ার ভাণ্ডার খুলে এই কামনাটুকু মঞ্জুর করে নাও।
মঞ্জুর করে নাও, মঞ্জুর করে নাও...

বিজয় নাবিক ॥ কা ম রু ল ই স লা ম হু মা য়ু ন

আঁধার ধরায় উজ্জ্বল করা সুবহে সাদিক
উতাল সাগর দক্ষ হাতে বিজয়-নাবিক ॥
মা আমিনার কোল জুড়ে এক মধুর পরশ
মুত্তালিবের বংশে দেখো অতুল হরষ ॥
মাখলুকাতে এ কোন সাড়া খুশির জোয়ার
জিন-পরী আর ফেরেশতারা হয় মাতোয়ার ॥
স্বপ্ন-ভোরে ফুটলো আলো বিপুল আলো
কাটলো তিমির ভাঙলো পাষাণ-দৈত্যগুলো ॥

পাপে-তাপে ক্লিষ্ট মানব মুক্তি গোণে
খোদার রহম ঝরছে অঝোর রাত্রিদিনে ॥
মানবতার দীপ্ত-মধুর ডাকলো যে বান
অত্যাচারীর ধুলায় লুটায় সব নিশান ॥
খোদার রাহে বিলিয়ে জীবন হয় রঙীন
রাঙলো ভুবন আসলো আলোর নতুন দিন ॥

www.pathagar.com

রাসূল আমার প্রিয় রাসূল ॥ আ ল তা ফ হো সা ই ন রা না

রাসূল আমার প্রিয় রাসূল
আসলো মরুর বুকে
তাঁর সুবাসে আকাশ জমিন
হাসলো পূর্ণ সুখে ॥

যার ছিলো হাসি খুশি
মায়াভরা মুখ
দু'খী মানুষের ত'রে
পেতে দিতো বুক ॥

তাঁর ছিলো অনাবিল
সুন্দর মন।
মানব কল্যাণে ছিলো
ব্রত সারাক্ষণ ॥

যুগে যুগে ধরায় এলো
বহু প্রতিনিধি
আল-আমিন ছিলো শুধু
তাঁর উপাধি ॥

সৃষ্টির শিরোমণি
মহামানব যিনি
সব নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী
মুহাম্মদ [সা] তিনি ॥

পূর্ণিমার চাঁদ সে তো
আলোর দিশারি নবী
হৃদয়ের মাঝে আঁকি যেনো
তাঁর'ই নূরের ছবি ॥

www.pathagar.com

তোমার ছায়া-মায়া ॥ গো লা ম ন বী পা ন্না

মনে অনেক শান্তি মেলে
নামটি তোমার ডেকে,
ক্লান্তি যতো দূর হয়ে যায়
এ দেহ-মন থেকে।

তোমার নামে অপার মায়া
ঢেউ খেলে যায় মনে,
এমন ছায়া মিলবে কোথায়!
অন্য কোনো জনে?

তাইতো তোমার ছায়া-মায়া
দু'টোই রাসূল চা'বো,
তা না হলে একূল-ওকূল
কেমনে ঠাঁই পাবো।

তাঁর তুলনা নাই ॥ জু বা য়ে র হু সা ই ন

কুসুম বাগে ফুটল গোলাপ
জুঁই চামেলি বেলী
মৌমাছিদের কানে কানে
কিসব বলাবলি।

আকাশ ফুঁড়ে নামল নবী
দেখলো ধরা চেয়ে
ধন্য হলো মরুর ধুলি
তাঁরই ছোঁয়া পেয়ে।

দয়ার-নবী রাসূলে খোদা
রহমতেরই নীড়
শান্তি পেতে তাঁরই আশে
করলো সবে ভীড়।

লোকের যত দুঃখ-ব্যথা
ঘুচলো সেদিন তাই
দো-জাহানে তিনিই সেরা,
তাঁর তুলনা নাই।

www.pathagar.com

তুমি এলে তাই ॥ মোঃ আবুল হোসেন ময়েজী

আঁধারের রূপ দেখেনি পৃথিবী এতটা অন্ধকার
কোলাহল এত সদা আহাজারি আবাস রুদ্ধ দ্বার।
মায়ের কন্যা সন্তান হলে যেন হারিকেন বহে,
জ্যান্ত কবর! মায়ের হৃদয় তবু দিনরাত সহে।
অমা যামিনির আঁধারের চাপে সুরুজ আঁড়ালে পড়ে,
পথিক পায়না হারিয়ে ঠিকানা স্তূপ হয় গহ্বরে।
ডাষ্টবিন যেন মানব ধরাটি, পচা গলা লাশে ভরা
হাহুতাশে কাটে অসহায় নরে পাখি যেন নীড়হারা।
লাত মানাতের ওজজার জাতে ভরপুর কাবাঘর,
গোটা ধরনীতে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব পরস্পর।
আরবের মাটি পদধ্বনি শোনে আসে কোন মহাজন!
বারে বারে ফিরে তবুও দেখেনা কেঁদে ওঠে তনুমন।
সুবহে সাদেকে বারতা জানায় সূর্যের আগমন,
নূর-ই ইলাহী আগমন ধ্বনি আমিনার বাজে মন।
তুমি এলে তাই ধন্য ধরনী ধন্য আমিনার ঘর,
শুধু তারা নয়, সজীবতা ফিরে মানুষে পরস্পর।
আঁধার কাটিয়ে হয় আলোকিত সে আলোতে পথ পায়,
অত্যাচারের জ্বালাতন থামে পথ পায় অসহায়।
তুমি এলে তাই মানুষেরা পেল জীবন্ত কুরআন,
বিষাক্ত ধরা জান্নাতী নূরে গড়ে হলে মহিয়ান।
শুকরিয়া করি মহান প্রভুর আরশে আজিমে যিনি,
দরুদ ও সালাম হে নবী তোমাকে, লও এ হৃদয় বাণী ॥

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] প্রতি ॥ ই ক বা ল মু জা হি দ

তোমার বিদায় হজ্বের ঘোষণা
আমার কাছে
স্পষ্ট ছিল
তুমি বলেছিলে
ওদের কোন বিপদ নেই
যারা কুরআন-হাদীস আঁকড়ে ধরবে।
কিন্তু আমি ধরে রাখতে পারিনি
হে রাসূল!
অনেক করেছি ভুল
এখন ক্রমাগত ছুটছি
ক্ষীণ কণ্ঠে ব্যর্থ আর্তনাদে
তোমার শাফায়াত চাই।
তোমার ভালোবাসার শামিয়ানায়
আমাকে আশ্রয় দাও হে রাসূল [সা]!

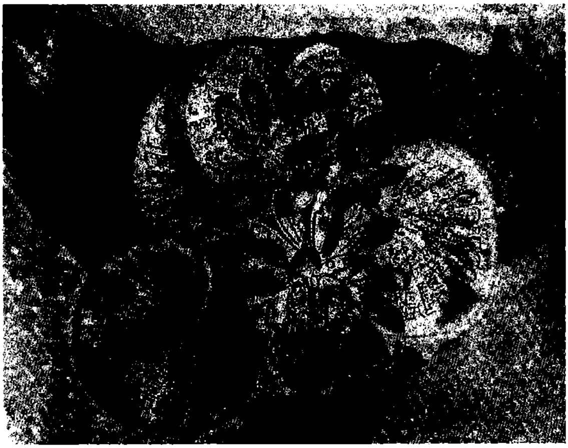

www.pathagar.com

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলের [সা] অনুসরণ

মুহাম্মাদ ইউছুফ

মানুষ যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী ছিল। পৃথিবী যখন ডুবে ছিল মূর্খতা, অজ্ঞতা আর জাহিলিয়াতে। মানুষ মানুষের সাথে আচরণ করতো হিংস্র জন্তুর ন্যায়। সমাজের সকল স্তরে যখন বিরাজ করছিল এক অস্থির ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। জোর যার মুল্লকটাই যখন ছিলো তার। গোত্রে গোত্রে হিংসা-বিদ্বেষ আর হানাহানিতে সাধারণ মানুষ যখন ছিল অতিষ্ঠ। অবিচার আর যুলুমের সীমা যখন পাহাড়কেও অতিক্রম করে গিয়েছিলো। শান্তির সাদা বকটি যখন ছিলো একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শান্তিপ্রিয় মানুষ যখন শান্তির অন্বেষায় ছিলো পাগলপারা। মানুষ পাচ্ছিল না যখন কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান। ঠিক তেমন একটি সমাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরণ করলেন তার প্রিয় রাসূলকে [সা]। রাসূল [সা] জন্মের চল্লিশ পর্যন্ত তৎকালীন সমাজের অবর্ণনীয় অবস্থা দেখতে পেয়েছিলেন স্বচক্ষে। আর এই অবস্থা থেকে উৎড়ানোর জন্য নিজেও যখন 'হিলফুল ফুযুল' সংগঠন করে মানুষের কল্যাণে তেমন ভূমিকা রাখতে না পেরে শান্তির প্রত্যাশায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন হেরা গুহায়। ঠিক এমন সময় মহান আল্লাহ নাযিল করলেন

www.pathagar.com

মানুষের শান্তি সমৃদ্ধ জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন। রাসূল [সা] কুরআনের অমিয় বাণী নিজে অবগত হলেন। তারপর তা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তার নিজের বংশ এবং আশপাশের সকল শ্রেণীর লোকের কাছে। তখনকার মানুষগুলো শান্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে যদিও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু রাসূলের [সা] সেই শান্তির আহ্বানে তারা তেমন একটা সাড়া দিল না। রবং তারা রাসূলের [সা] শান্তিপ্রিয় কাজে করল বাধার সৃষ্টি। রাসূল [সা] ধৈর্য সহকারে তার মিশন রেখেছিলেন অব্যাহত। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে, যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে কাজ করে গেলেন ইসলাম বৈরী লোকগুলোর মাঝে। অনেক চেষ্টা করেও যখন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাথী পেলেন না, তার উপর যুলুম আর নির্যাতনের পরিধি যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, নিজের জীবনই যখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লো তখন আল্লাহর হুকুমে শান্তিকামী মানুষের শহর মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন। সেখানকার মানুষগুলোর সমর্থন ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সুখী সমৃদ্ধ শান্তির অদ্বিতীয় নিকেতন ইসলামী রাষ্ট্র। আর এই ইসলামী রাষ্ট্র গঠন গড়ার মাধ্যমেই তিনি শান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে দিলেন সমগ্র বিশ্বে।

মানবতার কল্যাণে রাসূলের [সা] দাওয়াত

রাসূল [সা] আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে কিছুদিন গোপনে গোপনে মানুষকে ডাকলেন সকল অনাচার, অত্যাচার, যুলুম, নিপীড়ন, মদ, জুয়া, সুদ, হানাহানি, রাহাজানি ও অন্যের সম্পদ দখল ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে শান্তির পথ অবলম্বন করার জন্য। কিছুটা সময় পর যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলকে [সা] নির্দেশ দিলেন প্রকাশ্যে তার দীনের ঘোষণা দিতে তখন রাসূল [সা] তা-ই করলেন। ঘোষণা দিলেন "লা ইলাহা ইলাল্লাহ"। সাথে সাথেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোকগুলো শুরু করলো রাসূলের [সা] উপর নানা ধরনের যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়নসহ অকথ্য ভাষায় গালাগালি। রাসূল ধৈর্যহারা হলেন না। কাজ চালিয়ে গেলেন অবিরাম। কিন্তু তৎকালীন জাহিলী সমাজের লোকগুলো এতোই বেপরোয়া ছিল যে তারা রাসূলকে [সা] শারীরিকভাবেও আঘাত করতে লাগলেন। রাসূল [সা] তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ না হয়ে তাদের সাথে কোন ধরনের ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি না করে তাদের হেদায়াতের জন্যই বরং আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।

অবশেষে রাসূল [সা] এবং তার অনুসারীদের উপর যুলুম আর নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করলো তখন আল্লাহর নির্দেশে নিজের প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন মদীনায়। মক্কা এবং মদীনার জীবনে রাসূল [সা] কখনো কোন গোত্র বা বংশের লোককে জোর করে ইসলামের পথে ডাকেননি। কারণ রাসূল ছিলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ। রাসূলের [সা] ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা : 'হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি" [সূরা আম্বিয়া-১০৭]

তাই আল্লাহর রাসূল [সা] মানুষকে শান্তির পথ ডেকেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবেই।

www.pathagar.com

অন্য রাষ্ট্রের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে রাসূলের [সা] অনুসরণ

আজকের বিশ্বে তথাকথিত পরাশক্তিগুলো যেভাবে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে বা অস্ত্র আর পেশী শক্তির জোরে আরেক দেশ দখল করে নিয়ে সে দেশের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে বিশ্বে সৃষ্টি করছে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ। সেক্ষেত্রে রাসূলের [সা] আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূল কখনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বৈরী আচরণ করতেন না। শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সৈন্য পাঠিয়ে সে দেশ দখল করে নিতে হবে এ নীতি রাসূল [সা] কখনই অনুমোদন করেননি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে কোনো ব্যাপারে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকলে তা কড়ায় গণ্ডায় নিজে পালন করতেন এবং সাহাবীদেরও সেটার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সলীম ইবনে আমের [রা] হতে বর্ণিত একটি হাদীস এই রকম : 'মুয়াবিয়া [রা] এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন তাদের ধাওয়া করার জন্য। পথিমধ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সওয়ার। তিনি বলছিলেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, এ ব্যক্তিটি আমর ইবনে আবাসা [রা]। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন আমি রাসূলে পাককে [সা] বলতে শুনেছি, যার সাথে কোন কওমের চুক্তি হয় তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিপে করবে।'

হাদীসটি শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসলেন। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনার সৃষ্টি হলো না। রাসূলের [সা] এটাই ছিল শান্তিপ্রিয় নীতি। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে নীতি অনুসরণ করা আজ খুবই প্রয়োজন।

অন্য ধর্মের প্রতি রাসূলের [সা] দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ

বর্তমান বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির সবচেয়ে জঘন্যতম কারণ হচ্ছে অন্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করা। প্রত্যেক ধর্মের মানুষই তার নিজস্ব ধর্মীয় আদর্শ লালন করে তার অন্তরের গভীরে। যখন তার ধর্মের ব্যাপারে অন্য ধর্মের লোকেরা মন্তব্য করে বা কটাক্ষ করে কথা বলে তখন স্বীয় ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ মর্মাহত, ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। আর এর ফলে দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী অশান্তির অশনি সংকেত। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেভাবে কুৎসা রটাচ্ছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। এতে করে বিশ্বে শান্তি তো আসবেই না বরং অশান্তি বেড়ে যাবে অসহনীয় মাত্রায়। শুধু তাই নয় পশ্চিমা দেশগুলো আজ আমাদের প্রিয় রাসূলের [সা] ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করে এবং রাসূল [সা] সম্পর্কে অযাচিৎ মন্তব্য করে বিশ্ব শান্তিকে পদদলিত করছে।

কিন্তু বিশ্ব মানবতার বন্ধু, সকল মানুষের জন্য রহম দিল, আল্লাহর প্রিয় রাসূলের [সা] ভূমিকা ছিল শান্তির পক্ষে। তিনি রাষ্ট্রের মধ্যে বা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি হোক এমন কোন কাজ নিজে করে যাননি এবং উম্মাতে মুহাম্মদীকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে যাননি।

www.pathagar.com

তিনি যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন অমুসলিমদের ধর্মের প্রতি কখনও কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। রাসূল [সা] বলেছেন, 'অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবনের এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই'।

রাসূল [সা] আরো বলেছেন, 'সতর্ক থাক, সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি অমুসলিমদের ওপর যুলুম করে অথবা তাদের হক নষ্ট করে অথবা তাদের সামর্থ্যের চাইতে বেশি কাজের বোঝা চাপাতে চেষ্টা করে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কিছু জোরপূর্বক নেয়, আমি কিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বো।" [আবু দাউদ]

বর্তমান বিশ্বে রাসূলের [সা] এই নীতি অনুসরণ করলে কোনো সংখ্যালঘুই নির্যাতনের স্বীকার হবে না, সৃষ্টি হবে না বিশ্বে অশান্তি।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণে রাসূলের [সা] অনুসরণ

তৎকালীন সময়ে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কারাবন্দী হয়েছেন রাসূল তাদের সাথে সম্পূর্ণ মানবীয় আচরণ করেছেন। তাদের খাওয়া, পরা ও চিকিৎসাসহ সবকিছুর সুব্যবস্থা করেছেন। এমনকি রাসূলের [সা] প্রিয় জন্মভূমি যে মক্কা থেকে রাসূলকে [সা] যুলুম, নির্যাতন ও হত্যার পরিকল্পনা করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ইসলামের সুদিনে সেই মক্কা যখন বিজয় হলো তখন মাবনতার বন্ধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে ছাড়া সবাইকে সাধারণ মক্ষা করে দিলেন। কারো বাড়ি ঘরে কিংবা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা হামলা কিংবা ক্ষতি সাধন করেনি। মক্কার বিজয়ের পর তিনি ঘোষণা দিলেন– ১. যারা আপন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকবে, তারা নিরাপদ, ২. যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ এবং ৩. যারা কাবাগৃহে আশ্রয় নিবে তারাও নিরাপদ। এজন্যই তো রাসূল [সা] সকল সৃষ্টির জন্য ছিলেন রহমতস্বরূপ। ছিলেন শান্তির বাহক। শান্তি বার্তা এনে দিলেন বিশ্বজুড়ে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ইসলামী দেশগুলোতে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের ময়দান থেকে লোকদের বন্দী করে তাদের সাথে করা হচ্ছে অমানবিক আচরণ। যার বিভিন্ন চিত্র মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। গুয়ান্তেনামো বে কারাগারে যেসব বন্দী আছে তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে তা আজ বিশ্ববাসী অবগত। শুধু যুদ্ধবন্দীই নয় চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে যে দেশে তারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে সে দেশের অর্থ-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, হত্যা করা হচ্ছে শিশুদের। যার কারণে বিশ্বজুড়ে আজ অশান্তির কালোছায়া বিরাজমান। এই অবস্থা থেকে উৎড়াতে হলে অবশ্যই বিশ্বনবীর [সা] তৎকালীন যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ অনুসরণ করতে হবে। নচেৎ বিশ্বব্যাপী অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে পড়বে ক্রমাগত সংকুচিত তো হবেই না।

মানবাধিকার সংরক্ষণে রাসূলের [সা] অনুসরণ

আরবের জাহিলী সমাজে নারীরাই ছিল সবচেয়ে বেশি অধিকার বঞ্চিত। অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিলো না। ঐ সমাজে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়াটা ছিল বাবা-মায়ের জন্য

www.pathagar.com

সাংঘাতিকভাবে অপমানকর। তাই যে পরিবারে মেয়ে সন্তান জন্ম নিতো সে পরিবারে দেখা দিতো দারুণ অসন্তোষ। আর এ কারণেই অনেক নিষ্ঠুর বাবা-মা মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে সাথে সাথেই তাকে মেরে ফেলতো বা জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলতো। পুরুষরা যে যেভাবে পারতো নারীদের উপর অত্যাচার চালাতো। পুরুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছিল নারীরা। সমাজ কিংবা পরিবারে তার কোন ভূমিকাই ছিলো না। ছিলো না কোন অধিকার। পিতা বা স্বামীর সম্পদে নারীর ছিলো না অংশ। নারীকুলে ছিল না শান্তির সুনিমল ছায়া। রাসূল [সা] আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক পিতা এবং স্বামীর সম্পদে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গেছেন। যেখানে একজন নারীর ইজ্জত আব্রু দিনে দুপুরেও নিরাপদ ছিল না সেখানে একজন নারী যদি গভীর রাতেও দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করতো তাহলে তার মান-সম্মানে আঘাত করার মতো কেউ সাহস করতো না। ঘৃণ্য দাসপ্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে পরাধীন জীবন যাপন থেকে নারীসহ সকল মানুষকে মুক্ত করে গেছেন আল্লাহর রাসূল [সা]। তিনি দাস-দাসী মুক্তির জন্য সাহাবায়ে কিরামদের উৎসাহ দিয়েছেন। এটিকে তিনি সাওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি নিজেও ৬৩ জন দাসকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর অনুমোদন নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'একবার খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী নামক এক মহিলা রাসূলের [সা] কাছে অভিযোগ দিলেন, তার বাবা তার মতের বিপরীতে একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। রাসূল [সা] ঐ বিয়ে বাতিল করে দেন।' [বুখারী ও মুসলিম]

আরবের জাহিলী সমাজে যেখানে স্ত্রীর কোনো অধিকারই ছিলো না, কোনো কাজেই যেখানে স্ত্রীকে মর্যাদা করা হতো না সেই সমাজেই রাসূল [সা] স্ত্রীদের সকল ধরনের অধিকার সংরক্ষণ করেছিলেন। হযরত আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। রাসূল [সা] সকলকে তাকিদ দিয়েছেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের অধিকার মোহরানা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দেয়। ইসলাম স্ত্রীর সকল খোরপোষের দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীর উপর। রাসূল [সা] এ ব্যাপারে বলেছেন, "কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাদেরকে পালন করে, তাদেরকে খোরপোষ দেয় না।"

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় একটি শিশু যে বয়সে লেখা পড়া করার কথা কিংবা খেলাধুলা করে বেড়ে ওঠার কথা ঠিক সে সময়ে তারা কঠোর পরিশ্রম করছে। আবার অনেকেই তাদের সাথে করছে অমানবিক আচরণ। তারা যে পরিমাণ কাজ করতে পারে না তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। যেটা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। তাই রাসূল [সা] বলেছেন', যারা ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না বড়দেরকে সম্মান করে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'। [আবু দাউদ]

বর্তমান যুগে শ্রমিকের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে মালিক শ্রেণীর দারুণ অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না এবং যথা সময়ে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য পরিশোধ করা হয় না। এ ব্যাপারে রাসূল [সা] বলেছেন,

২২—

www.pathagar.com

'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি আদায় করে দাও।' আবার কেউ কেউ শ্রমিককে তো মানুষই মনে করতে চায় না। তাদের সাধ্যের বেশি কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে তৈরি হয় ভেদাভেদ ও বৈষম্য। তাই রাসূল [সা] বলেছেন, 'শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।' [বুখারী ও মুসলিম]

এভাবে রাসূল [সা] সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ করে গেছেন যা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় ।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে রাসূলের [সা] অনুসরণ

ধনীরা আরো ধনী হবে আর গরীবরা আরো গরীব হতেই থাকবে এটা ছিল তৎকালীন জাহিলী সমাজের চিত্র। বর্তমানেও এটা বিরাজমান। কেউ রাজার হালে বসবাস করছে আবার কেউ না খেয়ে মরছে। তৎকালীন সময়ে ধনীরা গরীবদের কোনো মানুষই মনে করতো না। তারা তাদেরকে দাস-দাসীর মতো ব্যবহার করতো। গরীবরা না খেয়ে মারা গেলেও ধনীদের এ ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। আর বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] এ ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন, 'নি:সন্দেহে আল্লাহ তাআলা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ মাল দিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক করেছেন, যা তাদের ধনী-গরীব-ফকিরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরীবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায় তার মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোন কারণই থাকতে পারেনি। এই বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই জেনে রাখো আল্লাহ তাআলা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব দেবেন।' [তাবারানী আসসগীর ও আল আওসাত]

রাসূল [সা] যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজের ধনী লোকদের থেকে যাকাত নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে তাদের সকল সমস্যা সমাধান করে দিলেন। সুদ ও সুদভিত্তিক ব্যবসা নিষেধ করলেন। মুছে দিলেন ধনী-গরীবের ভেদাভেদ। আজকের বিশ্বেও রাসূলের [সা] সেই নীতি অবলম্বন করলে ধনী-গরীবের ভেদাভেদ দূর হয়ে আসতে পারে সমতা এবং শান্তি।

রাসূলের [সা] জীবন পরিচালিত হয়েছিল কুরআনের আলোকে। আর কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করার কারণেই তৎকালীন সময়ে তিনি সকল ক্ষেত্রে অশান্তি দূর করে শান্তি নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। আজকের বিশ্বেও শান্তি প্রত্যাশী মানুষগুলোর সামনে সেই পথ উন্মুক্ত। তারা যদি সেই আলোকিত পথ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের পথ ধরে এগিয়ে যায় তাহলে বিশ্বে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই হবে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র। ■

www.pathagar.com

রাসূলের [সা] আদর্শে জীবন গঠন

আবদুর রহমান

এসো সকলকে সালাম প্রদান করা

হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] বলেছেন, "তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা পুরোপুরি ঈমানদার হতে পার না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যে অনুযায়ী তোমরা কাজ করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা এই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন খুব বেশি করে কর এবং একেবারে সাধারণ করে তোল।" [সহীহ্ মুসলিম]

আলোচ্য হাদিসটিতে ঈমান, পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা তৈরীর জন্য সালামের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই সকলকে সালাম দেয়া ঈমানের অন্যতম একটি কাজ। ঈমানকে সুসংবদ্ধ করার জন্য বেশি বেশি সালাম প্রচলন করা একান্ত জরুরি। সবার আগে সালাম দেয়া একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। যে সালাম দেয় সে অহঙ্কারমুক্ত। সালাম বিনয় ও নম্রতার প্রতীক।

www.pathagar.com

আমাদের এ যুগের কেউ কেউ সালাম বলতে পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদেরকে কদমবুছি করে বকশিশ আদায়ে অভ্যস্ত। সালাম দ্বারা কদমবুছি বুঝানো হয়নি। সালাম বিনিময়ের মাধ্যম পারস্পরিক শান্তি কামনা করা। সে পরিচিত হোক আর অপরিচিত হোক, ছোট হোক আর বড় হোক। যখন তুমি সকলকে সালাম দেবে তখন চরিত্র উন্নত হবে এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভালোবাসা তৈরি হবে। মানুষের মন জয় করা সহজ হবে। যে সালাম দেয় সে কখনও দুশমনি করতে পারে না। সালামের মাধ্যমে কৃত্রিমতা ও কুটিলতামুক্ত মন তৈরি হয়।

সালামের নিয়ম

দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করবে, সাইকেল-মোটরসাইকেলে আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে সালাম দেবে, একাকী থাকলে সমষ্টিগত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করবে। দু'জনের মধ্যে একটি পিলারের আড়াল হলে পুনরায় সালাম দেয়া যাবে। টেলিফোন মোবাইলে কথার শুরুতে সালাম দেয়া উচিত। কারো ঘরে প্রবেশের আগে সালাম দেয়ার মাধ্যমে অনুমতি চাওয়া, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া।

পরস্পর সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা, কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তির ইমারত নির্মাণ এবং পূর্ণ ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হক যথাযথভাবে আদায় করা যায়।

সফলতার প্রস্তুতি নিতে হবে

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত। নবী [সা] বলেন : [কিয়ামতের দিন] আদম সন্তানের পা [স্বস্থান থেকে] একটুও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না পাঁচটি বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

১. সে তার জীবনকালটা কি কাজে ব্যয় করেছে।

২. তার যৌবনকাল কি কাজে ব্যয়িত হয়েছে।

৩. সে তার ধন-সম্পদ কোন্ পন্থায় উপার্জন করেছে।

৪. কোন্ কাজে ব্যয় করেছে এবং

৫. সে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটা আমল করেছে। [তিরমিযী]

আমাদের সবাইকে ক্ষণস্থায়ী এই জীবন- ইহ্কাল ত্যাগ করে পরকালীন জিন্দেগিতে পাড়ি জমাতে হবে। সেখানে জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। উপরোক্ত পাঁচটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কাউকে নড়তে দেয়া হবে না।

নবী-রাসূল [সা] ও সাহাবীগণ পরকালের চিন্তায় সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। হযরত আবু যার গিফারী [রা] মাঝে মাঝে বলতেন- হায়! আমি মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন? আমি

www.pathagar.com

যদি একটি গাছ হতাম তাহলে আমার পরকালের চিন্তা করার প্রয়োজন হতো না। গাছটি কেটে ফেললে আল্লাহর নিকট হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার বা শাস্তি– এমনি ভয়াবহ অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পেতাম।

আমরা যেহেতু মানুষ হয়ে জন্মেছি– তাই অবশ্যই আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করতেই হবে। যে ব্যক্তি পরকালীন জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করে জীবন পরিচালনা করে, সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

মানুষের জীবনকাল একটি কঠিন পরীক্ষা বা প্রস্তুতির সময়। আল্লাহ মানুষকে যতকিছু নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন, যৌবনকাল, ধন-সম্পদ উপার্জন করার সুযোগ ও ব্যবহার করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান ও শিক্ষা।

সুতরাং আমাদের অমূল্য জীবনকে হেসে-খেলে অতিবাহিত করলে চলবে না। তারুণ্যকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দিলে চলবে না। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে।

মহান রাব্বুল আলামীনের দেয়া জীবন ও যৌবনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পরকালের জবাবদিহিতার প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি।

সততা অবলম্বন করা প্রয়োজন

হযরত ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [সা] বলেন, সততা পুণ্য ও কল্যাণের পথ দেখায়। আর পুণ্য ও কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর সিদ্দিক [পরম সত্যবাদী] নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট চরম মিথ্যুক নামে অভিহিত হয়। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

সততা, সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। তোমরা নিশ্চয় জান, সততার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আবদুল কাদের জিলানী [রহ] ডাকাত দলের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সততা ও সত্যনিষ্ঠার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় নির্দেশ এসেছে। যেমন– আত তওবা : ১১৯, আহযাব : ৩৫ ও মুহাম্মাদ : ২১ প্রভৃতি সূরা।

যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল ও মনীষীগণ সততার পরিচয় দিয়েছেন। তোমরা জান যে, সত্যবাদিতার কারণে নবী করীম [সা] আল আমীন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কাফির-মুশরিক সকলেই তাঁকে সত্যবাদী হিসেবে জানতো এবং তাঁর কাছে ধন-সম্পদ আমানত রাখতো।

সততার মাধ্যমে উন্নত নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে। সত্যবাদীদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল

www.pathagar.com

মীন বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো- সৎ কার্যাবলী।

তাই আমাদের সত্য কথা বলতে হবে সত্য পথে চলতে হবে

মিথ্যাবাদিতা মুনাফিকের অন্যতম একটি আলামত। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদের পছন্দ করেন না। আর মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে, সমাজে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। মিথ্যাবাদীরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

বিনয় নম্রতা অবলম্বন করা

হযরত উমার [রা] থেকে বর্ণিত। একদা তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। সে লোকদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হয়। আর যে ব্যক্তি গর্ব-অহঙ্কার করে আল্লাহ তাকে হতাশ করেন, যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে কিন্তু সে মানুষের দৃষ্টিতে নীচ ও মর্যাদাহীন হয়ে যায়। এমনকি সে তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্যজীবের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট হয়ে যায়।

বিনয় নম্রতা নৈতিক চরিত্রের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। বিনয় নম্রতা ছাড়া কেউ সফলকাম হতে পারে না। যে সর্বদা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে সে সকলের কাছেই প্রিয়পাত্র হয়। এ ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনদের মান-মর্যাদা রক্ষা করা, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অহঙ্কারের সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা না বলা, উচ্চস্বরে কথা না বলা ও অশালীন কথাবার্তা না বলা। সবসময় প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে মানুষের সাথে ওঠাবসা, আচার ব্যবহার করা, চরিত্রে নম্রতা বিনয় অবলম্বন করা। কারো প্রতি দোষারোপ না করা, কৃপণতা না করা, ঝগড়া-বিবাদ, অহঙ্কার, অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজ বর্জন করা।

যুগে যুগে যেসব নবী-রাসূলগণ এসেছেন, সবাই বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করেছেন। সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌছানোর জন্য বিনয় নম্রতার কোন বিকল্প নেই। আর গর্ব-অহঙ্কার একেবারেই পরিত্যাগ করতে হবে। হাদিসে এসেছে- 'যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' গর্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করে সর্বক্ষেত্রে আমাদের বিনয় নম্রতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

আবু শুয়াইহ আল খুযাঈ [রা] থেকে বর্ণিত, নবী করীম [সা] বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ-আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।" [সহীহ মুসলিম]

www.pathagar.com

যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে কখনও মুসলিম হতে পারে না। রাসূল [সা] একদা আল্লাহর শপথ করে তিনবার উচ্চারণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আন নিসার ৩৬নং আয়াতে প্রতিবেশীর অধিকার এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামে। কিয়ামতের দিন দু'জন প্রতিবেশীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরতম প্রতিবেশী, চলার সাথী, পথিক, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে সদ্ব্যবহার, দয়া এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত। রাসূলে করীম [সা] বলেন, জিবরীল [আ] এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন এমনকি আমার মনে হত তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।

প্রতিবেশীর প্রতি এতই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে ব্যক্তি পাড়া প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে কখনো ঈমানদার হতে পারে না। যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে সে পাকা ঈমানদার হতে পারে না। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের কথাও বলা হয়েছে। যেন কোন মেহমান কষ্ট না পায় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সকলের সাথে ভালকথা বলাও অপরিহার্য। অন্যথায় চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেশীর সুখে-দু:খে, বিপদে-আপদে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। ফল-ফলাদি ও খাদ্যবস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন পাঠানোও জরুরি। নামায, রোযা, দান-খয়রাত করলেও প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। প্রতিবেশীর কল্যাণের কথা চিন্তা করেই সকল কাজ-কর্ম করা উচিত। সুখে-দু:খে সর্বদা তাদের পাশেই থাকতে হবে এবং সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তবেই আল্লাহপাক এবং রাসূল [সা] আমাদের ওপর খুশি থাকবেন।

দীনি শিক্ষা গ্রহণ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [সা] বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি দীন সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান ও সমঝ দান করেন। [মুসনাদে আহমদ]

প্রিয় বন্ধুরা, সকল কল্যাণের মূল কথা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা। জ্ঞানার্জন ছাড়া কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। এ জন্যই রাসূল [সা] বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয।" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি দীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দান করেন। এ কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দীনি শিক্ষাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। দীনি শিক্ষার মাধ্যমেই অফুরন্ত কল্যাণ ও জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

দীনি শিক্ষা লাভ করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। যে ব্যক্তি দীনি শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার মত সৌভাগ্যবান আর কেউ কি হতে পারে?

এ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে দীন ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান অর্জন সম্ভব। শুধু তাই নয় কুরআন-হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো জরুরি।

দীনি শিক্ষা– ঈমানদার মুমিন ব্যক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা তা ছাড়া ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি দীনি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পথ চলবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দেবেন। আর দীনি শিক্ষা শুধু গ্রহণ করলেই হবে না– এটি অন্যদের মাঝেও পৌছে দিতে হবে।

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহ সেই বান্দাহকে সবুজ-সতেজ করে রাখবেন যে রাসূলের [সা] দীনি শিক্ষা গ্রহণ করলো, পূর্ণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলো, তা স্মরণ রাখলো এবং যেমন শুনেছে ঠিক সেইভাবে হুবহু তাই অন্যদের নিকট পৌছিয়ে দিল। এই কাজ যে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে রাসূল [সা] তার জন্য দু'আ করে বলেছেন যে, আল্লাহ যেন এই লোককে চির সবুজ ও সতেজ রাখেন।

সুতরাং আমরা দীনি শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যবহারিক জীবনে পালন করি এবং অন্যদের মাঝেও সেটা প্রচার করি।

জামায়াতে নামায আদায় করা

হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'কোন ব্যক্তির জামায়াতে নামায পড়ার সওয়াব তার বাজারে ও ঘরের নামায অপেক্ষা বিশ গুণেরও বেশি। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভালোভাবে অযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতি পদক্ষেপে তার এক ধাপ মর্যাদা বর্ধিত হয় এবং তার একটি করে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটকে রাখে এবং তার অযু ভঙ্গ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ কর, হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল কর।' [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

প্রত্যেকের জন্য নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। পবিত্র কুরআনে নামাযের কথা বিরাশি বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদিসে জামায়াতে নামায আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নামায বেহেশতের চাবি। নামায সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর নামায যদি জামায়াতে

www.pathagar.com

আদায় করা হয় তাহলে বিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি করা হয় এবং অযু করা থেকে নামায শেষ পর্যন্ত তার মর্যাদা বাড়তে থাকে এবং গুনাহ্ মাফ হতে থাকে। আর ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন।

জামায়াতে নামায আদায়ের কত বড় মর্তবা! একটু চেষ্টা করলেই এই মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব। নামাযের সময় জামায়াতে নামায আদায় করার অভ্যাস আমাদের মধ্যে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

কুরআন অধ্যয়ন

হযরত উমামা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন পড়ো, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। [সহীহ মুসলিম]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। আর হিদায়াতের জন্য দিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও একমাত্র সংবিধান। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে আল কুরআনে।

তাই কুরআন অধ্যয়ন করা জরুরি। জানা এবং মানার জন্য আল কুরআন পড়তে হবে। আল কুরআন শুধু তিলাওয়াত করলে হবে না। অর্থ ব্যাখ্যা সহকারে পড়তে হবে বুঝতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তার সফল প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

রাসূল [সা] বলেছেন, যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলালেবু, তার খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে খোরমার মতো। তাতে খুশবু নেই কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ফল। খুশবু তার মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে মাকাল ফলের মত। তাতে কোন খুশবুও নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত।

কুরআন হলো পথের আলো, কুরআন জীবনের আলোকবর্তিকা। এজন্য আমাদের নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। কুরআন তার পাঠকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে।

সুতরাং আমরা নিয়মিত কুরআন পড়ি, নিজেদের জীবনকে সুন্দর করি এবং আল কুরআনের সমাজ গড়ি।

জ্ঞান অর্জন করা জরুরি

হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূল [সা] বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন।' [সহীহ মুসলিম]

বন্ধুরা, ইল্ম হাসিল করার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা। ইলম অর্জন করা সকল

www.pathagar.com

মুসলিমের কর্তব্য। ইলম অর্জন এমন একটি কাজ যার ফলে জান্নাত পাওয়া খুব সহজ হয়ে যায়। কেননা জান্নাত লাভ নেক আমল করার ওপর নির্ভরশীল। আর সঠিক ইল্‌ম ব্যতীত নেক আমল সম্ভব নয়।

দীন সম্পর্কিত ইল্‌ম যে ব্যক্তি অর্জন করে তার জন্য আসমান জমিনের সকল জীবই আল্লাহর কাছে গুনাহ্ মাফের জন্য দু'আ করে।

ইলম সন্ধানকারীর ওপর ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট থাকেন। ইল্‌ম একটি নূর তা ইল্‌ম অর্জনকারীকে আলোকমণ্ডিত করে তেমনি অপরকেও করে জ্যোতির্ময়।

ইলম সংক্রান্ত একটি হাদিসের শেষাংশে ৩টি কথা বলা হয়েছে : একজন আবিদের তুলনায় আলিমের মর্যাদা বেশি, আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস-উত্তরাধিকরী। আর যে ব্যক্তি ইল্‌ম লাভ করে সে প্রকৃতই ভাগ্যবান।

সকল কল্যাণের মূল হচ্ছে ইল্‌ম। যে ব্যক্তি ইল্‌ম লাভ করতে পারে না সে যদি বিপুল ধন-সম্পত্তি লাভ করে, তবুও তার মত হতভাগ্য ও প্রকৃত কল্যাণ হতে বঞ্চিত আর কেউ নেই।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] ইল্‌মের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'ইল্‌ম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর নারীর জন্য ফরয'। এর সময়সীমা সম্পর্কে বলেন, "তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অর্জন কর"। এর বিস্তৃতি বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'প্রয়োজনে চীন দেশে যাও'।

বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা

হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান [এ শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ থেকে যেন পালিয়ে না যায়] আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। [তিরমিযী]

২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঘূর্ণিঝড় সিডর। সিডরের আঘাতে অনেক শিশু-কিশোর-তরুণ যুবকসহ প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ ও পশু-পাখি। ঘরবাড়ি, গাছপালা ধন-সম্পদ সবকিছুই তছনছ হয়ে গেছে।

হাদিসের মর্মানুযায়ী আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। যারা নিহত হয়েছেন তাদের জন্য দু'আ

www.pathagar.com

করি– আল্লাহ্ যেন তাদের কল্যাণ দান করেন আর যারা জীবিত আছেন তাদে· আমাদের যার যা আছে– তাই নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসি। জামা-কাপড়, খাদ্য-সামগ্রী, টাকা-পয়সা, বই-খাতা ও কলম দিয়ে যেন এক একজন শিশু-কিশোরের পাশে দাঁড়াই তাহলে তারা নবোদ্যমে নিজেদের কাজে ফিরে আসবে।

বিপদে-আপদে অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখতে হবে।

উত্তম চরিত্র অর্জন করা আবশ্যক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল [সা] বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক হচ্ছে তারা যাদের চরিত্র তোমাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম।" [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ঈমানের পরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন নৈতিক চরিত্রের ওপর। ইসলামের দৃষ্টিতে সেই উত্তম যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।

কিয়ামতের দিন রাসূলের [সা] নিকট অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি কে হবেন জানো? যার চরিত্র সুন্দর, উত্তম-ভালো, সেই রাসূলের [সা] প্রিয় ব্যক্তি হবে এবং আমল ওজন করার ক্ষেত্রেও উত্তম চরিত্রই অত্যন্ত ভারী জিনিস রূপে প্রমাণিত হবে।

উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য খারাপ কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে হবে। মিথ্যা কথা বলা, অপরকে মিথ্যা দোষারোপ করা গালাগাল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা খারাপ কথা বলে, অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

ভালভাবে লেখাপড়া করা পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, বিনয় নম্রতা অবলম্বন করা, নিয়মিত নামায আদায়ের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন সম্ভব।

যাদের চরিত্র পবিত্র এবং উত্তম তারা দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণ লাভ করবে। উত্তম চরিত্র সকল কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেয় এবং চরিত্রবান লোকদের মুখমণ্ডল সব সময়ই উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হয়ে থাকে।

তাই আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে অপূর্ব নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করতে হবে। মন-মগজ থেকে সকল প্রকার ক্লেদ, কালিমা মলিনতা থেকে মুক্ত করে চরিত্রকে নির্মল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ করা একান্ত অপরিহার্য।

প্রকৃত মুসলিম হতে হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রা] নবী করীম [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] বলেছেন, মুসলিম সেই যার জবান ও হাত থেকে অপর মুসলিমগণ রক্ষা পায় এবং মুহাজির সেই যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে। [বুখারী]

www.pathagar.com

মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য ইসলামের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হয়।

রাসূল [সা] প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য নিজের জবান ও হাত থেকে মানুষকে হেফাজতের কথা বলেছেন।

বন্ধুরা, জবান বলতে এখানে জিহ্বাকে বুঝানো হয়েছে। জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারলে এবং স্বীয় আয়ত্তে রাখলে দুনিয়ার সকল প্রকার ফেৎনা ফাসাদ থেকে দূরে থাকা সম্ভব। মানুষ খারাপ কথা বলুক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তা চান না। জিহ্বা আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহার করলে ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ যথাযথ পালন করা সম্ভব। দুনিয়ার বহু ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জিহ্বার আঘাত তরবারির চেয়েও বিষাক্ত।

জবান বা জিহ্বার সাথে সাথে রাসূল [সা] হাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। এক মুসলমানের হাত দ্বারা অপর মুসলমান ভাই যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এ জন্যও রাসূল [সা] নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদিসে হাত দ্বারা অনধিকার চর্চা, অপরের মাল-সম্পদে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ করার অর্থও বুঝায়।

যার জবান ও হাত দ্বারা অপর মুসলিম আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে কখনো প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল [সা] প্রকৃত মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে জিহ্বা ও হাতকে সংযত করার নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও হাত দ্বারা অপর ব্যক্তিকে আঘাত করে সে ইসলামের হুকুম-আহকাম যতই পালন করুক না কেন কখনও প্রকৃত ও পূর্ণ মুসলিম হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

হাদিসের শেষ অংশে মুহাজির বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।

তাই আমরা সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলি, নিজের হাত দিয়ে অন্যকে আঘাত না করি। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে প্রকৃত মুসলিম হই।■

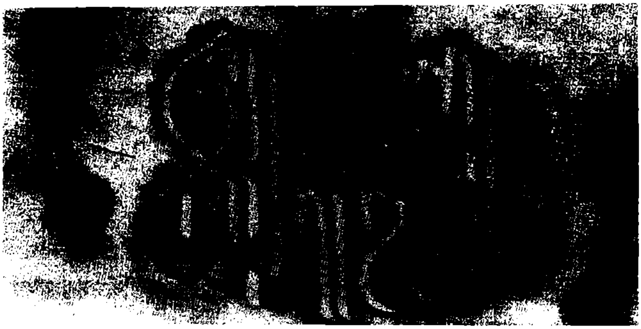

www.pathagar.com

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল [সা]

মোরশেদা খান শেলী

পাশ্চাত্য জগত আল্লাহবিমুখ চিন্তাধারার ওপর যে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা গড়ে তুলছে, যাতে মানুষকে পশুর পর্যায়ে রাখা হয়েছে এবং যা মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগবাদের শিক্ষা দিয়েছে, তার মৌলিক মতাদর্শের যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে নারী পুরুষের সহশিক্ষা ও অবাধ মেলামেশাজনিত সভ্যতাহীন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থা।

শিক্ষাঙ্গন ছাড়াও সামাজিক পারিবারিক দাম্পত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গে এই অবাধ মেলামেশার যে কুফল দেখা দিয়েছে তা নারীকে নারীত্বের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে নিচে নামিয়ে কেবল দাসীর জীবনে এবং ভোগপণ্যে পরিণত করেছে! নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি, নর-নারীর সমানাধিকার ইত্যাকার মায়াবী ও মুখরোচক শ্লোগানের প্রভাবে সরলমনা অনেক নারী বিভ্রান্ত হয়ে অধ:পতনের নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর সমাজ- সমাজ সংসারে ক্রমাগত বেজে চলে এক ভয়াবহ ধ্বংসের ঘণ্টাধ্বনি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা দু'টি পর্যায়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে। যেমন :

১. অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলী যুগে।

২. আজকের আধুনিক যুগে।

আমরাতো অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলী যুগে নারীরা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

কম-বেশি জানতে পারি বিভিন্ন ইতিহাসের মাধ্যমে। কিন্তু আজকের বর্তমান আধুনিক যুগে যেভাবে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে সে সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে।

আজকের আধুনিক যুগে নারীরা বিভিন্নভাবে সমাজে অবমাননার শিকার হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নারীরা বুঝতে না পারলেও একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে এই নারীরা কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমর্যাদার শিকার হচ্ছে। যেমন :

১. বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

২. অশ্লীল সাহিত্যের মাধ্যমে।

৩. নারী সৌন্দর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে।

৪. অশ্লীল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

৫. ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে, প্রভৃতি।

এ সবের মাধ্যমে নারীরা যে ভূমিকা রাখছে তা খুবই জঘন্য। বিশেষ করে অশ্লীল চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নারীরা যেভাবে পণ্যে পরিণত হচ্ছে তা খুবই দৃষ্টিকটু ও ন্যাক্কারজনক। তাদের কারণে দেশের যুব সমাজ আজ ধ্বংসের মুখে। তাদের এই বেহায়াপনা শুধু একটি নারীকে অপমানিত করছে না বরং গোটা নারী সমাজকে অপমানিত করছে। যদিও একশ্রেণীর লোক তাদের বাহ্ বাহ্ দিচ্ছে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করছে। এ কারণে তারাও ভাবছে যে তাদের মর্যাদাটা যথাথযভাবে রক্ষা হচ্ছে। আসলে কি তাই? এখানে কি নারীকে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে? না তাদের দ্বারা স্বার্থ হাসিল করছে? না তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে? এটা অবশ্যই প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ আমরা সবাই জানি এই নারীরাই একটা জাতির অর্ধেক। তাছাড়া তাদের বিশেষ মর্যাদাও আছে। যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নেপলিয়ান বলেছেন যে,

"আমাকে একটা শিক্ষিত মা উপহার দাও,
আমি তোমাদেরকে একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।"

এটা কি তিনি শুধু শুধুই বলেছেন? না নারীর মর্যাদার কথা ভেবে বলেছেন।

সেই জাহিলিয়াতের যুগে নারীদের কোন মর্যাদা অধিকার ছিল না নারীরা কেবল ভোগ-বিলাসের পাত্র ছিল, তখন সেই তমাসচ্ছন্ন যুগে রাসূলই [সা] কেবল নারীদের মর্যাদার কথা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে নারীরা সমাজে বিভিন্নভাবে মর্যাদার অধিকারিণী। যেমন :

১. মা হিসাবে।

২. কন্যা হিসাবে।

www.pathagar.com

৩. স্ত্রী হিসাবে।

৪. বোন হিসাবে।

৫. দাসী হিসাবে।

মা হিসাবে মর্যাদার কথা উল্লেখ করে রাসূল [সা] বলেছেন– "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।" তাছাড়া আরও একটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,

"একবার এক ব্যক্তি রাসূলের [সা] কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূল [সা] আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে অগ্রাধিকার কার? রাসূল [সা] বললেন, "তোমার মা"। তারপর তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে? রাসূল [সা] বললেন, "তোমার মা"। এভাবে লোকটি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনবারই রাসূল [সা] বললেন, "তোমার মা"। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে মা হিসাবে নারীর মর্যাদা কত উর্ধ্বে। আরও একটি হাদীস থেকে জানা যায় তিনি নারীকে মা হিসাবে কত বড় মর্যাদা দান করেছেন। হাদীসে আসছে–

> "এক যুদ্ধে এক সাহাবীর মা খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি রাসূলের [সা] কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূল [সা]! বাড়িতে আমার মা খুব অসুস্থ, আমি কি যুদ্ধে যাব? রাসূল [সা] বললেন, না তুমি বাড়িতে যাও তোমার মায়ের খেদমত করো তাহলে তুমি যুদ্ধের সওয়াব পাবে।"

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে রাসূল [সা] এখানে কিভাবে মায়ের মর্যাদা তুলে ধরেছেন। যেখানে যুদ্ধ করা ফরয, সেখানে সেই ফরয কাজটি বাদ দিয়ে মায়ের সেবার কথা রাসূল [সা] বলেছেন।

নারী বা মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল [সা] কিভাবে ভূমিকা রেখেছেন, সেটা অনুধাবনের বিষয় বটে। মায়ের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফে বলেন যে,

> "আমরা মানুষকে তাকীদ করেছি তারা যেন পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার মা নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। কষ্ট স্বীকার করে সন্তান প্রসব করেছে।"

জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানের কোনো কদর বা মর্যাদা ছিল না। কন্যা হিসাবে রাসূলই [সা] সর্ব প্রথম কন্যা সন্তান হওয়াকে অভিভাবকরা পাপ মনে করতো। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। ঠিক এমনি সঙ্কটপূর্ণ সময়ে রাসূল [সা] ঘোষণা দিলেন যে,

> "যখন তোমাদের ঘরে কোনো কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয়।"

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে,

> "রাসূল [সা] বলেছেন, যাকে এই কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয় সে

www.pathagar.com

যদি তাদের সাথে সদয় আচরণ করে, উত্তমভাবে লালন পালন করে তবে এই কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।"

নারীকে আরও একটা বড় মর্যাদা দিয়ে রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সেটা হচ্ছে স্ত্রী হিসাবে। স্ত্রীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল [সা] বলেছেন যে :

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রী নিকট সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে নিজ পরিবারের সঙ্গে স্নেহশীল আচরণ করে।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

"আর স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।" (সূরা আন-নিসা)

বোন হিসাবে নারীকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা রাসূলের [সা] বাণী থেকে জানা যায়। রাসূল [সা] বলেছেন :

"যে ব্যক্তি তার দুই বোনকে ভরণ পোষণ দেবে আমি এবং সে আখিরাতে এক সাথে মিলিত হবো।"

সর্বশেষে আরও একটি মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে দাসী হিসাবে। যদিও দাস-দাসী প্রথা মুসলিম সমাজে এখন নেই। তবুও রাসূল [সা] সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দাসী হিসাবেও নারীকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় এবং অতুলনীয়। রাসূল [সা] বলেছেন :

"যার অধীনে কোনো দাসী আছে সে যেন তাকে ভালভাবে শিক্ষা দান করে ভদ্রতা, শালীনতা, শিক্ষা দেয়, অতপর তাকে স্বাধীন করে দেয় অথবা বিয়ে করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।"

ওপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূলের [সা] প্রদর্শিত পথই সর্বকালে ও সর্বযুগে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। এখানে ছোট কন্যা থেকে শুরু করে সর্ব বয়সের নারীকে সমান মর্যাদা দান করা হয়েছে। আজকের সমাজেও যদি সেই আল্লাহ প্রদত্ত বিধান এবং রাসূল [সা] প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা হয় তাহলে শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র বিশ্বেই নারীর মর্যাদা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।

নারী ফিরে পাবে তার পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার। স্মরণযোগ্য যে, ইসলাম ছাড়া নারীর যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আর দ্বিতীয় কোনো পথই অবশিষ্ট নেই।

সুতরাং নারীর সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্য রাসূল [সা] নির্দেশিত পথই সর্বোত্তম এবং একমাত্র পথ।■

www.pathagar.com

পরশ পাথর

নাসীমুল বারী

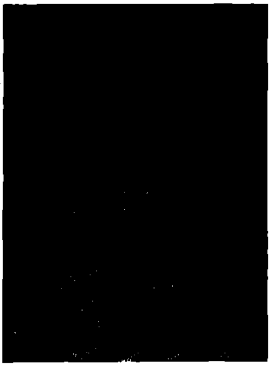

পড়ন্ত এক বিকেলে দ্রুত হেঁটে আসছে কাবার দিকে আফিফ।

মরু-ধূলিময় আর কারো অমসৃণ পাহাড়ে ঘেরা শহর মক্কা। দিনের রোদে বাতাস এখনো তপ্ত। তপ্ত মরুর বালিরাশিও। মাঝে মাঝে তপ্ত ঘূর্ণি বাতাসে বালু উড়ে উপরে উঠে যায়। তারপরই ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকাকে বালি কুয়াচ্ছন্ন করে তোলে।

তপ্ত এ বালুময় পথ ধরেই দ্রুত হেঁটে চলছে আফিফ।

ইয়ামেনের কিনদা এলাকার যুবক। তাই নামটাও অমনই– আফিফ আর কিনদি। আব্বাসের সাথে দেখা করতে মক্কায় এসে পৌঁছেছে, কিন্তু আব্বাসের দেখা পায়নি। আব্বাসের সাথে তার দেখা করতেই হবে। তাকে তার জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তবেই শান্তি।

কাবা ঘরের খাদিম মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস।

মুহাম্মাদের চাচা।

আব্বাস অনেক আগে আফিফকে ইয়ামেনের ধুনা নিয়ে আসতে বলেছিল। সে কথা দিয়েছিল ধুনা দিয়ে আসবে। আজ ধুনা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আব্বাস তো ঘরে নেই। নিশ্চয় কাবার ওদিকে কোথাও আছে।

www.pathagar.com

তাই দ্রুত হেটে চলছে কাবার দিকে।

সন্ধ্যার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে, তার প্রাপ্য দ্রব্যাদি বুঝিয়ে দিতে হবে।

কাবার কাছে পৌঁছতেই আব্বাস তাকে দেখে সহাস্যে বলে– কি হে আফিফ কেমন আছো?

– ভালো। তোমাকেই খুঁজছি। তোমার ধুনা এনেছি।

– ও! তাই নাকি। বেশ তো।

ঠিক তখনি কাবার বারান্দায় এসে ঢোকে এক লোক।

গায়ে লম্বা পোশাক।

চোখ তার বেশ উজ্জ্বল।

পড়ন্ত বেলার সূর্যটা দেখে নিল। তারপর যমযম কূয়োর ধারে গিয়ে পানি তুলে মুখ ধুলো, মাথায় দিল। অভিনব ও বিশেষ নিয়মে এসব কাজ করে কাবার কাছে ফিরে এলো। তাকে অনুসরণ করল একজন মহিলা ও একটি ছোট ছেলে। তারপর কাবাকে সামনে রেখে লোকটি দাঁড়িয়ে বিশেষ নিয়মে কিছু কাজ করতে লাগল– তা দেখে বুঝা যায় এ এক ধরনের ইবাদত।

মহিলা আর ছেলেটিও একইভাবে অনুসরণ করল।

আফিফ ভীষণ চমকে তাকিয়ে র'লো সেদিকে। আব্বাসের সাথে কথা বলা ভুলেই গেল।

ক্ষণিক পর অনেক বিস্ময় নিয়ে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করে– ওরা কারা? কী করছে ওরা?

আফিফের এমন বিস্ময়াভিভূত প্রশ্ন শুনে আব্বাস একটু থমকে যায়। সুদূর ইয়ামেন থেকে এসেও এ যুবক ওই ইয়াতীম মুহাম্মাদের প্রতি কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেছে। যুব ছোকরাদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। সবাই যেন নিজেদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে। মুহাম্মাদের কথায় পবিত্র মূর্তিগুলোকে অসাড় ভাবছে। এ কেমন কাণ্ড!

আফিফ বিদেশী মেহমান। তাই ওর সাথে অসৌজনমূলক কোন আচরণ করল না আব্বাস। অথচ ভেতরে ভেতরে খুব রাগ হয়েছে। নিজেকে ভদ্রভাবে সামলিয়ে মৌন কণ্ঠে বলল– ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। সে দাবী করছে যে সে একটা নতুন ধর্মের প্রবর্তক। মহিলা তার স্ত্রী– নাম খাদীজা। ছোট ছেলেটি আমারই ভাই আবু তালিবের পুত্র আলী।

– অমন করে কী করছে?

– এটা নাকি ওদের ইবাদত।

– এতো সুন্দর ওদের ইবাদত।

বিস্ময়ে ভাবতে থাকে আফিফ।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদের ওই রাতের ঘটনার পরই এমন সুন্দর ও মহান ইবাদতের জন্যে তাঁকে তৈরী করা হয়।

রাতের ঘটনাটা বড়ই অলৌকিক।

মাত্র পূর্ণিমা পেরিয়েছে।

রমযানের রাত। শেষ প্রহর।

চাঁদনী রাতটা এখনো বেশ কোমল। হেরা পর্বতের গায়ে এ কোমল দীপ্তময় আবা আছড়ে পড়ছে। প্রত্যুষের দিগন্তরেখা দেখা দেয়নি। পাখিরা বাসা ছেড়ে জেগে উঠেনি। মুহাম্মাদ হেরা পর্বতেই ধ্যানে আছেন।

মক্কার ভিন্ন স্বভাবের মানুষ আবদুল্লাহর পুত্র এই মুহাম্মাদ।

একদম ভিন্ন প্রকৃতির।

কাবার ওই মূর্তিগুলোতে বিশ্বাস রাখেনি কখনো। শ্রদ্ধা করেনি। প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম বিশ্বাসকেও মানেনি। তবু বিশ্বস্ততায় ছিল 'আল-আমীন' আর সমাজ সংস্কারে 'হিলফুল ফুজুল'। ধর্মীয় আর সামাজিকতার অন্ধকারে ডুবে থাকা আরবে মুহাম্মাদ দ্যাদীপ্যমান আলোককণা। শান্তি আনয়নের এক স্বপ্নদ্রষ্টা।

সেই মুহাম্মাদের উপরই রাতের এ প্রহরে ঘটে গেল এক মহা ঘটনা। আকাশ পৃথিবীর এক নবতর উন্মেষ।

আকাশে দিগন্ত বিস্তৃত পাখা মেলে আর পৃথিবীর জমিনে পা রেখে দাঁড়িয়ে এক স্বর্গীয় ছায়ামূর্তি মুহাম্মাদের দিকে চেয়ে আছে। চোখে মুখে তার স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য বিকশিত।

ভয়ে কেঁপে উঠেন মুহাম্মাদ।

আর তাকিয়ে থাকতে পারলেন না তার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। নিজের চিন্তাকে সংযত করলেন। হঠাৎ নজরে পড়ে সেই ছায়ামূর্তির ঠোঁট কাঁপছে। মৃদু বাতাসে গাছের পাতা যেমন কেঁপে ঠিক তেমন। সেই কাঁপা ঠোঁটে স্বর্গীয় ছায়ামূর্তিটা বলে, "মুহাম্মাদ এখন আপনি আল্লাহর নবী।"

একথা অন্ধকারের নীরবতা ভেদ করে অনুরণিত হতে লাগল চারদিক। আবার বলে সেই ছায়ামূর্তিটা, "মুহাম্মাদ এখন আপনি আল্লাহর নবী। আমি জিবরাঈল; আপনার কাছে আমি এ খবর বলেয় নিয়ে এনেছি। আপনি বলুন, পড়, প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

সেই প্রথম ওহী; প্রথম বাণী।

নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটে রাতের এ প্রহর থেকেই।

তারপর!

www.pathagar.com

তারপর আরো এসেছেন জিবরাঈল। শিখিয়েছেন পবিত্র হবার নিময়াবলী। ইবাদত বাণী– আরো অনেক।

জিবরাঈলের শেখানো আল্লাহর এ ইবাদত প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত। এ ইবাদত সুন্দর আর শান্তির হবে না তো কোনটা হবে?

বিস্ময়ে বিমূঢ় একরাশ প্রশান্তি। রুক্ষ তপ্ত মরুতে এ ইবাদত যেন শীতলতার বয়ে যাওয়া নহর। এর পাশে শুধুই প্রশান্তি! চমক আর বিস্ময়ে ঘোর তাই যেন কাটছে না আফিফের। তাঁর পরশ পেতে মনটা আকুতি করছে।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়াভিভূত চিৎকার দিয়ে আফিফ বলে– আমার ইচ্ছে আমি ওদের মধ্যে চতুর্থ জন হই।■

www.pathagar.com

বোহাইরা পাদ্রীর বিস্ময়

নাজমুস সা'দাত

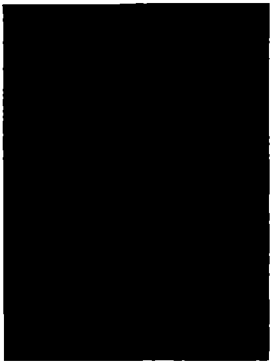

এক.

বসরা নগরী, সিরিয়া।

নিজের তেজারতী এবং কারবার নিয়ে আবু তালিব বছরে একবার করে এখানে আসেন। সেই বাণিজ্য উপলক্ষে এবারও কুরাইশদের কাফেলা বসরায় এসেছে।

আবু তালিবের ইচ্ছে ছিলো না, সেই সুদূর মক্কা থেকে মাত্র বারো বছরের বালক মুহাম্মাদকে নিয়ে এই বসরায় আসেন। কারণ মরুর উত্তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে ভ্রমণের যে কষ্ট এবং দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ওই বালককে পেরেশান করে তুলবে।

কিন্তু মক্কা থেকে রওনা দেবার প্রাক্কালে বালক মুহাম্মাদ আবু তালিবের পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল 'চাচাজান! আমিও যাবো আপনার সাথে।'

আবু তালিবও তার ভাতিজাকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন। ওর মনে কোন কষ্ট হোক তা তিনি চাইলেন না। তাই তাকেও এই সফরের সঙ্গী করেছেন।

www.pathagar.com

নগরীর প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশের আগে একটা গীর্জা সংলগ্ন বাড়ীতে নিজের শিষ্য 'নিসতাস' কে সাথে নিয়ে খৃস্টান ধর্মযাজক 'বোহাইরা' মক্কা থেকে আগত কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলাটিকে দেখলো।

'ওটা কুরাইশদের কাফেলা মনে হচ্ছে। তাই না নিসতাস?'

'জ্বি, তাইতো মনে হচ্ছে!' পাশে দাঁড়ানো নিসতাস গুরুর কথায় সম্মতিসূচক মাথা দোলালো।

'কিন্তু একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে নিসতাস!' ভ্রু কুচকে কাফেলাকে দেখছে খৃস্টান পাদ্রী।

'কি ঘটছে গুরু?'

'কতোদিন ধরে, কতোবারই না জীবনে এই কাফেলা দেখেছি কিন্তু এরূপ পরিবর্তন তো কোনদিন দেখিনি! আজ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।' যেন চিৎকার করে অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে বোহাইরা পাদ্রী।

'আজ কি দেখছেন?' উৎস্যুক শিষ্যের চোখে মুখেও।

'এক খণ্ড মেঘ! ঐ যে দেখো! কাফেলাটাকে ছায়া দিতে দিতে আসছে। দেখতে পাচ্ছো?'

গুরুর কথায় শিষ্য নিসতাস আকাশের দিকে তাকালো। সেই সাথে সজোরে চিৎকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ! তাইতো। মেঘের টুকরো। মেঘটা কিন্তু কাফেলার সাথে অবস্থানরত ওই সবচেয়ে কম বয়সী বালকটার মাথার উপর অবস্থান করছে।'

'আরে একি! আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিসতাস, ওর আশপাশের সমস্ত পাথর ও বৃক্ষ সিজদা করছে।'

'এসব কি ঘটছে গুরু! কেন ঘটছে?' অবুঝের মতো প্রশ্ন করলো শিষ্য নিসতাস।

বোহাইরা পাদ্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। একটু ভেবে বললো, 'সম্ভবত নবী...'

'নবী? সেই নবী যার কথা আপনি আমাদেরকে বলছিলেন!'

'হ্যাঁ, মেঘ তো কেবল সেই নবীকেই ছায়া দেবে। আমার মনে হয় ওই নবীর আত্মপ্রকাশের করার সময় এসে গেছে। আর কুরাইশদের এই কাফেলাতেই সেই নবী অবস্থান করছে।'

ও কথা শুনে নিসতাস আরো তীক্ষ্মভাবে কাফেলাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

'তবে ওই বালক...' আটকে গেল নিসতাসের কণ্ঠ।

'বিষয়টা আরো ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।'

'কিভাবে?' গুরুর কাছে জানতে চাইলো শিষ্য নিসতাস।

www.pathagar.com

'খাবারের ব্যবস্থা করো! পুরো কাফেলাটাকে দাওয়াত করবো।'

'সবাইকে?'

'হুঁ, সবাইকে। যাও।' হুকুম করলো পাদ্রী বোহাইরা।

'জ্বি। খুব ভালো কথা, গুরু। আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।' গুরুকে সম্মান জানিয়ে চলে গেল শিষ্য নিসতাস।

দুই.

ধীরে ধীরে কাফেলা নিকটবর্তী হলো।

বোহাইরা সজোরে চিৎকার করে ডাকলো 'হে কুরাইশ কাফেলা আমি তোমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার দাওয়াত কবুল করো।'

কাফেলা থেকে আবু তালিব বললো 'এ কেমন নতুন কথা শোনাচ্ছ ভাই বোহাইরা? আমি তো বরাবরই এইদিক দিয়ে যাওয়া আসা করি। কৈ এর আগে তো কোনদিন দাওয়াত দাওনি! আজ হঠাৎ তোমার কি হলো?'

'সত্যিই বলছি ভাই! নেমে এসো সবাই। আমার একটু তোমার মেহমানদারী করতে দেবে তো। মন চাইলো তোমাদের জন্য একটু ভালো মন্দ করবো। তাই আর কি! রান্না হচ্ছে তোমরা সবাই দাওয়াত কবুল কর। বড়ো ছোট আজাদ গোলাম- সবাই এসো।'

বোহাইরার এ আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করে কাফেলা সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। সবাই কাফেলা থেমে বোহাইরার আস্তানায় ঢুকে গেল।

বালক মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে চাচা আবু তালিব বললেন 'বাছা, তুমি কাফেলায় রয়ে যাও। আমি চাইনা তোমার কোন ক্ষতি হোক।'

ভাতিজাকে রেখে আবু তালিব বোহাইরার আস্তানায় খাবারে অংশগ্রহণ করলো।

বোহাইরা পুরো দলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে গিয়ে বললো 'সবাই এসেছো ভাই?'

'হ্যাঁ সবাই।' একজন কুরাইশ উত্তর করলো।

বুহাইরা পুনরায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকালো। ওভাবে তাকাতে দেখে আবু তালিব বললো 'এভাবে কি দেখছো ভাই? তুমি কি কাউকে খুঁজছো?'

'ভাই আবু তালিব! আমি বলেছি সবাই আসবে। একজনও যেন বাদ না থাকে। এমন যেন না হয় যে, বাদ পড়া কেউ আমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।'

'ভাই বোহাইরা। আমরা সবাই এসেছি। কেবলমাত্র একটা বালক বাদ। অবশ্য সে অনেক ছোট।'

আবু তালেবের এই কথায় বোহাইরার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে গেলো। বললো 'ওটা ঠিক হচ্ছে না। আমি চাইনা ওই বালকও এই দাওয়াত থেকে বঞ্চিত হোক। যাও ওকেও নিয়ে এসো। আমাদের সাথে খাবে।'

www.pathagar.com

বোইরার এই কথার সাথে সাথে একজন কুরাইশ বলে উঠলো– 'লাত এবং উজ্জার কসম! এটা বড়ই লজ্জার কথা যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে আমাদের সাথে দাওয়াতে শরীক হচ্ছে না।' কথাগুলো বলতে বলতে উটের হাওদা থেকে বালক মুহাম্মদাকে বের করে নিয়ে এলো লোকটি।

সবাই খেতে বসলো।

এক পর্যায়ে বোহাইরা বালক মুহাম্মাদের নিকটবর্তী হয়ে বললো, 'তোমার সাথে কথা আছে। খেয়ে উঠো বলছি।'

তিন.

খাওয়া শেষে মুহাম্মদাকে নিয়ে বোহাইরা একটু নির্জনে গেল। খুব নীচু স্বরে বলতে লাগলো, 'লাত এবং ওজ্জার কসম! যা জিজ্ঞেস করছি ঠিক ঠিক জবাব দাও।'

বোহাইরার এই কথায় বালক চোখ তুলে তাকালো।

'ও দুটোর কসম দিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ও দুটো আমি এতো অপছন্দ করি যে...'

'ঠিক আছে আল্লাহর কসম!' নিজেকে শুধরে নিলো পাদ্রী।

'এবার বলো, তুমি কি নিরবতা পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ, নির্জনতা আমার ভালো লাগে।'

'আকাশের দিকে তাকালে তোমার মনে হাজারো চিন্তা এসে জমা হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, হয়।'

'তুমি কি তোমার সমবয়সীদের সাথে গল্প গুজব আড্ডা দাও?'

'না, কখনো নয়।'

'তুমি কি কখনো এমন স্বপ্ন দেখো, যা পরে সত্যে পরিণত হয়?'

'জ্বি হ্যাঁ।'

বোহাইরা যেন তার মনের সমস্ত জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে গেল। তাই চিৎকার করে বললো– 'আবু তালিব, ভাই এদিকে শুনে যাও।'

বিস্মিত আবু তালিব প্রাদ্রীর নিকট এসে বললেন, 'কি হয়েছে বোহাইরা, এভাবে ডাকাডাকি করছো কেন?'

'এই বালক তোমার কে হয়?'

'আমার পুত্র।'

'কখ্নো নয়। এর বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই।'

'জ্বি হ্যাঁ। ও আমার ভাতিজা।'

www.pathagar.com

'ওর বাবার কি হয়েছে?'

'জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেছেন।'

এবার বোহাইরা অত্যন্ত নিচু স্বরে আবু তালিবের কানে কানে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো– 'ভাই, বলছিলাম কি, তোমার এই ভাতিজাকে নিয়ে তুমি ফিরে যাও।'

'কেন?' চোখ কপালে তুলে অত্যন্ত নিচু স্বরে জানতে চাইলেন আবু তালিব।

'ইহূদীরা ওর ক্ষতি করতে পারে। কারণ আমি যা বুঝতে পারছি তা যদি ওরাও বুঝতে পারে তবে ওরা তোমার ভাতিজাকে ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু কেন?'

'তোমার ভাতিজা প্রভূত উন্নতি সাধন করবে।'

'উন্নতি করবে! সত্যি বলছো ভাই? আমার ভাতিজা উন্নতি করবে?'

'হ্যাঁ ওর চেহারা নবীর মতো। দৃষ্টিও নবীদের দৃষ্টির মতো।'

'নবী?'

'আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এর কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের নিকটে ওহী আসে। নবীরা সেই ওহী অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়।'

বোহাইরা পাদ্রীর কথাগুলো শোনার পর আবু তালিব এবার বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।■

তথ্যসূত্র :

১. জামে আত তিরমিযী [আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান বর্ণিত]

২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ [আবু মূসা আশআরী রা. বর্ণিত] - ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ পৃষ্ঠা-৭৫

৩. মুখতারাছারুস সিরাত- শেখ আবদুল্লাহ পৃষ্ঠা-১৫-১৬

৪. সীরাতে ইবনে হিশাম- ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮০-১৮৩

৫. যাদুল মায়াদ- ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭

৬. স্যার উইলিয়াম ম্যুর, ড্রেপার, মারগোলিয়থ প্রমুখ খৃস্টান লেখকগণের 'বোহাইরা পাদ্রী'র এ ঘটনা সংক্রান্ত বর্ণনা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ
কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর
নিউমার্কেট শোরুমে আপনাকে
স্বাগতম

আমাদের নিজস্ব প্রকাশিত বই-এর
পাশাপাশি এখানে পাবেন
পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ
তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন সৃজনশীল
দেশী-বিদেশী বই
গল্প, উপন্যাস সহ বৈচিত্রপূর্ণ
মাল্টিমিডিয়া ও
অডিও ভিডিও সামগ্রী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১৫১-১৫২, নিউমার্কেট, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদের [সা]
৬৩ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন

ওমর ফারুক

৫৭০ খ্রিস্টাব্দেঃ জন্ম ২৯ আগষ্ট। ১২ মতান্তরে ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় বিশ্বনবীর [সা] জন্ম।

৪ সেপ্টেম্বর বয়স ৭ দিন। আকিকা ও নামকরণ করা হয়। হালিমা কর্তৃক প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ ।

৫৭২ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ২ বছর : হালিমা কর্তৃক বিশ্বনবীর [সা] মাতা আমিনার কাছে প্রেরণ। মক্কায় মহামারি রোগের কারণে পুনরায় হালিমার কাছে প্রেরণ।

বিশ্বনবীর [সা] বন্ধু, শ্বশুর ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের [রা] জন্ম।

৫৭৪ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৪ বছর : হালিমার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন প্রথমবারের মত বিশ্বনবীর [সা] বক্ষ বিদীর্ণকরণ।

৫৭৫ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৫ বছর : হালিমার ঘর বিশ্বনবী [সা] থেকে মাতা আমিনার কাছে প্রত্যাবর্তন।

৫৭৬ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৬ বছর : এ বছরের শেষ দিকে মাতা আমিনার সাথে মদীনায় গমন।

বিশ্বনবীর [সা] জামাতা ইসলামের তৃতীয় খলিফা হয়রত উসমানের [রা] জন্ম।

www.pathagar.com

৫৭৭ খ্রিস্টাব্দেঃ মক্কায় ফেরার পথে মদীনার সন্নিকটে আবওয়া নামক স্থানে মাতা আমিনার মৃত্যু। দাসী উম্মে আয়মানের সাথে মক্কায় প্রত্যাবর্তন ।

দাদা আবদুল মুত্তালেব আভিভাবক হলেন।

৫৭৮ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৮ বছর ছয় মাস ১০ দিন : পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল।

৫৮০ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ১০ বছর : দ্বিতীয় বারের মত বিশ্বনবীর [সা] বক্ষ বিদীর্ণকরণ। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আওফের [রা] জন্ম।

৫৮২ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ১২ বছর : পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া সফর।

৫৮৩ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ১৩ বছর : বিশ্বনবীর [সা] শ্বশুর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের [রা] জন্ম।

৫৮৪ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ১৪ বছর : আরবের বিখ্যাত ওকাজের মেলা ক্ষেত্রে সংঘটিত ফুজ্জারের যুদ্ধে কোরাইশদের সমর্থনে অংশগ্রহণ।

৫৮৭ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ১৭ বছর : "হিলফুল ফুজুল" নামক শান্তি সংঘ গঠন।

৫৯৩ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ২৩ বছর : খাদিজার সাথে পরিচয়, তার ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। আসমা বিনতে আবু বকরের জন্ম।

৫৯৪ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ২৪ বছর : আবু বকরের [রা] সাথে ব্যবসা উপলক্ষ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন। বিশিষ্ট সাহাবী যুবাইর ইবনে আওয়ামের [রা] জন্ম।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ২৫ বছর : ব্যবসায়িক কাজে তৃতীয়বার সিরিয়া গমন। হযরত খাদিজার [রা] সঙ্গে বিবাহ বন্ধন।

৬০০ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৩০ বছর : বিশ্বনবীর [সা] জ্যেষ্ঠ কন্যা যয়নবের জন্ম।

আল-আমিন, উপাধি লাভ। চাচাত ভাই আলীর [রা] জন্ম।

৬০৫ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৩৫ বছর : কাবাঘর সংস্কারে অংশগ্রহণ। বিশ্বনবী [সা] হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে মিমাংসা করেন।

৬০৭ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৩৭ বছর : আলীর [রা] প্রতিপালনের ভার গ্রহণ। হেরা গুহায় অবস্থান ও ধ্যান পালন শুরু। বিশ্বনবীর [সা] জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসেমের জন্ম।

৬১০ খ্রিস্টাব্দেঃ ১ ফেব্রুয়ারী বয়স ৪০ বছর ১দিন : নবুওয়তের সূচনা। সর্বপ্রথম হেরা পর্বতের গুহায় ওহী নিয়ে জিবরীলের [আ] আগমন। খাদিজার সাথে বিখ্যাত পণ্ডিত ওরাকা ইবনে নওফেলের কাছে গমন।

ইসলাম প্রচারের নির্দেশ লাভ। সর্বপ্রথম খাদিজা, হযরত আলী ও আবু বকর সিদ্দিকের [রা] ইসলাম গ্রহণ। গোপনে ইসলাম প্রচার শুরু।

আরকামের ঘরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন।

পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা অবতীর্ণ।

৬১২ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৪২ বছর : আছমা বিনতে আবু বকর, সাঈদ ইবনে যায়েদ, খাব্বাব ইবনে আরাত, উমাইর ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মাসউদ

www.pathagar.com

ইবনে কারী, সালাম ইবনে আমর বিলাল ইবনে রাবাহ, আইয়াস ইবনে রাবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস [রা] প্রমুখগণের ইসলাম গ্রহণ।

৬১৩ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৪৩ বছর : আবু আহমদ ইবনে জাহাশ, [রা] আমর ইবনে রাবিয়া, জাফর ইবনে আবু তালেব, আছমা বিনতে সালাম, খুনায়েস, হাতিব ইবনে হারেস, ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল, হাত্তব ইবনে হারিছ, ফুকাইহা বিনতে ইয়াসার, মামার ইবনে হারেস, আমেল ইবনে যুহাইর, সাঈদ ইবনে উসমান, মুত্তালিব ইবনে আজহার, আবু হুযায়কা ইবনে উতবা, সালেম মাওলা আবি হুজায়ফা, রামলা বিনতে আবু আউফ, নাইম ইবনে আবদুল্লাহ [রা] প্রমুখগণের ইসলাম গ্রহণ।

৬১৫ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স : ৪৫ বছর : মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান। প্রথম পর্বে ১৬ জনের আবিসিনিয়ায় হিজরত।

৬১৬ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স : ৪৬ বছর : আবু জাহেল কর্তৃক বিশ্বনবীকে [সা] গালমন্দ। বিশ্বনবীর চাচা হামযা [রা], বিশিষ্ট কবি লবিদ ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা বিশিষ্ট কোরাইশ নেতা ওমরের [রা] ইসলাম গ্রহণ। প্রথমবারের মত মুসলমানদের প্রকাশ্য কা'বা প্রাঙ্গণে নামায আদায়।

৬১৭ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৪৭ বছর : শি'আবে আবু তালিবের আবরোধ জীবন শুরু।

৬১৮ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৪৮ বছর : সূরা আর আ'রাফ ও সূরা আল ফুরকান অবতীর্ণ। উসামা ইবনে যায়িদের [রা] জন্ম। কাবার ভেতরে জন্মগ্রহণকারী একমাত্র মানব হাকিম ইবনে হাযামের [রা] জন্ম।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৪৯ বছর : [মুহাররম] অবোধ জীবনের সমাপ্তি।

হযরত খাদিজা [রা] ও চাচা আবু তালিবের ইন্তেকাল। পুনরায় কোরাইশদের অত্যাচার শুরু।

৬২০ খ্রিস্টাব্দেঃ ৫০ বছর বয়স : ইসলাম প্রচারের জন্যে তায়েফ গমন। তায়েফবাসীর ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি ও নির্মম অত্যাচার।

সওদার [রা] সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ [২য় বিবাহ]

হজ্জ উপলক্ষ্যে হজ্জযাত্রীদের কাছে ইসলাম প্রচার। মদীনায় খাযরাজ বংশীয় ৬ জন ব্যক্তিবর্গের ইসলাম প্রচার শুরু।

হযরত আয়েশার সাথে বিবাহ বন্ধন। [৩য় বিবাহ]

৬২১ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৫১ বছর : বক্ষ বিদীর্ণকরণ। [২৭ রজব] মি'রাজ গমন। মি'রাজে মুসলমানদের উপর ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।

৬২৩ খ্রিস্টাব্দেঃ ১২ জিলহজ্জ বয়স ৫৩ বছর : আকাবায় ৭৫ জন মদিনাবাসীর বাইআত গ্রহণ, আব্বাসের [রা] ভাষণ প্রদান।

মুসলমানদের মদীনায় হিজরত শুরু। বিশ্বনবীকে [সা] হত্যার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা। "দারুন নদওয়া" বা কুরাইশ বৈঠকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়।

৬২৪ খ্রিস্টাব্দেঃ ১ হিজরী, ৮ই রবিউর আউয়াল বয়স ৫৪ বছর : বিশ্বনবী [সা] ও হযরত আবু বকর [রা] মদিনার পথে হিজরত করেন। শত্রুরা টের পায়নি।

www.pathagar.com

২৭ সেপ্টেম্বর [১২ রবিউল আওয়াল] মদিনার উপকণ্ঠে কুবায় অবস্থান। ৩০ সেপ্টেম্বর মদিনায় গমন। বনী সালেম আমর বিন আউফ পল্লীতে ১০০ জন লোক নিয়ে সর্বপ্রথম জুমার নামায আদায়। মদীনার বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইউব আনসারীর বাড়িতে অবস্থান। মসজিদে নববী ও আহলে সুফফার আবাসস্থল নির্মাণ। আনসার এবং মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মদিনার ইহূদি ও পৌত্তলিকদের নিয়ে বিখ্যাত মদিনা সনদ সম্পাদন।

আযান প্রথা প্রর্বতন, যোহর ও আছরের নামায দু'রাকআতের স্থলে চার রাকআতের বিধান প্রবর্তন।

৬২৫ খ্রিস্টাব্দেঃ [২ হিজরী] বয়স ৫৫ বছর : পুনরায় কা'বা শরীফকে কিবলা নির্ধারণ।

হযরত আলীর [রা] সাথে নবী করীমের [সা] ৪র্থ কন্যা ফাতিমার বিবাহ হয়।

সর্বপ্রথম জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আল-কুরআনের সূরা আল-হজ্জের ৩৯ ও ৪০ নং আয়াত আবতীর্ণ। মুসলমানদের উপর রোযা ও যাকাত ফরয করা হয়।

বদরের যুদ্ধ : হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে ইসলামের ইতিহাসে এটি প্রথম যুদ্ধ। ২য় হিজরী ৮ রমযান, প্রিয় নবী [সা] সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। মদীনার অস্থায়ী গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। সেনাবাহিনী ৩১৩ মতান্তরে ৩১৪ জন। ৮৩ জন মুহাজির বাকি সব আনসার। ১৭০ আউস এবং ৬১ জন খাযরাজ গোত্রের লোক। মুসলমানদের বিজয়। ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। ১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।

ফেৎরা দান ও ঈদের জামায়াত প্রচলন।

৬২৬ খ্রিস্টাব্দেঃ [৩য় হিজরী] ১১ শাওয়াল বয়স ৫৬ বছর : বিখ্যাত ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত। হামযার [রা] শাহাদাত। ৭০ জন মুসলিম সৈনিককের শাহাদাত ও ৪ জন বন্দী।

হযরত হাফসার [রা] সাথে বিবাহ বন্ধন [৪র্থ বিবাহ]।

হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মার [রা] সাথে বিবাহ বন্ধন [৫ম বিবাহ]।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দেঃ [৪ হিজরী] বয়স ৫৭ বছর : মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি। হযরত উম্মে সালমার [রা] সাথে বিবাহ বন্ধন [৬ষ্ঠ বিবাহ]। নবী করীমের [সা] নাতি ইমাম হাসানের [রা] জন্ম।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দেঃ ৫ম হিজরী] বয়স ৫৮ বছর : যায়েদ ইবনে হারিসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহাশকে বিবাহ [৭ম বিবাহ]। জুয়ায়রিয়া বিনতে হারেসের সাথে বিবাহ বন্ধন [৮ম বিবাহ]

হযরত আয়েশার [রা] উপর অপবাদ আরোপ। অযু ও তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন। অপবাদ আরোপের দণ্ড বিধান প্রবর্তন। তালাকের বিভিন্ন আইন প্রবর্তন।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দেঃ [৬ষ্ঠ হিজরী] বয়স ৫৯ বছর : হযরত উম্মে হাবিবার সাথে বিবাহ বন্ধন [৯ম বিবাহ]।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দেঃ ২২ মার্চ : হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ১৫০০ লোক নিয়ে মক্কার দিকে

www.pathagar.com

যাত্রা। হুদাইবিয়ার বাইয়াতুর রিদওয়ান গ্রহণ। ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর। বিশ্বের রাজন্যবর্গের কাছে বিশ্বনবীর [সা] দাওয়াত সম্বলিত চিঠিসহ দূত প্রেরণ শুরু। মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার নির্দেশ।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দেঃ [৭ম হিজরী] মুহাররম] বয়স ৬০ বছর : ইহুদীদের সাথে খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত। ইহুদীদের জিযিয়া প্রদান স্বীকৃতি।

হযরত মাইমুনা বিনতে হারিসের সাথে বিবাহ বন্ধন। [দশম বিবাহ]। হযরত সাফিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধন [একাদশ বিবাহ]। হারিস কর্তৃক নবী করীমকে [সা] বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা। হালাল হারামের বিধান ঘোষণা। হযরত মরিয়ায়ে কিবতিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। [দ্বাদশ বিবাহ]।

৬৩১ খ্রিস্টাব্দেঃ [৮ম হিজরী] বয়স ৬১ বছর : বাহরাইনের রাজা মুনজার ইবনে সাবি এর ইসলাম গ্রহণ ও বাহরাইন বিজয়। ওমান প্রদেশ বিজয়।

নবী করীমের [সা] পুত্র ইব্রাহীমের জন্ম।

জ্যেষ্ঠ কন্যা যয়নবের ইন্তেকাল।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দেঃ [১০ রমযান] ১০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ বিশ্বনবীর [সা] মক্কা যাত্রা। মক্কায় বিশিষ্ট নেতা আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ। মক্কা বিজয়। ২০ রমযান : কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ। কাবা ঘরে নামায আদায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

বয়স ৬২ বছর : [৯ম হিজরী] রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযান।

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দেঃ বয়স ৬৩ বছর [১০ম হিজরী] নবী করীমের [সা] কাছে মুসাইলামার চিঠি এবং রাসূলের পক্ষ থেকে জবাব দান। পুত্র ইব্রাহীমের ইন্তেকাল। যিলকদ [৭ মার্চ] ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবীসহ মক্কায় পবিত্র হজ্জব্রত পালন। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান। সাহাবাদের ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দেঃ ৬৩ বছর বয়স : [১১ হিজরী ২৮ সফর] বিশ্বনবীর [সা] অসুখের সূত্রপাত। নামাযে হযরত আবু বকরের ইমামতি।

৭ রবিউল আউয়াল : [১৩ জুন] : পীড়া বৃদ্ধি। সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী [সা] শেষ নসিহত, কবর পূজার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

১১ রবিউল আউয়াল : সর্বশেষ নামাযের জামায়াতে যোগদান।

১২ই রবিউল আউয়াল : ৮ই জুন ,সোমবার, বিকেলে বিশ্বনবী [সা] ইন্তেকাল।

সাদ ইবনে উবাদার উদ্যোগে সাকীফায়ে বানু সায়েদায় হযরত ওমরের নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে সকলের পরামর্শ। হযরত আবু বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ।

১৩ই রবিউল আউয়াল দিবাগত রাতে নবী করীমের [সা] দাফন সম্পন্ন হয়।■

www.pathagar.com

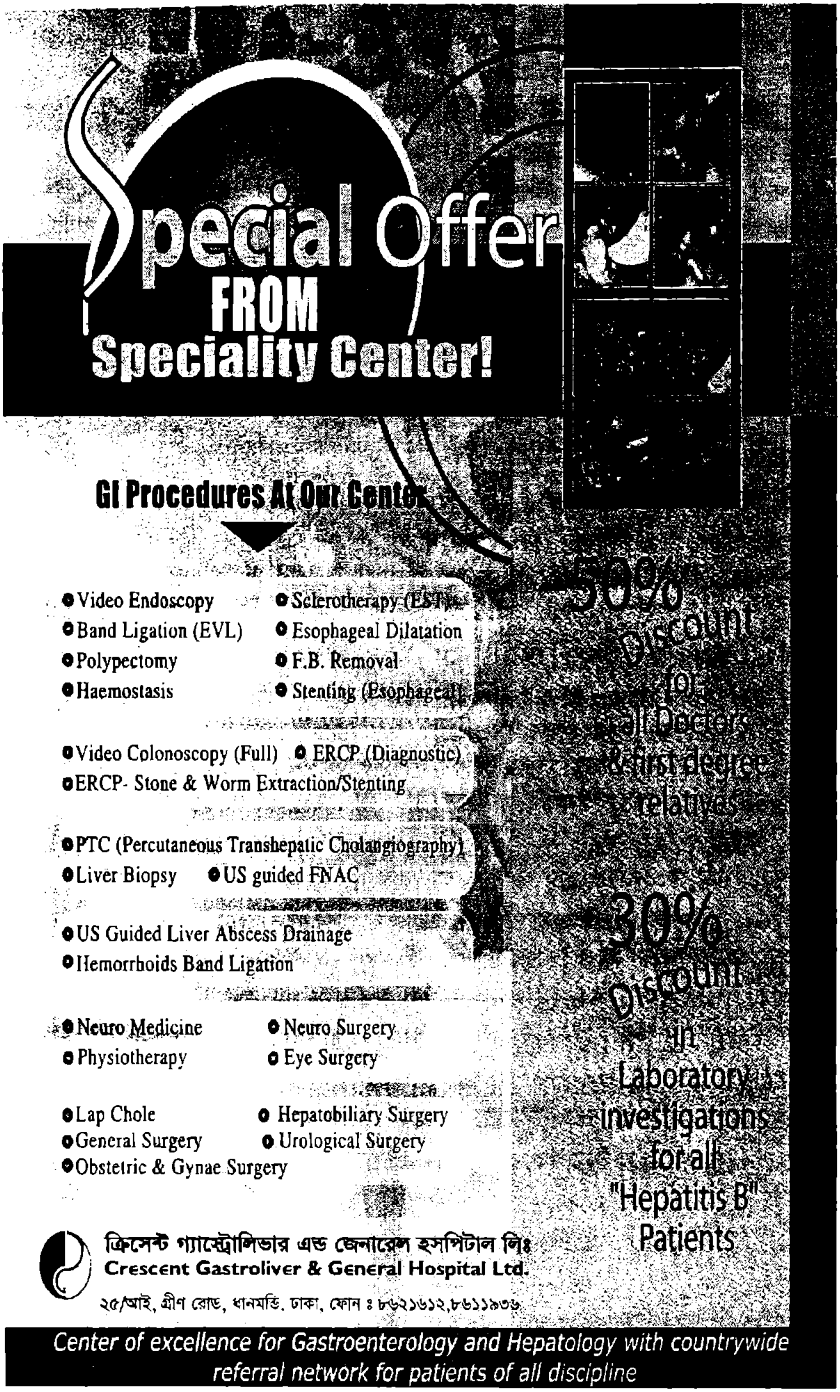

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের

বা র্ষি ক প্র তি বে দ ন

[জুন ২০০৭- এপ্রিল ২০০৮]

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

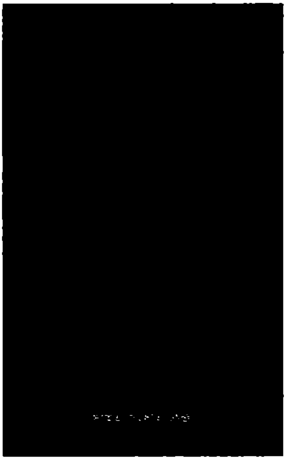

সুস্থ ধারার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে ক'টি সংগঠন ইতোমধ্যে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হচ্ছে- সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র তার মধ্যে অন্যতম। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও কবি আসাদ বিন হাফিজের নেতৃত্বে একদল দক্ষ ও গতিশীল সংগঠকের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এর কার্যক্রম। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হলো :

সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাত স্মারক-২০০৭

বিশিষ্ট কবি মোশাররফ হোসেন খানের সম্পাদনায় ও শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের প্রচ্ছদে সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ২০০৭ প্রকাশ করা হয়। এতে দেশের খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখা স্থান পায়। স্মারক-গ্রন্থটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় একশত টাকা মাত্র।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের রেজিস্ট্রেশন

'দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০' অনুযায়ী সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ২০০৭ সালে সরকারীভাবে নিবন্ধিত হয়। যার নম্বর হচ্ছে এস-৬৯০৯ [৯৭]/০৭।

www.pathagar.com

বন্যা দুর্গত ও সিডর আক্রান্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক বিবেচনায় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র নীরবে বসে থাকেনি। ২০০৭ সালের বন্যা ও সিডর আক্রান্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ। ১০ আগস্ট ২০০৭ ফরিদপুর জেলার উপকূলীয় নুর মণ্ডলের ডাঙ্গী এলাকার ২০০শত পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের নেতৃত্বে সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদুর রহমান, অর্থ সম্পাদক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও আবদুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ এতে অংশ নেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও যৌথবাহিনীর সদস্যরা নেতৃবৃন্দকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিচ্ছেন সিডরের ভয়াবহ আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন

www.pathagar.com

এছাড়াও সিডর আক্রান্ত বাগের হাটের বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ করেন সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদুর রহমান। ৫নং জোনের মাত্রা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সেক্রেটারী শোয়েব সাকিবের নেতৃত্বে পিরোজপুরের জিয়ানিগর উপজেলায় দুইদিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের সময় ত্রাণ গ্রহণ করছেন এক ক্ষতিগ্রস্ত মা

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্যরা

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের দৃশ্য

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের দৃশ্য [বায়ে]
এবং ত্রাণপ্রাপ্ত হাস্যোজ্জ্বল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকজন [ডানে]

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণে দৃশ্য [বায়ে]
এবং ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন [ডানে]

www.pathagar.com

কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

১৬ জুন ২০০৭ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রেসক্লাবের ভিআইপি কনফারেন্স লাউঞ্জে কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কবি ফররুখ আহমদের জীবনের ওপর তৈরীকৃত ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

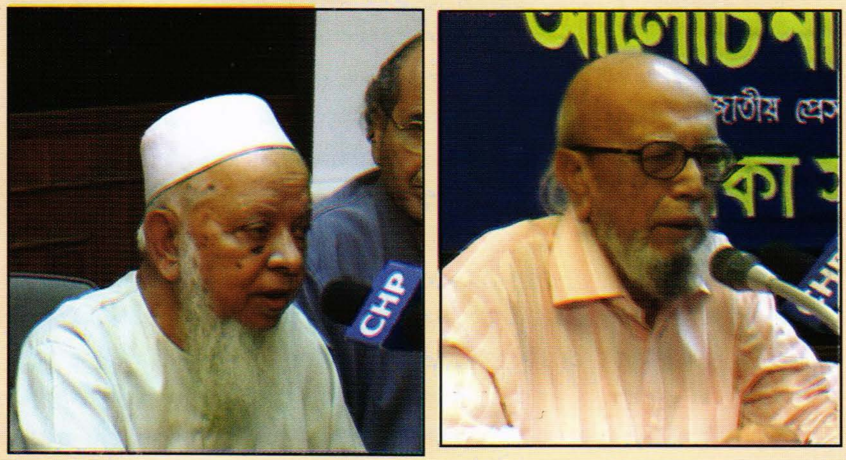

কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড.কাজী দীন মুহম্মদ ও কবি আল মাহমুদ

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, কবি আল মুজাহিদী ও অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। আলোচনা করেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি মোশাররফ হোসেন খান প্রমুখ।

কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ও কবি আল মুজাহিদী

www.pathagar.com

প্রধান অথিতির বক্তব্যে ড. কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, ফররুখ আহমদ মুসলমান হিসাবে যা বিশ্বাস করেছেন তাই লিখেছেন। তাই তিনি আমাদের বিশ্বাসের ও আদর্শের কবি। তাঁর লেখনি ও আদর্শকে ধারন করেই আমাদের বড় হতে হবে। তাঁর সকল রচনাই প্রমাণ করে তিনি শুধু ইসলামকে ধারন করেই লিখেছেন।

সভাপতির বক্তৃতায় কবি আল মাহমুদ বলেন, কবি ফররুখ ছিলেন বিশ্বাসী কবি, স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তিনি যে বিশ্বাসের ডাক দিয়ে গেছেন তা আমরা অন্তরে গেঁথেছি। তিনি যত বড় কবি ছলেন সেটা আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, কবি ফররুখ ও জসীম উদ্দীন আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে কবি ফররুখের জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহবান জানান। কবি আল মুজাহিদী বলেন, কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন রেনেসাঁর কবি। আমাদের মত তিনি এখানে ওখানে ছুট দেননি। তিনি আরো বলেন, জাতির এই ঘোর দুর্দিনে জাতিকে বাঁচাতে হলে ফররুখের উত্তরাধিকারীদের সত্যের পতাকাটি তুলে ধরতে হবে। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, ফররুখ আমহদ ছিলেন আদর্শের কবি। তাঁর এই আদর্শিক লেখার সংগে জাতিকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে জাতির উন্নয়ন করতে হবে। কবি আসাদ বিন হাফিজ বলেন, ৩৩ বছর পর তাঁর বাড়িতে জন্মবার্ষিকী অনষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব। কবি হাসান আলীম বলেন, কবি ফররুখ ছিলেন আমাদের স্বপ্নের কবি, এই স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। কবি মোশাররফ হোসেন খান বলেন, মহাকবি ফররুখ আহমদ–এক কালজয়ী কবির নাম। তিনি বিশ শতকের শেষতম মহাকবি। 'হাতেম তা'য়ী'র মতো অসাধারণ মহাকাব্য আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত আর কেউ মহাকাব্য রচনা করেননি। সুতরাং তাঁর নামের সাথে 'মহাকবি' শব্দটি অনিবার্যভাবেই যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সেটাই সময়ের দাবি।

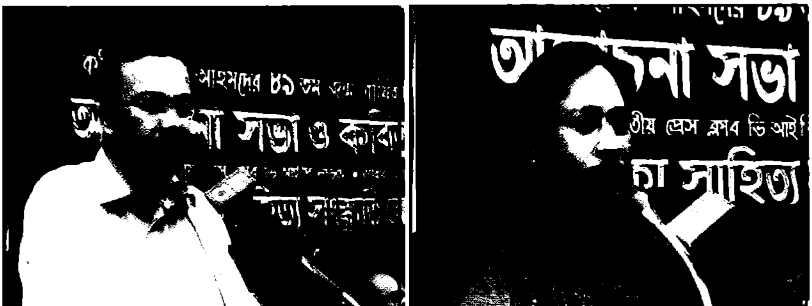

কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এবং সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ

www.pathagar.com

উক্ত অনুষ্ঠানে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন কবি আসাদ বিন হাফিজ যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ :

১. এই সভা অবিলম্বে বাংলা একাডেমী থেকে ফররুখ রচনাসমগ্র প্রকাশ করার জোর দাবি জানাচ্ছে

২. এই সভা প্রস্তাব করছে কবির সর্বশেষ বাস ভবন ইস্কাটনের বাজারের সামনের রাস্তাটিকে 'কবি ফররুখ সড়ক' নাম করণ করা হোক।

৩. এই সভা কবির জন্মস্থান মাগুরা জেলার মধুমতি তীরের মাঝআইল গ্রামের পৈতৃক বাড়িটিকে পর্যটনে আওতায় এনে সেখানে ফররুখ স্মৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলার আহবান জানাচ্ছে।

কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
কবি হাসান আলীম ও কবি মোশাররফ হোসেন খান

কবি ফররুখ আহমদের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করছেন
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ [বায়ে] ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ [ডানে]

www.pathagar.com

কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকারদের সম্মানে ইফতার মাহফিল

জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'যুক্তিভিত্তিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে ইসলামবিরোধী মহলের মুখোশ উন্মোচনে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও কলম সৈনিকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ রাজধানীর একটি রেস্তোঁরায় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মানে আয়োজিত উক্ত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ, কবি আল মাহমুদ, দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দীন, শিল্পকলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক সুরকার ও গীতিকার আজাদ রহমান, দৈনিক সংগ্রামের ব্যবস্থাপনা সম্মাদক মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূরুল ইসলাম বুলবুল, কবি আবদুল হাই শিকদার, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, কবি আল মুজাহিদী, অধ্যাপক ফজলে আজিম, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফ্রি থিংকার সোসাইটির চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর চৌধুরী, প্রফেসর ড. শফিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার সালাহউদ্দীন, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, ড. আবু ইউসুফ, ম. মিজানুর রহমান, কবি আশরাফ আল দীন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা নিজামী বলেন, রমযানের গোটা আয়োজন কুরআনকে কেন্দ্র করে। রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা আর তাকওয়া হচ্ছে কুরআনী হেদায়াতের আলোকে গড়ে তোলা নৈতিক গুণের নাম। এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে, কারণ এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। পবিত্র কুরআন হচ্ছে 'হুদাল্লিননাস'- অর্থাৎ গোটা মানবজাতির জন্য ন্যায়, ইনসাফ, শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র পথ। তিনি বলেন, এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করা হয়েছে। সূরা আন নহলের ৯০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, এই আয়াতটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতি জুমার খুতবায় তা পাঠ করা হয়। কুরআনের এ হেদায়াতের ভিত্তিতে এবং রাসূলের [সা] নেতৃত্বে গড়ে ওঠা উম্মতকে আল্লাহপাক শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সেই সাথে এই উম্মতের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে গোটা মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষ্যদানের জন্য। রাসূলের [সা] এই উম্মতরাই হবেন বিশ্বব্যাপী সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী। মাসব্যাপী রোযা পালনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ এই যোগ্যতা

www.pathagar.com

অর্জন করবে এটাই হচ্ছে রমযান ও রোযার দাবি। কুরআনের এই সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন আবেদন জাতি ধর্ম নিবির্শেষে সকলের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজের। একজন প্রকৃত খাঁটি মুসলমান হিসাবে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উপস্থিত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, মুসলমানদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক কুরআনের বিশ্বজনীন আদর্শকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ কুরআন নাযিল হয়েছে গোটা মানব সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।

জোন তিন-এর উদ্যোগে কবি ফররুখ আহমদের ৩৩তম মৃত্যু বার্ষিকী ও ঈদপুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

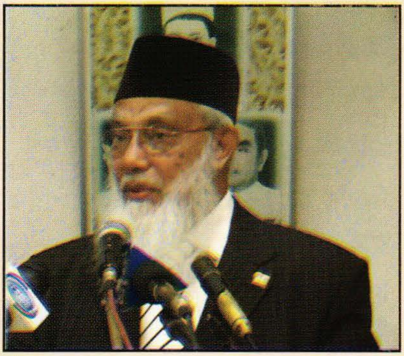

ফররুখ আহমদের ৩৩তম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

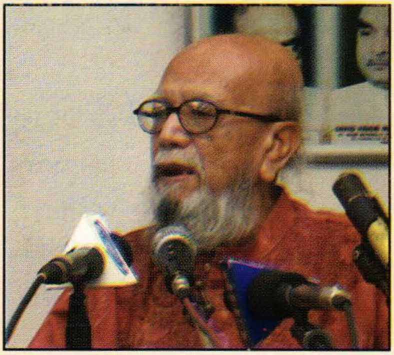

ফররুখ আহমদের ৩৩তম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

"ফররুখ আহমদ যেমন বড় মাপের মানুষ ছিলেন তেমনি ছিলেন বড় মাপের কবি। এক অসাধারণ কবিত্ব শক্তি নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা একথা বলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের জোন তিন-এর উদ্যোগে রাজধানীর হামদর্দ মিলনায়তনে ফররুখ আহমদের মৃত্যুবার্ষিকী, ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংবাদ পাঠক দেওয়ান সাইদুল হাসান, কবি হাসান

www.pathagar.com

আলীম, কবি মোশাররফ হোসেন খান ও কবি শরীফ আবদুল গোফরান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জোন তিন-এর সভাপতি আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

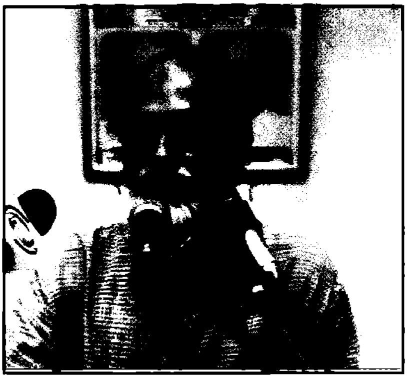

ফররুখ আহমদের ৩৩তম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক

অনুষ্ঠানে বিচারপতি আবদুর রউফ বলেন, যাদের কোন অতীত নেই তারা হতভাগা, যারা অতীতকে স্মরণ করে না তারাও হতভাগা। তিনি বলেন, আজকে আমরা অতীতকে স্মরণ করছি, ফররুখ আহমদকে স্মরণ করছি। এটা আমাদের সৌভাগ্য। ফররুখ আহমদ যেমন বড় মাপের মানুষ ছিলেন তেমনি একজন বড় মাপের কবিও ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

কবি আল মাহমুদ বলেন, এক অসাধারণ কবিত্ব শক্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব। তাঁর মতো শক্তিমান কবির কাছে আমরা অনেকভাবে ঋণী।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল ফররুখ আহমদের গান, কবিতাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী ও অনিন্দ্য সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে।

বক্তব্য রাখছেন দেওয়ান সাইদুল হাসান

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখছেন কবি হাসান আলীম

বক্তব্য রাখছেন কবি মোশাররফ হোসেন খান

বক্তব্য রাখছেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

বক্তব্য রাখছেন কবি শরীফ আবদুল গোফরান

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল

বিগত ১৭ আগস্ট, ২০০৭ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভি,আই, পি লাউঞ্জে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ।

কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাদেক খান, নয়া দিগন্ত সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, শিক্ষাবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ, সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ, চারুকলার সাবেক ডিজি ড. আব্দুস সাত্তার, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল [অব.] আবু বকর সিদ্দিক, কবি আবদুল হাই শিকদার, সংগ্রামের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুবুল হক, চিত্র অভিনেতা আবুল কাশেম মিঠুন, নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন, ড. রওজাতুর রুম্মান, চিত্র পরিচালক মো: হাফিজ উদ্দিন প্রমুখ। প্রস্তাবনা পাঠ করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। বক্তারা জাতীয় এই দুর্যোগের মুহূর্তে পুরনো ইস্যু সামনে না এনে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ মুকাবেলায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

www.pathagar.com

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান বিচারপরিত মোহাম্মদ আবদুর রউফ এবং সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট মাহফুজ উল্লাহ

বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাদেক খান ও চারু কলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আবদুস সাত্তার

www.pathagar.com

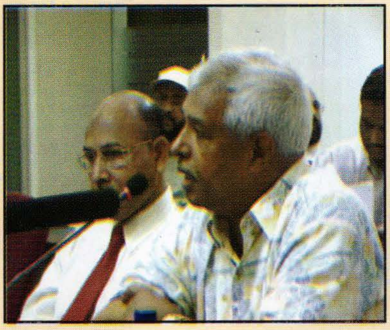

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন
বিগ্রেডিয়ার জেনারেল [অব.] আবু বকর সিদ্দিক এবং দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন

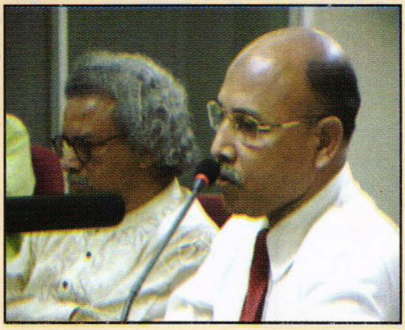

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন
দৈনিক সংগ্রামের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুবুল হক এবং কর্ণেল [অব.] আলাউদ্দিন গাজী

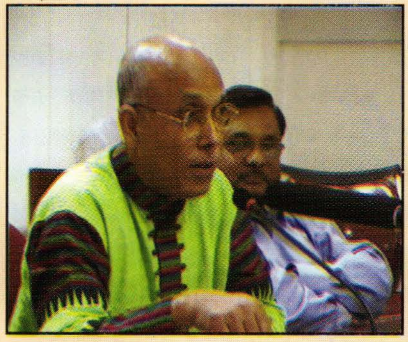
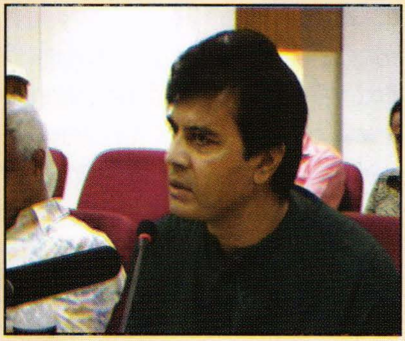

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে
বক্তব্য রাখছেন কবি আবদুল হাই শিকদার ও চিত্র নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন

www.pathagar.com

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন
চিত্র নায়ক আবুল কাশেম মিঠুন ও ড. রওজাতুর রুম্মান

বন্যা মুকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন
কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ

শাখা সংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক

১৫ নভেম্বর, ২০০৭ জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে বেলা ৩ টায় সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের উদ্যোগে 'নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়ন সময়ের দাবী' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন সাংস্কৃতিক সংগঠক অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্টের আহবায়ক কবি আসাদ বিন হাফিজ। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ, খবরপত্র সম্পাদক গিয়াস কামাল চৌধুরী, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল [অব.] আবু বকর সিদ্দিক, ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, কবি আবদুল হাই শিকদার, অধ্যাপিকা মাহবুবা চৌধুরী,

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, মাহবুবুল হক, হাফিজ উদ্দিন, কাজী মোরতুজা আলী, ড. রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, ড. হাসান মোহাম্মদ, ইঞ্জি: মো: ইসহাক, মেজর সাঈদ, অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন, কবি হাসান আলীম প্রমুখ।

শাখা সংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত আলোচকবৃন্দ

শাখা সংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ

গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকগণ গত ১৪ নভেম্বর ২০০৭ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ইতিবাচক বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচকগণ বলেন, গোটা জাতি যখন আগামী নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, তখন একটি চিহ্নিত মহল যুদ্ধাপরাধী,

www.pathagar.com

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি ননইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আলোচকগণ এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

শাখা সংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন
প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ

২১ ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় জাতীয় প্রেসক্লাব কনফারেন্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, ছড়া ও কবিতা পাঠের আসর, দেশের

www.pathagar.com

গান এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী। এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইতিহাসবিদ ও গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, দৈনিক সংগ্রামের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুবুল হক, কবি আসাদ বিন হাফিজ,মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান, মো: আবেদুর রহমান, কবি শরীফ আবদুল গোফরান প্রমুখ। কবিতাপাঠে অংশ নেন কবি শরীফ আবদুল গোফরান, মনসুর আজিজ, নাজমুস সা'দাত, আমিন আল আসাদ প্রমুখ। ভাষার গান পরিবেশন করেন মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী ও মো: আমিনুল ইসলাম। আবৃত্তি করেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও আহসান হাবীব খান। সবশেষে ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়।

বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০০৭

বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্যরা সপরিবারে ঢাকার অদূরে রূপগঞ্জের পন্ডগার্ডেনে শিক্ষা সফরে যান। ৭ ডিসেম্বর ২০০৭ দুই শতাধিক নারী-পুরুষের সরব উপস্থিতিতে পন্ডগার্ডেনের সবুজ জমিন আলোড়িত হয়ে ওঠে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা মেতে ওঠেন এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে।
ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, বড়দের প্রতিযোগিতা, সমাপনী অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান– সব মিলিয়ে একটি আনন্দঘন ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সবাই সময় কাটান।

বার্ষিক শিক্ষা সফরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দিচ্ছেন বিশিষ্ট ব্যাংকার ও ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (বায়ে) এবং শিক্ষা সফরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ (ডানে)

www.pathagar.com

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও লেখক সম্বর্ধনা

বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেছেন, অনেক রক্তপাত ও অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এ দেশের মানুষ মুসলমান। আমাদের ধর্ম ইসলাম। ধর্মই আমাদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি। আমরা মুসলমান হওয়ায় আমাদের স্বাধীনতা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। আর ভবিষ্যতেও পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

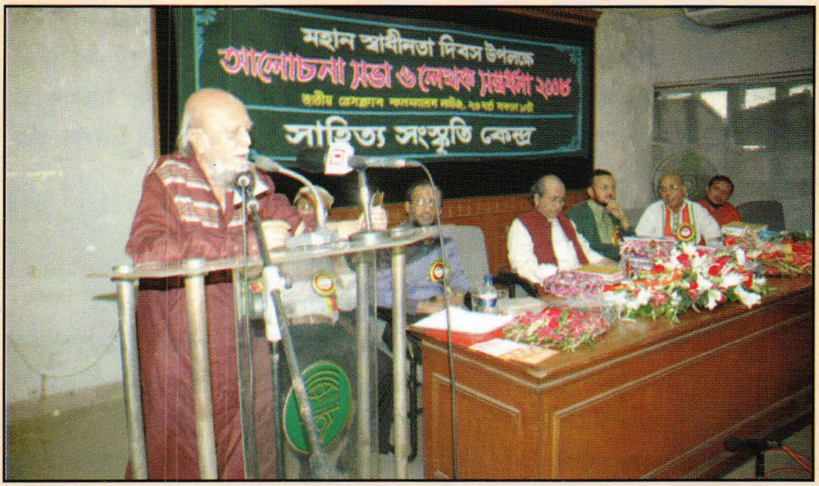

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কবি আল মুজাহিদী

www.pathagar.com

গত ২৬ মার্চ ২০০৮ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কবি আল মুজাহিদী, কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, কবি আবদুল হাই শিকদার, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি আমীরুল ইসলাম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ আবেদুর রহমান।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে সম্মাননাপ্রাপ্ত লেখকবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের ২৩ জন সদস্যের বই প্রকাশ হওয়ায় তাঁদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। সম্বর্ধিত লেখকরা হলেন- মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কাজী মোরতুজা আলী, কবি সৈয়দ রফিক, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি নাসির হেলাল, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিশু সাহিত্যিক ইকবাল কবীর মোহন, কবি হারুন ইবনে শাহাদাত, আহসান হাবীব বুলবুল, কবি মহিউদ্দিন আকবর, কবি মনসুর আজিজ, কবি সামুয়েল মল্লিক, কথাসাহিত্যিক নাসীমুল বারী, ছড়াকার জামান সৈয়দী, মানসুর মুজাম্মেল, মুজাম্মেল প্রধান, শাহ মুহাম্মদ মোশাহিদ, নিজাম সিদ্দিকী, মালেক মাহমুদ, জালাল ইউসুফী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কবি আল মুজাহিদী বলেন, আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এ স্বাধীনতা সবার স্বাধীনতার মধ্যে বিভাজন করা চলবে না। স্বাধীনতার নামে জাতিকে বিভক্ত করলে দেশে বিপর্যয় নেমে আসবে।

www.pathagar.com

কবি আবদুল হাই শিকদার বলেন, একমাত্র বাংলাদেশের মানুষ নিজ মাতৃভূমিকে অকার্যকর হিসাবে গালি দেয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন নজির নেই। যে সকল বুদ্ধিজীবী বিদেশীদের দালাল হিসাবে দেশদ্রোহী কাজ করছে মহল্লাভিত্তিক তালিকা করে তাদের নজরদারীর মধ্যে রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মাহবুবুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন শেষ হয়নি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অহ্বান জানান।

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাহবুবুল হক

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি মো: আমীরুল ইসলাম

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা ও লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

বক্তব্য রাখছেন কবি আসাদ বিন হাফিজ

লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত লেখক ও শ্রোতাদের একাংশ

www.pathagar.com

লেখক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে হামদ, না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ৪ এপ্রিল, ২০০৮ সন্ধ্যা ৬.৩০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ হামদ-না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হামদ-না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যা উদ্বোধন করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি জে আর মুদাচ্ছির। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জে আর মুদাচ্ছির বলেন, আমরা শুধু পবিত্র কুরআন পড়ব না, তার অনুসরণও করব। দেশ ও জাতির উন্নয়ন– নবী করীম [সা]-এর জীবন অনুসরণ করা ছাড়া সম্ভব নয়।

সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে হামদ, না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি জে আর মুদাচ্ছির এবং কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

আমরা দ:খের সাথে লক্ষ্য করছি দেশের উন্নতির জন্য যখন সবাই মিলে কাজ করা দরকার তখন আমরা এক ভাই অপর ভাইকে শত্রু মনে করছি। তিনি বিভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

সীরাতুন্নবী [সা] উপলক্ষে হামদ, না'ত পরিবেশন করছেন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা

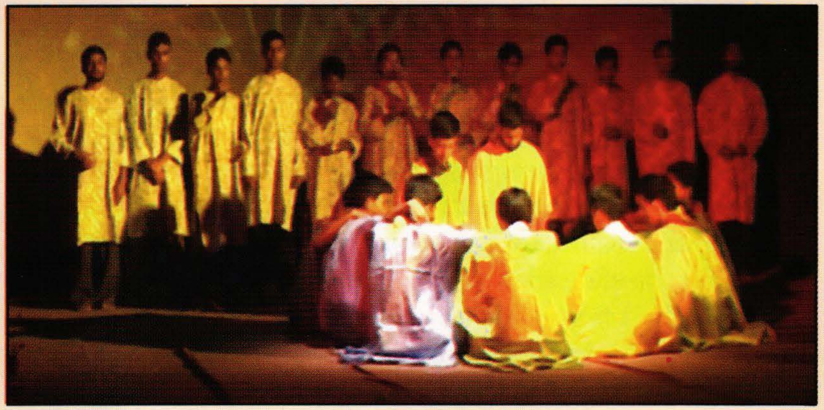

সীরাতুন্নী [সা] উপলক্ষে হামদ, না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যায় সম্মিলিত পরিবেশনার দৃশ্য

উদ্বোধনী পর্বের শেষে শরীফ বায়জীদ মাহমুদের গ্রন্থনা ও পরিচালনায় হামদ-না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ পরিবেশনার মাধ্যমে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ, উত্তরা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, অনিন্দ্য সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের শিল্পীবৃন্দ এবং টুনটুনিদের আসরের ক্ষুদে শিল্পীরা। রাসূলে করীমের [সা] শানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি জাকির আবু জাফর, কবি মনসুর আজিজ, কবি শুভ্র জাহিদ। কবিতা আবৃত্তি করেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও আহসান হাবীব খান। গণসঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে ঝড় তোলেন শিল্পী আবুল কাশেম ও তাঁর সহশিল্পীরা।
এছাড়াও মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী কোরাসে অংশ গ্রহণ করেন কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গানের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দৃশ্যায়ন ছিল বাড়তি আকর্ষণ। হল উপচে পড়ে দর্শকরা ঠাঁই নেন বাইরে। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হাজারো দর্শক উপভোগ করেন শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা। এক কথায় এ এটা ছিল হাজারো নারী, পুরুষ ও শিশুদের নবীর [সা] প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের এক বিরল নজির।

www.pathagar.com

সীরাতুন্নী [সা] উপলক্ষে হামদ, না'ত ও আবৃত্তি সন্ধ্যায় বক্তব্য রাখছেন
কবি আসাদ বিন হাফিজ ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

পল্টন ও অন্যদিগন্ত সাহিত্য সংসদের আয়োজনে

নির্বাচিত কবিদের একুশের কবিতা পাঠ ও 'মাতৃভাষা' শীর্ষক আলোচনানুষ্ঠান

মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পল্টন সাহিত্য সংসদ ও অন্যদিগন্ত সাহিত্য সংসদের যৌথ আয়োজনে নির্বাচিত কবিদের একুশের কবিতা পাঠ ও মাতৃভাষা শীর্ষক এক আলোচনানুষ্ঠান মতিঝিলস্থ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আবদুল হাই শিকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারি কবি আসাদ বিন হাফিজ ও কবি হাসান আলীম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অন্যদিগন্ত সাহিত্য সংসদের সভাপতি মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কবি নাসির হেলাল, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি শফিকুর রহমান রঞ্জু, ছড়াকার আব্দুর রহমান বিক্রম, কবি ইদ্রিস সরকার প্রমুখ।

পল্টন সাহিত্য সংসদ ও অন্যদিগন্ত সাহিত্য সংসদের যৌথ আয়োজনে মাতৃভাষা শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে পল্টন সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি মহিউদ্দিন আকবর এবার একুশে বইমেলায় প্রকাশিত সংসদের কবি-সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলীর পরিচয় তুলে ধরেন।
পল্টন সাহিত্য সংসদের সেক্রেটারী জাকারিয়া খান সৌরভের পরিচালনায় 'মাতৃভাষা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক এস এম রইস উদ্দিন। কবিতা পাঠে অংশ নেন ছড়াকার মানসুর মুজাম্মিল, কবি নূর-ই আউয়াল, ছড়াকার মতিউর রহমান মনির, নার্গিস চমন, কবি কাব্য সুলতানা, ছড়াকার আমিনুল ইসলাম মামুন, ছড়াকার নজরুল ইসলাম শান্ত, রেদওয়ানুল হক, সিদ্দিক আবুবকর, এনাম শেখ, আনতা নূর হক, আবুল হোসেন ময়েজী, শেখ সাদী আরিফ, পলাশ-ই আশিক, শাকিল মাহমুদ ও আবিদ আজম। এছাড়া ছড়াকার-গীতিকার গোলাম নবী পান্নার পরিচালনায় এক ঝাঁক তরুণ কবিও অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন।

১৪১৫ সাল উদযাপন

১৪ই এপ্রিল ২০০৮ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত বাংলা নবর্ষ ১৪১৫ উপলক্ষে মহানগর নাট্যমঞ্চ সংলগ্ন গুলিস্তান শিশুপার্কে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালীর। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহম্মদ আবদুর রউফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদের নির্বাহী পরিচালক জামাল উদ্দিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মো: শহীদ ফারুকী, মজিবুর রহমান মনজু, কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল, কবি শরীফ আবদুল গোফরান প্রমুখ।

১৪১৫ সাল উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

www.pathagar.com

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে একটি কলুষিত ধারা দিয়ে বিশৃঙ্খল করে তুলছে। আজ সময় এসেছে সুস্থ সংস্কৃতির সাথে অপসংস্কৃতির পার্থক্য করার। তিনি বলেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের আজকের এই বর্ণাঢ্য আয়োজন জাতিকে দিক নির্দেশনা দিতে সহায়তা করবে।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংবাদপাঠক ও আবৃত্তিকার শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও নাট্যকার আহসান হাবীব খানের উপস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সাইমুম, প্রবাহ, নিমন্ত্রণ, মহানগর, অনুপম, ফুলের মেলা ও টুনটুনিদের আসরসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বৈশাখের গান, দেশের গান, পল্লীগীতি, গম্ভীরাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

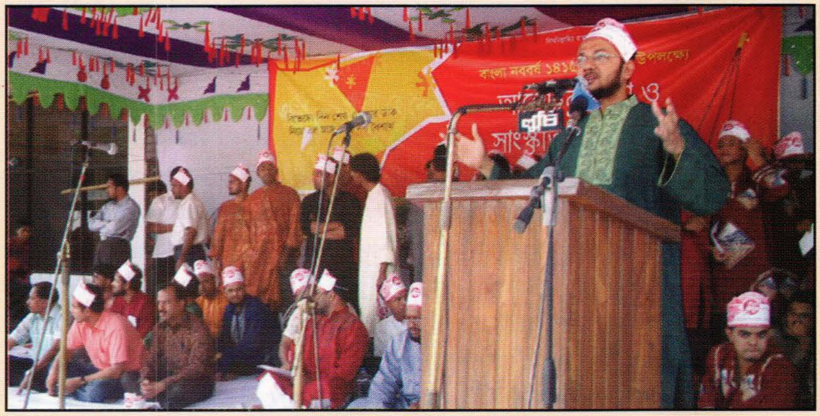

১৪১৫ সাল উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

১৪১৫ সাল উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ও আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি। র‍্যালিটি মহানগর নাট্যমঞ্চ থেকে শুরু হয়ে জিরোপয়েন্ট, পল্টন মোড় থেকে কাকরাইল হয়ে পুরানা পল্টনে এসে শেষ হয়। র‍্যালির বিশেষ আকর্ষণ ছিল আবহমান বাংলার ঐতিহ্য লাঙ্গল-জোয়াল, ধানের মুঠি, দাঁড়িপাল্লা, ঢেঁকি, নৌকা, মাটির কলস, শিঁকা, ছনের ঘর, বর-কনে, পালকিসহ অনেক কিছু। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বৈশাখী এই আয়োজনে হাজার হাজার নারী- পুরুষ, শিশু-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চলমান স্রোতের বিপরীতে সুস্থ সংস্কৃতির এক নয়নাভিরাম দৃশ্য নগরবাসীর নজর কাড়ে।

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচী

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা [ওপরে ও নিচে]

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে জাতীয় পতাকা র‍্যালী

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

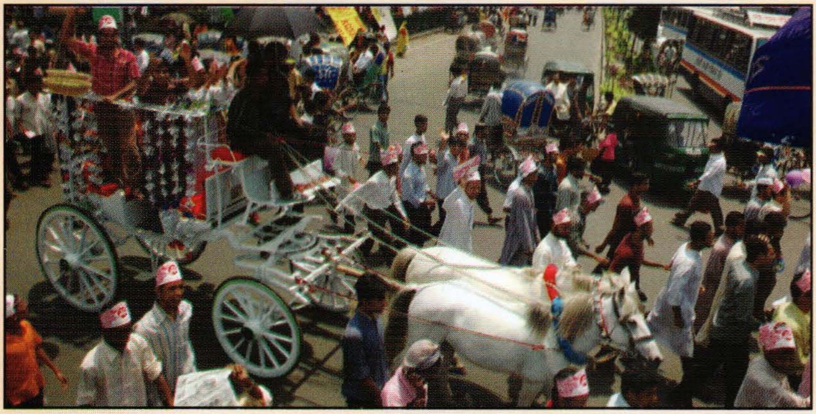

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪১৫ সাল উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে টমটম র‍্যালী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শীঘ্রই বের হচ্ছে-
আমাদের প্রযোজিত
৪টি টেলিফিল্ম

- বিচার
- হাট্টুয়া
- বন্ধু
- উপলব্দি

গ্রামীণ ফোনে
২২০০ ডায়াল
করুন *

প্রতিদিন তেলাওয়াত
তরজমা, হাদীস
ইসলামী গান,
রাসূল সা. জীবনী ও
নামাজ শিক্ষা সহ
প্রয়োজনীয় ইসলামী
তথ্য সেবা গ্রহণ করুন

* চার্জ, ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য

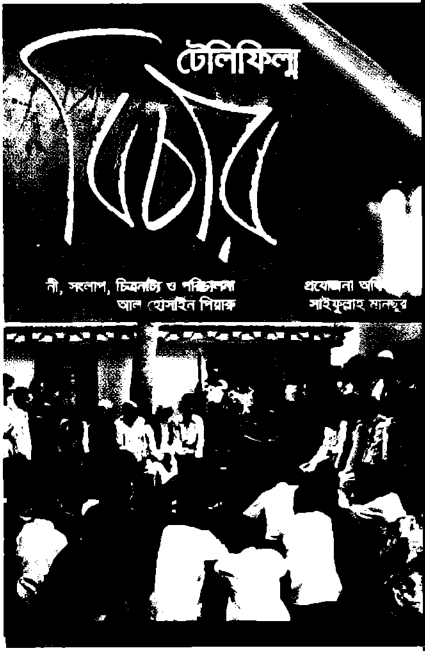

স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

CHP

প্রধান কার্যালয়ঃ ফোন- ৯৩৪২২১৫, ০১৭১১৮২৭৯৫৩, ০১৭১১১১৮৫৪৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৩৬২৩৫০ e-mail : spondon@bangla.net

ঢাকার শো-রুম-১ : বড় মগবাজার ফোনঃ ৯৩৬০৭৭১
ঢাকার শো-রুম-২ : কাঁটাবন ফোন ঃ ০১৭১৪৩৬১৬১৬
সিলেটের শো-রুম : করিম উল্লা মার্কেট ফোন ঃ ০১৭২৬৫৪৩৯১১
ফেনী শো-রুম : তমিজিয়া শপিং সেন্টার ফোন- ০১৭২৬৪৯৫৯৮৫
চট্টগ্রামের শো-রুম : ইসকপ অডিও ভিডিও সেন্টার ফোন ঃ ০১৭১১৩৮১৯৬০
বগুড়ার শো-রুম : ৭, ইসলামী ব্যাংক প্লাজা ফোন ঃ ০১৮১৯-০৪২০১০
সাতক্ষীরার শো-রুম : মুনশি পাড়া, পুরাতন সাতক্ষীরা, ফোন ঃ ০১৭১০৯৫৮২৪৮
কুমিল্লা শো-রুম : কুমিল্লা টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্স ফোন ঃ ০১৭২৫৬১১৩৩৬
যশোর শো-রুম : মোল্লাপাড়া মোড়, ঢাকা রোড, যশোর, ফোন ঃ ০১৭২৬৯৩২৯০০

ক্যাসেট সিডি ভিসিডি ডিভিডি ক্রয়ের সময় মনোগ্রাম দেখে নিন

www.pathagar.com

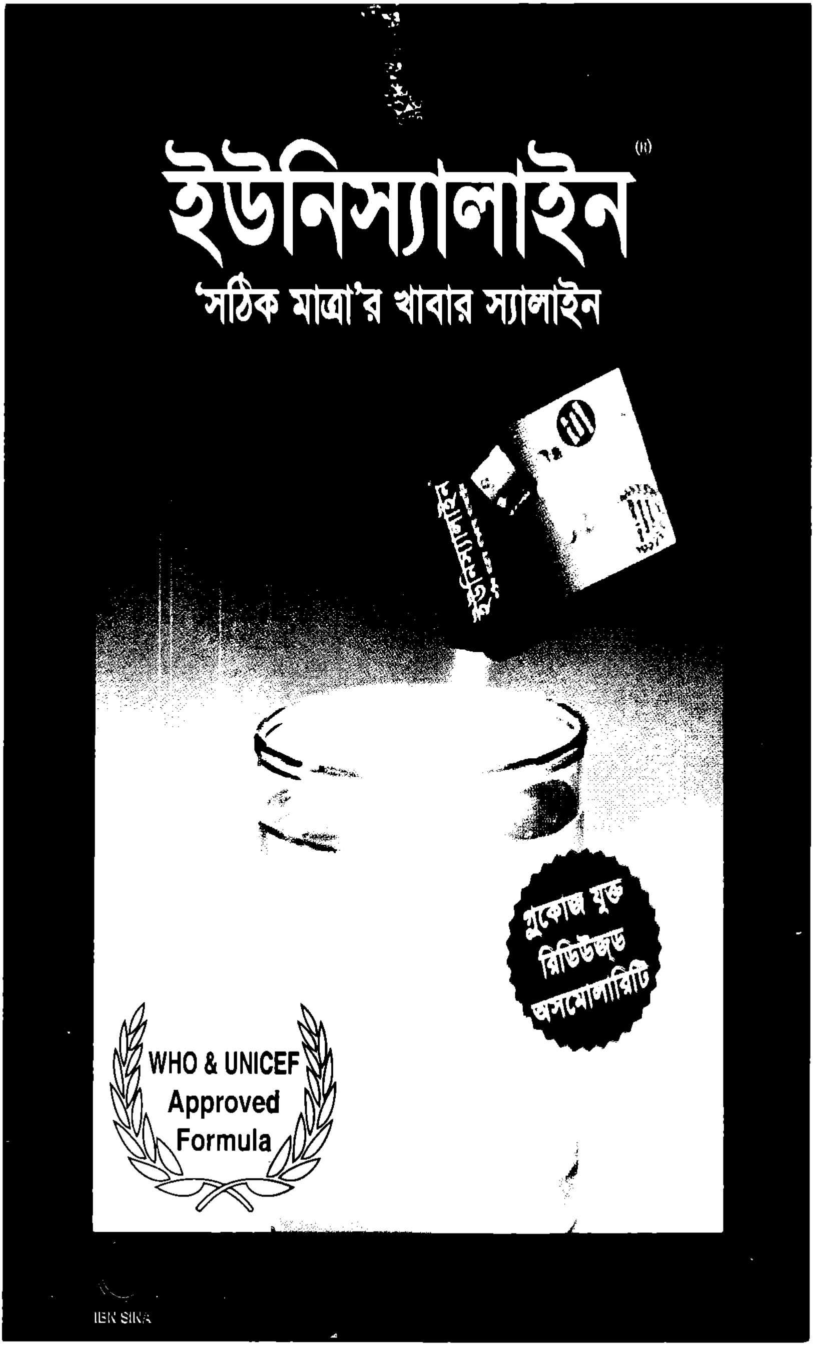

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বিকামালিহী

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনিরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুতকণা-স্ফুলিংগে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিননুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আল-ফারুকের-হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদত অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে
নিখিল ব্যথিত 'উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে।
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

ফর্‌রুখ্ আহ্‌মদ

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত